ব হ্নি ব ন্যা

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

মিত্র ও ঘোষ

১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

প্রথম মুদ্রণ, চৈত্র, ১৩৬৫

—সাড়ে আট টাকা—

[রচনাকাল : মে, ১৯৫৬-মার্চ, ১৯৫৭]

প্রচ্ছদপট :

অঙ্কন—আশু বন্দ্যোপাধ্যায়

ব্লক ও মুদ্রণ—রিপ্রোডাকশন সিণ্ডিকেট

মিত্র ও ঘোষ, ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে এস. এন. ... র্তৃক

মিত্র শ্রীদুর্গা প্রেস, ২।১, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা-৬ হইতে শ্রীগো... পাল ম

উৎসর্গ

শ্রীরাজশেখর বসু

শ্রীচরণেষু

১৮. ৩. ৫৯

কয়েকটি কথা

সিপাহীবিদ্রোহের পটভূমিকায় বহু ছোটগল্প লিখেছি—বহুদিন থেকেই লিখছি। তবে সেগুলির সঙ্গে ইতিহাসের সম্পর্ক খুব যে বেশি ছিল এমন কথা বলতে পারি না। ঐ সময়কার ইতিহাসাশ্রিত কোন কাহিনী নিয়ে একটি বড় উপন্যাস রচনা করব—এ ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও উপাদানের অভাবে এতদিন কাজে হাত দিতে পারি নি। কিছুকাল আগে ডাঃ প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের আনুকূল্যে অনেকগুলি মূল্যবান ইতিহাসের বই হাতে এসে গেল। তার মধ্যে Forbes-Mitchell এর স্মৃতিকথা পড়তে-পড়তে হঠাৎ ওয়ালেস ও হোপের বিচিত্র কাহিনী পেয়ে গেলাম।

সেই সঙ্গে আরও একটি জিনিস পেলাম—ও বইয়ে শুধু নয়, আরও অনেকগুলি বইতেই—বিবিঘরের হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে একটি বিচিত্র তথ্য। এ ব্যাপারে নানাসাহেবের এক মুসলমানী রক্ষিতা—হুসেনী বিবিরই সমধিক আগ্রহ ছিল, এবং সিপাহীরা সে হত্যায় অসম্মত হলে তিনি কয়েকজন কসাইকে প্রচুর অর্থলোভ দেখিয়ে ঐ কাজ করিয়েছিলেন। কোন কোন বইতে এই প্রসঙ্গে সর্দার খাঁর নামও পাওয়া যায়। বিদেশের কতকগুলি অসহায় স্ত্রীলোক ও শিশু সম্বন্ধে এই জিঘাংসার কোন কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না—যেমন পাওয়া যায় না ইতিহাস-প্রসিদ্ধ বারনারী আজিজনের ইংরেজ-হত্যায় অতিরিক্ত উৎসাহের কোন হেতু। Forbes-Mitchell-এর স্মৃতিকথাতেই জেমি গ্রীনের রোমাঞ্চকর কাহিনী পাই। মহম্মদ আলি খাঁ এই প্যাটার্নের সঙ্গে মিলে যান বলে তাঁর গল্পটুকুও আমি নিয়েছি। হীরালালের নামও আছে ঐ বইতেই। সবটা মিলিয়ে এই কাহিনী গড়ে তুলেছি।

বিশ্বাসযোগ্য ইতিহাস যতটা পাওয়া গেছে—ততটা ঠিক রাখবারই চেষ্টা করেছি এ উপন্যাসে। শুধু শেষের দিকে সেকেন্দ্রাবাগের যুদ্ধটা এক দিন পিছিয়ে দিয়েছি আর হীরালালের একটি ছোট্ট কাহিনী সামান্য কদিন এগিয়ে এনেছি। আশা করি উপন্যাসলেখকের এ অপরাধটুকু ইতিহাস-পাঠকরা ক্ষমা করবেন।

ডাঃ প্রতুলচন্দ্র গুপ্তের কাছে আমার অনেক ঋণ। শুধু বই দিয়ে নয়, নানারকম উৎসাহ ও উপদেশ দিয়ে তিনি আমাকে বহু সাহায্য করেছেন তাঁকে ধন্যবাদ জানানো বাহুল্যমাত্র।

বইটি ছাপতে যাবার আগে পাণ্ডুলিপি-সংশোধনে শ্রীমান বিজয়কুমার মিত্র আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। তাঁকে আমার কৃতজ্ঞতা ও প্রীতি জানাচ্ছি।

ব হ্নি ব ন্যা

॥ ১ ॥

১২৭৩ সনের অগ্রহায়ণ মাস। দুটি বাঙালী ব্রাহ্মণ হাঁটা-পথে মীরাট যাচ্ছিলেন। বয়োজ্যেষ্ঠের নাম মৃত্যুঞ্জয়, কনিষ্ঠটি তাঁর ভাগ্নে—নাম হীরালাল। মৃত্যুঞ্জয়ের বয়স পঁয়তাল্লিশের কাছাকাছি, হীরালাল সতেরো পার হয়ে আঠারোর পা দিয়েছে—তরুণ বালক মাত্র।

আমরা যে দিনের কথা বলছি সে দিনটা হীরালালের সুপ্রভাত হয় নি। ভোর হতেই মামা বকাবকি ও গালাগালি শুরু করেছেন। আর এখনও, এই বেলা প্রথম প্রহর পার হবার মুখেও, তা বন্ধ হয় নি। মামার রাগের কারণ মুখ্যত এই যে, তিনি বহুদিন পশ্চিমে চাকরি করছেন, এখানকার শীত সম্বন্ধে তাঁর যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে, তিনি চেয়েছিলেন একটি 'রেজাই' আনতে (পশ্চিমে লেপকে রেজাই বলে), এই অবাচীন ভাগ্নেটি তা আনতে দেয় নি। তরুণ ভাগ্নে থাকতে মামা আর কিছু মাল বইবেন না, তাকেই সেই বোঝাটি বইতে হবে—বোধ করি এইটে বুঝেই সে প্রবল আপত্তি তুলেছিল। বলেছিল, 'এই তো সবে শীতের শুরু—এখন কাঁথাতেই বেশ ভাল চলে যাবে। আর ক'টা দিনই বা, রানীগঞ্জ পর্যন্ত যখন রেলগাড়িতে যাচ্ছি তখন আর ভাবনা কি, বাকী পথ তো শুনেছি পনেরো দিনে মেরে দেওয়া যায়।'

কিন্তু বাংলাদেশে শীতের শুরু হলেও, পশ্চিমে এর মধ্যেই জাঁকিয়ে শীত পড়েছে। [illegible]গার জলে এমন কামড় লাগছে যে সকালে সেদিকে ঘেঁষা দুষ্কর। সূর্যোদয়ের পর [illegible]ান করে সন্ধ্যা করতে বসলে আঙুল বেঁকে যায়। ফলে ক'দিন শীতে ঘুম [illegible]চ্ছ না ভাল করে। গতকাল যে চটিতে ছিলেন সেখানে চটিওয়ালা দয়া করে [illegible]খানা কম্বল দিয়েছিল, কিন্তু তাতে হিতে বিপরীতই হয়েছে। কম্বল [illegible] পিশুতে বোঝাই ছিল—ঘুম তো হয়ই নি—সারারাত বসে দুজনে গা [illegible]কেছেন। আরও আশঙ্কা, তাঁদের কাঁথাতে বা পিরানেও বোধ করি [illegible]শ চালান হয়ে গেল। সেই ভয়ে ব্রাহ্মণ ভোরবেলা উঠেই কাঁথা-[illegible] নিজে হাতে করে রোদে মেলে দিয়েছেন; তবে তাতেই যে পিশু [illegible], সে আশ্বাস খুব নেই মনে মনে; এখনও কত দিনরাত জেগে কাটাতে [illegible]চার ঠিক কি। পথ পনেরো দিনে না হোক, এক মাসেই শেষ করা

যেত—কিন্তু দলছাড়া হয়ে পথ চলা নিরাপদ নয়। তাঁরা যে দলের সঙ্গে যাচ্ছেন, সে-দলে তিন-চারটি বৃদ্ধ এবং একটি সত্তঃপ্রসূতা নারী আছে। তাদের গোরুর গাড়িতে চাপানো হয়েছে। ফলে দৈনিক দু বেলা মিলিয়েও সাত-আট ক্রোশের বেশি হাঁটা যাচ্ছে না।

এগুলো মুখ্য কারণ।

বিরক্তির কতকগুলো গৌণ কারণও আছে।

এবার তাঁর স্ত্রীর সুপারিশ ছিল ছোট শালাটির জন্য। কিন্তু বিধবা বোন কান্নাকাটি করায় তাকে আনতে পারেন নি। আসবার সময় স্ত্রীর অপ্রসন্ন মুখ দেখে আসতে হয়েছে। আগেকার দিন হলে দুজনকেই আনা চলত, কিন্তু সে-সব দিন আজকাল আর নেই। সাহেব স্পষ্টই বলে দিয়েছেন, 'তোমরা এক-এক বার দেশে গিয়ে যদি তিন-চারটে করে বেকার ছোকরা ধরে আন তো আমি নাচার। অত চাকরি আমার কাছে নেই। তা হলে কিন্তু সেপাইএর চাকরি নিতে হবে। একটি করে এনো—চেষ্টা করব। Remember, one at a time.'

কমিসারিয়েটের চাকরি—মেজর সাহেবের সুপারিশ ছাড়া হবার জো নেই— আর সাহেবও এক কথার মানুষ। সুতরাং শালাকে আনতে ভরসা হয় নি। তার এখন ষোল বছর বয়স। এধারে ভাগ্নে আঠারোয় পড়েছে। বোন সেই যুক্তিতেই জিতে গেছেন, 'সতেরো পার হল দাদা, এখনও যদি উপায় করতে না পারে তো কবে করবে? নীলাম্বরের তো বেটের [illegible] ষোল সবে—দু বছর পরেই নিয়ে যেয়ো না! চাই কি, ওর এখেনে, কলছ, [illegible] একটা উপায় হয়ে যেতে পারে। ওর তো মাথার ওপর বাপ আছে, আমার ভাগ্নের কে আছে বল?'

অকাট্য যুক্তি। তবু মনটা ঠিক খুশী হয় নি। বোনের সঙ্গে ঘর [illegible] হয় না, স্ত্রী গৃহিণী, তাঁর হাতেই সব। এর শোধ তুলতে তাঁর এ[illegible] পয়সা কতগুলি যে পিত্রালয়ে চালান করবে, তার ঠিক কি? [illegible] আশঙ্কা সেইখানেই।

এছাড়াও বিরক্তির কারণ আছে।

চীনা রেলগাড়ি চলছে আজকাল রানীগঞ্জ পর্যন্ত, তাতে চড়লে [illegible]

এগিয়ে যাওয়া চলত। তাতেও বাদ সাধলেন স্ত্রী। উড়ুনির প্রান্ত চেপে ধরে মাথার দিব্যি দিলেন, 'রেলগাড়িতে আর বাঙালীর যাবার জো নেই। আমি মেশোমশায়ের কাছে শুনেছি। গোরারা নাকি বড্ড মার-ধোর করে। ধরে নিয়ে গিয়ে খিষ্টান করে দেয়। তুমি আমায় বাক্যি দিয়ে যাও যে—হাঁটা-পথে যাবে। নয়তো সোজা নৌকোয় যাও।'

'হ্যাঁ—তা যাবে না। আমার বাবার জমিদারি আছে কিনা। নৌকোয় যাবে। তা ছাড়া নৌকোয় আজকাল হামেশা ডাকাত পড়ছে।'

'বেশ, তা হলে হাঁটা-পথে যাও। না না—আমায় বাক্যি দিয়ে যাও, নইলে আমার মাথা খাবে, মরা মুখ দেখবে।'

অগত্যা 'বাক্যি' দিতে হয়েছে। কিন্তু দোষ যারই হোক, সে ঝালটাও বেচারা হীরালালের ওপর পড়েছে।

সকাল থেকেই চলছে গজগজানি, 'তোমার বাপু যত বিপরীত কাণ্ড, বুঝেছ? তোমার বয়সে আমারা স্বরূপগঞ্জের হাট থেকে দু মন চালের বস্তা মাথায় করে এনেছি। এত বড় সাজোয়ান ছেলে, বললুম যে একখানা লেজাই নিয়ে যাই, তা নয়। বলে, ভারী হবে, কর্তা, দিনই বা, কাঁথা নিয়ে চলুন।—না-হয় আমিই বইতুম রে বাপু। এখন কাঁথায় শীত মানছে? তাই দে না হয় তোর কাঁথাখানাও—কেমন বয়েসের জোর দেখি। থাক্‌ গে খালি গায়ে। তুও তো দেখি তোমার শীত আমার চেয়ে বেশি। চান করতে নামবে এক-পহর বেলায়—তাও হি-হি কর। বলি মায়ের দুধ খেয়েছিলে, না খাও নি?'

স্নান-আহ্নিক সব কিছুর ফাঁকে ফাঁকেই চলছে আক্রমণ। হীরালালের সুগৌর মুখ ক্ষণে ক্ষণেই রক্তবর্ণ ধারণ করছে। বিধবা মায়ের ছেলে, এতখানি বয়স পর্যন্ত খেলাধুলো করে বেড়িয়েছে, কখনও মার কাছে বকুনি খায় নি। বারবার তাই তার চোখে জল এসে যাচ্ছিল। কিন্তু এখানে অভিমানের কোন মূল্য নেই বলেই সে প্রাণপণে সেই উদ্গত অশ্রু দমন করতে লাগল।

সন্ধ্যা-আহ্নিক শেষ করে, পশ্চিমের তোফা সোনালী রঙের মুড়ি-গুড় দুই ডেলা গালে ফেলে, মৃত্যুঞ্জয় একঘটি গঙ্গার জল প্রাণপণে দাঁত বাঁচাতে বাঁচাতে, 'উঃ আঃ' শব্দ করে গলায় ঢেলে দিলেন, তার পর অকস্মাৎ হীরালালের ওপর আর এক দফা ঝেঁঝে উঠলেন, 'বলি নবাব-পুত্তুরের মত বসে থাকলেই চলবে? কাঠ-কুটো আনতে হবে না? উনুন ধরাতে হবে না? না তাও আমাকেই করতে হবে? তোমাকে সঙ্গে আনাই দেখছি

আমার ঝকমারি হয়েছে। চাল-ডাল চেয়ে এনেছ দোকানীর কাছ থেকে? বাসনগুলোয় একবার গঙ্গামিত্তিকে বুলিয়ে নিয়েছ?'

হীরালাল নিঃশব্দে চাল-ডালের পুঁটুলিটা মামার সমনে রেখে উহুন ধরাতে বসল। মামার আগে সে স্নান ও সন্ধ্যা-গায়ত্রী শেষ করেছে। বটগাছের ছায়ায় রান্নার জায়গা বেছে নিয়ে জল-হাত দিয়ে লেপেও রেখেছে। উহুন অর্থে এখানে তিনটি নুড়ি-পাথর। তাই সাজিয়ে সে কাঠ ধরাতে বসল। দোকানী ঘুঁটের ওপর কিছু আংরা দিয়েছে, তাতেই প্রাণপণে ফুঁ দিতে দিতে তার চোখমুখ লাল হয়ে উঠল।

মামা কিন্তু তখনও থামেন নি, 'বলি পাথর তিনটে ধুয়েছিলে বাপু—না কি? কে-না-কে হয়তো রেঁধে ফেলে রেখে গেছে—সত্তিক জাতের সকড়ি খাব নাকি শেষ পর্যন্ত?'

'পাথর তিনটে যে চান করার আগেই গঙ্গা থেকে ধুয়ে এনে রাখলুম মামা।'

'কে জানে বাপু, তোমাদের কি সে আক্কেল আছে! আক্কেল থাকলে আর এমন কাণ্ড হয়! লোকে কথায় বলে—এক ব্যান্নন হুনে পোড়া! একখানা কাঁথা ভরসা, তাও গেল পিণ্ডতে বোঝাই হয়ে। পিণ্ড কি আর রোদে মুরে। এখনও এত পথ বাকি—এখন থেকে রাতের বেলা ধুনি জ্বেলে সারারাত্ত বসে কাটাও আর কি! ঘুম আর হচ্ছে না—সে দফা গয়া!'

অতি কষ্টে কাঠ ধরল। মৃত্যুঞ্জয় গজগজ করতে করতে রান্না চাপালেন। কিন্তু ডাল নামিয়ে সেই হাঁড়িতেই ভাত চাপাতে গিয়ে আর এক বিভ্রাট বেধে গেল। জলের ঘটি থেকে আলগোছে জল ঢালতে গিয়ে ঘটিটা গেল হাঁড়িতে ঠেকে।

'এই নাও, ঘটিটা গেল আবার সকড়ি হয়ে!···যাও দিকি বাপু, চট্ করে টটা মেজে আর একঘটি জল নিয়ে এস দিকি। নাও নাও,—হাঁ করে চেয়ে দাঁড়িয়ে থেকো না হাঁদার মত, শরীরটা, একটু নাড়ো।'

রান্না এখনও চলছে, শেষ পর্যন্ত ঘটিটা মেজেই ঝুলিতে পোরা হবে, সুতরাং এখন ঘটিটা সকড়ি হয়ে গেলে এমনই বা কি মহাভারত অশুদ্ধ হবে হীরালাল তা বুঝতে পারল না, তবে মামার হুঙ্কারটা বুঝল। সে দিশেহারা হয়ে ছুটল গঙ্গার দিকে মামার অসাবধানতার প্রায়শ্চিত্ত করতে। কিন্তু আগেই বলেছি যে দিনটা তার সুপ্রভাত হয় নি। সেখানে আর এক কাণ্ড ঘটে গেল। বাঁধা

ঘাট নয়, শক্ত এঁটেল মাটির উঁচু-নীচু পাড়। তারই ওপর একটা উঁচু জায়গা থেকে হাত বাড়িয়ে ধুতে গিয়ে ঘটিটা হাত ফসকে নদীতে পড়ে গেল এবং দেখতে দেখতে অনেকখানি জলের ভেতর গিয়ে পড়ল। শীতকালের জল—তার মধ্যে বহুবার-মাজা ঘটিটা দেখতে বিন্দুমাত্র অসুবিধা হয় না। ঘটিটা এত দূরেই গিয়ে পড়েছে যে, এক-কোমর জলে না নামলে আর উদ্ধারের আশা নেই।

এক মুহূর্তমাত্র ইতস্তত করল সে। গিয়ে কাপড়টা ছেড়ে শুকনো গামছা পরে আসাই উচিত, কিন্তু সেই অত্যল্পকালের মধ্যেই অসহিষ্ণু মামার উগ্রমূর্তি চোখের সামনে দিয়ে ভেসে গেল। সে আর বিন্দুমাত্র দেরি না করে কোমরে উড়ুনি বাঁধা অবস্থাতেই জলে নেমে পড়ল। কাপড় এবং উত্তরীয় দুটোই ভেজানোর যে কোন প্রয়োজন নেই—একথা ভাববারও সময় পেল না।

অদৃষ্ট মন্দ হলে বিভ্রাট বেড়েই যায়। এঁটেল মাটির ঘাট, যেখানে সকলে স্নান করে সেখানে তবু খানকতক ইঁট বিছানো আছে—তাড়াতাড়ি হবে বলে হীরালাল সেদিকে যায় নি, সামনেই এক জায়গায় নেমে পড়েছিল। ফলে পা পিছলে অকস্মাৎ গভীর জলে গিয়ে পড়ল। একে সে সাঁতার জানত না, কলকাতার ছেলে, সাঁতার শেখার সুবিধে হয় নি, তার ওপর তখনকার পশ্চিমের গঙ্গা এখনকার মত ছিল না, তখন বড় বড় জাহাজ চলত। দেখতে দেখতে হীরালাল ডুবজলে পড়ে হাবুডুবু খেতে খেতে খরস্রোতে ভেসে চলল।

॥ ২ ॥

তখনকার দিনে 'রইস' বা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা নৌকোয় যাতায়াতই পছন্দ করতেন। তাই নদীর বুকে হামেশাই নানা ধরনের বজরা নৌকো ঘোরাফেরা করত। অদৃষ্টক্রমে হীরালাল যেখান দিয়ে ভেসে যাচ্ছিল, তার কাছেই একটা বজরা অনেকক্ষণ থেকে অলস মন্থরভাবে ভাসছিল। ভাবগতিক দেখে অনায়াসেই অনুমান করা চলে যে, তার এখান থেকে যাবারও ইচ্ছে নেই—আবার কূলে ভিড়তেও আপত্তি আছে। মাঝি ঠিক নোঙর করে নি, কিন্তু হাল ধরে বসে নৌকোটা যতদূর সম্ভব এক জায়গাতেই রাখার চেষ্টা করছিল। কোন ধনী লোকের বজরা হবে, কারুকার্য-করা জানলায় ভেলভেটের পর্দা

লাগানো ; সমস্ত বজরাটিতে গালার রং, দরজা-জানলার মাথায় হাতির দাঁতের কাজ-করা। দাঁড়ি-মাঝিদেরও বেশভূষা সাধারণ মাঝিদের থেকে একটু ভিন্ন ধরনের—কিছু মূল্যবান।

হীরালাল এ বজরা লক্ষ্য করে নি করবার কথাও নয়। কারণ এমন বজরা নিত্য কত যাওয়া-আসা করে গঙ্গার বুকের ওপর দিয়ে, এ ক'দিন দেখে দেখে সে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। কিন্তু নৌকোর মালিক বা আরোহী তাকে লক্ষ্য করেছিলেন। কারণ তিনি বহুক্ষণ থেকে পর্দার ফাঁকে দূরবীন লাগিয়ে বসে আছেন এবং নদী-তীরের নরনারীদের লক্ষ্য করছেন। অলস কৌতূহলে, হীরালাল যখন থেকে ঘটি হাতে নদীতে নেমেছে, তখন থেকে তাকেও লক্ষ্য করেছেন। তার অগাধ জলে পড়ে যাওয়াও তাঁর চোখ এড়ায় নি, কিন্তু তিনি গোলমাল বা চেঁচামেচি করেন নি। তাঁর অব্যর্থ সন্ধানী দৃষ্টিতে তিনি চকিতের ভেতর দেখে নিয়েছেন যে, স্রোতের যে গতি তাতে ছেলেটি অবিলম্বে নৌকোর পাশ দিয়েই ভেসে যাবে।

আরোহী ঠিক নয—আরোহিণী। কারণ দূরবীন হাতে যে বসে ছিল সে স্ত্রীলোক।

স্ত্রীলোক—তবে ঠিক সাধারণ স্ত্রীলোকের মত নয়। বুদ্ধি বা তৎপরতা কোনটারই যে তার বিন্দুমাত্র অভাব নেই, সেটা তার পরবর্তী আচরণেই ধরা পড়ল।

সে কাউকে ডাকল না, মুহূর্তমাত্র ইতস্ততও করল না। চোখের নিমেষে গায়ের ওড়নাটা ফেলে দিয়ে জানালা দিয়েই জলে লাফিয়ে পড়ল এবং এক হাতে জানলার চৌকাঠটা ধরে আর এক হাত বাড়িয়ে মজ্জমান হীরালালের কোমরে-বাঁধা উড়ুনটা ধরে টেনে আনল।

ইতিমধ্যে তার জলে পড়ার শব্দে মাঝি-মাল্লারা ছুটে এসেছে। তারাই এবার হীরালালকে টেনে তুলল। স্ত্রীলোকটি কিন্তু কারও সাহায্যের অপেক্ষা করল না, অবলীলাক্রমে অত্যন্ত লঘুসঞ্চারে নিজেই লাফিয়ে ওপরে উঠে পড়ল। তার মুখ আগের মতই প্রশান্ত, ভাবলেশহীন। যেন এমন একটা কিছু অস্বাভাবিক ব্যাপার ঘটে নি। শুধু ভাল করে লক্ষ্য করলে তার বঙ্কিম ওষ্ঠাধরের প্রান্তে সামান্য একটুখানি সাফল্যের হাসি চোখে পড়তে পারত।

হীরালাল এর মধ্যেই বেশ খানিকটা জল খেয়ে ফেলেছিল। তবে মাঝি-মাল্লারা এসব ব্যাপার ভাল বোঝে, তাদের চেষ্টায় শীগ্‌গিরই সে খানিকটা

জল বমি করে ফেলে সুস্থ হল এবং খানিক পরে তার নিশ্বাস-প্রশ্বাসও স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এল।

আরও একটু পরে সে চোখ মেলে তাকাল। ততক্ষণে তাকে একটা শুকনো কাপড়ে জড়িয়ে গালিচের ওপর শুইয়ে দেওয়া হয়েছে। সে সম্বিৎ ফিরে পেয়ে একটু একটু করে চারদিকে চেয়ে দেখল। দেখল, সে একটি বজরার ভেতরে শুয়ে আছে। চারিদিকে দামী আসবাবপত্র, ভাল ভাল ছবি, ফুলদানিতে ফুল। আর—আর তার সমানে একটি সুন্দরী তরুণী। তার পরনে পশ্চিমী পোশাক, মাথার ওপর হাল্কা রেশমের উত্তরীয়। সবটা জড়িয়ে স্বপ্নের মতই মনে হল তার।

কিন্তু সে মোহ রইল অল্পক্ষণই—হীরালাল তাড়াতাড়ি উঠে বসল।

এবার তরুণীটি কথা বলল। হিন্দুস্থানী ভাষায় প্রশ্ন করল, 'তুমি কে? কোথা থেকে আসছ? কোথায় যাবে? জলে পড়লে কি করে? আমি না থাকলে যে মারা পড়তে।'

কাছেই মাঝি দাঁড়িয়েছিল, সে এবার হাত-পা নেড়ে হীরালালকে বুঝিয়ে দিল, 'মালেকান্ নিজে জলে নেমে তোমাকে টেনে তুলেছেন—তা জান? আমরা কেউ আগে দেখতেও পাই নি।'

হীরালাল বাল্যকালে মুনশীর কাছে কিছু কিছু ফার্সী পড়েছিল। তা ছাড়া এই ক'দিনে পথে শুনে শুনে কিছু হিন্দীও শিখেছে। সে কোনমতে তার সঙ্গে কিছু বাংলা মিশিয়ে সংক্ষেপে নিজের ইতিহাস বিবৃত করল।

শুনে তরুণীটির মুখ ক্ষণেকের জন্য যেন উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। বলল, 'ও, তুমি কমিসারিযেটে কাজ করবে—সে তো ভাল কথা।'

'কাজ পাব কিনা জানি না, কাজের জন্যে যাচ্ছি।'

'ঠিক পাবে। নিশ্চিত আশা না থাকলে কি আর তোমার মামা নিয়ে যাচ্ছেন!'

হীরালাল এবার একটু জল চাইল।

স্ত্রীলোকটি ইতস্তত করে বলল, 'তোমাকে এখানে জল খেতে দেব না। তোমার গলায় তো পৈতে দেখছি—নিশ্চয়ই হিন্দু। আমি মুসলমান।'

হীরালাল বেশ গুছিয়ে জবাব দিল, 'আমি ব্রাহ্মণ। কিন্তু তা হোক, আপনি আমার জীবন রক্ষা করেছেন। আমার কাছে আপনি প্রণম্য।'

'সে কথা থাক। চল তোমাকে পাড়ে নামিয়ে দিই গে। তোমার

মামা বোধ হয় এতক্ষণে তোমার আশা ছেড়ে দিয়েছেন। ওখানে নেমে জল খেয়ো।'

তরুণীর ইঙ্গিতে বজরা এবার তীরের দিকে ফিরল।

হীরালাল বলল, 'আপনার কাছে চির-ঋণী রইলাম।'

তরুণী হেসে বলল, 'ঋণ রাখতে আমি দেব না। দেখো, একদিন কড়ায়-গণ্ডায় শোধ করিয়ে নেব।'

হীরালাল জোর দিয়ে বলল, 'সে তো আমার পক্ষে সৌভাগ্য!'

'দেখা যাক্, যখন পাওনাদার দোরে গিয়ে দাঁড়াবে তখনও সৌভাগ্য ভাব কি না!'

বজরা তীরের কাছাকাছি গিয়ে থামল। ঘাট নেই—তাই ঘাটে লাগতে পারল না। মাঝি নামবার সুবিধের জন্যে একখানা লম্বা তক্তা ফেলে দিল।

সত্যিই মৃত্যুঞ্জয় এর ভেতর কেঁদে-কেটে মাথা খুঁড়ে হাট বসিয়ে দিয়েছেন। জলের ধার থেকে অনেক দূরে নিরাপদে দাঁড়িয়ে চীৎকার করছেন, 'ওরে, তার যে একটা ছেলে রে, আমি তাকে গিয়ে কী জবাব দেব রে! ওরে, ছোঁড়া কি অক্ষেণে আমার সঙ্গে বেরিয়েছিল রে! ওরে, ওকে এনে এস্তক আমি যে জেরবার হয়ে গেলুম রে! কোথা থেকে এমন শত্রু সঙ্গে এল রে!'

দু-চার জন জলেও খানিকটা করে নেমেছে। কিন্তু হীরালাল ঠিক কোন্‌খানে ডুবেছে—ডুবেছে কি ভেসে গেছে—কিছুই কেউ জানে না। তাই, ঠিক কী করতে হবে তাও কেউ বুঝতে পারছে না। শুধু খানিকটা হৈ-চৈ করছে মাত্র।

জানলার পর্দা ঈষৎ ফাঁক করে একবার দেখেই তরুণী ব্যাপারটা বুঝে [illegible] একটু হেসে বলল, 'তাড়াতাড়ি যাও, ওঁরা বড় কাতর হয়েছেন।'

হীরালাল একটু ইতস্তত করে বলল, 'কিন্তু আপনার নাম-ঠিকানা কিছুই যে জানা হল না।'

'কিছু দরকার নেই। সময় হলে আমিই যাব তোমার কাছে। শুধু নামটা জেনে রাখ—আমিনা। তবে লোকে আমাকে ডাকে হুসেনী বিবি বলে।'

ব্রাহ্মণ হয়ে মুসলমানের মেয়েকে নমস্কার করা হয়তো ঠিক হবে না, আশীর্বাদ করারও বয়স হয় নি, বিদায় সম্ভাষণটা কিভাবে জানানো উচিত ঠিক করতে না পেরে হীরালাল খানিকটা বিমূঢ়ের মত দাঁড়িয়ে থেকে অবশেষে এমনিই বেরিয়ে এল।

মামা প্রথমটা তাকে দেখেই আনন্দে জড়িয়ে ধরলেন। খানিকটা গালি-গালাজ করলেন, আশীর্বাদও করলেন কিছু কিছু। তার পর সংক্ষেপে সব ইতিহাস শুনে নিজে আর একবার স্নান করলেন, হীরালালকেও করালেন। আবার নতুন করে রান্নার যোগাড় হল, কারণ সে ভাতে কাকে মুখ দিয়েছে। আবার শুরু হল বকাবকি—গজগজ করা। এবার বরং কিছু বেশীই—কারণ বাড়তি হিসেবে ঘটিটার শোকও যোগ হয়েছে।

গোলমালে ঘটিটার কথা কারও মনে ছিল না, তা ছাড়া সম্ভবত লোকের পায়ে-পায়ে সেটা আরও দূরে গিয়ে পড়েছিল। এখন অনেক চেষ্টা করেও আর খুঁজে পাওয়া গেল না।

॥ ৩ ॥

এখনকার কানপুর শহর, বিশেষত এই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরের কানপুর দেখে কেউ এক শ বছর আগেকার কানপুর কল্পনা করতে পারবেন না। তখন শহরের মধ্যে এখানে ওখানে অনেক ফাঁকা মাঠ ও পুষ্করিণী ছিল সত্যি, কিন্তু যেখানে বসতি ছিল সেখানে একেবারে ঘিঞ্জি, ঘেঁষাঘেষি ঘরবাড়ি, গায়ে গায়ে লাগানো। পথ নিতান্তই সংকীর্ণ, ডুলি বা পাল্‌কি ছাড়া কিছুই যাবার উপায় ছিল না ; এক্কা চলত বটে, তাও সে নিতান্তই গায়ের জোরে। চওড়া রাস্তা তৈরী করে জমি অপব্যয় করার কোন অর্থ সেকালের লোক বুঝত না—একালের বড় বড় মোটরগাড়ি, বাস্ বা লরী যাতায়াতের কথা তখন কেউ কল্পনা করে নি। তা ছাড়া, বহুলোক কাছাকাছি বাস করায় একটা নিরাপত্তাও ছিল। অরাজকতা তখন চারিদিকেই,—রাহাজানি ও ডাকাতি তো ছিল প্রায় নিত্য-নৈমিত্তিক। এখনও এই কারণেই, গ্রামাঞ্চলে চারিদিকে অজস্র ফাঁকা জমি পড়ে থাকা সত্ত্বেও, মানুষ বাস করে একেবারে গায়ে গায়ে ঘর বেঁধে, ফলে মহামারী বাধলে গাঁ উজাড় হতে দেরি লাগে না।

কিন্তু আমরা বলছিলাম কানপুরের কথা।

সেই ঘিঞ্জি কানপুরের আরও ঘিঞ্জি পাড়া হল উকিল-মহল্লা। সংকীর্ণ পাথর-বাঁধানো রাস্তা, তার দু দিকে দোতলা তিনতলা বাড়ি। একটির কার্নিশ এসে লেগেছে আর একটির কার্নিসে। কোথাও দিনের বেলাও নীচের দিকে

সূর্যালোক প্রবেশ করে না। একতলার ঘরে চিরাগ না জ্বাললে, আর যাই হোক, লেখাপড়ার কাজ চলে না। পথের দু ধারে বিপণিশ্রেণীর অভাব নেই—দুধ-দই-পেঁড়া থেকে শুরু করে চাল-ডাল-তেল-ঘি এবং তামাক-হুঁকা-টিকিয়ার অসংখ্য দোকান চারদিকে। ছোট ছোট দোকানই বেশি—সূর্যোদয় থেকে রাতদুপুর পর্যন্ত দোকান সাজিয়ে বসে থাকে খদ্দেরের আশায় এবং সেই কারণেই রাস্তাটা কিছু আলোকিত থাকে। কারণ এইসব দোকানেই দিনরাত একটা করে অর্ধ-মশাল জ্বলতে থাকে। দোকানের সামনেই—পাস্তয়া বা পাশবালিশ যা-ই বলুন—ঐ আকারের একটা গোলাকার ধাতু-পাত্র ঝোলে। তার গায়ে বদনার মত নল লাগানো। সেই নলে থাকে একগোছা ছেঁড়া নেকড়া—সলতের মত, ঐ পাত্রে থাকে রেড়ি বা 'কড়ুয়া'র তেল। সল্‌তের গোছা সেই তেলের জোরে মশালের মত জ্বলে। তাতে আলো যত না হোক—ধোঁয়া হয় প্রচুর। সে ধোঁয়া, পথটুকু তো বটেই, অধিকাংশ সময় দোতলা অবধি দু ধারের বাড়িগুলোকে ঝাপসা আচ্ছন্ন করে রাখে। শীতকালে ভাল করে চোখ মেলে তাকানোই যায় না।

এই উকিল-মহল্লারই এক প্রান্তে মুনশী নানকচাঁদের বাড়ি। সাধারণ দোতলা বাড়ি, বিশেষত্বের মধ্যে নীচের তলায় প্রবেশের কোন সদর দরজা নেই। দু দিকে দুখানি হিসেবে দোকানঘর, আর তারই মধ্যে দিয়ে সোজা খাড়া সিঁড়ি উঠে গেছে একেবারে দোতলা পর্যন্ত। ডানদিকে দেওয়ালের গা বেয়ে একগাছা মোটা দড়ি টাঙানো না থাকলে সে সিঁড়িতে ওঠানামা করাই কষ্টসাধ্য হত।

সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে একটি পাথরের নীচু ফালি-বারান্দা। সেই বারান্দার চারদিকে কয়েকটি আধা-অন্ধকার ঘর। এগুলি হল মুনশী সাহেবের দপ্তরখানা। একটিতে তাঁর মোহরার বসে; একটিতে কাগজপত্র থাকে—আলকাৎরা মাখানো সারি সারি টিনের বাক্সয়। পথের দু দিকে যে দুটি ঘর—সিঁড়ির ঠিক দু পাশে—তার একটি হল স্বয়ং নানকচাঁদের গদি বা অফিস ঘর, আর একটি তাঁর বৈঠকখানা। সেখানে একজনের মত একটু শোবার ব্যবস্থাও আছে।

এই বারান্দারই অপর প্রান্তে অন্দরমহলে যাবার রাস্তা। সেখানে পৌঁছলে নীচে নামবার একটা সিঁড়ি মেলে। আর সেখান দিয়েই আছে আর একটি পথ—সে পথে পিছনের একটা অব্যবহার্য পরিত্যক্ত খাপরার

বাড়িতে যাওয়া যায়। এই বাড়িটা সদাসর্বদাই চাবি-দেওয়া পড়ে থাকে। এটুকুও নানকচাঁদের সম্পত্তি। এটি তিনি নাকি এক আতরওয়ালাকে ভাড়া দিয়ে রেখেছেন। সে তার ফুঁকো কাচের শিশি আর তেল রাখবার পাতলা চামড়ার 'কুপি' রাখে ওই ঘরগুলোতে। কিন্তু আসলে এটি পিছনের সংকীর্ণতর গলিপথে বের হবার একটি গোপন রাস্তা।

নানকচাঁদের বৃত্তি কি তা এক কথায় বলা শক্ত। নানারকম ব্যবসা আছে—কিছু প্রকাশ্য, কিছু গোপনীয়। এ ছাড়া মামলা-মোকদ্দমার তদ্বিরেও তাঁর অসাধারণ খ্যাতি, তাতেই তাঁর সবচেয়ে মোটা আয়। এক শ্রেণীর মানুষ আছে—আদালতে ঘুরেই যাদের সুখ। নানকচাঁদও সেই শ্রেণীর। তবে অবশ্য নানকচাঁদ এ থেকে একটা মোটা আয়ও করে থাকেন। সেজন্যে অনেকে তাঁকে উকিলসাহেব বলেই জানে।

নানকচাঁদের কিছু সম্ভ্রান্ত মহিলা-মক্কেল ছিল—তাদেরই জন্য পেছনের এই গলিপথটি ব্যবহৃত হত। অনেক সময় তাঁদের জনসাধারণের দৃষ্টি বাঁচিয়ে আসার প্রয়োজন হত। পূর্বাহ্নে সংবাদ দিলে নানকচাঁদ এই বাড়ির দরজা খোলা রাখবার ব্যবস্থা করতেন। মক্কেলরা সঙ্কেত করলেই একটি প্রায় মূক দাসী নিঃশব্দে কপাট খুলে ডিব্বার আলোতে পথ দেখিয়ে উপরে নিয়ে আসত —আবার কাজ মিটলে তেমনি সেই পরিত্যক্ত হানাবাড়ির ভেতর দিয়ে নিয়ে গিয়ে পথে তুলে দিত। ঐ পেছনের রাস্তা দিয়ে সাধারণত যারা যাতায়াত করত, তারা এই ভাঙাচোরা খাপরার বাড়িটার সঙ্গে নানকচাঁদের প্রাসাদোপম তিনমহলা বাড়িটার যোগাযোগ কল্পনা পর্যন্ত করতে পারত না।

নানকচাঁদের দোতলার বৈঠকখানা ঘরে পৌষমাসের মাঝামাঝি এক সন্ধ্যাবেলায় কয়েকজন লোক একত্র হয়েছিলেন। মাঝারি আকারের ঘর, তার একপ্রান্তে একটা খাটিয়া। খাটিয়াতে একটি শয্যা গোটানো আছে। প্রয়োজনমত নানকচাঁদ সেটি ব্যবহার করেন। বাঁকী মেজের সবটাই জুড়ে ফরাস পাতা। সাধারণ 'দরি' বা শতরঞ্চির ওপর দামী জাজিম পাতা—আর তার ওপর গোটাকতক তাকিয়া ফেলা। একদিকে দেয়াল-ঘেঁষে একটি ছোট কাঠের বাক্স, তাতেই বোধ করি নানকচাঁদের কাগজপত্র থাকে, আবার বাক্স বন্ধ করে তার ওপর কাগজ রেখে লেখাও চলে—অর্থাৎ বর্তমানকালে যাকে 'ডেকস্কো' (ডেস্ক) বলে তারই দেশী সংস্করণ। কারণ

বাক্সর পাশেই আছে মাটির দোয়াতদান, গোটা দুই খাগের কলম, আর একটা বালির পাত্র। ঐ বালিই ব্লটিং কাগজের কাজ করে।

বাক্সর পাশেই একটি মাটির 'চিরাগ-দানে' একটি চিরাগ বা প্রদীপ জলছে। দরকার হলে আর একটি আলোও জ্বালা যেতে পারে—ঘরের কোণে সে ব্যবস্থাও আছে। একটি পেতলের বাতিদানে দেশী মোমবাতি সাজানো আছে। সম্ভবত রাত্রে লেখাপড়ার দরকার হলে উকিলসাহেব সেটি জ্বালান।

আমরা যে বিশেষ সন্ধ্যাটির কথা বলছি, সেই সন্ধ্যাবেলায় যাঁরা নানকচাঁদের ঘরে জমায়েত হয়েছিলেন তাঁরা কেউই সাধারণ অর্থে মক্কেল নন। সাধারণ মক্কেলরা অবশ্য এ ঘরে বসেন না—তাঁদের জন্য গদিঘর আছে। বিশেষ মক্কেল এলেই এই ঘরটির প্রয়োজন হয়। কিন্তু আজ বাক্স বন্ধ—কাগজপত্রের কোন চিহ্ন নেই। বাক্সর পেছনে তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে নানকচাঁদ গুড়গুড়িতে তামাক টানছেন। তাঁর মুখ গম্ভীর—বরং একটু চিন্তাকুল। তিনি ছাড়া ঘরে আছেন আর দুটি মহিলা। দুজনেই তরুণী এবং অত্যন্ত সুশ্রী। দুজনের মুখের গঠন এবং বেশভূষা দেখলে মোটামুটি এটা কল্পনা করতে বাধে না যে এঁরা দুজনে দুই বোন, এঁদের অবস্থা ভাল এবং এঁরা মুসলমান। এঁদের জন্যেও গুড়গুড়ির ব্যবস্থা হয়েছে। সেকালে হিন্দুর বাড়িতে মুসলমানের জন্য এবং মুসলমানের বাড়িতে হিন্দুর জন্য আলাদা গুড়গুড়ির ব্যবস্থা থাকত।

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে নানকচাঁদ ফরসির মুখ থেকে নিজের মুখ সরিয়ে কথা বললেন, 'যার জন্যে তোমাদের ডেকে পাঠিয়েছি, অনেক আগেই তার আসা উচিত ছিল। এখনও কেন এসে পৌঁছল না তা জানি না। একটু ভাবনা হচ্ছে—কারণ সে বিলায়েত-ফেরত লোক, জবানের ঠিক রাখে।... তবে ভয় আর কি—কোথাও আটকে পড়েছে হয়তো। যাক্—আমিনা, তোমার কথা বল একটু—শুনি ততক্ষণ।'

আমিনা বিবি নিঃশব্দে তামাক টানছিল, সেও ফরসির নল সরিয়ে বোনের হাতে দিয়ে বলল, 'লোকটি কে, উকিলসাহেব? কী তার পরিচয়? আমি কি তাকে দেখি নি?'

নানকচাঁদ বললেন, 'পরিচয় সে দিতে বারণ করেছে। তা ছাড়া পরিচয় তার আমিও ঠিক জানি না। নামটা জানি। কিন্তু নামটা সে নিজেই বলবে। এটুকু শুধু বলতে পারি যে, সে লিখাপড়ি জানা লোক—খানদানী ঘরের ছেলে।

লিখাপড়ি সে বহুত করেছে। সাহেবদের মত আংরেজি বলতে পারে। দু দফে সে বিলায়েত গিয়েছিল। একবার নেপালের জঙ্‌বাহাদুর রাজার সঙ্গে আর একবার আজিমুল্লা খাঁর সঙ্গে মুনশী হয়ে। তোমাদের যা লক্ষ্য তারও তাই লক্ষ্য। কি করে সে খবর পেয়েছে যে নানাসাহেবের পেয়ারের হুসেনী বিবি এবই ভেতর সমস্ত ফৌজী ঘাঁটি, মায় বাংলা মুলুকের বারাকপুর, দমদম, কলকাত্তা পর্যন্ত ঘুরে এসেছে। সঙ্গে এনেছে কলকাত্তা কিলার নকশা। তাই সে আমাকে এসে ধবেছে যে, একবার হুসেনী বিবির সঙ্গে তার দেখা করিয়ে দিতে হবে।'

আমিনার মুখ আরক্ত হয়ে উঠল, কিন্তু তা মুহূর্তের জন্য। বলল, 'এ খবর কে আর দেবে—নিশ্চয়ই আপনি দিয়েছেন।'

এতখানি জিভ কেটে নানকচাঁদ বললেন, 'জয় রামজীকি! তা কখনও হতে পারে? কারুর কথা কারুর কাছে বললে, আজ কি আর নানকচাঁদকে করে খেতে হত বিবিসাহেব—না, তা হলে তোমরাই এমন করে বিশ্বাস করতে পারতে? সে ভয় নেই বিবি, তেমন বাপে আমায় জন্ম দেয় নি। যা কান দিয়ে শুনব তা মুখ দিযে আর বেরুবে না— বোল্‌নেওয়ালার হুকুম না হলে। এ খবর সে-ই যোগাড় করেছে। এ-ও সে জানে যে, তোমার মেহেরবানি আছে এ বান্দার ওপব। তাই আমাকে এসে ধরেছে। অবিশ্যি—' এবাব একটু গলাখাঁকারি দিযে নানকচাঁদ গলাটা পরিষ্কার করে নিলেন—'অবিশ্যি তাব জন্যে সে কিছু দিয়েছেও। জান তো বিবি আমার নিযম, কিছু নগদ হাতে না পেলে কোন পরোপকার আমি করি না।'

আমিনা হেসে বলল, 'তা জানি। হ্যাঁ, আমাবও একটু কাজ আছে।'

সে নিজের কামিজেব ভেতর হাত ঢুকিযে একছড়া মুক্তোর মালা বার করে নানকচাঁদেব সামনে ফেলে দিল। বলল, 'টাকা চাই। ইহুদী জহুরীর কাছ থেকে কিনেছিল নানাসাহেব। বিশ হাজার টাকা দাম এর।'

নানকচাঁদ চিরাগের আলোয মালাটা ঘুরিয়ে ফিরিযে দেখে বললেন, 'জানি। কিনেছিলেন কিন্তু আদালা বেগমের জন্য। এ তো চোরাই মাল বিবি, বেশী দাম এব পাবে না। এ বেচা কঠিন।'

আমিনার চোখের কোলে বিদ্যুৎ খেলে গেল, 'যে কাজে নেমেছি মুনশীজী, সেখানে সত্য, ধর্ম, ইমান সব তুচ্ছ। টাকা চাই-ই আমার। কৃপণ নানাসাহেব যা দেয় তাতে কুলোয় না। বিলেত আদালাই তার বেশী পেয়ারের।

আজিজন বেচারী একা আর কত দেবে বলুন। এ মালা আমাকেই দেবার কথা—আদালা জোর করে আদায় করেছে। তেমনি জব্দ করেছি ওকে, বেমালুম সরিয়েছি, সে টেরও পায় নি। সে কথা যাক—কাল সন্ধ্যের ভেতর আমার দশ হাজার টাকা চাই উকিলসাহেব।'

উকিলসাহেব চিন্তিতমুখে আর একবার মালাটি বাতির আলোতে তুলে ধরলেন। তার পর বললেন, 'এখানকার জহুরীরা এ মালা দেখলেই চিনতে পারবে। শেষে কি বুড়োকালে মান খোয়াব?'

দ্বিতীয় তরুণীটি এতক্ষণ একমনে তামাক টানছিল, সে এবার মুখ খুলল, 'আপনার শতেকভুয়ার খোলা উকিলসাহেব। আর সেই জন্যই তো আপনার কাছে আসি। একে আপনি ঠিক চোরাই মালের কারবার বলে ভাবছেন কেন—এ তো দেশেরও কাজ।'

নানকচাঁদ মুখ তুলে তার দিকে চাইলেন। হাসি-হাসি মুখে বললেন, 'তোমরা তা মনে-প্রাণে বিশ্বাস কর বলেই তোমাদের এই আব্দারগুলো আমি মেনে চলি। নইলে পোদ্দারি করা আমার ব্যবসা নয়। অর্থলোভ আমার আছে, কিন্তু চোরা-গোপ্তা এসব কাজ করায় বড় ঝুঁকি আজিজন বিবি।··· তবে এটাও আমি বলে রাখছি—এর আগেও বলেছি, তোমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না। আংরেজ সরকার তোমরা ভাংতে পারবে না। আর তাতে দরকারও নেই। অনেকদিন পরে একটু শান্তির মুখ দেখেছি। আবার ঘুরে-ফিরে তোমার ঐ নানাসাহেবের খপ্পরে গিয়ে পড়লে দেশ বলতে আর কিছু থাকবে না। আবার মারাঠার নামসর্বস্ব পেশোয়াদের হাতে কিংবা মুঘল-বংশের ঐ কুলাঙ্গারদের হাতে দেশকে তুলে দিতে চাই না আমি। তবে তোমরা বিশ্বাস কর—তোমাদের কথা আলাদা।'

আমিনা প্রদীপের কম্পমান শিখাটার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে নানকচাঁদের কথা শুনছিল, সে উত্তর দিল, 'এতদিন বলি নি, আজ বলে রাখছি বাবু নানকচাঁদ, ইংরেজ সরকার এদেশ থেকে অত সহজে যাবে তা আমিও বিশ্বাস করি না। যেত, যদি এই নানাসাহেব তাত্যা টোপীর দল মানুষ হত! যেমন ধুন্ধুপন্থ পেশোয়া, তেমনি তার মুনশী ঐ আজিমুল্লা! ঘেন্না করে উকিলসাহেব, ওদের দিকে চাইলে আমার ঘেন্না করে। আপনি বোধ হয় জানেন না, আমি ইংরেজদের সঙ্গে মিশেছি, আমরা দুই বোনই ইংরেজি জানি। আমি জানি, ওদের তাড়ানো, কি দেশ শাসন করা, এই জন্যেই

কামুক, বিলাসী, অকর্মণ্য লোকগুলোর কাজ নয়। ওদের হাতে দেশ পড়লে দেশ জাহান্নমে যাবে এ-ও জানি। কিন্তু, কিন্তু আমাদেরও উপায় নেই উকিলসাহেব।'

বলতে বলতে আমিনার কণ্ঠ যেন সাপের মতই হিস হিস করে উঠল, 'আমরা যে আগুন জ্বালতে চলেছি তাতে আমরাও পুড়ে মরব—তা জানি। তবু, তবু জ্বালতেই হবে। আর কোন কথা আমি জানি না—আমি শুধু জানি এ আগুন জ্বললে কতকগুলো ইংরেজ মরবে। সে-ই আমার পরম লাভ! পারলে আমি ওদের দেশটা সুদ্ধ মহাসাগরের জলে ডুবিয়ে দিতুম। কিন্তু তা সম্ভব নয়—এমন কি ওদের এদেশ থেকে তাড়ানোও সম্ভব নয়। তাই যেটুকু সম্ভব সেইটুকুই করে যাব—যতদূর সম্ভব তাই করে যাব। ইংরেজ মারতে হবে—এই আমার ব্রত, এই আমার তপস্যা। নিজের হাতে, হ্যাঁ, নিজের হাতেও মারতে পারতুম। কিন্তু সে কটা মারব। একটা, দুটো—নয়তো দশটা। তাতে আমার তৃষ্ণা মিটবে না বাবুজী। আমি চাই শ'এ শ'এ হাজারে হাজারে ইংরেজ মারতে। সেই পরিমাণ আগুন জ্বালাতে হবে। দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত জ্বালাব সে আগুন। তারই ইন্ধন খুঁজে বেড়াচ্ছি।'

বোধ করি দম নেবার জন্যই থামল আমিনা, তার পর বলল, 'এরা রাজা হবে। ঐ লোভী স্বার্থসর্বস্ব কামুক বাঁদরগুলো। আমি কি পাগল বাবুজী, যে তাই বিশ্বাস করব। ওরাও ইন্ধন—কালে ওরাও পুড়বে। আমার তপস্যার, আমার মারণযজ্ঞের ফলাফল আমিই ভাল জানি নানকচাঁদজী—চোখ বুজলেই আমি তা প্রত্যক্ষ দেখতে পাই।...তবু, তবু থামতে আমি পারব না। টাকা আমার চাই-ই। তার জন্য চুরি-জোচ্চুরি কিছুতেই পিছপা হলে চলবে না।'

বলতে বলতে আমিনা বিষম উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল। চোখে তার উন্মাদিনীর দৃষ্টি, সারা শরীর বংশী-বিমুগ্ধা সর্পিণীর মত দুলছে, নিশ্বাস দ্রুত হতে দ্রুততর হয়ে উঠেছে—সারা মুখে যেন কে আগুনের-রং লেপে দিয়েছে এমনি লাল—এই দারুণ শীতের রাতেও তার ললাট কণ্ঠ ঘামে ভরে গিয়েছে। তার সে মূর্তির দিকে চাইলে ভয় করে। নানকচাঁদও ভয় পেয়ে হাত দুই সরে বসলেন।

পশ্চিমের বাড়িতে সেকালে জানলা বড় একটা থাকত না। এ ঘরেও ছিল না। থাকার মধ্যে গোটা-দুই দরজা—শীতের ভয়ে তাও বন্ধ ছিল। ফলে প্রদীপের ধোঁযায় তামাকের ধোঁযায় ঘরের বাতাস বেশ ভারী হয়ে উঠেছিল।

কতকটা সেই কারণেই- হয়তো আমিনার ললাটের স্বেদ-বিন্দু লক্ষ্য করেও নানকচাঁদ উঠে গিয়ে একটা দরজা খুলে দিলেন। একটু দাঁড়িয়ে কান পেতে কী যেন শোনবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু কোথাও কোন সাড়া শব্দ নেই। শীতের ভয়ে অন্তঃপুরিকারাও যে যার ঘরে দরজা দিয়ে রেজাই-এর নীচে ঢুকেছেন। ভেতর দিকে একবার চেয়ে দেখলেন—সেখানে না দেখা যায় কোনও আলো, বা না পাওয়া যায় কোনও শব্দ। তখন আবার কপাটটা ভেজিয়ে দিয়ে নানকচাঁদ নিজের আসনে এসে বসলেন।

'একটু গরম দুধ খাবে আজিজন বিবি?'

আজিজনের আগেই আমিনা উত্তর দিল, 'না না, কিছু দরকার নেই। আমি শান্ত হয়েছি, আপনি স্থির হয়ে বসুন।'

আমিনা আজিজনের হাত থেকে ফরসিটা টেনে নিল।

নানকচাঁদও তাকে আর একটু শান্ত হবার অবকাশ দিলেন। খানিকক্ষণ নিঃশব্দে তামাক টানবার পর প্রশ্ন করলেন, 'তার পর, কি রকম দেখে এলে, সব প্রস্তুত?'

আমিনার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল, 'শুধু দেখতেই যাই নি উকিলসাহেব, প্রস্তুত করতেও গিয়েছিলুম। সে কাজ যতদূর সম্ভব সেরে এসেছি। সমস্ত উত্তর ভারতে সেখানে যত ব্যারাক আছে সব জায়গাতেই এ কথাটা ছড়িয়ে পড়েছে ইংরেজরা তাদের ধর্ম নষ্ট করতে চায়, সবাইকে খ্রীষ্টান করবে এই ওদের ইচ্ছে। সুবিধেও কিছু হয়ে গেল বৈকি! নতুন বন্দুক এনেছে কোম্পানি—তার টোটা তৈরি হচ্ছে কলকাতার কিলায়। সে টোটায় জড়ানোর জন্যে একরকম তেলা-কাগজ আমদানি করেছে, সে-রকম কাগজ এর আগে দেখি নি কখনও।'

নানকচাঁদ সাগ্রহে বললেন, 'কি রকম তেলা—তুমি দেখেছ?'

আমিনা উত্তর দিল, 'দেখেছি বৈকি! শক্ত অথচ তেলা—এপিঠ-ওপিঠ দেখা যায়। এমনি পাতলা কাগজে তেল মাখালে যেমন দাঁড়ায় তেমনি, অথচ কোন তেল হাতে লাগে না।...আমাদের সুবিধে হয়ে গেল। আমরা রটিয়ে দিয়েছি যে, শুয়োরের চর্বি দিয়ে এই কাগজ তৈরী। শুয়োরের চর্বি না হলে এমন কখনও হতে পারে না। শুয়োরের চর্বিতে হিন্দু-মুসলমান দুএরই জাত যাবে—আর তখনই ধরে সবাইকে খ্রীষ্টান করে দেবে।

নানকচাঁদ অবিশ্বাসের সুরে বললেন, 'একথা কি সবাই বিশ্বাস করবে? মানুষ কি এতই বোকা?

''অনেকেই করবে উকিলবাবু। আমাদের দেশের লোক ধর্মের কথায় ঠিক এতটাই বোকা হয়ে পড়ে। কথাটার কানঘুষো শুনেই কিলা থেকে তিন-চার জন সিপাই জমাদার হাবিলদার ডেকে কাগজ পুড়িয়ে সাহেবরা প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছিল যে, কাগজে চর্বি নেই। কিন্তু তবু কেউ বিশ্বাস করে নি।... আরও রটিয়েছি—রটিয়ে দিয়েছি যে, সিপাইদের যে আটা দেওয়া হচ্ছে—তাতে আছে গরু আর শুয়োরের হাড়ের গুঁড়ো। তা ছাড়া বুঝিয়ে দেওয়া হচ্ছে সিপাইদের যে, এই কটা ইংরেজের এত জোর নেই যে, এতবড় দেশটায় রাজত্ব করে। যা কিছু করছে সিপাইরা—আর ইংরেজ বসে বসে খামকা ওদের ওপর রাজত্ব করছে।'

'তার পর?' নানকচাঁদ সাগ্রহে প্রশ্ন করলেন।

'সিপাইদের অসন্তোষের আরও কারণ আছে।' আমিনা বললে, 'মাইনে কম, অথচ প্রত্যেকেরই বড় সংসার। অনেক সিপাইএর দুটো-তিনটে করে বউ আছে। এদেশে কোম্পানির ফৌজে কেউ কাজ করছে শুনলে তার আত্মীয়স্বজন সব ভাবে যে, সে তাদের খাওয়াতে বাধ্য—সবাই এসে ঘাড়ে চাপে। মানমর্যাদা হারাবার ভয়ে সিপাইও চুপ করে থাকে। ফলে সবাইকারই দেনা। সিপাইদের একথাও বোঝাবার চেষ্টা করা হচ্ছে যে, কাজ সমানই করে ওরা, বরং ইংরেজের চেয়ে বেশীই করে। অথচ ওদের চেয়ে ইংরেজ সিপাইদের মাইনে বহুগুণ বেশী। বুঝেছেন? আয়োজনে কোনও দিক থেকে খুঁত থাকছে না।'

নানকচাঁদ ক্ষণকাল নিঃশব্দে আমিনার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। আমিনার মুখে সগর্ব হাসি। সে পুনশ্চ বললে, 'আর একটা ভারি সুবিধে হয়ে গেছে, জানেন? স্বয়ং খোদাতালা সুবিধেটা করে দিয়েছেন।'

'কি রকম ?'

'কারা যেন একটা মজার খেলা শুরু করেছে। দুপুর রাত্রে গ্রামে কোন একজনের বাড়ি কেউ দুখানা রুটি ফেলে দিয়ে যায়। তার সঙ্গে লেখা থাকে যে তাকেও এমনি করে ছটা গ্রামে এই রুটি পৌঁছে দিতে হবে, নইলে অনিষ্ট হবে। সে বেচারা প্রাণের ভয়ে তা-ই করে। এমনি করে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে চলেছে রুটির খেলা। আমরা সেই সুযোগে সিপাইদের ভেতর রটিয়ে দিয়েছি যে, সমস্ত দেশ তৈরী আছে। সিপাইরা জাগলে দেশও জাগবে—লড়াই শুরু হলে সবাই দলে দলে এসে সিপাইদের দিকে যোগ দেবে। টাকা আর রুটি—অন্তত এ-দুটোর অভাব হবে না এই যে রুটি চালাচালি চলছে—এতে আসন্ন বিপ্লবের খবরই পাঠানো হচ্ছে।'

নানকচাঁদ আবারও অবিশ্বাসের সুরে বললেন, 'এ কথা তারা বিশ্বাস করছে ?'

'করছে বৈকি।'

'তাজ্জব।...ভাবি তাজ্জব। ফৌজে গেলে কি মানুষ এতই বোকা হয়।'

আজিজন বলল, 'কেন, এতে অবিশ্বাস করবারই বা কি আছে ?'

'আছে বৈকি বিবিসাহেবা। আমাকে কেউ একথা বোঝাতে এলে আমি প্রশ্ন করতুম যে, বিদ্রোহ আসন্ন এই খবরটা দেওয়া হচ্ছে, না বিদ্রোহ করতে বলা হচ্ছে ? প্রস্তুত থাকতে বলা হচ্ছে, না প্রস্তুত আছে এই খবর দেওয়া হচ্ছে ? এ রুটির অর্থ কি ?'

'যে যা প্রশ্ন করছে, সুবিধামত তাকে সেই জবাবই দেওয়া হচ্ছে।'

'কিন্তু গ্রামের লোক এ রুটির কি খবর খুঁজে পাবে ? রুটি পাঠানোর দরকারই বা কি ? কেউ কি এ প্রশ্ন করছে না ?'

'সে প্রশ্ন করলে আমরা বলব যে, সোজাসুজি বিদ্রোহের খবরটা তো আর প্রচার করা যায় না। তাই এই রুটির ছদ্মবেশ।'

'কিন্তু রুটি পাঠানোর যে এই অর্থ—সেটা তো আগে তা হলে প্রচার করতে হয়েছে। নইলে শুধু মাঝরাত্রে রুটি এসে পৌঁছলে সাধারণ লোক কি বুঝবে ? আর রুটি পাঠানোর অর্থ যদি আগে প্রচার করা হয়ে থাকে তো রুটি পাঠানোর কোন প্রয়োজনই থাকে না। না বিবিজান —এ বড় গোঁজামিলের ব্যাপার। এ যারা বিশ্বাস করছে তাদের গর্দানের ওপর মাথাটা নেই। ফৌজের সম্বন্ধে ক্রমেই হতাশ হচ্ছি !'

আমিনা ও আজিজন দুজনেই হেসে উঠল। আমিনা বলল, 'সবাই যদি আপনার মত বুদ্ধিমান হত তো আমাদের কাজ চলত কি করে? আর তা হলে তারা আট টাকা মাইনেতে ফৌজেই বা কাজ করতে যাবে কেন? তারা তো উকিল নানকচাঁদের মত মাথা খাটিয়েই হাজার হাজার টাকা রোজগার করতে পারত!'

নানকচাঁদ এ কথার উত্তর না দিয়ে নীরবে আরও কিছুক্ষণ তামাক টানতে লাগলেন। পরে বললেন, 'পঞ্জাবী সিপাইরা তোমাদের দিকে আসবে মনে কর?'

'না বাবুজী। ওরা এক আশ্চর্য জাত। এই সেদিনের মার-খাওয়া একবারে ভুলে গেল।'

'কিংবা ভোলে নি। যারা মেরেছে তাদের হিম্মত জানে। আবার তাদেরই হাতে মার খাবার ইচ্ছে নেই।—রাজপুতরা?'

'ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। রাজপুত রাজারা যে কি করবেন।'

'তারা কেউ তোমাদের দিকে আসবে না। অন্তত নানাসাহেবের নাম থাকলে তো নয়ই। মারাঠাদের হাতে বহু দুঃখ তারা পেয়েছে, ইংরেজদের তাড়িয়ে সে জায়গায় মারাঠারাজ বসাতে তারা আর চাইবে না।·· হুঁ। বোঝা গেল।—তেলেঙ্গীরা?'

'সন্দেহ আছে এখনও।'

'না বিবিসাহেব। তা হলে এ কাজে এগোনো তোমাদের উচিত হয় নি। আশা-ভরসা বড়ই কম। আগুন জ্বালছ বটে—তবে সে আগুনে পতঙ্গের মত তোমাদেরই ঝাঁপ দিয়ে মরতে হবে।'

'দেখা যাক। দিল্লী থেকে দমদম প্রায় কলকাতা পর্যন্ত—ইংরেজ ফৌজ যা আছে, সিপাই আছে তার দশগুণ। আর এইখানকার ইংরেজ যদি ঘায়েল করতে পারি—বোম্বাই, মাদ্রাজ সব জায়গায় সিপাইরাই জাগবে। বেগতিক দেখলে চাই কি রাজপুত আর পঞ্জাবী সর্দাররাও আমাদের দিকে আসবে।'

'ওরাও মুলুক থেকে ফৌজ আনাবে।'

'শুনেছি বাবুজী, আড়াই মাস সময় লাগে ওদেশ থেকে এদেশে পৌঁছতে।'

'আড়াই মাস খুব বেশী সময় নয়, হুসেনী বিবি। তা ছাড়া, গোর্খারা আছে। ইংরেজদের হাতে না রাখলে জঙ্‌বাহাদুরের চলবে না।···এখনও সময় আছে, এখনও বিরত হও। মুঘলরাজ মরে পচে গেছে, দিল্লীতে এখন তিল

শকুনের আড্ডা। পেশোয়া-বংশও মরে গিয়েছে বিবি, সে আর বাঁচবে না। পুষ্যিপুত্তুরকে দিয়ে পরলোকের নামে পিণ্ডিই দেওয়া চলে শুধু, ইহলোকে আর কোন সুবিধে হয় না। দেখ—ভাল করে ভেবে দেখ!'

আমিনা পাথরের মূর্তির মত স্থির হয়ে বসে রইল কিছুক্ষণ। তার পর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল, 'না, ফেরার আর কোন উপায় নেই। নরকের পথে অনেকদূর নেমে এসেছি। যেদিন এই দেহটা ঐ নানাসাহেবের লালসার খোরাক করে দিয়েছি, সেই দিনই তো চিতাশয্যা বিছিয়েছি নিজে হাতে বাবুসাহেব, পুড়ে মরা ছাড়া এর তো আর কোন গতি নেই। আর পুড়ি যদি তো আরও দু-চারজনকে পোড়াতে ছাড়ব কেন। কার কি হবে তা নিয়ে আর মাথা ঘামাব না। আমরা দুই বোন আগুন জ্বালাতে এসেছি, আগুন জ্বালিয়ে চলব—যতক্ষণ বাঁচি। নিজের দেহকে স্ফুলিঙ্গ করে—ভারতব্যাপী ইন্ধনের উপযুক্ত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ—তাই না?…না, আর বাঁচবার, সাবধান হবার, ফেরবার কোন পথ কোথাও খোলা নেই।'

নানকচাঁদের কান কিন্তু শেষের দিকে আমিনার কথায় ছিল না। তাঁর অভ্যস্ত কান কোন দূর পদশব্দ শুনছিল। আমিনার বলা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি বলে উঠলেন, 'ঐ বোধ হয় তিনি এসেছেন—এতক্ষণে!'

তার পর উঠে গিয়ে আবার কপাট খুলে দাঁড়ালেন। সঙ্গে সঙ্গে একঝলক ঠাণ্ডা বাতাস এসে প্রদীপের শিখাটা কাঁপিয়ে তুলল। আজিজন ঘাড়টা উঁচু করে দেখল—বাইরের জমাটবাঁধা অন্ধকারের মধ্যে একটা ক্ষীণ আলোক-শিখা ক্রমশ কাছে এগিয়ে আসছে। একটু পরেই আগন্তুক ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়ালেন। সঙ্গের আলোক-সহচরীটি যেমন নিঃশব্দে এসেছিল, তেমনিই নিঃশব্দে ফিরে চলে গেল। নানকচাঁদ আবার সন্তর্পণে দরজাটা বন্ধ করে দিলেন।

যিনি এসে দাঁড়ালেন, প্রদীপের ক্ষীণ আলোতেও তাঁকে বেশ ভাল করে দেখা গেল। তিনিও মুসলমান, ঠিক যুবাপুরুষ না হলেও মধ্যবয়সে পৌঁছতে এখনও দেরি আছে। অত্যন্ত সুপুরুষ, উজ্জ্বল গৌরবর্ণের সঙ্গে ঘনকৃষ্ণ কুঞ্চিত দাড়ি ও গোঁফ বড় চমৎকার মানিয়েছে। চোখ মুখ নাক ও ললাট—সমস্তই সুডৌল ও সুশ্রী। চোস্ত পাজামা ও চাপকান পরনে, মাথায় সাদা সুতোর কাজ-করা টুপি। ঘরের মাঝামাঝি এসে লোকটি দুটি মহিলার মাঝামাঝি একটা স্থানের দিকে মুখ করে ঈষৎ অভিবাদনের ভঙ্গি করলেন।

নানকচাঁদ ততক্ষণে নিজের জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছেন। এবার তিনি পরিচয় করিয়ে দিলেন, 'এই যে, এঁর কথাই তোমাদের বলছিলুম। ইনিই আমার সেই বন্ধু—মহম্মদ আলি খাঁ, রোহিলখণ্ডের লোক। আর এরা—এঁদের পরিচয় তো জানেনই।'

ক্ষীণ আলোর প্রথম অস্পষ্টতা সয়ে গেছে। দু পক্ষই দু পক্ষকে ভাল করে দেখে নিয়েছেন, ফলে একটা অস্বাভাবিক স্তব্ধতা ঘরের মধ্যে।

নানকচাঁদ আগে অতটা বুঝতে পারেন নি। এখন আমিনার দিকে তাকিয়ে তার স্তম্ভিত দৃষ্টি অনুসরণ করে চোখ তুলে মহম্মদ আলি খাঁর দিকে তাকালেন।

মহম্মদ আলি খাঁ নিথর নিস্পন্দ পাথরের মূর্তির মত অবিচল অবস্থায় দাঁড়িয়ে। তাঁর দৃষ্টি বিস্ময়-বিস্ফারিত, স্থির। নানকচাঁদ দেখলেন, একটু একটু করে সেই প্রসারিত চোখদুটি বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে এল—ক্রমে সে বাষ্প গলল। আয়ত চোখের কোল বেয়ে সে জল ফোঁটা ফোঁটা করে ঝরে কপোল ভাসিয়ে শ্মশ্রু প্রান্ত বেয়ে বুকের কাছে জামাটা ভিজোতে লাগল।

ততক্ষণে রমণী দুটিরও স্তম্ভিত অবস্থা কেটেছে। আজিজন নিজের কঙ্কণ দিয়ে নিজের ললাটে আঘাত করল। আমিনা অস্ফুটকণ্ঠে কি একটা বলে উঠল। ভাল করে তার কণ্ঠে স্বরও ফুটল না। পরমুহূর্তেই সে চেতনা হারিয়ে আজিজনের কোলে ঢলে পড়ল।

॥ ৫ ॥

নানকচাঁদের বাড়ির বৈঠক ভাঙল সেদিন অনেক রাত্রে। প্রথম প্রহর তার বহু পূর্বে উত্তীর্ণ হয়ে গেছে—দ্বিতীয় প্রহরও শেষ হয় হয়। নীচের দোকানপাট বন্ধ করে দোকানদাররা যে যার ঘরে চলে গিয়েছেন ; দু-একজন এখনও মায়া কাটাতে পারেন নি বটে—তবে তাঁরাও ঝাঁপ বন্ধ করে ভেতরে বসে কাজ করছেন। ফলে পথ জনবিরল ও অন্ধকার—সেদিকে চাইলে সাধারণ গৃহস্থেরও ভয়-ভয় করে।

নানকচাঁদই প্রথমে কপাট খুলে বাইরে এলেন—তাঁর পেছনে পেছনে বাকি তিন জন। যে দাসী মহম্মদ আলি খাঁকে পথ দেখিয়ে এনেছিল সে

তখনও অপেক্ষা করছে। বোধ হয় এই রকমই হুকুম ছিল। এধারের বারান্দা থেকে অন্তঃপুরে যাবার পথে সিঁড়ির মুখটায সে একটা অতিশয় মলিন কাঁথা মুড়ি দিয়ে শীতে কুকুর-কুণ্ডলী অবস্থায় বসে আছে—অথবা বলা উচিত, বসে বসে ঘুমিয়ে পড়েছে। তাব সামনের ডিব্বাটা তখনও জ্বলছিল—কুয়াশাচ্ছন্ন নিবাত আবহাওয়াব জন্য তার শিখাটা নিষ্কম্প স্থির, যদিও তাতে আলো অপেক্ষা ধোঁযাই বেরুচ্ছিল বেশী। নানকচাঁদ বুড়িকে ডাকলেন না—হয়তো সেটা শুধু অনুকম্পাই নয়, তাব মুলে সতর্কতার প্রশ্নও কিছু ছিল—তিনি কাছে এসে সাবধানে ডিব্বাটা তুলে নিলেন ও তার শিখাটা একটু উজ্জ্বল কবে দিয়ে পাশের সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলেন।

বোধ কবি অনাবশ্যক বোধেই তিনি তাঁর অনুগামীদের দিকে ফিবে চাইলেন না—অথবা তাদেরই সঙ্গে আসতে কোন ইঙ্গিত করলেন না। তারাও সেজন্য অপেক্ষা করল না। নিঃশব্দে সেই সংকীর্ণ সিঁড়িপথে কোনমতে 'জান' বাঁচিয়ে তাঁর পেছনে পেছনে একজনেব পর একজন অনুগমন করতে লাগল। সিঁড়ি পার হযে একটা অন্ধকাব স্যাঁতসেঁতে সুঁড়ি পথ—তাব পর সামান্য একটু উঠোন। উঠোনটায রাশীকৃত আবর্জনা—কোথাও কোথাও বর্ষায় আগাছাও গজিয়েছিল, এখনও তার চিহ্ন রযেছে। ফুঁকো কাচের শিশি-ভাঙাই বেশি—তার মধ্যে দিয়ে খালি-পা বাঁচিয়ে যাওযা কঠিন। উপস্থিত সকলকার পাযেই জুতো থাকাতে অবশ্য সেজন্যে কোন অসুবিধা হল না। যথাসম্ভব সাবধানেই তাঁরা উঠোন পাব হলেন। নানকচাঁদ চাবি দিয়ে দরজা খুললেন, তার পর এক প্যাশে সবে দাঁড়িয়ে তাঁদের বাইরে যাবাব পথ দিলেন।

মহম্মদ আলি খাঁ ঘোড়ায় চড়ে এসেছিলেন—সে ঘোড়া বাইরে বাঁধা ছিল। শিক্ষিত ঘোড়া—আলো দেখে যেন আড়মোড়া ভেঙে সোজা হয়ে দাঁড়াল, কিন্তু কোন শব্দ করল না। মহম্মদ খাঁ কোন বিদায়-সম্ভাষণ করলেন না—নানকচাঁদের দিকে ফিরে ঘাড়টা ঈষৎ একটু নত করলেন মাত্র—তার পর নিঃশব্দ ত্বরিত-গতিতে ঘোড়ার ওপর উঠে বসলেন। ঘোড়াও বোধ হয এই ইঙ্গিতটুকুরই অপেক্ষা করছিল, সে চোখের নিমেষে সেই পাথর-বাঁধানো সড়কে ক্ষুরের প্রতিধ্বনি জাগিয়ে অদৃশ্য হযে গেল।

আমিনা ও আজিজনের ডুলিওয়ালারাও অপেক্ষা করছিল। এবার তারা ডুলি এনে একেবারে দরজার সামনে নামাল। আজিজনের সাধারণ

ডুলি—শুধু বসবার জায়গায় একটু দামী গদি পাতা। আমিনার ডুলি কিন্তু ধনী গৃহিণীরই উপযুক্ত—চারদিকে ভেলভেটের ঘেরাটোপ, তাতে সলমা-চুমকির কাজ-করা—ডিব্বার আলোতে ঝকমক করে উঠল।

আজিজনও নানকচাঁদকে দু হাত জোড় করে নমস্কার করল শুধু—কোন বিদায়-সম্ভাষণ জানাল না। কেবল ডুলিতে পা দিয়ে একবার কি মনে করে আমিনার দিকে ফিরে দাঁড়াল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুই বলা হল না। নিঃশব্দে গিয়ে আবার নিজের ডুলিতে উঠল।

আজিজনের ডুলি পথের বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেল। আমিনা এতক্ষণ কেমন একরকম তন্দ্রাচ্ছন্নের মত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। এবার যেন ঘুম ভেঙে জেগে উঠল। একটা ছোট দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে নানকচাঁদকে শুধু বলল, 'কাল সন্ধ্যের সময় ?'

নানকচাঁদ ঘাড় নাড়লেন।

আমিনা ডুলিতে উঠে বাহকদের নির্দেশ দিল, 'ঘাটে চল।'

শহরের একপ্রান্তে সতীচৌরা ঘাট। কবে কোন্ বিস্মৃত অতীতকালে কোন্ সতী এখানে সহগমন করেছিলেন, তারই স্মৃতি বহন করছে এই ঘাটটি। স সতীদেবীর একটি মন্দিরও আছে—কিন্তু তৎসত্ত্বেও এ অঞ্চলে ভদ্রলোকদের আসা-যাওয়া খুব কম। প্রধানত জেলে-নৌকার মাঝিদেরই আড্ডা এখানটায়—মন্দিরটিও তারাই জিইয়ে রেখেছে। কাছাকাছি বসতিও বিশেষ নেই, ঘাটের দু দিকে উঁচু পাড়ে ঘন আগাছার জঙ্গল। জেলেরা দিনের বেলা তবু ঘাটে কিছু ভিড় করে—সন্ধ্যের পর যে যার নৌকোয় আশ্রয় নেয়। নৌকোগুলোও ঠিক ঘাটে থাকে না, কিছু দূরে জলের মধ্যে একটার সঙ্গে আর একটা বাঁধা থাকে। ফলে কোন এক খুঁটিকে কেন্দ্র করে যেন একটি ভাসমান দ্বীপ গড়ে ওঠে।

আমিনার ডুলি যখন এসে ঘাটের মুখে থামল, তখন সতীচৌরা ঘাট নিষুতি হয়ে গেছে। গরমের দিনে অনেক রাত্রি পর্যন্ত মন্দির খোলা থাকে, তখন এখানে কিছু কিছু গান-বাজনাও হয়, কিন্তু এই দুর্দান্ত শীতের রাত্রে, গঙ্গার হাড়-কাঁপানো হাওয়ায় কোন ভক্ত বেশী রাত্রে মন্দিরে পুজো দিতে আসবে—এ সম্ভাবনা কম। সুতরাং পূজারী বহুক্ষণ আগেই মন্দির বন্ধ করে বাসায় চলে গেছেন—সম্ভবত এতক্ষণে রেজাইএর নীচে তাঁর নাসিকা গর্জন চলছে।

সারা ঘাট জনমানবশূন্য। নৌকোগুলোতেও আলোর চিহ্ন নেই। বস্তুত কুয়াশায় জল নৌকো কিছুই ভাল করে দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না—সব যেন লেপে মুছে একাকার হয়ে গেছে।

আমিনা সেই গাঢ় অন্ধকারেই সিঁড়ি বেয়ে জলের দিকে খানিকটা নেমে গেল। তার পর, একেবারে শেষ ধাপের কাছে গিয়ে, খুব আস্তে একটা শিস দিল।

সঙ্গে সঙ্গে আর একটা শিসে তার উত্তর এল। খুব কাছেই কেউ দাঁড়িয়ে আছে, এবং যে আছে সে পুরুষই—শিস শুনলে তা অনুমান করতে দেরি হয় না।

কিছুই দেখা যায় না—কাউকেই না। আমিনার বুকটা কি একটু ছাঁৎ করে উঠল?

কিন্তু ভয় পেলেও সে বিহ্বল হল না। তার কোমরে গোঁজা ছিল একটা ছোট্ট পিস্তল, দ্রুত হাতে সেটা খুলে নিয়ে চাপা কণ্ঠে বলে উঠল, 'কে?'

'আমি—বেটী। আমি—'

'ও, মৌলবীসাহেব। আসুন—সালাম।'

এতক্ষণে চোখ অন্ধকারে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। আমিনা দেখল ঘাটেই একটা নৌকো বাঁধা আছে, একেবারে তার সামনে—আর সেই নৌকো থেকেই দীর্ঘদেহ এক মৌলবী নেমে এলেন।

আমিনা নিশ্চিন্ত হয়ে পিস্তলটি কোমরে গুঁজল। মৌলবী তা এই অন্ধকারেও লক্ষ্য করলেন, হেসে বললেন, 'ভয় পেয়েছিলি বেটী?'

'সব রকম বিপদের জন্যেই প্রস্তুত থাকা ভাল নয় কি? যদি অপর কেউ হত?'

'তা বটে, ঠিকই।'

মৌলবী সিঁড়িরই একটা পইঠের ওপর বসলেন। তার পর পাশের জায়গাটা দেখিয়ে দিয়ে বললেন, 'ব'স আমিনা।'

আমিনা বসল বটে, কিন্তু তার কণ্ঠস্বরেই অসহিষ্ণুতা প্রকাশ পেল। বলল, 'তার পর?'

মৌলবী বললেন, 'আমার কাজ আমি করে যাচ্ছি। আরা, বক্সার, কাশী, চুনার, এলাহাবাদ, মির্জাপুর—শেষ করেছি। এবার যাব লক্ষ্ণৌ হয়ে ফৈজাবাদ, জৌনপুর। যেখানে যাচ্ছি, আগুন জ্বালাচ্ছি। যে কোন মুসলমান 'মুসলমান'

পরিচয় দিয়ে গর্ববোধ করে—তারই রক্ত তাতিয়ে তুলতে পারব বেটী, তুমি কিছু ভেবো না। কিন্তু; টাকা চাই—অনেক টাকা। মোল্লাদের টাকা না খাওয়ালে চলবে না, আমার একার দ্বারা তো সব কাজ হতে পারে না।'

'টাকা তৈরী আছে। কাল এমনি সময় সর্দার খাঁ টাকা নিয়ে ঘাটে উপস্থিত থাকবে। কিন্তু আপনি—আপনি একটু সাবধানে থাকবেন মৌলবীসাহেব। ইংরেজ জাত বড় শয়তান।'

'তা আমি জানি আমিনা। শয়তানের নজর পড়েছে। ছায়ার মত গোয়েন্দা ফিরছে আমার পিছু পিছু ক'দিন থেকেই। আজ অনেক কষ্টে ওদের চোখে ধুলো দিয়ে এসেছি—কুয়াশা ছিল বলেই সুবিধে।'

'যদি আপনাকে কয়েদ করে—যদি, যদি আর কিছু—'

আমিনার কণ্ঠস্বরে আন্তরিক উদ্বেগ ফুটে উঠল।

মৌলবীসাহেব করুণ প্রসন্ন হাসি হাসলেন। বললেন, 'যদি কি—ফাঁসি দেয় যদি? আহ্‌মেদউল্লা অনেকদিন তোমার বাপের নিমক খেয়েছে। তোমাদের অপমানের শোধ নিতে, তোমাদের কাজে যদি তার জান যায় তো সে পরোয়া করবে না আমিনা। তবে তোমার কাজটা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে এই যা আফসোস।'

আমিনা দু হাত বাড়িয়ে তাঁর ডান হাতখানা চেপে ধরল, বলল, 'দরকার নেই মৌলবীসাহেব। আমার জন্যে আপনি অনর্থক জীবন বিপন্ন করবেন না। যা পারি আমিই করব। আপনার যদি কোন ক্ষতি হয় তো আমি খোদাতালার কাছে কী জবাব দেব?'

'সে জবাব আমিই না হয় তোমার হয়ে দেব মা। তুমি কিছু ভেবো না।'

বলতেই তাঁর অভ্যস্ত কান খাড়া হয়ে উঠল। দূরে মাঝদরিয়া দিয়ে কোন একটা ডিঙ্গি যাচ্ছে, যতদূর সম্ভব নিঃশব্দে—তবু সেই সামান্যতম শব্দও সেই অখণ্ড নৈঃশব্দ্যের মধ্যে বেশ স্পষ্ট বোঝা গেল।

চকিতের মধ্যে আহ্‌মেদউল্লা উঠে দাঁড়ালেন। আমিনার মাথায় হাত রেখে বোধ করি কী একটা আশীর্বাদই করলেন—তার পর আরও চাপা গলায় শুধু বললেন, 'কাল এমনি সময়ে!' তার পরই এক লাফে তাঁর ডিঙ্গিতে উঠে ঘাটের সিঁড়িতে একটা ধাক্কা দিলেন—ডিঙ্গিটা নিঃশব্দে সোজা গিয়ে

মাল্লাদের নৌকোর ধীপের সঙ্গে লেগে গেল। আর তার কোন পৃথক অস্তিত্ব রইল না।

দূরের নৌকোটি কাছে আসছে। আমিনাও ঘাটের সিঁড়ি বেয়ে দ্রুত-গতিতে ওপরে উঠে গেল। ডুলিতে উঠে বাহকদের আদেশ করল, 'বাড়ি চল—জলদি।'

॥ ৬ ॥

কানপুরের মূল শহর থেকে তিন চার ক্রোশের ভেতরেই বিঠুর প্রাসাদ। শেষ পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাও যখন গদিচ্যুত হন তখন তাঁকে কোথায় রাখা হবে—ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কাছে তা একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। অনেক তকরার ও আবেদন-নিবেদনের পর বড়লাট এই বিঠুর স্থানটি নির্বাচন করেন। প্রথমটা বাজীরাও কিছুতেই বিঠুরে থাকতে রাজী হন নি, কারণ তিনি শুনেছিলেন যে, জায়গাটা বড়ই অস্বাস্থ্যকর। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁকে ঐখানেই থাকতে হয় এবং ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮৫১ পর্যন্ত—এই তেত্রিশ বছর ওখানে কাটিয়ে তিনি প্রমাণ করে দেন যে, জায়গাটার জল-হাওয়া খুব খারাপ নয়।

এই দীর্ঘকালে বিঠুর ও তার আশপাশে এক বিরাট বসতি গড়ে উঠেছে। রাজা নির্বাসিত হলেও রাজা তো বটেই—তাঁর লোকজন সিপাহি-সান্ত্রী জাঁকজমক কিছু না কিছু থাকবেই। রাজার উপযুক্ত বার্ষিক ভাতা না পেলেও পেশোয়ার পোষ্যপুত্র নানা ধুন্ধুপন্থ সেসব ছেঁটে ফেলতে পারেন নি—নামে বা মর্যাদায় না হোক, ইংরেজ কোম্পানির চোখে না হোক—ওদের কাছেই পেশোয়া সেজে বসে আছেন।

বংশ এবং পেশোয়া উপাধিকে চিরস্থায়ী করতে বন্দী ও নির্বাসিত বাজীরাও কম চেষ্টা করেন নি। রাজ্যচ্যুত হবার পরও বহুবার বিয়ে করেছিলেন এবং সেদিকে যখন কোন আশা-ভরসা থাকে নি, তখন প্রায় একসঙ্গে তিনটি পোষ্যপুত্র নিয়েছেন। আমরা যখনকার কথা বলছি তখন তাঁদের একজন গিয়েছেন, দুজন আছেন—নানাসাহেব ও বালাসাহেব।

কিন্তু এত কাণ্ড করেও পেশোয়া উপাধি অব্যাহত থাকে নি। ইংরেজ কোম্পানি স্বীকার করেন নি নানাসাহেবকে। ব্যক্তিগত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী

লেও নানাসাহেব পেশোয়া বাজীরাওএর আট লক্ষ টাকা বার্ষিক ভাতার অধিকারী হন নি। তার জন্য নানা লড়েছেন ঢের। বহু টাকা খরচ করে আজিমুল্লা খাঁকে বিলাতে পাঠিয়েছেন বিলাতী দরবারে আবেদন-নিবেদন জানাতে, কিন্তু কোন ফল হয়নি। সত্তর লক্ষ টাকা খরচ করে আজিমুল্লা খাঁ দু হাত ভরে বিলাতী প্রীতি আনলেও কোম্পানির ওপর কোন হুকুমনামা আনতে পারেন নি।

এর পর অনুমান করা অস্বাভাবিক নয় যে, নানাসাহেব ইংরেজদের বিষনজরে দেখবেন। কিন্তু বাহ্যত সেরূপ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নি—বরং তাঁর ইংরেজ-প্রীতি যেন দিন দিন বেড়েই যাচ্ছে। বিঠুর প্রাসাদে খানা ও নাচের মজলিস আগেও বসত—এখন তো প্রায় প্রতি শনিবারে বাঁধা-ধরা হয়ে গিয়েছে। এবং সে মজলিসে আসেন না কে। জেলা হাকিম, কমিশনার থেকে শুরু করে কানপুর গ্যারিসনের মিলিটারি অফিসাররা সকলেই দলে দলে তাতে যোগ দেন—সস্ত্রীক তো বটেই, কখনও পরিবারের অন্য পরিজন সমেতও। বিঠুরের নিমন্ত্রণ এমনই লোভনীয় যে, পেলে কেউই প্রত্যাখ্যান করেন না।

তার অনেকগুলি কারণ আছে। প্রথমত নানাসাহেব 'সাহাব লোগ'এর সম্মান জানেন—অর্থাৎ কাকে কতটুকু খাতির করতে হবে সে সম্বন্ধে তাঁর দিব্য জ্ঞান আছে। পানভোজনের বন্দোবস্তটা ইংরেজী মতেই হয়—এমন কি কাঁটাচামচগুলি পর্যন্ত খাস শেফিল্ডের। 'খানা' ও 'পিনায়' অর্থব্যয় করতে নানার কিছুমাত্র কার্পণ্য নেই। ভাল আহার্য ও দামী বিলাতী সুরা—এর কদর তিনি জানেন। তাছাড়া সাহেবদের সঙ্গে নানা মিশতেও জানেন। তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত কথাবার্তা, তাঁর রসিকতা প্রভৃতি ঠিক অন্যান্য দেশীয় রাজাদের মত নয়—অর্থাৎ ভোঁতা নয়। নাচের সময় গদিতে দেহ এলিয়ে দিয়ে 'মজা' দেখেন না. সামান্য ভুঁড়ি হওয়া সত্ত্বেও তিনি কখনও কখনও নিজে তো যোগ দেনই, অন্য সময়েও অতিথিদের ভেতর ঘুরে বেড়িয়ে তাঁদের সাহচর্য উপভোগ করেন। এইসব কারণে নানাসাহেব তাঁর জাতশত্রু সাহেবদের—প্রিয় তো বটেই, বিশ্বাসভাজনও।

যে রাত্রে আমিনা নানকচাঁদের বাড়ি গিয়েছিল সেদিন ছিল শুক্রবার। পরের দিন শনিবার—সাহেবদের আপ্যায়িত করতে নানা ব্যস্ত থাকবেন, এই জেনেই আমিনা নানকচাঁদ ও আহমেদউল্লার সঙ্গে টাকা লেনদেনের ব্যবস্থা

করেছিল, কিন্তু কার্যকালে তা ঠিক ঘটল না। সন্ধ্যায় আমিনা নিজের ঘরে বসে কয়েকটা চিঠি লিখছে, এমন সময় দাসী এসে সংবাদ দিল—মহামান্য পেশোয়া এই দিকেই আসছেন।

চকিতে আমিনা অসমাপ্ত চিঠিটা বিছানার নীচে লুকিয়ে ফেলল—তার পর আয়নার দিকে তাকিয়ে দ্রুত হস্তে বেশভূষা একটু ঠিক করে নিয়ে নিশ্চিন্ত আলস্যে একখানা বই হাতে করে শুয়ে পড়ল—যেন এতক্ষণ স অখণ্ড মনোযোগের সঙ্গে এই বইখানাই পড়ছিল।

নানাসাহেব নিঃশব্দে ঘরে প্রবেশ করলেন। তাঁর বয়স যৌবনের সীমাকে পেছনে ফেলে এসেছে, কিন্তু প্রৌঢ়ত্বে প্রবেশ করতে তাঁর এখনও অনেক দেরি। ভুঁড়িটা একটু স্পষ্ট হয়ে উঠেছে বটে, তবু তাঁর চলাচলন থেকে যৌবনদৃপ্ততা একেবারে মুছে যায় নি। নানাসাহেবের পরনে সাধারণ মারাঠীর পোশাক, কেবল কোমরবন্ধ ও উষ্ণীষে আভিজাত্যের চিহ্ন কিছু কিছু আছে। মাথা ও দাড়ি কামানো, স্থূল অধরোষ্ঠের দরুন গোঁফ থাকলেও তা ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে নি। তাঁর ললাটে তখনও সকালের পূজার চিহ্ন বিভূতি রয়েছে। দু কানের মুক্তালঙ্কারের মূলে চন্দনের চিহ্ন—গলায় একটি মুক্তার মালা।

নানা ঘরে ঢুকে একেবারে আমিনার শয্যার পাশে এসে দাঁড়ালেন তার পর তাঁর অভ্যস্ত মিষ্টকণ্ঠে ডাকলেন, 'হুসেনী!'

আমিনা যেন চমকে উঠল, 'এ কি, পেশোয়াজী স্বয়ং! কি ভাগ্য আমার! আজ এমন নিশীথরাত্রে সূর্যোদয় ঘটল।'

নানাসাহেব হাসলেন। বললেন, 'হুসেনীবিবি, বিলেত হলে এসব কথাবার্তা তোমার বহুৎ কাজে লাগত। মূর্খ পাহাড়ীর কাছে বিদ্যেটা একেবারে মাঠে মারা যাচ্ছে।'

আমিনা শয্যা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছিল। এখন নানাসাহেবকে বসতে বলে সে নিজেও নীচে তাঁর পায়ের কাছে বসল। নানা সস্নেহে তার কাঁধে একটা হাত রাখলেন।

আমিনা বলল, 'তার পর? দাসীকে কী হুকুম?'

'হুকুম ছাড়া কি আসার অন্য কোন কারণ থাকতে পারে না হুসেনী?'

'সে এখানে কেন থাকবে জনাব? তার জন্য আপনার পিয়ারী আদালা বেগম আছে। তাছাড়া, এমন অসময়ে, রূপসী মেমসাহেবদের জব্বর রোশনী চোখের সামনে থাকতে, কি মাটির চিরাগদের এমনি মনে পড়ে?'

নানাসাহেবের মুখে বারেক একটা ছায়াপাত হল। তিনি বললেন, 'আদালার কথা আর ব'ল না। সে বড় ক্ষেপে আছে কাল থেকে। তার একটা—তার একটা দামী জিনিস চুরি গেছে!'

'ও, তাই নাকি! কী জিনিস মহারাজ?'

'একটা দামী মুক্তার মালা!'

'এই! তা এতে আর দুঃখ করার কী আছে? তাকে রোজই তো কত দামী উপহার দিচ্ছেন। তার ভেতর কী গেল আর কী রইল—তারও কি হিসেব থাকে নাকি আদালার? বোঝা গেল, সেইজন্যই মহারাজ তাকে এত পেয়ার করেন। খুব হুঁশিয়ার মেয়ে।'

নানাসাহেবের দু চোখ নিমেষের জন্য জ্বলে উঠল। তিনি বললেন,'আমার পিতা-পিতামহ প্রত্যহ দামী জিনিস উপহার দেওয়ার হিম্মত রাখতেন ঠিকই, কিন্তু আমি—আমার কি আর সে ক্ষমতা আছে হুসেনী? তা হলে আর ভাবনা কি ছিল? আমি তো আজ ভিখিরী।'

'আপনার দাসী হুসেনীর জীবনের স্বপ্নই হল যে, আপনাকে সে হিন্দুস্তানের মসনদে দেখবে, জনাব!'

'ও তোমার পাগলামি হুসেনী। ইংরেজ প্রবল—আজ ওদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে সারা হিন্দুস্তানে এমন শক্তি কই?'

'যদি ঈশ্বর দিন দেন তো ওদের শক্তি দিয়েই ওদের মারব মহারাজ। আপনি শুধু ক্ষণকাল ধৈর্য ধরুন।'

'ওসব কথা থাক হুসেনী, শুধু শুধু মন খারাপ করে লাভ নেই। আমি ভাবছি আদালার ঘর থেকে ওর গহনা চুরি করলে—এ প্রাসাদে এমন সাহস কার।'

ছোট্ট একটা হাই হাতের আড়ালে সামলে নিয়ে আমিনা বলল, 'খোঁজ করুন চোর ধরা পড়বে বৈকি।'

'ওর ঝিকে আমি প্রথম চোটে কয়েদে রাখতে বলেছি। তাতেও না হয়; দু দন ঠাণ্ডিগারদে রাখলেই পেট থেকে কথা বেরুবে। সে কথা থাক, শোন, যে দরকারে আমি এসেছি!'

'হ্যাঁ, সেইটিই তো জানতে চাইছি। দরকার ছাড়া যে এমন অসময়ে দাসীর কাছে আপনি আসেন নি, তা আমি জানি!' আমিনার মুখে ঈষৎ ব্যঙ্গের হাসি।

ধরা পড়ে গিয়ে নানা অপ্রতিভ হলেন। হেসে বললেন, 'শোন, আজ

ওদের ব্যারাক থেকে এওয়ার্ট সাহেব এসেছেন। তিনি কথায়-কথায় বলেন যে, নেটিভ মেয়েদের কাছে ইংরেজী লেখাপড়া এখনও স্বপ্নের অগোচর। তার জবাবে আমি হঠাৎ বলে ফেলেছি যে, আমার মহালেই এমন তারত্রীর মেয়ে আছে যে মেমসাহেবের মতই ইংরেজী বুলি বলতে পারে।...সেই শুনে পর্যন্ত তিনি পীড়াপীড়ি করছেন—তোমার সঙ্গে আলাপ করবেন। তুমি একবারটি চল, লক্ষ্মীটি!'

'আমি বাইরে যাব—একঘর অচেনা পুরুষের মধ্যে?'

'দোষ কি? তুমি তো ঠিক অপর মেয়েদের মত পর্দানশীন নও। তা ছাড়া হয়তো এওয়ার্ট সাহেব ভাবছেন যে, আমি একটা মিছে চাল দিয়েছি ওঁর কাছে।'

আমিনা কিছুক্ষণ স্থির হয়ে রইল। তার পর বলল, 'আপনি তো জানেন পেশোয়া, ইংরেজদের ওপর আমার একটা বিজাতীয় ঘৃণা আছে। আমার মালিকের সঙ্গে যারা বেইমানি করেছে, তাদের দিকে তাকাতে পর্যন্ত আমার ঘৃণা বোধ হয়।' শেষের দিকে আমিনার কণ্ঠস্বর বুঝি একটু গাঢ়ও হয়ে এল।

নানাসাহেব সস্নেহে ও সপ্রেমে তার কাঁধে একটু চাপ দিয়ে বললেন,'জানি হুসেনী, তুমি ছাড়া আমার এ দিকটা কেউ এমন করে ভাবে না। তবু আমারই সম্মান রাখতে তোমার যাওয়া দরকার। নইলে আমাকে তারা হয়তো মিথ্যাবাদী ভাববে।'

আরও মুহূর্তকয়েক আমিনা চুপ করে রইল। বোধ করি তার মাথায় চিন্তার ঝড় বয়ে গেল এই অল্প সময়েই। তার পর শান্তকণ্ঠে সে জবাব দিল. 'আপনি যান জনাব, আমি এই পোশাকটা বদলে নিয়ে যাচ্ছি।'

'হ্যাঁ, তাই এসো। বেশ একটু সেজে গুজে।' খুশী হয়ে নানাসাহেব চলে গেলেন।

নানা অদৃশ্য হতেই আমিনার ললাটে ভ্রূকুটি ঘনিয়ে এল। স্থির নিশ্চল-ভাবে দাঁড়িয়ে কী যেন খানিকটা ভেবে নিল সে। তার পর অনুচ্চ কণ্ঠে ডাকল, 'মুসম্মৎ!'

'জী-বেগমসাহেবা! আমাকে ডাকছিলেন?' দাসী এসে দাঁড়াল।

গলা আরও নীচু করে আমিনা বলল,'সর্দার খাঁকে ডাক্। খুব তাড়াতাড়ি। এখানে নয়—ঐ পাশের ঘরে। আর শোন্, সে যখন আসবে আর কেউ না থাকে যেন, একটু হুঁশিয়ার থাকবি।'

মুসম্মৎ ঞ্জলবে বোধ করি অভ্যস্ত। সে নিঃশব্দে বার হয়ে গেল। আমিনাও যথাসম্ভব ক্ষিপ্রহস্তে তার প্রসাধন সারতে লাগল। বেশ পরিবর্তন তখনও সম্পূর্ণ শেষ হয় নি, মুসম্মৎ এসে সংবাদ দিলে, 'সর্দার খাঁ এসেছে বেগমসাহেবা।'

'এসেছে—ওঃ। আচ্ছা, তা হলে এখানেই নিয়ে আয়। তুই বাইরে থাক্—মহলের দরজার কাছে। কেউ না বিনা এত্তেলায় চলে আসে।'

মুসম্মৎ আবার বার হয়ে গেল। আমিনা আয়নার দিকে ফিরে ললাটের ওপর থেকে চূর্ণকুন্তলগুলি সরিয়ে অত্যন্ত লঘু হাতে দু চোখে সুর্মার রেখা টেনে নিল।

এবং সে রেখা টানা তখনও শেষ হয় নি, তার সেই অনিন্দ্যসুন্দর মুখের প্রতিচ্ছবির পাশে আর একটি মুখের ছায়া ফুটে উঠল দর্পণে। পুরুষের মুখ—কিন্তু সাধারণ নয় ঠিক। কুৎসিত। এত কুৎসিত, এত বীভৎস মুখ কল্পনা করাও কঠিন। যে এল তার দীর্ঘ স্থূল দেহ, ঘোরকৃষ্ণ বর্ণ, ছোট চোখ, স্থূল অধরোষ্ঠ, ঘনকৃষ্ণ শ্মশ্রুরাজি, কুঞ্চিত কেশ এবং তদুপরি সারা মুখে বসন্তের সুগভীর ক্ষতচিহ্ন। সবটা মিলিয়ে তাকে একটা দৈত্যের মতই দেখাচ্ছিল। তবু সেই ভয়াবহ মুখের দিকে চেয়েই আমিনার সারা মুখ উজ্জ্বল ও প্রসন্ন হয়ে উঠল। সে দর্পণের ভেতর দিয়েই আগন্তুককে ইঙ্গিত করে কাছে আসতে. ব ।ল।

সর্দার খাঁ কাছে এলে আমিনা ঘুরে দাঁড়াল এবং কোন প্রকার ভূমিকা না করে বলল, 'সর্দার, খুব জরুরী দুটো কাজ আছে—মন দিয়ে শুনে রাখ। উকিলপাড়ায় নানকচাঁদ বাবুজীর বাড়িতে যাবি। তিনি তোকে দু থলি টাকা দেবেন। সেই টাকা নিয়ে তুই যাবি সতীচোরা ঘাটে। সেখানে মৌলবী সাহেব অপেক্ষা করবেন। দু বার আস্তে শিস দিবি, তা হলেই তিনি যেখানে থাকুন কাছে আসবেন। তাঁকে এক থলি টাকা দিবি—আর এক থলি নিয়ে এখানে আসবি। শুনেছিস ভাল করে? ভুল হবে না তো? টাকা কেউ রাহাজানি ক.র না নেয়, তা হলে আর তোর মুখ দেখব না।'

এক নিশ্বাসে এতগুলো কথা বলে আমিনা চুপ করল। সর্দার খাঁ এতক্ষণ একদৃষ্টে আমিনার মুখের দিকে চেয়ে ছিল। সে ভয়ঙ্কর মুখে কোন ভাব ফোটা কঠিন, কিন্তু তার ক্ষুদ্র বর্তুলাকার চোখের ভাষা পড়া সম্ভব হলে দেখা যেত, সবটা জড়িয়ে একটা তন্ময় মুগ্ধ ভাবই ফুটে উঠেছে সে মুখে। এতক্ষণ

পরে সে কথা বলল, গম্ভীর অথচ শান্ত কণ্ঠে বলল, 'কোন গোলমাল হবে না মলেকান্, তুমি নিশ্চিন্ত থাক।'

আমিনার মুখ প্রসন্নতর হল—তার দু চোখে ফুটে উঠল অবিশ্বাস্য একটা স্নেহ। সে আরও কাছে এসে সর্দার খাঁর দু কাঁধে দুটো হাত রাখল। তার পর ঈষৎ গাঢ় কণ্ঠে বলল, 'সে আমি জানি সর্দার এ পৃথিবীতে একমাত্র তুই-ই আমাকে সত্যি সত্যি ভালবাসিস। এক এক সময়—হাঁ, এক এক সময় একথাও মনে হয় যে, থাক এ সব, সব কিছু ছেড়ে কোন দূর গাঁযে গিয়ে তোর সঙ্গেই ঘর বাঁধি। আমার জীবন তো গেছেই—এই তুচ্ছ দেহটা দিয়ে তোর জীবন যদি সার্থক হয় তো হোক, কিন্তু—না, সে তুই বুঝবি না সর্দার, তুই যা!'

সর্দারের সেই দানবীয় মুখও কিছুকালের জন্য যেন স্নেহে, প্রেমে, কৃতজ্ঞতায়, চরিতার্থতায় রমণীয় ও স্নিগ্ধ হয়ে এল। কিন্তু সে কোন কথা বলল না, অধিক কিছু আশা করল না—যেমন এসেছিল তেমনি নিঃশব্দে বার হয়ে গেল।

॥ ৭ ॥

খুব সূক্ষ্ম মসলিনের ওড়নায় মুখ ঢেকে আমিনা এক সময় নাচঘরের ভেতর এসে দাঁড়াল। তখন পানভোজন মিটে গেছে, কিন্তু আমোদ-আহ্লাদের আয়োজন শুরু হয় নি। এমন কি অন্য দিনের মত সাহেবদের প্রসন্ন হাস্যের হুঙ্কার এবং মেমসাহেবদের কলহাস্যের রজতবাদ্যও শোনা যাচ্ছে না। আমিনা বিস্মিত হয়ে দেখল সাহেব-মেমরা উপস্থিত ভারতীয়গণ থেকে একটু তফাতে দাঁড়িয়ে উত্তেজিত অথচ চাপা গলায় কি আলোচনা করছেন।

আলোচনার বিষয়বস্তুটা অনুমান করতে আমিনার দেরি হল না। অল্প একটু চাপা হাসিও তার ওষ্ঠপ্রান্তে দেখা দিল, কিন্তু সে এক মুহূর্তের জন্য। তার পরেই মুখে একটা অপরিসীম প্রশান্তি টেনে এনে আমিনা নানাসাহেবের দিকে অগ্রসর হল।

আমিনা কথা বলে নি—অথবা তার পায়ের মুক্তাখচিত ভেলভেটের জুতোজোড়া কোন শব্দ ওঠে নি, তার ব্যক্তিত্বের মধ্যেই বোধ করি কোন

চৌম্বক শক্তি ছিল, নানাসাহেব এবং তাঁর অতিথিবৃন্দ তার আগমনের অল্পক্ষণ মধ্যেই সচকিত হয়ে উঠলেন। সাধারণ অপর কোন রমণীর পক্ষে যা শুধুই আগমন—এই স্ত্রীলোকটির পক্ষে তা যেন আবির্ভাব। মুগ্ধ বিস্মিত চোখে ও উজ্জ্বল মুখে নানাসাহেব এগিয়ে এলেন। সাহেব-মেমদের বৈঠক নিমিষে ভেঙে গেল—তাঁরাও সকলে এসে ঘিরে দাঁড়ালেন।

নানাসাহেব সহাস্যবদনে খাঁটি বিলাতী ভঙ্গিতে পরিচয় করিয়ে দিলেন—'ইনিই হুসেনী বেগম—মিস্টার মুর, কর্নেল এওয়ার্ট, মিসেস এওয়ার্ট, লেফটেনাণ্ট হুইটিং, মিসেস হুইটিং—'

মধুর হাসিতে মুখ রঞ্জিত করে আমিনা বাঁ হাতের তর্জনী তুলে নানাসাহেবকে নিরস্ত করল, 'একটু আস্তে পেশোয়াজী, এমনভাবে কি পরিচয় করায়? দাঁড়ান, একে একে পরিচয়টা পাকা করে নিই।'

এই বলে বিস্মিত সাহেবদের অধিকতর বিস্মিত করে আমিনা তার ক্ষুদ্র কোমল সুগৌর হাতখানি কর্নেল এওয়ার্টের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'Glad to meet you Colonel Ewart, how do you do?'

এওয়ার্টের বহু দিনের অভ্যস্ত মিলিটারী শিক্ষাও কিছুক্ষণের জন্য গোলমাল হয়ে গেল। এমন কি বাড়িয়ে দেওয়া হাতখানির দিকে হাত বাড়াতেও তাঁর কয়েক লহমা দেরি হল। বস্তুত শুধু তিনি নন—উপস্থিত সকলেই যেন কয়েক মুহূর্তের জন্য বিস্ময়ে জড় হয়ে গিয়েছিলেন। যাই হোক, এওয়ার্টই সম্বিৎ ফিরে পেলেন সর্বাগ্রে। তিনি শ্বেতপদ্মের মত সেই হাতখানি নিজের দু হাতে ধরে ঝাঁকানি দিতে দিতে বিলাতী আপ্যায়নের গৎগুলি আউড়ে গেলেন।

পরিচয়-পর্ব শেষ হতে আমিনা ইশারায় একজন খিদমৎগারকে ডেকে তার হাতে-ধরা বিদ্‌রির কাজকরা হায়দ্রাবাদী থালায় সাজানো বিলাতী সুরার ক্ষুদ্র পাত্রগুলি একে একে অতিথিদের হাতে তুলে দিল। এবং সকলকে দেওয়া শেষ হলে, অবশিষ্ট পাত্রটি হাতে নিয়ে সে যখন আর কেউ বাকি আছে কিনা লক্ষ্য করছে, তখন অকস্মাৎ মুর তাঁর নিজের হাতের পাত্রটি বাড়িয়ে 'Your health, ma'am!' বলতেই, অনায়াসে ও স্বচ্ছন্দে তাঁর পাত্রের সঙ্গে নিজের পাত্র ঠেকিয়ে অতি সহজ ভাবেই সে পাত্রটি নিজের মুখে তুলল।

নানা ঠিক এতটা আশা করেন নি। কিন্তু খুশীই হলেন। গর্বে তাঁর

মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। ইংরেজদের অবজ্ঞা লক্ষ্য না করার মত মূর্খ তিনি নন। নির্বোধ নন বলেই তিনি তা লক্ষ্য না করবার ভান করেন। আজ যে-কোন তুচ্ছ ব্যাপারেই হোক, তাদের উপর এক হাত নিতে পেরে তাঁর আনন্দের অবধি ছিল না। তিনি তখনই মনে মনে হুসেনী বিবিকে পুরস্কৃত করবার একটা সংকল্প নিয়ে ফেললেন।

পান-পর্ব শেষ হতে সাহেব-মেমরা আমিনাকে কেন্দ্র করে ঘিরে বসলেন। আমিনা তাঁদের কাছে এখন পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য। নানার রক্ষিতা উপপত্নী—এমন বিশুদ্ধ উচ্চারণে ইংরেজী কথা বলবে, এ তাঁদের কাছে স্বপ্নেরও অগোচর বৈ কি।

মিসেস মুর প্রশ্নটা করেই বসলেন,—'আপনি কি কোন মেমসাহেবের কাছে লেখাপড়া শিখেছিলেন—না বিলেতে গিয়েছিলেন কখনও?'

আমিনা উত্তর দিল, 'না, বিলেত যাই নি—এখানেই শিখেছি।'

'কার কাছে বলুন তো?' মিসেস মুরের কৌতূহল প্রবল হয়ে ওঠে।

'কনভেণ্টে।

'ও, তাই বলুন।' মিসেস এওয়ার্ট বলে ওঠেন।

মিসেস মুর বলেন, 'কোন্ কনভেণ্টে বলুন তো?'

আমিনা প্রশ্নটা এড়িয়ে যায়, 'Somewhere in the hills—ছেলেবেলায় পাহাড়ে থাকতাম।'

মিসেস মুর বলেন, 'মাপ করবেন, এমন উঁচু দরের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান যে এদেশে আছে তা-ই আমাদের জানা ছিল না। নামটা জানতে পারলে ভাল হত।'

আমিনা মাথা নীচু করে ঈষৎ অন্তরঙ্গ নিম্নস্বরে বলল, 'যাঁদের কাছে পড়েছি তাঁদের আমি দেবীর মতই শ্রদ্ধা করি। আজ এমন জায়গায় নেমেছি যে তাঁদের নাম মুখে আনাই পাপ বলে মনে হয়। সুতরাং আপনার অনুরোধ রাখতে পারলাম না।'

মিসেস মুর ক্ষুণ্ণ হলেন, কিন্তু সেই সঙ্গে নিজের স্বজাতীয়দের প্রতি এতাদৃশ শ্রদ্ধা দেখে খুশীও না হয়ে পারলেন না।

আমিনা বলল, 'আমি যাই এবার। মনে হচ্ছে আপনাদের কোন জরুরী আলোচনার ভেতর এসে পড়ে ব্যাঘাত ঘটিয়েছি। সুতরাং—'

'না, না, কিছুতেই না।'

চারিদিক থেকে প্রতিবাদের ঝড় উঠল।

'এমন কোন কথা নয় বেগমসাহেবা।'

হুইটিং বুঝিয়ে দিলেন, 'আমাদের এক সার্জেণ্ট ম্যাককার্থি আজ এইমাত্র কলকাতা থেকে এসে পৌঁচেছে। সে-ই সব খবর দিচ্ছিল। কতকগুলো বদমাইশ লোক নানারকমে কোম্পানির সঙ্গে শত্রুতা করছে।'

'কি রকম? কি রকম?' কৌতূহলে আমিনা সোজা হয়ে বসে, 'তাদের সাহস তো কম নয়। আজ কোম্পানিই তো আমাদের হিন্দুস্তানের বাদশা। মুঘলরাও এমনভাবে পুরো দেশটা দখল করতে পারে নি। অতবড় শিবাজী মহারাজের বাদশাহি, তাও তো কোম্পানির হাতে—সেই কোম্পানির সঙ্গে দুশমনি করে এত সাহস কার?'

লেফটেনাণ্ট হুইটিং 'With your permission ma' am' বলে পাইপে তামাক ভরতে ভরতে জবাব দিলেন, 'কলকাতায় একটা বদমাইশের আড্ডা হয়েছে। ধর্মের নামে তারা প্রকাশ্যে বদমাইশি করে বেড়াচ্ছে। নাম দিয়েছে ধর্ম-মহাসভা।'

'ওঃ, ধর্ম!' অবজ্ঞার সুরে আমিনা বলে ওঠে, 'ধর্মের কথা আজকাল আর কে শুনছে।'

'না ম্যাম, ধর্মের কথা শোনে বৈকি। ঐ সব অশিক্ষিত বর্বরদের কাছে এখনও ঐ শব্দটার মূল্য আছে। আর অন্ধ বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে ঐ বদমাশ বেটারা নানা কথা রটনা করছে। জানেন সেদিন কি হয়েছে? এক বেটা জাহাজী লস্কর এসেছিল কলকাতার কিলায়—তেষ্টা পায় তার, এক সিপাহীর কাছে জল চেয়েছিল। জানেন তো সিপাহীদের ছুঁই-ছুঁই-এর ব্যাপার। সে লোটা করে আলগোছে ঢেলে দিতে চেয়েছিল কলাপাতার নল লাগিয়ে, তাতে লস্করটা একটু চটে যায়, বলে লোটাটা দাও, আমি জল ঢেলে খাচ্ছি। সিপাহী বলে, লোটা তোমার হাতে দিলে ও লোটা আমাকে ফেলে দিতে হবে। লস্করও গরম—বলে, লোটা মেজে নিও না হয়। সিপাহী তার জবাবে বলে যে, তোমার ছোঁয়া লোটা ঘরে নিলে আমার জাত যাবে। তখন লস্করটা জল না খেয়েই চলে যায়। বলে যায় যে, আমারই ভুল হয়েছিল তোমার কাছে জল খেতে চাওয়া। তোমার জল খেলে আমারই জাত যেত। তোমার আছে কি। শুয়োরের চর্বি মুখে তুলেছ—যা নাকি মুসলমানেরও হারাম। তোমরা যে নতুন টোটা দাঁতে কেটে বন্দুক ভর—তার

মোড়কে শুয়োরের চর্বি আছে জান না ?…সে লোকটা তো এই অনিষ্টটি করে দিয়ে সরে পড়ল, এখন তাই নিয়ে নাকি মহা হৈ চৈ পড়ে গেছে।'

আমিনা এতক্ষণ পাথরের মূর্তির মত অবিচল মুখে বসে শুনছিল, এখন তার অঙ্কিত ভ্রূ কুঞ্চিত করে প্রশ্ন করল, 'সত্যিই তাই আছে নাকি ?'

'আপনি কি পাগল হয়েছেন ম্যাম ? ওটা স্রেফ ওর বানানো কথা। রাগের মাথায় একটা শেষ কামড় দিয়ে যাওয়া—'

'তা আপনারা সে কথাটা জানিয়ে দেন না কেন ?' নিতান্ত ভালমানুষের মত প্রশ্ন করে আমিনা।

'আর বলবেন না! সব জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রকাশ্যে প্যারেডে প্রশ্ন করা হয়েছে যে, কারুর কোন সন্দেহ আছে কি না। যারা সন্দেহ প্রকাশ করেছে তাদের নিয়ে গিয়ে দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে ও কাগজগুলো এমনিভাবেই তৈরি—তাতে চর্বি মাখাবার দরকার হয় না। আগুনে ধরে দেখানো হয়েছে যে সহজে পোড়ে না। কিন্তু কে কার কড়ি ধারে বলুন! কুসংস্কার এমনই জিনিস যা চোখকেও ঠিক দেখতে দেয় না, কানকেও ঠিক শুনতে দেয় না। ওরা যে উল্টোটা বিশ্বাস করবার জন্যই প্রস্তুত হয়ে আছে। ওদের কানে যে আগে থেকেই বিষ ছড়ানো হচ্ছে। ফলে ভেতরে ভেতরে নাকি গোলমাল বেড়েই চলেছে।'

'কারা এ বিষ ছড়াচ্ছে ? তাদের কী স্বার্থ ?' আমিনা আবারও সরলভাবে প্রশ্ন করে।

'কারা যে ঠিক করছে সেইটেই এখনও জানা যাচ্ছে না। নিশ্চয়ই কোন স্বার্থান্বেষী লোক আছে, যারা স্বপ্ন দেখছে যে, ইংরেজদের তাড়িয়ে দেশে আবার অরাজকতা আনবে—আর সেই সুযোগে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করবে। ওখানে ঐ ধর্ম-মহাসভাই খানিকটা কাজ করছে। আর এখানে এক মৌলবী —লক্ষ্ণৌ থেকে কাশী পর্যন্ত লোক ক্ষেপিয়ে বেড়াচ্ছে। কিন্তু এদেরও পেছনে লোক আছে বেগমসাহেবা, এ আপনি নিশ্চিত জানবেন।'

আমিনা কথাটা নিস্পৃহ ঔদাসীন্যের সুরে বলল, 'কারা আছে, তাদের খোঁজ করে ধরে ধরে লটকে দিলেই তো হয়!'

'মুশকিল কি হয়েছে জানেন ম্যাম্, আমাদের বড়লাট বাহাদুর হয়েছেন বড্ডই ভদ্রলোক। তিনি কেবলই ভাবেন যে, এই বুঝি ধর্মে হস্তক্ষেপ করা হল—ঐ বুঝি নেটিভরা মনে ব্যথা পেল। অবশ্য এবার নাকি

তাঁর সুমতি হয়েছে। আপাতত ঐ মৌলবাটাকে গ্রেপ্তার করার হুকুম হয়েছে।'

'ধরা পড়েছে সে ?'

আমিনার কণ্ঠে কি উদ্বেগের ইঙ্গিত ফুটে ওঠে ?

'না। লোকটা ভয়ানক ধূর্ত আর ধড়িবাজ। আজ তিন-চারদিন কেবলই আমাদের চোখে ধুলো দিচ্ছে। আসলে পুলিসগুলোও হয়েছে ফাঁকিবাজ, বুঝলেন না ! নইলে একটা লোক—আর এতগুলো [illegible] ! কি করে চোখে ধুলো দেয় বলুন তো !'

আমিনা ইশারায় একটা খিদমৎগা [illegible] পানীয় পরিবেষণ চলে।

অবশেষে আমিনা [illegible], এদের—মানে, মৌলবীদের পেছনে [illegible]

হুইটি [illegible] তো মনে হয়, মাফ করবেন [illegible] রাজারা আছেন। নইলে টাকা যোগাচ্ছে [illegible] yet seen enough of them। এঁরা বড় [illegible], এঁদের শায়েস্তা করার জন্য ডালহৌসির মত ক্যালিবারের [illegible]র।'

আমিনার চোখে নিমেষে বিদ্যুৎ খেলে গেল, কিন্তু তা নিমেষের জন্যই। যথাসম্ভব নিরাসক্তভাবেই সে বলল, 'কিন্তু আপনি কি মনে করেন না যে, এদের ভেতর যদি সে অসন্তোষ এসেই থাকে তো সেজন্য প্রধানত ঐ লর্ড ডালহৌসিই দায়ী। তিনি অকারণ বহু রাজাকে বা রাজপরিবারকে শত্রু করেছেন।'

'তা হয়তো করেছেন। কিন্তু তা না হলেও অসন্তোষ কিছু থাকতই বেগমসাহেবা, কে আর অল্পে খুশী থাকে বলুন ! রাজত্ব থাকলেও স্বাধীন রাজাদের সুযোগ-সুবিধে তো তাঁরা ঠিক পেতেন না।'

'তা পেতেন না। তেমনি পেতেন নিরাপত্তা, পেতেন নিশ্চিন্ত আরাম।... না লেফটেনান্ট হুইটিং, এঁদের আপনারা বন্ধুরূপেই পেতে পারতেন—অন্তত অধিকাংশকেই।'

এই সময় মিসেস হুইটিং স্বামীর কাঁধে হাত রেখে ঘড়িটার দিকে দেখালেন। ঘরের চারিদিকেই ঘড়ি—ছোট বড় নানা আকার ও মূল্যের। প্রায় সব ঘড়িতেই একই সময়—বারোটা বাজে।

'বাই জোভ, এবার তো তা হলে উঠতে হয়।'

সকলেই উঠে পড়লেন। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই আরও কিছুক্ষণ হাসি-তামাশা চলল—তার পর যথারীতি বিদায়-সম্ভাষণান্তে সাহেব-মেমরা সকলেই বিদায় নিলেন। রইলেন শুধু নানা সাহেবের অন্তরঙ্গ দু-চারজন লোক। কিন্তু নানাসাহেব ইঙ্গিতে তাদেরও দূরে থাকতে বলে আমিনার কাছে এসে বসলেন। তার একটা হাত নিজের হাতের মধ্যে তুলে নিয়ে নিম্নকণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, 'তুমি কি এই জন্যেই বাংলা মুল্লুকে গিয়েছিলে হুসেনী?'

'হ্যাঁ জনাব, এই জন্যেই। আর এই জন্যেই হুসেনী মাঝে মাঝে টাকা টাকা করে আপনাকে বিরক্ত করে। নইলে তার নিজের প্রয়োজন সামান্যই। জানেন তো, আপনার এ বাঁদী কখনও কোন অলঙ্কার চেয়ে নেয় নি আপনার কাছ থেকে।' হুসেনীর কণ্ঠে বিজয়-গর্ব চাপা থাকে না।

'হুসেনী, কিন্তু এ যে বড় সাংঘাতিক খেলা। ইংরেজ জাত সাপের চেয়েও খল, বাঘের চেয়েও ভয়ঙ্কর।'

নানাসাহেবের ললাটে স্বেদবিন্দু দেখা দিয়েছিল।

তা লক্ষ্য করে আমিনা নিজের রেশমী রুমালে নানাসাহেবের ললাট মুছে নিয়ে বলল, 'মিছিমিছি এত বেশি ভাববেন না হিন্দুস্তানের ভাবী বাদশা! সাপের মন্ত্র আছে—বাঘকেও ফাঁদে ফেলা যায়। তা ছাড়া, আপনার ভয় কি, আপনি তো কোন ধরা-ছোঁওয়ার মধ্যে যাচ্ছেন না। আপনাকে বাদ দিয়েই আপাতত চলুক না। দেখুন না, ঘটনা-স্রোত কোন্ দিকে নিয়ে যায় আমাদের।'

'কে জানে হুসেনী, বড় ভয় করে। একদিকে তুমি আর একদিকে আজিমুল্লা খাঁ—বন্ধু ও প্রেয়সী। দুজনে তোমরা একই দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছ আমাকে। জানি না এর পরিণাম কি। কোথায় ছিল এইসব বাঁদীর বাচ্চা ভিখিরীর দল, ভেবে দেখ হুসেনী, সাত সমুদ্দুর পেরিয়ে এসে এত বড় মুঘল শক্তি, এত বড় মারাঠা শক্তি ভেঙে চুরমার করে দিল! এদের সঙ্গে তোমরা পারবে?'

'এরা কিছুই ভাঙে নি পেশোয়াজী। মুঘল শক্তি আর মারাঠা শক্তি নিজেদের পাপের ভারে নিজেরাই ভেঙে পড়েছে। তেমনি এদেরও পাপের ভরা পূর্ণ হয়ে এসেছে। এরাও যাবে। আপনি তো কিছু কিছু ইতিহাস পড়েছেন জনাব, রোম সাম্রাজ্যের নাম শুনেছেন নিশ্চয়ই। সারা দুনিয়ার

অর্ধেকটাই নাকি তাদের ছিল। সে শক্তিও থাকে নি। কিছুই চিরকাল থাকে না। আমরাও থাকব না। এত ভয় কিসের? ভেবে দেখুন, শিবাজী মহারাজ কয়েকজন লোক নিয়েই আলমগীর বাদশার শক্তির অহঙ্কার চূর্ণ করেছিলেন। আপনি সেই দেশেরই লোক, সেই জাতিরই নেতা। আপনার সাহস এত কম, উচ্চাশা এত অল্প।'

নানাসাহেব লজ্জিত বোধ করলেন। উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'হুসেনী, তুমি আমার ঋণ বাড়িয়েই দিচ্ছ। তুমিই ঠিক আমার সহধর্মিণী হবার উপযুক্ত, ভাগ্যদোষে মুসলমানের ঘরে গিয়ে পড়েছিলে।'

এইবার তাঁর অন্তরঙ্গরা যেখানে চক্রাকারে বসে আড্ডা জমিয়েছিল, নানা সেই দিকে রওনা হলেন। আমিনা কিছুক্ষণ স্থিরদৃষ্টিতে সেই দিকে তাকিয়ে থেকে অস্ফুটকণ্ঠে বলল, 'ঠিকই ধরেছ পেশোয়া, ভাগ্যদোষই বটে, তোমারও— আমারও।'

তার পর যেমন নিঃশব্দে এক সময় তার আবির্ভাব ঘটেছিল, তেমনিই নিঃশব্দে এক সময় সে অন্তর্হিত হল।

॥ ৮ ॥

মীরাটে এসেও হীরালাল মামার হাত থেকে অব্যাহতি পেল না। কারণ ভাগ্য বিরূপ। মৃত্যুঞ্জয় অফিসে গিয়ে দেখলেন যে, কোন এক অজ্ঞাত কারণে মেজর সাহেবের মেজাজ গরম হয়ে আছে। মৃত্যুঞ্জয়ের আভূমিনত সেলামেও তাঁর ভ্রূকুটি সরল হল না—এমন কি ঘর থেকে আনা আমসত্ব ও মোরব্বা বার করে সামনে রাখতেও বিশেষ কোন সুফল পওয়া গেল না। মুখটা যেমন মেঘাচ্ছন্ন ছিল তেমনিই রইল।

বেগতিক দেখে মৃত্যুঞ্জয় কথাটা সেদিন পাড়তে সাহস করলেন না। ফলে বাসায় ফেরবার পর ঝালটা সম্পূর্ণ পড়ল এসে হীরালালের ঘাড়েই।

'অপয়া, অপয়া, ছোঁড়াটা বিশ্ব-অপয়া! জান হে মুখুয্যে, সকালে উঠে ছোঁড়ার মুখ দেখলে হাঁড়ি ফাটে।'

মৃত্যুঞ্জয় অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন, 'কোন ছোঁড়া?'

'[illegible]াবার—আমার ঐ গুণধর ভাগ্নে! এই তো এতদিন চাকরি করছি,

বাড়ি থেকে আমসত্ত্ব এনে দিলে মুখে হাসি ফোটে না সায়েবের, এ তো আমি কখনও দেখি নি রে বাবা।…মুখে যেন গেরন লেগে আছে। মনে হচ্ছে যেন সাতখানা হুনের জাহাজ ডুবে যাবার খবর পেয়েছে!'

'না হে গাঙ্গুলী, বোঝ না। এর ভেতর ঢের ব্যাপার আছে।'

'ব্যাপার আমার মাথা আর মুণ্ডু। এবার বেরিয়ে-ইস্তক এই ব্যাপার চলেছে!'

'কেন, পাঁজি দেখে বেরোও নি?'

'তা কেন বেরোব না। তাতে কি হবে। মূর্তিমান অযাত্রা যে আমার সঙ্গে। সারা পথ জলেছি ছোঁড়ার জন্যে—এখানে পৌঁছেও তো এই। চাকরি যা হবে তা তো বুঝেছিই—টুঁ টুঁ—অষ্টরম্ভা। এখন বসে খাক্ আমার ঘাড়ে—বিধবা মেয়ের মত আর কি! অদেষ্টে যা আছে তাই হবে তো। আমি কি করব। শালাটাকে আনলে এ সব কিচ্ছু হত না। তাদের এখন দিন ভাল চলেছে। মাঝখান থেকে হল এই যে, গিন্নী বইলেন বেঁকে—আমাকে জব্দ করবার জন্যে অর্ধেক মাল পাচার করে দেবেন বাপের বাড়িতে—সে আর দেখতে হবে না। মাথার ঘাম পায়ে ফেলা পয়সা আমার, তা কি দুখ-দরদ করবে ভেবেছ? রামচন্দর। মেয়েমানুষ জাতটাই এমনি নেমোখারাম।'

এক নিশ্বাসে ভাগ্নে থেকে শুরু করে বিশ্বের তাবৎ স্ত্রীলোকের সদ্গতি করে, বোধ করি বা নিশ্বাস নেবার জন্যেই, মৃত্যুঞ্জয় থামলেন। হীরালালের এতদিনে অনেকটা গা-সওয়া হয়ে গিয়েছিল, পথে আসতে আসতে বহুবারই সে পাতালে-প্রবেশের প্রাক্কালে সীতাদেবীর মনোভাবটা উপলব্ধি করেছে, কিন্তু তবু আজকের এই অপমানটা তার গলাধঃকরণ করা কঠিন হয়ে পড়ল। কোনমতে দাঁতে দাঁত চেপে কান্নাটা দমন করল এবং সকলের অলক্ষ্যে দু ফোঁটা অবাধ্য অশ্রু উত্তরীয়ের প্রান্তে মুছে ফেলল। পথে যাদের সামনে অপমানিত হয়েছে তারা মুসাফির—তা ছাড়া অধিকাংশই অ-বাঙালী। তাদের সঙ্গে জীবনে আর হয়তো কখনও দেখাই হবে না। এখানকার কথা আলাদা। কমিসারিয়েটে যতগুলি বাঙালী কাজ করেন প্রায় সকলেই থাকেন এই বাসায়। কেউ কেউ রেঁধে খান, কিন্তু বেশির ভাগই মেস করে বাস করেন—কনৌজী পাচক আছে একজন—সে-ই রেঁধে দেয়। যদি সত্যিই হীরালালের চাকরি হয় তো তাকেও এখানে থাকতে হবে—এঁরা সকলেই দীর্ঘদিনের নিত্যসঙ্গী হবে তার

তাঁদের সামনে, বলতে গেলে প্রথম পরিচয়েই, এই ধরনের অপমানে চোখে জল আসবারই তো কথা।

মুখুয্যে এতক্ষণে কথা বলবার সুযোগ পেয়ে বললেন, 'ওহে, ব্যাপারটা আগে শোনই না।...কলকাতায় কি-সব গোলমাল বেধেছে—সেপাইরা নাকি গোলমাল করছে। এধারে লক্ষ্ণৌ ফৈজাবাদেও এক মৌলবী নাকি সেপাইদের ক্ষেপিয়ে বেড়াচ্ছে।...মেজর সায়েব মনে করেন যে, একটা বড় রকমের হাঙ্গামা বাধা বিচিত্র নয়। ..আসলে তাইতেই মেজাজ খারাপ।···ভয়, বুঝলে গাঙ্গুলী, ভয়।'

'হ্যাঁ, তোমার যেমন কথা, সায়েবদের আবার ভয়!'

'যা বলছি শোন না—বাবারও বাবা আছে, কটা সায়েব আছে বল তো এদেশে। জোর তো এই সব সেপাইদেরই।'

'দেশ থেকে গোরা আনবে রে বাবা। জাহাজ জাহাজ গোরা আনিয়ে ফেলবে—এই এত্ত বড় বড় জাহাজ বোঝাই করে।' মৃত্যুঞ্জয় বোধ করি জাহাজের আকৃতিটা বোঝাতেই দু হাত বিস্তার করে অনেকখানি শূন্য দেখালেন।

'তা হলে তো কথাই ছিল না। আসল কথা হচ্ছে কি, এইসব সাহেবরা যারা সেপাইদের সঙ্গে হাতে-কলমে কাজ করে, তারা যতটা ভয় পেয়েছে বড় সাহেবরা তত ভয় পায় নি। সেই তো হয়েছে বিপদ। কাল সকালেই মেজর সাহেব জেনারেলের কাছে কথাটা পাড়তে গিয়েছিলেন, জেনারেল হেসে উড়িয়ে দিয়েছেন। তাতেই সাহেবের মেজাজ অত গরম ছিল।'

'দেবেই তো, দেবেই তো, হেসে উড়িয়ে দেবারই তো কথা। দিশি সেপাই, সায়েব দেখলে যাদের কাপড় নোংরা হয় তারা করবে গোলমাল গোরাদের সঙ্গে, তুমি ক্ষেপেছ মুখুয্যে!'

'কে জানে ভাই, ওরাই যখন ভয় পাচ্ছে—'

'মেনিমুখো—ওরা সব মেনিমুখো! আসলে আমাদের এই মেজরটি হয়েছেন পয়লা নম্বরের গাড়ল।'

তার পরই প্রচণ্ড এক হাই তুলে ভাগ্নের উদ্দেশে হুঙ্কার ছাড়লেন—'কৈ হে নবাবপুত্তুর, দয়া করে একটু সন্ধ্যা-আহ্নিকের যোগাড় করে দেবে, না কি সেটাও নিজেকে করে নিতে হবে? কুঁড়ে-পাতর গেলবার সময় তো খুলো খোরাক উসুল কর—একটু গতর নাড়তে পার না?'

'কি কর গাঙ্গুলী!' ওদিকে থেকে চৌধুরী মৃদু ধমক দিলেন—'খামকা এসে ইস্তক ছেলেটাকে খিঁচোচ্ছ কেন?'

বয়োজ্যেষ্ঠ শুধু নয—মাইনেও পান মোটা। এ বাসায চৌধুরীর প্রতিপত্তি বেশি। সুতরাং তখনকার মত মৃত্যুঞ্জয় চুপ করে যেতে বাধ্য হলেন।

পরের দিনও মেজরের মুখের মেঘ কাটল না। কিন্তু আর কতকাল অপেক্ষা করা চলে। অগত্যা আম্‌তা আম্‌তা করে বারকতক ঘাড চুলকে মৃত্যুঞ্জয কথাটা পেড়েই ফেললেন, 'সার, ইযোব অনার, মাই নেফিউ সাব, মাই সিস্টার্‌স সন।'

'ইয়োর—হোযাট?' সাহেব যেন গর্জন করে উঠলেন।

সে গর্জনে সামান্য ইংরেজী বিদ্যে যেটুকু জানা ছিল তাও মৃত্যুঞ্জয ভুলে গেলেন, ওখানের এই দারুন শীতেও তাঁর গাযে ঘাম দেখা দিল। ঢোঁক গিলে বললেন, 'ইয়োর অনার বাত দিযা থা হুজুর—একঠো নোকরি. আই মিন সার্ভিস, দেগা। মেরা বহিন্‌কি লেডকা—মা-বাপ কোই নেহি হ্যায—আপনি মা-বাপ হ্যায় হুজুব।'

'শাঁট আপ। নেহি মাংতা—কোইকো নেহি মাংতা। নেটিভ আউর নেহি লেঙ্গে। বেইমান কাঁহেকা—তুম লোগ সব বেইমান হ্যায়। কোইকো নোকবি আউর নেহি দেঙ্গে—যাও হিঁয়াসে, ভাগো।'

খরচ কম হলেও মাসে তিন-চার টাকা। ভাগ্নেকে বসে খাওয়াতে হবে নাকি?

মৃত্যুঞ্জয মরীযা হয়ে আবারও কি বলতে গেলেন। কিন্তু মেজর সাহেব এবার একেবারে অগ্নিমূর্তি—চীৎকার করে উঠলেন, 'গো টু হেল, ডু ইউ হিয়ার—ড্যাম্‌ড্‌ সোযাইন! ফিন বাত বোলনেসে জুরমানা কিযা যাযগা—ভাগো হিঁয়াসে।'

মৃত্যুঞ্জয কাঁপতে কাঁপতে বার হযে এলেন। বুঝলেন কলিতে স্ত্রীই গুরুজন—তার কথাটা ঠেলা ঠিক হয নি। শ্যালককেই আনা উচিত ছিল।

সেদিন রাত্রে মৃত্যুঞ্জয দাঁতে কুটোটিও কাটলেন না—হীরালালের তো কথাই ওঠে না। চৌধুরী, মুখুয্যে, ঘোষাল—অনেকেই অনুরোধ করতে এলেন কিন্তু মৃত্যুঞ্জর জলস্পর্শ করলেন না। হীরালালের কিছু একটা ঘাড়ে দশটা মাথা নেই যে, সে-ক্ষেত্রে সে একা আহারে বসবে। আগে হলে চৌধুরীই ভরসা

দিতেন—'চাকরির জন্যে ভাবনা কি, সে হয়ে যাবে'খন', কিন্তু গত কয়েকদিন অফিসের হাওয়াটা তেমন ভাল লাগছে না। তিনি কোন আশ্বাসই দিতে পারলেন না।

এর পরেরও দু-তিনটে দিন হীরালালের যেভাবে কাটল তার বর্ণনা দেওয়া অনাবশ্যক। পাঠক-পাঠিকারা যতটা পারেন কল্পনা করুন, তবুও অনেকখানি পেছনে পড়ে থাকবেন—এটুকু বলেই ক্ষান্ত থাকব। শেষ অবধি তৃতীয় রাত্রিও বিনিদ্র কাটবার পর হীরালাল সংকল্প করল—সে গঙ্গাতে প্রাণ দেবে। চুপি-চুপি এই দু-তিন ক্রোশ রাস্তা হেঁটে গড়মুক্তেশ্বর যাবে এবং সেখানেই গঙ্গাতে ঝাঁপ দিয়ে মরবে। তার অদৃষ্টে এই মৃত্যু আছে—তাই মা-গঙ্গা পূর্বেই টেনেছিলেন। মাঝখান থেকে ঐ রমণী তাকে বাঁচিয়ে ঘটনাটা অনর্থক বিলম্বিত করল। লাভের মধ্যে এই কয়েকদিন অতিরিক্ত কষ্টভোগ।

সে চতুর্থ দিন প্রত্যুষে সেই সংকল্প মতই খালি পায়ে আলোয়ানটা গায়ে জড়িয়ে বের হয়ে পড়ল। গড়মুক্তেশ্বর কোন্ দিকে তা সে জানে না। কিন্তু জিজ্ঞাসা করে নিতে পারবে। আপাতত সে পথে পড়ে যে-কোন একদিকে হন হন করে হাঁটতে শুরু করল। বাসা ও মামার কাছ থেকে আগে অনেকটা দূরে যাওয়া আবশ্যক।

কিন্তু কিছুদূর যাবার পরেই এক বাধা।

লক্ষ্য করল একটা এক্কা তার পেছনে ছুটে আসছে এবং সে এক্কার একমাত্র আরোহী বোধ হয় তাকেই লক্ষ্য করে কি বলছে।

প্রথমে বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল—মামা নয় তো?

পরেই ভুল ভাঙল। এর মাথায় টুপি আছে। লোকটা এদেশীয় কেউ হবে। মামা তো শামলা আঁটেন মাথায়। সে দাঁড়িয়ে গেল।

এক্কা কাছে এসে থামতে আরোহী নেমে এসে বিশুদ্ধ হিন্দুস্থানী ভাষায় প্রশ্ন করল, 'তুমি কি বাঙালী?'

লোকটি এদেশীয়ই। তবে সধারণ বেশভুষা, কম-দামী ধুতি ও পিরান পরনে—অর্থাৎ হোমরা-চোমরা কেউ নয়।

হীরালাল মাথা নেড়ে জানাল যে, সে বাঙালীই বটে।

লোকটি হেসে বলল, 'নাঙ্গা শির দেখে তাই আন্দাজ করেছি—তেলেঙ্গী নয় তো বাঙালী! তা তেলেঙ্গী আর এদেশে কোথায় এত। আচ্ছা, এখানে বাঙালীদের একটা বাসা আছে কোথায় চেন?'

হীরালাল যথাসাধ্য হিন্দীতেই কথাবার্তা চালাল। সে বলল, 'চিনি।'

'তুমি কি সেখানে থাক?'

'থাকি।'

'হীরালাল চাটার্জি বলে এক ছোকরা সেখানে এসেছে?'

হীরালাল তো স্তম্ভিত। তার খোঁজে আবার কার প্রয়োজন পড়ল? তাকে এখানে চেনেই বা কে? কেমন একটা ভয়ও হল মনে মনে।

এধারে তাকে নিরুত্তর দেখে লোকটি পুনশ্চ প্রশ্ন করল, 'কি, জান নাকি?'

শুষ্ক ওষ্ঠে একবার জিহ্বা বুলিয়ে নিয়ে হীরালাল জবাব দিল, 'আমারই নাম হীরালাল।'

'চ্যাটার্জি?'

'হ্যাঁ।'

'সোহি শোচা থা। কেঁও কি অযসাই উমর হোগা—বাতা দে গিয়া।'

'কিন্তু কে—মানে—আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না, কে আমাকে তো এখানে কেউ চেনে না।'

'কানপুর থেকে খবর এসেছে বাঙালীবাবু। একঠো জরুরী চিঠি আছে। হুসেনী বেগমকে চেন?'

'বেগম-টেগম কাউকে আমি চিনি না। নিশ্চয় ভুল হয়েছে।'

'উহুঁ, ভুল হয় নি। তোমার চেহারাও মিলে যাচ্ছে। ভাল করে ভেবে দেখ।'

অকস্মাৎ বিস্মৃতির মেঘ কেটে গেল; তার রহস্যময়ী প্রাণদাত্রী—হ্যাঁ, হ্যাঁ—এই রকমই কী একটা যেন নাম বলেছিল সে। সে কি তার ঋণের বদলে কিছু চায়? মন্দ কি—মরণের আগে ঋণটা শোধ করে মরতে পারবে।

'হুসেনী বিবি একজনকে চিনি বটে—'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ—ওই। যে হুসেনী বিবি সে-ই হুসেনী বেগম। তিনি এই চিঠিটা তোমাকে দিতে বলেছেন। বলেছেন যে, তোমার এখানে কমিসারিয়েটে চাকরি পাবার কথা। যদি কোন কারণে না পাও তো এই চিঠি যার নামে আছে সেই সাহেবকে দিও—চাকরি মিলবে।'

খামে মোড়া একখানা চিঠি সে পিরানের জেব থেকে বার করে হীরালালের হাতে দিল। তার পর বলল, 'ব্যস, আমার কাজ খতম। যদি কিছু বিকশিশ দেবার থাকে তো দিতে পার।'

দাঁত বার করে লোকটা হাসল একবার—কাষ্ঠ হাসি।

বিব্রত হীরালাল বলল, 'কিন্তু আমি তো···আমার কাছে তো এখন কিছুই নেই!'

মা রাহাখরচের টাকা বলে মামার হাতেই কয়েকটা টাকা দিয়েছেন। আর গোপনে দিয়েছেন তার হাতে মাত্র দুটি টাকা, কিন্তু সেও তো তার পুঁটুলিতে কাপড়ের সঙ্গেই বাঁধা আছে।

'ছাৎ তেরি বেশরম বাংগালী!'

অবজ্ঞাসূচক স্বরে কথা কটা বলে সে লোকটা আবার এক্কায় উঠে বসল এবং এক্কা ঘুরোতে বলে নিজেও মুখ ঘুরিয়ে নিল।

মামার অপমানের কাছে এ অপমান তুচ্ছ। তবু জাতিগত ধিক্কারে হীরালালের তরুণ রক্ত গরম হয়ে উঠল। কিন্তু একা এই অপরিচিত জায়গায় সে কী-ই বা করতে পারে। বিশেষত দোষ তো তারও কিছু আছে। সুসংবাদ বহন করে আনলে পুরস্কৃত করাই নিয়ম।

যোদ্ধা হীরালালের আর মরা হল না। কে এক অপরিচিতা তরুণী, অজ্ঞাতকুলশীলা—নিয়তির মত বার বার তার জীবন রক্ষা করছে। সে যে-ই হোক—মনে মনে সেই দেবী-স্বরূপিণীকে সে হাত জোড় করে নমস্কার জানাল।

বাসায় পা দিতেই মামা যেন বোমার মত ফেটে পড়লেন, 'বলি কোথায়—কোথায় যাওয়া হয়েছিল নবাবপুত্তুরের, তাই শুনি! তোমার দ্বারা কি আমার এক কড়ার উপকার হবে না? সকালবেলাই উধাও! হাওয়া খেতে গেছলে নাকি সাহেবদের মত? তাও তো পারলে বুঝতুম! মেজর সাহেব ভোরবেলা যখন হাওয়া খেতে বেরোয়, তখন তার পায়ের কাছে গিয়ে সটান উপুড় হয়ে পড়লেও তো একটা কাজ হয়। দেখ বাপু, এই সাফ বলে দিলুম, চাকরি-বাকরি যদি না হয় তো ঐ রসুয়ে ঠাকুরের কাছে থেকে রান্নাবান্নাটা শিখে নাও। খোরাকি ছাড়া মাসে দু টাকা মাইনে—কম যাচ্ছে না তো! সেটাই না হয় রোজগার কর।'

আজ কিন্তু হীরালাল মাথা হেঁট করল না। সাহসে ভর করে চিঠিখানা বাড়িয়ে ধরে কোনমতে ঢোঁক গিলে বলে ফেলল, 'চাকরি বোধ হয় হবে।'

হীরালাল যে কোন দিন তাঁর বকুনির পর উত্তর দিতে পারবে, এটা মামার

স্বপ্নেরও অগোচর। তা ছাড়া তিনি কথাটা ঠিক বুঝতেও পারলেন না। খানিকটা হাঁ করে তাকিয়ে থেকে বললেন, 'তার মানে? তার মানে কি বাপু?'

'এই চিঠিখানা যাঁর নামে আছে, তাঁকে দিলে বোধ হয় আমার চাকরি হবে।'

'এ কার নামে চিঠি? তোমাকে কে দিলে?'

কিন্তু মামা হাত দেবার আগেই চৌধুরীমশাই চিঠিটা টেনে নিলেন, 'এ কি! এ যে খোদ জেনারেল সাহেবের নামে দেখছি। লিখেছেও তো সাহেব কেউ—এমন জড়ানো লেখা তো নেটিভ কারুর নয়! কে দিয়েছে এ চিঠি বাবা হীরালাল?'

হীরালালের ঠিক এতখানি হাটের মাঝে কথাটা বলবার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু মামাই জেরার পর জেরা করে অস্থির করে তুললেন। তখন সব কথাই খুলে বলতে হল—শুধু আত্মহত্যার সংকল্পটা বাদ রইল।

মামার মুখে এতক্ষণ পরে সকৌতুক হাসি ফুটে উঠল। তিনি মুখুয্যের দিকে চেয়ে চোখ টিপে বললেন, 'বলি ভাগ্নের আমার চেহারাটি তো খারাপ নয় একে খুবসুরত চেহারা, তায় কাঁচা বয়স—মোচলমান মাগী ঢলেছে আর কি! তা মন্দ কি, এই ফাঁকে যদি গুছিয়ে নিতে পারিস তো নে! তবে ওরা সব কাঁচা-খেগো, দেখো যেন জাতধর্ম খুইয়ে বসে থেকো না!'

লজ্জায় হীরালালের মুখখানা আবীরের মত রাঙা হয়ে উঠল। তার চেহারাটা সত্যিই ভাল। দীর্ঘ গঠন, গৌর বর্ণ এবং—কৈশোরে নিয়মিত ভাবে আখড়াতে গিয়ে কসরৎ করার ফলে—এই বয়সেই পেশীগুলো সুগঠিত হয়ে উঠেছে। কিন্তু এতগুলি বয়োজ্যেষ্ঠ লোকের সামনে গুরুজনের মুখে এই ধরনের ইঙ্গিত শুনে তার মনে হল—এ চেহারাটা কোথাও গোপন করতে পারলে সে বেঁচে যেত। তা ছাড়া, সেই দেবী সম্বন্ধে—অন্তত হীরালালের অন্তরলোকে সে মহিলা দেবীর আসনেই অধিষ্ঠিতা—এ ধরনের কটূক্তিতে সে একটু ব্যথাও অনুভব করল।

'কিন্তু চিঠিটা কে দিয়েছে—কী লেখা আছে ওতে, তাও তো জানা গেল না।' মুখুয্যেই কথাটা তুললেন।

'লেফাফাটা যে আঁটা রয়েছে।'

'তাতে কি। দাও, আমি খুলে দিচ্ছি।' ঘোষাল হাতটা বাড়িয়ে দিলেন

এবং অনেকক্ষণ ধরে ভাতের হাঁড়ির ভাপ লাগিয়ে সুকৌশলে খামখানা খুলেও ফেললেন।

জড়ানো জড়ানো লেখা। কোনমতে এইটুকু বোঝা গেল—কানপুর গ্যারিসনের কোন সাহেব এখানকার জেনারেল সাহেবের কাছে জনৈক হীরালাল চট্টোপাধ্যায়ের চাকরির জন্য সুপারিশ করেছেন।

সকলেই নিশ্চিন্ত হলেন। খামখানিও বেমালুম আবার জোড়া হল। এখন কথা উঠল—জেনারেলের কাছে নিয়ে যাবে কে? এবং ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খেলে মেজর সাহেব যদি মৃত্যুঞ্জয়ের কোন অনিষ্ট করেন!

অনেক যুক্তির পর স্থির হল চৌধুরী পরদিন ভোরবেলা নিয়ে গিয়ে দূর থেকে জেনারেল সাহেবকে দেখিয়ে দেবেন এবং হীরালাল সেলাম করে চিঠিখানা তাঁর হাতে দেবে। আপাতত মৃত্যুঞ্জয়ের পরিচয় দেবার কোন কারণ নেই। জেনারেল সাহেব ভোরবেলা ঘোড়ায় চড়ে নদীর দিকে বেড়াতে যান—সেই সময় তাঁকে ধরাই সমীচীন।

অনেক দিন পরে হীরালাল ভাল করে আহার করল এবং মামা অফিস চলে গেলে প্রাণভরে দিবানিদ্রা দিল। মৃত্যুঞ্জয় কিন্তু মনে মনে অপ্রসন্ন হয়েই রইলেন। ভাগ্নের চাকরি পাওয়া ষোল আনা কৃতিত্বটা তাঁর রইল না, বরং ভাগ্নের দিকেই বেশিটা পড়ল—এটা মনে করে তিনি একটা অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। তবে শেষ পর্যন্ত এই বলে নিজেকে সান্ত্বনা দিলেন, 'আমি সঙ্গে করে না নিয়ে এলে তো আর ঐ মাগীর সঙ্গে পরিচয় হত না।'

॥ ৯ ॥

মুনশী কাল্‌কাপ্রসাদ কিছুদিন থেকেই বড় চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। চিন্তার এমন কোন কারণ নেই—যতই তিনি একথা মনকে বোঝাতে চেষ্টা করেন মন ততই বেশি করে চিন্তা করে। আজ কয়েক দিন হল তিনি সে চেষ্টাই ছেড়ে দিয়েছেন। অর্থাৎ ভেবেই চলেছেন আকাশ-পাতাল।

চিন্তার কারণটা প্রত্যক্ষ। প্রত্যক্ষ সত্যকে এড়িয়ে যাওয়ার উপায় কি?

কাল্‌কাপ্রসাদ নামকরা ব্যবসাদার গ্রীনওয়ে সাহেবের মুনশী। পদটা এমন কিছু গৌরবের নয়—মূল্যবান তো নয়ই। তবু সাধারণ লোক ঠিক মুনশী

শব্দটার সম্যক্ অর্থ অবগত না থাকায় এবং একজন হোমরা-চোমরা সাহেবের সঙ্গে পদাধিকারটা জড়িয়ে থাকায় প্রায় সকলেই কালকাপ্রসাদকে সম্ভ্রমের চোখে দেখত। বাজারে তিনি ধার পেতেন প্রচুর এবং মহাজনরা তাগাদা করতে সাহস পেত না। যেখানে তিনি যেতেন সেখানেই সকলে তাঁকে সম্মানের আসনটি ছেড়ে দিত। এই পদাধিকার-বলেই তিনি এই বয়সে রামশঙ্করের সর্বাঙ্গসুন্দরী দশমী কন্যার পাণিগ্রহণ করতে পেরেছেন। তিনটি স্ত্রী বিদ্যমানে এমন সুন্দরী কন্যা তাঁকে কে দিত!

কিন্তু এখন সেই সম্পদই দায় হয়ে দাঁড়াল যে। কেউ মুখে কিছু বলে না, কিন্তু তাদের চোখে চোখে চাপা সেই অবজ্ঞার আভাস পান। হয়তো বা কিছু বিদ্রূপও। গুজব কানে আসে প্রায়ই। কিন্তু খোদ সাহেব সে-কথা আলোচনা করেন না। তাঁকে জিজ্ঞাসা করারও সাহস নেই কালকাপ্রসাদের। পথের লোকের সঙ্গে কিছু এসব আলোচনা করা যায় না। সাধারণ মানুষের মত যাকে-তাকে জিজ্ঞাসা করতে সম্ভ্রমে বাধে। বিশেষত লোকে তাঁর কাছ থেকেই খবরটা আশা করে। হাজার হোক, সাহেবের মুনশী।

সুতরাং চিন্তিত না হয়ে উপায় কি।

কয়েকদিন ধরে ভেতরে ভেতরে ছটফট করলেন ভদ্রলোক। তার পর আর ধৈর্য ধরতে না পেরে একদিন ভোরবেলাই রওনা হয়ে গেলেন বন্ধু কানহাইয়ালালের বাড়ি। কানহাইয়ালাল বহুদিনের বন্ধু—তার কাছে অত লজ্জা-শরম করার প্রয়োজন হবে না।

কালকাপ্রসাদ যখন রওনা হলেন তখনও ভাল করে ফর্সা হয় নি। পথে বিশেষ লোকজনও চলছে না। সারারাত দুশ্চিন্তায় ঘুম হয় নি বলে একটু বেশী সকালেই উঠে পড়েছেন, তখনও পর্যন্ত রাস্তায় একা চলতে শুরু করে নি। কিন্তু কালকাপ্রসাদ সেজন্য পিছপা হলেন না—প্রয়োজন হলে সারা পথটাই হেঁটে যেতে পারবেন তিনি, সে শক্তি—বলতে নেই, ভগবান বজরঙ্গবলীর আশীর্বাদে—এখনও তাঁর আছে। নইলে তিনটি স্ত্রীর ওপর আর একটির পাণিগ্রহণ করতে সাহস করতেন না। তিনি বেশ জোরে জোরেই পা চালালেন।

অবশ্য বেশী দূর তাঁকে যেতে হল না। নবাবগঞ্জের প্রান্তে পীর সাহেবের আস্তানা, তার ধারেই একটা এক্কার আড্ডা। দূর থেকে দেখা গেল—অত ভোরেই একখানা এক্কা প্রস্তুত হয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে আছে। এতটা পথ

হাঁটবার সঙ্কল্প করা আর হাঁটা এক কথা নয়। এক্কা দেখেই কাল্‌কাপ্রসাদের গতি মন্থর হয়ে এল।

এক্কাওয়ালা আলিজান মিয়া পরিচিত লোক। সে এই অঞ্চলে আজ ত্রিশ বছর এক্কা চালাচ্ছে—এখানকার সম্ভ্রান্ত অধিবাসীদের সকলেই চেনে। দূর থেকে কাল্‌কাপ্রসাদকে দেখে সে-ও এক্কা নিয়ে এগিয়ে এল, 'সেলাম আলাস কম—মুনশীজী, কঁহি চল্‌না হ্যায় কেয়া?'

কাল্‌কাপ্রসাদও জবাবে 'আলাযকম্ সেলাম' জানিয়ে একেবারে এক্কায় চড়ে বসলেন এবং কানহাইয়ালালের বাড়িতে নিয়ে যাবার নির্দেশ দিয়ে পুনশ্চ গভীর চিন্তায় মগ্ন হলেন।

কিন্তু আলিজান তাঁকে বেশীক্ষণ চিন্তা করতে দিল না। কিছুক্ষণ নিঃশব্দে গাড়ি চালাবার পরই মৃদু কেসে গলাটা সাফ করে নিয়ে ডাকল, 'মুনশীজী!'

কাল্‌কাপ্রসাদ যেন ঘুম থেকে জেগে উঠলেন। সারারাত বিনিদ্র কাটাবার পর হয়তো বা ভোরাই হাওয়াতে, চিন্তার ভেতরেই একটু তন্দ্রা এসেছিল। তিনি চমকে প্রশ্ন করলেন, 'কি? কী হয়েছে?'

'না, কিছু হয় নি। একটা কথা জিজ্ঞাসা করব যদি গোস্তাকি না ধরেন!

'কী কথা?'

মুখে প্রশ্ন করলেও কথাটা অনুমান করতে দেরি হল না কাল্‌কাপ্রসাদের। এই তো—এখানেই তো একটা উপায় হয়ে গেল।

আলিজান আরও একটু ইতস্তত করে বলল, 'কী সব গুজব শুনছি মুনশীজী—এসব কি সত্যি?'

'গুজবটা কী শুনেছ আগে তাই বল—তবে তো বুঝব!' তাচ্ছিল্যের সঙ্গেই যেন কথাটা বলেন কাল্‌কাপ্রসাদ।

আলিজান মিয়া উৎসাহিত হয়ে বলল, 'শুনছি নাকি আংরেজদের শাহি আর থাকবে না? সিপাইরা নাকি খুব গরম হয়েছে। শুনেছি বিলায়েত থেকে ওখানকার বাদশা-বেগমের হুকুম এসেছে ফৌজের সবাইকে ইসাই* করতে হবে। সেই হুকুম মোতাবেক এখানে গরু আর শুয়োরের চর্বি খাইয়ে

*ইসাই—ইসার মতাবলম্বী; খ্রীষ্টান। যীশু মুসলমানদের কাছে ইসা রূপেই পরিচিত। পশ্চিমা মুসলমানদের কাছে খ্রীষ্টান শব্দটি তত প্রচলিত নয়। ইসাহী বা ইসাই শব্দটিই বহুল-ব্যবহৃত। 'নাসারা'ও বলেন কেউ কেউ—যীশু নাসরতের লোক বলেই বোধ হয় (Jesus of Nazareth)।

নাকি রাতারাতি হিন্দু মুসলমান সবাইকার জাত মারবার চেষ্টা হয়েছিল—একটুর জন্যে নাকি সব বেঁচে গেছে? তাইতে সব সিপাই খাপ্পা হয়ে উঠেছে—আংরেজশাহি ঘুচিয়ে দিয়ে মুঘল বাদশার হাতে আবার বাদশাহি ফিরিয়ে দেবে—এসব কি সত্যি?'

কাল্‌কাপ্রসাদ হো হো করে হেসে উঠলেন। বললেন, 'গুজবটা যারা ছড়িয়েছে তাদের মাথা আছে—মানতেই হবে। ওহে বাপু, দেশের বাদশাহিটা কি এই সব সিপাইরা হাতে করে তুলে দিয়েছিল আংরেজদের হাতে যে, এখন ইচ্ছে করলেই ফিরিয়ে নেবে? আংরেজরা নিজেদের হিম্মতে কেড়ে নিয়েছে। একটা আংরেজ এক-শটা সিপাইর মহড়া নিতে পারে—তা কি জান না? সিপাইরা লড়বে আংরেজদের সঙ্গে—পাগল আর কি!'

একটা পরিপূর্ণ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে আলিজান বলল, 'বাঁচলাম বাবুজী। খবরটা শুনে পর্যন্ত আমার ভাবনায় ঘুম হচ্ছিল না। সত্যি কথা বলতে কি, আংরেজদের হাতে শাহি পড়ে তবে একটু শান্তির মুখ দেখেছি। আবার কি হবে—কার হাতে মুলুক যাবে—এই সব ভেবে বড়ই অশান্তি হচ্ছিল—আমার তো বয়স কম হল না বাবুজী, চার কুড়ি হতে চলল—অনেক দেখলাম। আমি তো বেরিলীর লোক—রোহিলা-নবাবদের রাজত্বে বাস করেছি। বলতে গেলে কানপুর শহরে পালিয়ে এসেছিলুম। জোর যার মুলুক তার—এ সবাই জানে। কিন্তু একজন জবরদস্ত বাদশার শাসনে থাকা ঢের সুবিধে, নিশ্চিন্ত হয়ে থাকা যায়—তাই না বাবুজী?'

কাল্‌কাপ্রসাদ সত্যিই মনে খানিকটা বল পেলেন। হোক না সামান্য একাওয়ালা—এরাই তো দেশের সাধারণ লোক। এর মনোভাব নিশ্চয়ই আরও অনেকের মনোভাব।

তিনি কণ্ঠস্বরে জোর দিয়ে বললেন, 'নিশ্চয়ই, এক শ বার।'

আরও খানিকটা নিঃশব্দে একা চালাবার পর আলিজান বলল, 'আচ্ছা, ও ইসাই করবার খবরটা তা হলে বিলকুল ঝুট—কি বলেন?'

'বিলকুল!'

উৎসাহিত হয়ে আলিজান বলল, 'তাই তো আমিও বলি মুনশীজী, এত বড় জাত, এত এলেমদার লোক ওরা—ওরা কি এমন দুশমনি করতে পারে রায়তদের সঙ্গে? তা হলে আল্লা ওদের এত বড় করবেন কেন?......আসল কথাটা কি জানেন, ঐ ইসাই করবার খবরটা শুনেই একটু দমে গিয়েছিলুম।'

কাল্‌কাপ্রসাদ বেশ জোর দিয়েই বললেন, 'ওসব কতকগুলো মতলববাজের কাণ্ড, বুঝলে না?—ওসব গুজবে কান দিও না।'

কান্‌হাইয়ালাল দীক্ষিতও কিছু চিন্তিত মুখেই বসে ছিলেন। এমন কি গুড়গুড়িতে তামাকটা যে বৃথা পুড়ে যাচ্ছে, সেদিকেও তাঁর খেয়াল ছিল না। এখন অকস্মাৎ কাল্‌কাপ্রসাদকে দেখে যেন হাত বাড়িয়ে স্বর্গ পেলেন।

'আরে এস এস কাল্‌কাপ্রসাদ, ঠিক তোমার কথাই ভাবছিলুম।'

'কেন বল তো—ব্যাপার কি?' কাল্‌কাপ্রসাদ যতটা সম্ভব হাল্কা ভাবে কথা বলার চেষ্টা করেন।

কান্‌হাইয়ালাল তাঁর বাড়ির বাইরে একটা নিমগাছতলায় চারপাই পেতে বসে ছিলেন। কাল্‌কাপ্রসাদের প্রশ্নের উত্তরে তখন কোন জবাব দিলেন না—গুড়গুড়ির নলটা কাল্‌কাপ্রসাদের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে উঠে গেলেন এবং বাড়িতে ঢোকবার সদর দরজাটা চেপে বন্ধ করে দিয়ে ফিরে এসে প্রশ্ন করলেন, 'এ সব কি শুনছি বল তো কাল্‌কাপ্রসাদ, আমি তো মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না!'

কিছুক্ষণ স্থিরদৃষ্টিতে বন্ধুর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে কাল্‌কাপ্রসাদ বললেন, 'কী শুনছ তাই আগে শুনি!'

'শুনেছ নিশ্চয় তুমিও—আর তাই এত ভোরবেলা ছুটে এসেছ!' কান্‌হাইয়ালাল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বন্ধুর মুখের দিকে তাকান।

কাল্‌কাপ্রসাদ তবু ভাঙেন না। বলেন, 'তবু তুমি ঠিক কী শুনেছ আগে তাই বল না!'

কান্‌হাইয়ালাল গলা আরও খাটো করেন। বলেন, 'গুজব তো নানা রকম। তবে এটা ঠিক যে, একটা বড় গোছের গোলমাল বাধবে। বাংলা মুলুকে যে-সব হিন্দুস্থানী সিপাই আছে তারা তো ক্ষেপে উঠেছেই—আবার তারাই চেষ্টা করছে এ মুলুকের সিপাইদেরও ক্ষেপাতে। কি সব নাকি চাপাটি পাঠানো চলছে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে—সারা মুলুকই নাকি ক্ষেপে উঠবে! ইংরেজ-রাজত্ব নাকি আর থাকবে না।...তুমি কী শুনেছ বল তো?'

কাল্‌কাপ্রসাদও গলা নামালেন, 'তুমি যা শুনেছ তা সবই আমি শুনেছি। বাংলা মুলুকে গোলমাল তো রীতিমত পেকেই উঠেছে। বিলাতের মহারাণী সাহেবা নাকি হুকুম দিয়েছেন যে, এ মুলুকের সবাইকে ক্রেশ্চান করতে

হবে। তা করতে গেলে আগে সিপাইদের হাত করা দরকার। শুধু ইংরেজ ফৌজের আর জোর কত! সিপাইদের যদি ক্রেস্তান করা যায় তো তারাই তখন সাহেবদের দিক টানবে—তারা চাইবে যে, তাদের যখন জাত গেছে তখন সকলেরই জাত চলে যাক। আর সেই মতলবেই নাকি নতুন এক টোটা এনেছে, তাতে গরু আর শুয়োর—দুই জানোয়ারেরই চর্বি আছে। দাঁতে কেটে বন্দুকে পুরতে হবে- আপনিই জাত চলে যাবে সঙ্গে সঙ্গে। এ ছাড়া নাকি আটার সঙ্গে গরুর হাড়ের গুঁড়ো মিশিয়ে দিচ্ছে—যাতে রুটি খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জাত চলে যায়।'

কান্‌হাইয়ালাল কিছুকাল নির্বাক থেকে বললেন, 'এসব তুমি বিশ্বাস কর?'

'আমি তো ভাই করি না, কিন্তু—'

'কিন্তু কি?'

'অনেকেই তো করে দেখছি।...বাজারে আটার দাম আগুন হয়ে উঠেছে, তবু সিপাইরা বাইরে থেকে আটা কিনছে, ব্যারাকে যে-সব আটা দেওয়া হচ্ছে তা খাচ্ছে না। গুজব বেশ ভাল করেই ছড়িয়েছে। এখন আমাদের কর্তব্য কি?'

কান্‌হাইয়ালাল বহুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন। গুড়গুড়ির মাথার আগুন অনেকক্ষণ নিভে গেছে। তবু অন্যমনস্কভাবে তাতেই গুটি দুই টান দেবার চেষ্টা করলেন। তার পর বললেন, 'দেখ কাল্‌কাপ্রসাদ, আমিও এই কথাটাই কদিন ধরে ভাবছি। একটা গোলমাল বাধাবার চেষ্টা চলছে তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু বাধাচ্ছে কারা? এ গুজব সিপাইদের মধ্যে কেউ বেশ ভালভাবেই ছড়াচ্ছে। এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় —রোজ রোজ নতুন নতুন। কিন্তু কেন? কার এতে স্বার্থ? এদেশী রাজারা আর নবাবরা? তাদের স্বার্থ আছে স্বীকার করি—তারা হয়তো আবার স্বাধীন রাজা হবার স্বপ্ন দেখছে তাও ঠিক, কিন্তু তারা এত মিলেমিশে কাজ করতে পারবে বলে তো বিশ্বাস হয় না। তাই ভাবছি কাল্‌কাপ্রসাদ, এর পেছনে কারা আছে—আর তাদের শক্তি কত? শত্রুকে দেখতে পেলে ভয় কমে যায়—অদৃশ্য শত্রুই বেশী ভয়ঙ্কর।'

কাল্‌কাপ্রসাদও খনিক গুম খেয়ে রইলেন। তার পর প্রশ্ন করলেন, 'আচ্ছা, সিপাইরা কি সত্যিই ইংরেজদের বিরুদ্ধে যেতে সাহস করবে শেষ পর্যন্ত? তুমি কী মনে কর?'

কানহাইয়ালাল বললেন, 'যেতে পারে। কারণ কি জান? সাহস-দুঃসাহসের কথা নয়, পেটের কথা। একটা গোলমাল বাধা মানেই লুটতরাজের সুযোগ। এর আগে ওরা মাইনে পেত না—মুঘল-বাদশাহের আমলে তো দু বছর তিন বছর করে মাইনে বাকি পড়ে থাকত, কিন্তু তখন মাইনের অত তোয়াক্কা করত না। ইংরেজ-আমলে জবরদস্তিটা বন্ধ করতে হয়েছে যে —তাতে ভারি মুশকিল।'

'কিন্তু ভবিষ্যৎ?'

'ভবিষ্যৎ অত ভাবার মত যদি মাথা থাকত কালকাপ্রসাদ, তো তারা ফৌজ যাবে কেন—তোমার মত মুনশীগিরি করত।'

'আচ্ছা, এই ক্রেস্তান করার কথাটা তুমি কি বিশ্বাস কর?'

'না, করি না, এ বিলকুল ঝুট। ইংরেজরা অত বোকা নয়। আর তাতে তাদের লাভই বা কি? শুনেছি আলমগীর বাদশা পর্যন্ত এ কাজ করতে পারেন নি—ভাল করে বাদশা বনবার আগেই ইংরেজরা তা করতে সাহস করবে—এ তো মনে হয় না।'

আবার কিছুক্ষণ দুজনেই চুপচাপ।

কালকাপ্রসাদ খানিক পরে উঠে কানহাইয়ালালের চারপাইতেই এসে বসলেন। তার পর গলা নামিয়ে ষড়যন্ত্রকারীদের মত ফিস্ ফিস্ করে বললেন, 'এখন তোমার আমার কর্তব্য কি?'

কানহাইয়ালাল উত্তর দিলেন, 'সেই কথাই তো তোমাকে জিজ্ঞাসা করব ভাবছিলাম। তুমি তো সাহেবের সঙ্গে বাস কর—কী রকম বুঝছ বল দিকি।'

'কিছুই বুঝছি না। তা নইলে আর এই সাত-সকালে প্রাণের দায়ে ছুটে আসব কেন।...কোন কথাই তোলে না। তবে মনটা যে খুব ভাল নেই তা মুখ দেখেই বুঝতে পারি। চিন্তিত একটু—কিন্তু সে ঐ পর্যন্তই।'

কানহাইয়ালাল নিঃশব্দে কিছুক্ষণ ভেবে নিয়ে বললেন, 'তা হলে আমাদের এখন কিছুদিন চুপচাপ থাকাই ভাল, বুঝলে? ব্যাপারটা কোন্‌দিকে গড়ায় দেখা যাক। সিপাইরা যদি সত্যিই ক্ষেপে—তা হলেও যে শেষ পর্যন্ত কোন সুবিধা করতে পারবে তা মনে হয় না। ইংরেজ জাত বড় শক্ত জাত, বুঝলে কালকাপ্রসাদ, ওদের এখনও পুরো চেনে নি এরা। ওরা মার খেয়ে হাল ছাড়তে শেখেনি—এইটে বড় কথা। না, আরও কিছুকাল দেখ!'

'কিন্তু', কাল্‌কাপ্রসাদ বললেন, 'আমাদের অবস্থাটা যে সাংঘাতিক। আমরা যে আগেই বিষদৃষ্টিতে পড়ব। ধনপ্রাণ নিয়ে টানাটানি হবে—'

'আমি বলি কি—পয়সাকড়ি যা আছে, এই বেলা সরাও। মেয়েদের না হয় কোন ছলছুতোয় দেহাতে পাঠিয়ে দাও। তার পর বেগতিক দেখলে নিজেরাও গা-ঢাকা দেবে। এ ছাড়া তো আর কোন উপায় দেখছি না।'

কাল্‌কাপ্রসাদ বললেন, 'না কি গোপনে গোপনে এদের একটু সাহায্য করে হাতে রাখব? দু দলেই থাকা যাক না।'

'উঁহু।' দৃঢ়ভাবে ঘাড় নাড়লেন কান্‌হাইয়ালাল, 'দু নৌকোয় পা দেওয়া ঠিক নয়। ওভাবে তুমি কাউকেই খুশী করতে পারবে না, দু দলই চটে থাকবে, তা ছাড়া কথাটা বেশীদিন গোপনও থাকবে না। তখন প্রাণ নিয়ে টানাটানি। কেউই বিশ্বাস করবে না। না না কাল্‌কাপ্রসাদ, ও-কাজে যেও না। দীর্ঘদিন ইংরেজের নোকরি করেছি, নিমক খেয়েছি—আমাদের এখন ভোল পালটাতে যাওয়া ঠিক হবে না। সিপাইদের আমি বিশ্বাস করি না—তাদের যারা ক্ষেপাচ্ছে, তাদেরও না। ইংরেজের বাদশাহির সবে শুরু। ভগবান তাদেরও কিছুদিন সময় দেবেন—এই আমার বিশ্বাস।'

'কিন্তু সারা দেশ যদি ক্ষেপে ওঠে?'

'তা সম্ভব নয়। দেশের লোককে তুমিও চেন, আমিও চিনি। আর তা যদি ক্ষেপে তো আমরাও তখন ক্ষেপব। নদীতে বান এলে ঘরদোর ভাসবেই—ইচ্ছে করলেও তো তুমি স্থির থাকতে পারবে না ভাই।'

কাল্‌কাপ্রসাদ অনেকক্ষণ গুম্ খেয়ে বসে রইলেন। তার পর বললেন, 'তোমার কথাগুলোই ঠিক বলে মনে হচ্ছে। সেই জন্যেই তো ভাই তোমার কাছে ছুটে এলুম। হাজার হোক, একের বুদ্ধি বুদ্ধিই নয়।...তা হলে তাই করি, কি বল—মেয়েদের সব দেহাতে রওনা করিয়ে দিই?'

'হ্যাঁ, কিন্তু সবাইকে একসঙ্গে নয়। আমিও সরাতে শুরু করেছি। স্ত্রী দু জনকে পাঠিয়েছি তাদের বাপের বাড়ি। ছেলেমেয়েরা যাচ্ছে আজকে আমার বহিনের বাড়ি। এই ভাবে সরাচ্ছি। রটিয়ে দিয়েছি বহিনের ননদের বিয়ে—তাই ওদের পাঠাচ্ছি। নইলে নানারকম গুজব উঠবে।'

'ঠিক, ঠিক। আমিও তাই করব। দেখি, বাড়ি গিয়ে মার সঙ্গে পরামর্শ করি।'

কাল্‌কাপ্রসাদ উঠে পড়লেন।

কান্হাইয়ালাল বললেন, 'চললে নাকি? একটু ব'স না, গরম দুধ খেয়ে যাও একটু।'

'না ভাই, আজ থাক। পূজাপাঠ হয় নি এখনও—চলি।'

কান্হাইয়ালাল গলির মোড় পর্যন্ত বন্ধুর সঙ্গে সঙ্গে এসে বিদায়-সম্ভাষণ জানিয়ে গেলেন। প্রশ্ন করলেন, 'এক্কা ডেকে দেব নাকি?'

'না থাক, এখন খানিকটা হাঁটি। দরকার হয়, একটা চল্‌তি এক্কায় উঠে পড়ব।'

বড় রাস্তায় উঠে কাল্‌কাপ্রসাদ খানিকটা স্থির হয়ে দাঁড়ালেন। একবার চারদিকে চেয়ে দেখলেন। ততক্ষণে শহর কর্মমুখর হয়ে উঠেছে। পথ-ঘাটে পুরোদমে লোক-চলাচল শুরু হয়েছে। খালি এক্কার অভাব নেই। কিন্তু কাল্‌কাপ্রসাদের সত্যি সত্যিই গাড়ি চড়তে ইচ্ছা হল না। মাথাটা যেন কেমন গোলমাল হয়ে গিয়েছে, কোন কথাই ভাল করে বুঝতে পারছেন না। খানিকক্ষণ হন হন করে হাঁটতে পারলে বোধ হয় সুস্থ হতে পারতেন।

কাল্‌কাপ্রসাদ প্রথমটা বেশ জোরে জোরেই পা চালালেন।

বেলা প্রথম প্রহর তখনও উত্তীর্ণ হয় নি, কিন্তু প্রথম বসন্তের সূর্য তখনই প্রখর হয়ে উঠেছে। উষ্ণ বাতাস দুঃসহ না হলেও সুখসেব্য আর নেই। কাল্‌কাপ্রসাদ ভ্রূ কুঞ্চিত করলেন। চারদিকেই অস্বস্তি।

না, এভাবে হাঁটা আর চলবে না।

তিনি ইঙ্গিতে একখানা এক্কাই ডাকলেন।

এক্কায় চড়ে অপেক্ষাকৃত নিশ্চিন্তভাবে আর একবার শহরের দিকে তাকালেন। কর্মব্যস্ত শহরের রাজপথে যে যার কর্মে চলেছে। দোকানপাটে স্বাভাবিক বেচা-কেনার ভিড়, সবই প্রতিদিনকার মত ঠিক চলছে; কিন্তু তবু কাল্‌কাপ্রসাদের কেমন যেন মনে হল—কোথায় একটা কি ভাবী বিপর্যয়েরই চিহ্ন ফুটে উঠছে। সব ঠিক আগেকার মত নেই। শান্ত নগরী যেন ঝড়ের পূর্বের শান্ত সমুদ্রের মত—ঈশান কোণে মেঘ দেখা দিলেই তুফান উত্তাল হয়ে উঠবে। এ স্তব্ধতা সেই তুফানেরই পূর্বাভাস।

এ কি তাঁর অকারণ আতঙ্ক?

তাঁর ভীত মনেরই প্রতিক্রিয়া?

অথবা এই আপাত-শান্ত জনতার গতিবিধির মধ্যে সত্যিই কোন ঝড়ের সঙ্কেত বোঝা যাচ্ছে

কে জানে!

কাল্‌কাপ্রসাদ কাঁধের গামছাখানা টেনে ললাটের ঘাম মুছলেন।

জীবনে বুঝি সুখশান্তি বলে কোন জিনিস সত্যিই নেই। ওটা কবির কল্পনা।

॥ ১০ ॥

আজিমুল্লা খাঁ সাধারণত একটু বেশী বেলাতেই শয্যা ত্যাগ করতেন। বিলাত যাওয়ার ফলে এই অভ্যাসটি তাঁর হয়েছিল—এখানে ফিরেও তা ত্যাগ করতে পারেন নি। সুতরাং সেদিন যে চাকরের ডাকাডাকিতে অত ভোরে ঘুম ভাঙল বলে বিরক্ত হবেন সে আর বিচিত্র কি। গায়ের মোটা চাদরখানা সরিয়ে রীতিমত ভ্রূকুঞ্চিত করেই প্রশ্ন করলেন, 'কি, ব্যাপার কি? বাড়িতে কি ডাকাত পড়েছে নাকি?'

ভৃত্য আলিমদ্দী সে দৃষ্টির সামনে ভয়ে এতটুকু হয়ে গেল। কিন্তু তার যে উভয়-সঙ্কট। দরজার বাইরে যে দৈত্যটা দাঁড়িয়ে আছে সে-ও কিছু অবহেলার নয়। সে মাথাটা চুলকে উত্তর দিল, 'আজ্ঞে, বিঠুর থেকে—'

'বিঠুর থেকে কী? লোক এসেছে? তার জন্যে এই শেষরাত্রের ঘুম ভাঙালি?

আজিমুল্লার কণ্ঠস্বর আরও উগ্র হয়ে উঠল।

এই বেয়াদব ও মূর্খ ভৃত্যটাকে আজই তাড়াতে হবে। এতদিনে তার বোঝা উচিত যে, আজিমুল্লা নানাকে এতটা পরোয়া করেন না যে নানা লোক পাঠালেই আজিমুল্লাকে ভোরের সুখনিদ্রাটি ত্যাগ করতে হবে।

আলিমদ্দী তাড়াতাড়ি বলল, আজ্ঞে নানা নন—হুসেনী বেগম!'

'হুসেনী বেগম! লোক পাঠিয়েছে?'

আজিমুল্লার ঘুমের ঘোর কেটে গেল। কণ্ঠস্বরও অপেক্ষাকৃত সহজ হয়ে এল।

'হুসেনী বেগম! কী চায় তার লোক?'

আজ্ঞে, খুব নাকি জরুরী খবর। একেবারে দানোর মত একটা লোক পাঠিয়েছে, সে এসেই জুলুম করতে শুরু করেছে। এখনই আপনাকে না ডাকলে সে বোধ হয় আমায় তুলে আছাড় দিত!'

'ও—তা—আচ্ছা, নিয়ে আয় তাঁকে।'

খাটিয়া ত্যাগ করে আজিমুল্লা একখানা চেয়ারে এসে বসলেন।

তিনি একটু বিস্মিতই হলেন।

হুসেনী তাঁর এই বাসস্থানের খবর পেল কেমন করে?

কানপুরে আজিমুল্লা খাঁর নির্দিষ্ট কোন বাসা নেই। বাড়ি অবশ্যই একটা আছে—এই বাড়ি—কিন্তু এখানে তিনি কচিৎ রাত্রিবাস করেন। এক-এক দিন রাত বেশী হয়ে গেলে বিঠুরেই থেকে যান—সেখানে তাঁর জন্য একটি ঘর নির্দিষ্ট আছে, খানসামাও একজন আছে। এ ছাড়া শহরের তিন-চারটি জায়গায় তাঁর সম-সংখ্যক রক্ষিতা আছে—তাদের বাড়িতেও পালা করে থাকতে হয়। পূর্বাহ্নে কাউকেই খবর দেন না—রাত্রি প্রথম প্রহর উত্তীর্ণ হলে কোথায় যাবেন সেটা ঠিক করেন। কেবল যেদিন অখণ্ড বিশ্রামের প্রয়োজন হয় সেদিনই এখানে আসেন। কারণ এ বাড়িতে বিশ্রামের ব্যাঘাত করার মত কেউ নেই। তাঁর বিবি বড়লোকের মেয়ে, সে বেশির ভাগই তার পিত্রালয় জৌনপুরে থাকে। থাকার মধ্যে এক বুড়ী নানী—তিনি আজিমুল্লার গতিবিধির কোন খবরই রাখেন না, বিশেষ কোন কৌতূহলও নেই।

কাল বহুরাত্রে আজিমুল্লা ঠিক করেছিলন এখানে আসবেন। সে খবর তো কারও পাবার কথা নয়। তবে? তবে কি হুসেনী বেগম তাঁর গতিবিধির ওপর গোয়েন্দাগিরি করে?

আজিমুল্লা খাঁর ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে উঠল।

আলিমদ্দীর পিছু পিছু এসে ঢুকল হুসেনীর লোক। এ'কে আজিমুল্লা আগেও কোথায় দেখেছেন, কিন্তু ঠিক স্মরণ করতে পারলেন না। তবে অলিমদ্দী বড় মিছে বলেনি—লোকটা সাক্ষাৎ দানো বা দৈত্যই বটে। হুসেনী বিবি এমন দূতটিকে কোথা থেকে খুঁজে বার করল? এ তো বিঠুরের কোন ভৃত্য নয়। অন্তত বিঠুরে এ'কে তিনি বেশি দেখেন নি। লোকটা সেলামের ভঙ্গি মাত্র করে বিনা ভূমিকাতেই কাজের কথা পাড়ল, 'মালেকান্ হুসেনী বেগম-সাহেবা একবার আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান। কখন কোথায় আপনার সুবিধে হবে জানতে চেয়েছেন।'

আজিমুল্লা সে কথার কোন উত্তর না দিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'আমি যে কাল এখানে থাকব বেগমসাহেবা জানলেন কী করে?'

'আমাকে খবর নিতে বলেছিলেন।' প্রশান্ত মুখেই সর্দার খাঁ উত্তর দেয়।

'তুমিই বা খবর দিলে কী করে?' আজিমুল্লার কৌতূহল প্রবল হয়ে উঠল।

'বাইরে এসে অপেক্ষা করছিলাম। আপনি গাড়িতে উঠে গাড়িবানকে এখানেই আনতে হুকুম করলেন, শুনলাম।'

'ওঃ!' বিস্ময়, নিশ্চিন্ততা ও প্রশংসা মিলে এই একটি স্বরই আজিমুল্লার গলা দিয়ে বার হল।

তার পর অপেক্ষাকৃত সহজ কণ্ঠে বললেন, 'হ্যাঁ, কী বলছিলে? বেগমসাহেবা আমার সঙ্গে দেখা করতে চান? সে তো সৌভাগ্যের কথা। তাঁকে ব'ল যে, তাঁর এ বান্দা তাঁরই মর্জির অপেক্ষা করবে।'

'তা হলে আজ সন্ধ্যের পরে?'

'তাঁর যদি হুকুম হয় তো তাই হবে।'

'কোথায়?'

'এখানে—কিংবা যেখানে তিনি হুকুম কববেন।'

'তা হলে এখানেই তিনি আসবেন—সন্ধ্যের পর।'

লোকটা আবারও সেলামের ভঙ্গি মাত্র করে চলে যাচ্ছিল, আজিমুল্লা ইঙ্গিতে নিরস্ত করলেন।

চেয়ারের পাশেই দামী মেহগ্নি কাঠের ডেস্ক। সেটাকে খুলে একটা টাকা বার করলেন। টাকাটা লোকটির হাতে দিযে বললেন, 'তোমাব বকশিশ।'

টাকাটা হাত পেতে নিয়ে সে আবারও সেলামের ভঙ্গিতে মাথাটা ঝুঁকোল।

কিন্তু সে চলে যাবার জন্যে ঘুরে দাঁড়াবার আগেই আজিমুল্লা মোলায়েম কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, 'তোমার নাম কি ভাই, সেটা তো জানা হল না?'

'আমার নাম সর্দার খাঁ—আপনার বান্দা।'

'বিঠুরে কতদিন কাজ করছ? তোমাকে তো দেখি নি?'

'আমি তো বিঠুরে কাজ করি না।'

'অ······তা তবে তুমি কী কর?'

'আমার বাজারে মাংসের দোকান আছে।'

'তা হলে তোমার সঙ্গে বেগমসাহেবার যোগাযোগটা—' বিস্ময় চাপতে পারলেন না আজিমুল্লা।

'যদি দরকার বোধ করেন তো বেগমসাহেবাকেই জিজ্ঞাসা করবেন।'

সর্দার খাঁ আর কিছুমাত্র প্রশ্নোত্তরের অবকাশ না দিয়ে আর একবার মাত্র মাথা হেলিয়ে ঘর থেকে বার হয়ে গেল।

নীচে তখন সদরের কাছে বসে আলিমদ্দী দাঁতন করছিল। তার পাশ দিয়ে সর্দার খাঁ প্রায় ঝড়ের বেগেই বার হয়ে গেল, কিন্তু সেই সচল পর্বতের অপসরণজনিত দমকা হাওয়াটা আলিমদ্দীর গায়ে এসে লাগার সঙ্গে সঙ্গে আরও একটা কি পদার্থ তার কোলের ওপর এসে পড়ল। প্রথমটা সে দস্তুরমত ভয় পেয়েছিল, কিন্তু তার পর আশ্বস্ত হয়ে দেখলে—জিনিসটা কোন অসার বস্তু নয়, একটি গোলাকার রুপোর টাকা।

আজিমুল্লা সারাটা দিন বলতে গেলে অধীর আগ্রহে হুসেনী বেগমের অপেক্ষায় রইলেন। সময়টা, এই প্রথম তাঁর মনে হল, বড় দীর্ঘ—সূর্যদেবের গতি বড়ই মন্থর।

হুসেনী তাঁর কাছে আসছে—হুসেনী।

স্বেচ্ছায়। তাঁকে তার প্রয়োজন পড়েছে!

তিনি কি অকারণেই এত অধীর হচ্ছেন?...তাঁর মত তীক্ষ্ণ-ধী লোকের বুঝি এতটা অধীরতা শোভা পায় না।

অথচ আজিমুল্লা বুদ্ধিজীবী লোক। আর যাই থাক, তাঁর বুদ্ধির অভাব আছে এমন অপবাদ শত্রুতেও দিতে পারবে না। সামান্য খিদমৎগারের পুত্র তিনি। সেনা-ব্যারাকের এক সাহেবের খিদমৎগারি করতেন আজিমুল্লার পিতা। এ তো এই সেদিনও—বেশ বড় হয়েও—আজিমুল্লা দেখেছেন। এবং সেজন্য তিনি লজ্জিতও নন। পিতার সেই খিদ্‌মৎগারিই আজিমুল্লার জীবনে উন্নতির পথ প্রশস্ত করে দিয়েছে। বরং সে পরিচয় যে আজ সম্পূর্ণরূপে ঢেকে দিতে পেরেছেন—নিজের এই কৃতিত্বে আজিমুল্লা গর্বিতই।

ব্যারাকে ব্যারাকে খিদ্‌মৎগার পিতার সঙ্গে ঘুরে বাল্যেই মেধাবী আজিমুল্লা বহু ইংরেজী শব্দ আয়ত্ত করেন—এমন কি কিছু ফরাসীও। সে-ইংরেজী ব্যাকরণসম্মত না হলেও খাঁটি সাহেবী ইংরেজী। উচ্চারণের ভঙ্গিটা পর্যন্ত সাহেবী। আরও একটা সুবিধা, বহু উচ্চশিক্ষিত লোকও, সাহেব বিশেষত স্কচ সাহেবের মুখের উচ্চারণ এক বর্ণও বোঝেন না, কিন্তু আজিমুল্লা শুনেই শিখেছিলেন—সে অসুবিধে তাঁর নেই।

আজিমুল্লা নিজেও অনেক রকম কায়িক শ্রমের কাজ করেছেন। কাফি-খানায় পেয়ালা ও সান্‌কি ধোওয়ার কাজও এক সময় তাঁকে করতে হয়েছিল। কিন্তু সাহেবদের সংস্পর্শে গোটা বাল্যকালটা কাটার ফলেই হোক বা সহজাত ব'লেই হোক, উচ্চাভিলাষ তাঁকে কখনও ত্যাগ করে নি। সেই উচ্চাভিলাষেই একদা তিনি কানপুর শহরে পৌঁছে ইংরেজী স্কুলের হেডমাস্টার গঙ্গাদীনকে খুঁজে বার করেন এবং তাঁর কাছে লেখাপড়া শিখতে আরম্ভ করেন। শুনে শুনে ইংরেজী ভাষায় যতই দখল থাক—লিখতে ও পড়তে না পারলে সবই বৃথা—এ কথাটা আজিমুল্লা ভালই বুঝেছিলেন।

তাঁর সে দূরদৃষ্টি ও অধ্যবসায়ের ফল ফলতেও দেরি হয় নি। গঙ্গাদীনের কাছে মোটামুটি পাঠ সমাপ্ত করে ঐখানেই শিক্ষকতা করতে শুরু করেন বটে, কিন্তু তাঁক কেউই সাধারণ স্কুল-মাস্টার বলে কোনদিন অশ্রদ্ধা করতে পারে নি। তাঁর সুশ্রী চেহারা, বুদ্ধিদীপ্ত চাহনি এবং ইংরেজদের মতই ইংরেজী উচ্চারণ শীগগিরই তাঁর একটি খ্যাতি রচনা করল। তখনকার দিনে সে ধরনের ইংরেজীনবিশ লোক এত ছিল না, সুতরাং খ্যাতি না রটাই বিচিত্র। সে খ্যাতি একদা নানাসাহেবের কানেও পৌঁছল। তিনি তার পূর্ব থেকেই কোম্পানির অবিচারের বিরুদ্ধে মহারানীর কাছে নালিশ করবার কথা ভাবছিলেন। আজিমুল্লা থাঁকেই তাঁর এ বিষয়ে উপযুক্ত লোক বলে বোধ হবে, তাতে আর আশ্চর্য কি।

নানার উকিল আজিমুল্লা গেলেন নবাবের মতই। বিলেতের লোক অত বোঝে না—ধনী ভারতীয় হিন্দু মাত্রেই তাদের কাছে রাজা, ধনী মুসলমান মাত্রেই নবাব। আজিমুল্লারও নবাব বলে খ্যাতি রটতে বিলম্ব হল না। আজিমুল্লা মুঠো মুঠো করে নানা সাহেবের সোনা ওখানে ছড়াতে লাগলেন। ফলে লণ্ডন শহরের বহু ধনী ও অভিজাত পরিবারের দ্বারই তাঁর সামনে উন্মুক্ত হয়ে গেল। ইতিমধ্যে বিলেতী অভিজাত সমাজে মেশবার সবরকম যোগ্যতাই তিনি আয়ত্ত করে নিয়েছিলেন। শৃগাল-শিকার ও বিলাতী নাচে তাঁর বেশ খ্যাতি রটে গেল। নেচে ও নাচিয়ে আজিমুল্লা শীগগিরই রীতিমত বিখ্যাত ব্যক্তি হয়ে উঠলেন। কিন্তু এধারে হৃদ্যতা যতই থাক, ইংরেজ কার্যকালে বিগলিত হয় না কখনও। আজিমুল্লাকেও শুধু-হাতেই ফিরতে হল। মক্কেলের সত্তর লক্ষ টাকা খরচ করে রিক্ত-হাতে ফেরাটা উকিলের পক্ষে মোটেই গৌরবের নয়। এক্ষেত্রে মক্কেলের বিষদৃষ্টিতেই পড়বার কথা, কিন্তু [illegible]

আজিমুল্লার পক্ষে দোষটা অপরের ঘাড়ে চাপিয়ে-দেওয়া এমন কিছু কঠিন হল না। আজিমুল্লা অনায়াসেই নানাসাহেবকে 'বুঝিয়ে' দিতে পারলেন।

তবে ইংলাণ্ড থেকে একেবারেই শুধু-হাতে ফেরেন নি তিনি। ইংলাণ্ড যাত্রার সময় তাঁর সেক্রেটারী হিসেবে তিনি পেয়েছিলেন মহম্মদ আলি খাঁকে। এই ছেলেটি উচ্চশিক্ষিত। বেরিলী কলেজের ছাত্র—রুড়কি কলেজের পাস-করা ইঞ্জিনিয়ার। কিছুদিন কোম্পানির কাছে ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে চাকরিও করেছিল। কিন্তু সে অল্পকালের জন্যই। সে চাকরি ছেড়ে ভাল ইংরেজি-নবিশ হিসেবে জঙ্‌বাহাদুরের সেক্রেটারীর চাকরি শুরু করে। তাঁর সঙ্গে সে বিলেতেও গিয়েছিল। ছেলেটি শুধু মেধাবী বা বিদ্বান নয়—সে যেন মনুষ্যরূপী বহ্নি। এত ইংরেজ-বিদ্বেষ আজিমুল্লা আর কারও দেখেন নি—বোধ করি নানাসাহেবেরও না। তার কারণ জিজ্ঞাসা করলে সে বলত, চাকরির ক্ষেত্রে তার প্রতি অবিচারই এই বিদ্বেষের হেতু। তার চেয়ে অনেক কম-শিক্ষিত সাহেব বা আধা-সাহেব তার চেয়ে অনেক বেশী মাইনে পেত এবং কর্তৃত্ব করত। সেই অপমানেই সে চাকরি ছাড়ে এবং আজও সে অপমান ভুলতে পারে নি। কিন্তু আজিমুল্লা তা বিশ্বাস করেন নি। আরও গূঢ় কারণ সন্দেহ করেছেন। যদিচ সে সন্দেহের সঠিক কোন কারণ খুঁজে পান নি।

তবে সে যাই হোক, এই ছেলেটি দীর্ঘকালের সাহচর্যে তার সেই সুতীব্র ইংরেজ-বিদ্বেষ আজিমুল্লার মনেও সংক্রামিত করেছিল। শুধু তাই নয়, ঐ ছেলেটি ইংরেজের শক্তির প্রতি তাঁর অখণ্ড শ্রদ্ধাকেও বিচলিত করে। সে-ই প্রথম শোনায় যে ইংরেজ অপরাজেয় নয়। নেপোলিয়নের কাছে সে স্থলযুদ্ধে প্রচুর মার খেয়েছিল এবং ভারতেও তার যে সুদীর্ঘ বিজয়ের ইতিহাস, তা রচনা করেছে দেশী সিপাইরাই—নইলে শুধু ইংরেজ সৈন্য কিছুই করতে পারত না। ইংলাণ্ড দেশ এতটুকু—ইংরেজও মুষ্টিমেয়। সাত সমুদ্র পার হয়ে এসে তাকে লড়াই করতে হয়েছে। তেলেঙ্গী সিপাইরা না থাকলে ক্লাইভ কি করতে পারতেন? ফরাসীরাই আজ ভারতের অধীশ্বর হয়ে বসত...ইত্যাদি।

এক কথায় মহম্মদ আলি খাঁ তাঁর শোণিতে নতুন নেশা ধরিয়ে দিয়েছিল। তারই প্ররোচনায় তিনি ফেরবার পথে কুস্তুন্তুনিয়া* থেকে যাত্রা পালটে ক্রিমিয়া যান, সেখানে ইংরেজ সৈন্যদের দুরবস্থা ও তাদের হতদারিদ্র্য স্বচক্ষে

* কনস্টান্টিনোপল্‌

দেখেন। ১৮ই জুন ইংরেজদের শোচনীয় পরাজয়ের দিনে তিনি সে পরাজয় নিজের চোখেই প্রত্যক্ষ করেন। তাতে মহম্মদ আলি খাঁর কথার যথার্থ্যই প্রমাণিত হয়। ইংরেজ অপরাজেয় নয়—ইংরেজদের শক্তি বা সম্পদও অফুরন্ত নয়।

তবু ফিরে এসে আজিমুল্লার একার পক্ষে হয়তো কিছুই করা সম্ভব হত না। নানাকে তাতানোই মুশকিল। বাকি যেসব শক্তিমান রাজা আছেন, তাঁদের সঙ্গে আজিমমুল্লার পরিচয় নেই। ভাগ্যান্বেষী একজন তরুণ মুসলমানের কথা তাঁরা বিশ্বাস করবেনই বা কেন? তা ছাড়া, সতর্ক ইংরেজ সরকারের দৃষ্টি রেসিডেণ্টরূপে প্রত্যেকেরই বলতে গেলে ঘরের মধ্যে জেঁকে বসে আছে। এ ক্ষেত্রে সহায়সম্বলহীন আজিমুল্লা কীই বা করতে পারতেন?

কিন্তু খোদার ইচ্ছা বুঝি অন্যরূপ।

নইলে ঠিক সেই বিশেষ মুহূর্তে হুসেনী বেগম তাঁর পাশে এসে দাঁড়াবে কেন?

একটা প্রবল বিদ্বেষের স্রোত আর একটা প্রচণ্ডতর স্রোতের সঙ্গে মিলবে কেন? একটা সর্বনাশা বহ্নি আর একটা প্রলয়ঙ্কর বহ্নির সঙ্গে এসে মিশবে কেন?

নানা ধুন্ধুপন্থ একদিন প্রীতির আকস্মিক অতিশয্যে আজিমুল্লাকে সঙ্গে করেই গিয়েছিলেন হুসেনী বেগমের মহলে—সে কোন্ এক অশুভ লগ্নে। সে-ই প্রথম চারটি চোখ মিলেছিল।

অন্তত আজিমুল্লার পক্ষে তো অশুভ লগ্ন বটেই।

সে-ই থেকে আজ পর্যন্ত আজিমুল্লা মনে শান্তি পান নি। ঐ রমণীরত্নকে তাঁর বক্ষোলগ্ন না করতে পারলে বুঝি শান্তি পাবেনও না।

সম্ভোগ? বহু স্ত্রীলোককেই তিনি এ বয়সে সম্ভোগ করেছেন—দেশী-বিলেতী বহু। কিন্তু আর কোন স্ত্রীলোকের সঙ্গেই বুঝি এই স্ত্রীলোকটির তুলনা হয় না।

রূপ?

না, শুধু রূপ নয়। আরও কি আছে হুসেনী বেগমের। কী এক আগুন—যা দেখলে মন-পতঙ্গ ঝাঁপিয়ে পড়ে নিঃশেষে নিজেকে দগ্ধ করতে না পারা পর্যন্ত শান্তি পায় না।

আজিমুল্লা সেদিন ফিরেছিলেন মূর্ছাহতের ন্যায়।

কিছু ব্যথিতও হয়েছিলন বৈকি। নিজে খানদানী ঘরের লোক না হলেও আজিমুল্লা দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় হুসেনীর চালচলন আচার-ব্যবহার চিনতে কিছুমাত্র ভুল করেন নি।

সামান্যা রূপোপজীবিনী কখনই নয় হুসেনী বেগম। কোন খানদানী ঘরেরই কন্যা। সে কিনা ঐ স্থূলোদর কাফেরটার কাছে আত্মবিক্রয় করছে!

আজিমুল্লা সুযোগের জন্য ব্যস্ত হলেন। তাঁর মত লোক কোন একটা সুযোগ খুঁজলে তা মিলতেও বিলম্ব হয না। বিশেষত প্রয়োজনবোধে মুক্তহস্তে টাকা ছড়াতে তিনি জানেন।

হুসেনী বেগমেরই এক দাসী এসে একদিন আজিমুল্লার বক্তব্য নিবেদন করল—আজিমুল্লা নির্জনে দর্শন-প্রার্থী।

সেদিন বিচিত্র এক হাসি ফুটে উঠেছিল আমিনার মুখে—রহস্যময, কুটিল এবং ভযঙ্কর সে হাসি।

অবশ্য অনুমতি আর নির্দেশ দুই-ই মিলেছিল। ফলে আজিমুল্লা নিশীথ রাত্রে একা হুসেনীব মহলে যেতে পেরেছিলেন এবং নির্বোধ প্রথম প্রণয়ীর মতই আবেগরুদ্ধ কম্পিত কণ্ঠে হুসেনার প্রণয়-ভিক্ষা করেছিলেন।

হুসেনী তাতে হেসেছিল। পরিষ্কার সহজ কণ্ঠে ঈষৎ বিদ্রূপের সুর মিশিয়ে প্রশ্ন করেছিল, 'কিন্তু মনিবকে ছেড়ে চাকরের ঘব করতে যাব কিসের দুঃখে বলতে পারেন খাঁ সাহেব?'

আজিমুল্লার মুখ রক্তবর্ণ হযে উঠলেও কথাটার ভাল জবাব দিতে পারেন নি সেদিন।

আরও মর্মভেদী আঘাত হেনেছিল হুসেনী, 'আপনি তো নানাসাহেবের টাকাতেই জীবনধারণ করেন, নানাসাহেবের চেযে বেশি কী দেবার আশা করেন? কী এমন লোভ দেখাতে চান আমাকে?'

তখনও প্রথমটা আজিমুল্লাকে নিরুত্তর থাকতে হয়েছিল।

অনেক কষ্টে অনেকক্ষণ পরে উত্তর দিয়েছিলেন, 'আমি আপনাকে ঘর দেব, মর্যাদা দেব—নেকা করব আপনাকে।'

'এ পথে যখন এসেছি খাঁ সাহেব, তখন ওসব ভুয়ো সম্মানের লোভ আমার নেই।...আপনার অনেকগুলি পত্নীর একজন হওয়ার চেয়ে নানাসাহেবের উপপত্নী হাওয়াতেও লাভ বেশি।'

তার পর সহসা নিরুত্তর আজিমুল্লার নিকটে এসে সর্পিণীর মতই হিস্ হিস্ করে বলেছিল, 'আমি তোমাকে চিনি আজিমুল্লা খাঁ। তুমি আমাকে আজ দেখছ—আমি তোমাকে দেখছি বহু দিন। তোমার সব গতিবিধির খবর রাখি। তোমার উচ্চাভিলাষ আছে আমি জানি। আমারও উচ্চাভিলাষ আছে জেনে রাখ। অনেক বড় আশা আমার। হিন্দুস্তানের তক্ত্ চাই আমি। পারবে দিতে? যেদিন সেই আসনে উঠবে, সেইদিন তোমার সেবা করবে তোমার এই বাঁদী—তার আগে নয়।'

সামনে সাপ দেখলে অন্ধকার রাত্রে পথিক যেমন চমকে ওঠে, তেমনিই বুঝি সেদিন চমকে উঠেছিলেন আজিমুল্লা। মনের অতল গহনে সীমাহীন অন্ধকারে যে উচ্চাশা সবেমাত্র অঙ্কুরিত হয়ে সেখানেই চাপা পড়ে আছে, যার অস্তিত্ব তিনি নিজের কাছেও স্বীকার করতে প্রস্তুত নন—তার খবর কেমন করে পেল এই মায়াবিনী।

হুসেনী তেমনিই বলে চলেছে, 'তুমিও যেমন তাতাচ্ছ নানাসাহেবকে—আমিও তেমনি। দুজনেরই লক্ষ্য এক—ইংরেজ-বিতাড়ন। তার জন্য চাই উপলক্ষ। নানাসাহেব সেই উপলক্ষ মাত্র। নানাসাহেবের নামে সিপাইরা বশ হবে। যদি নানাসাহেবকে কোনদিন ভারতের তক্তে বসাতে পার তো তাকে সরাতে কতক্ষণ?…কেমন—এই না তোমার মতলব? নিজেকে ঠকিও না আজিমুল্লা খাঁ—স্বীকার কর।'

আজিমুল্লা নতমস্তকে বসে ছিলেন—জবাব দিতে পারেন নি, অস্বীকার করতেও পারেন নি।

হুসেনী তাঁর একটা হাত ধরে ছিল।

'তুমি একা পারবে না আজিমুল্লা। আমিও একা পারব না। এস আমরা মিলিত হই। তুমি ও আমি। আমরা মিলিত হলে সম্ভব হবে। নানাকে তাতাবার ভার তোমার। অন্য বহু ব্যবস্থা আমি করতে পারব। কিন্তু নানা হিসেবী, নানা বুদ্ধিমান—যে নিতান্তই তার পদলগ্না দাসী, শুধু তার কথায় এত বড় ভরসা করবেন না। তুমি এই ভার নাও। আজ থেকে তুমি আমার অংশীদার হও। কাজ যদি কোন দিন ফতে করতে পার সেদিন তুমি পুরস্কার পাবে—রাজত্ব আর রাজকন্যা, যেমন রূপকথায় লেখা থাকে…দেখ, রাজী?'

সেই কোমল রক্তপদ্মের মত হাত দুটি চেপে ধরে আজিমুল্লা উত্তর দিয়েছিলেন, 'রাজী—খোদা জামিন।'

সেদিন থেকে শুরু হয়েছে তাঁদের এই অদ্ভুত অভিযান, বিচিত্র অংশীদারি। আজিমুল্লাকে বহু সাহায্য করেছেন হুসেনী আড়াল থেকে। বহু পথ খুলে গিয়েছে আজিমুল্লার সামনে। কিন্তু হুসেনী কোথায়?

তাঁরা দেখেন পরস্পরকে ঠিকই, কিন্তু দেখাশোনা হয় না। যোগাযোগ আছে, কাজও করেন পরস্পরের নির্দেশমত, তবে নির্জনে দেখা হওয়ার সুযোগ মেলে না। আজ সেই দুর্লভ সুযোগ মিলেছে। যা ছিল একেবারেই নাগালের বাইরে, আজ বুঝি তাই স্বেচ্ছায় এসে হাতে ধরা দিচ্ছে।

তবে কি—তবে কি হুসেনীর মন এতদিনে তিনি পেয়েছেন?

কথাটা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মনুষ্যচরিত্রে অভিজ্ঞ আজিমুল্লার মুখে হতাশার হাসি ফুটে ওঠে।

সে 'চীজ' হুসেনী নয়।

নিশ্চয়ই কোন ভয়ঙ্কর খবর আছে। কোন জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে কোথাও। তবু—তবু একটু অধীরতার সঙ্গেই অপেক্ষা করেন বৈকি আজিমুল্লা। হোক সে আশা সুদূর—তবু একান্তে কাছে পাওয়ার সৌভাগ্যই কি কম?

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসারও অনেক পরে হুসেনী বেগমের ডুলি এসে থামল। প্রায় নিঃশব্দেই এসেছিল, তবু যেটুকু শব্দ উঠেছিল, অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষমাণ আজিমুল্লার কানে তা এড়ায় নি। তিনি নিজেই তাড়াতাড়ি বার হয়ে এলেন এবং সসম্ভ্রমে ডুলির ওপরের ভেলভেটের ঘেরাটোপটা সরিয়ে ধরলেন।

রাজেন্দ্রাণীর মতই ধীর ও নিরুদ্বিগ্ন ভাবে নেমে এল আমিনা। তার সর্বাঙ্গে ঢাকাই মসলিনের ওপর লক্ষ্ণৌ-এর চিকন-কাজ-করা বোরখা। সে এক হাতে বোরখার কাপড় সামলে আজিমুল্লার পেছনে পেছনে এসে বাড়িতে ঢুকল এবং সিঁড়ি বেয়ে ওপরে তাঁর খাস কামরায় এসে বসল।

বিলেত থেকে ফেরবার সময় আজিমুল্লা অনেক আসবাবপত্র এনেছিলেন—বিলেতী জর্জিয়ান আসবাব, ভাল ভাল চামড়ায় ঢাকা কুর্সি, মেঝেতে পাতার ইস্পাহানী কার্পেট। দরজায় মূল্যবান দামাস্কের পরদা। সেকালের প্রবাসী ধনী ইংরেজের মতই গৃহসজ্জা।

আমিনা একখানা চেয়ারে বসে নিঃসঙ্কোচে মুখের ওপর থেকে বোরখা সরিয়ে দিল। ইতিমধ্যেই, বোধ করি পূর্ব নির্দেশমত, খানসামা বিলেতী

কাটা কাচের দামী পাত্রে শরবৎ এনে রেখে গেল। আলিমদ্দী চলে গেল দরজার পর্দাটা ভাল করে টেনে দিয়ে আজিমুল্লা খাঁ নিজের চেয়ারে এসে বসলেন।

'তার পর, বেগমসাহেবা! বলুন কী করতে পারি আপনার জন্যে?'

'শুধু কি আমারই জন্যে?'

বিশুদ্ধ ইংরেজীতে আমিনা উত্তর দেয়। প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপের আভাস তার কণ্ঠে।

আজিমুল্লাও ইংরেজীতে বলেন, 'হ্যাঁ, শুধু তোমারই জন্যে। যা কিছু সব তোমারই জন্যে বেগমসাহেবা!'

অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে হাসেন।

সে হাসিতে উত্তেজনা ও হতাশা দুই-ই বুঝি ফুটে ওঠে।

কিন্তু আমিনার মুখের হাসি মিলিয়ে যায়। কণ্ঠে তার রীতিমত উদ্বেগ। বলে, 'শোন, মৌলবীসাহেব ধরা পড়েছেন।'

'বল কি! কে বললে?'

'কাল রাত্রে খবর পেয়েছি। ইংরেজরা তাঁকে ধরেছে। লক্ষ্ণৌ-এর কয়েদখানায় পুরেছে তাঁকে। বিচার একটা হবে নিশ্চয়ই, কিন্তু সে কবে তা কেউ জানে না। মৌলবীসাহেব ভেতর থেকেই আমাকে খবর পাঠিয়েছেন। আশ্বাসও দিয়েছেন যে, আমি যেন না ভাবি; ইংরেজের কোন জেলখানা তাঁকে বেশী দিন ধরে রাখতে পারবে না, তিনি বেরিয়ে আসবেনই।'

'বেশ তো, তা হলে অত ভাবছ কেন?'

অন্যমনস্কভাবেই কথা কটা বলেন আজিমুল্লা। আমিনার রূপে বুঝি নেশা আছে। সুরার চেয়েও তেজস্কর।

ঈষৎ অসহিষ্ণুভাবেই আমিনা বলল, 'কথাটা বুঝছ না, নানাসাহেবকে সামলাবে কে?'

'নানাসাহেব!'

'আঃ খাঁ সাহেব! আজ তোমার হল কি? মৌলবীকে আমি এ কাজে লাগিয়ে রেখেছিলুম কেন?...নানাসাহেবকে এখনও তোমরা কেউ পুরো চেন নি। তার উচ্চাশা যতটা, লোভ যতটা, হিসাব-বুদ্ধি তার চেয়ে বিন্দুমাত্র কম নয়। তুমি এবং আমি যতই তাতাই, তিনি কিন্তু এখনও ইতস্তত করছেন—এ ব্যাপারে নামবেন কি না। মনে মনে ইংরেজের শক্তির

পরিমাণ বিচার করছেন। শেষ পর্যন্ত তাঁকে একটা কথায় রাজী করিয়েছি। চৈত্রের খাজনা ঘরে উঠে গেলে তিনি নিজে বেরোবেন দেশের অবস্থা বুঝতে। এটা নানাসাহেব বোঝেন যে, এক দল দু দল সিপাই ইংরেজকে তাড়াতে পারবে না। দেশের সাধারণ লোক কী চায় এবং তারা যথেষ্ট তেতেছে কি না—তিনি তা নিজে জানতে চান। সেই সঙ্গে নানান ব্যারাকের সিপাইদের মনোভাব এবং ইরেজদের জোর তিনি বুঝতে চান। এ আমি জানতুম—পেশোযাকে এটুকু আমি চিনেছি। তিনি নিজে না দেখে এবং না বুঝে এ-কাজে নামবেন না। যা আযত্তের বাইরে, তাব লোভে হাতে যেটুকু আছে সেটুকুও খোয়াতে তিনি রাজী হবেন না।'

'তাব পরও?' আজিমুল্লার দৃষ্টিতে শ্রদ্ধা ও বিস্ময় বুঝি চোখের কূল ছাপিয়ে ওঠে।

'নানা ধুন্ধুপন্থ যে এই প্রস্তাব কববেন তা আমি জানতুম। তাই আগে থেকেই প্রস্তুত হচ্ছিলুম। মৌলবীজী বহুদিন থেকে অযোধ্যাব গ্রামে গ্রামে শহবে শহবে প্রচার কবে বেড়াচ্ছিলেন।··এখন তো তিনি কযেদখানায চলে গেসেন।···তিনি কবে বেরুতে পাববেন তা জানি না। আমাদের কিন্তু অপেক্ষা করার সময় নেই। নানাসাহেব যখন বেরোবেন, তখন তিনি যেন আমাদেব উদ্দেশ্যের প্রতিকূল কিছু না দেখেন, না শোনেন। তিনি যেখানে যাবেন সেখানেই যেন তিনি দেখতে পান যে, দেশের লোক তাঁকেই চাইছে—তাঁব রাজত্ব চাইছে, কোম্পানির ওপব তাদের কোন আস্থা নেই। এই ব্যবস্থাটা এখন তোমাকে করতে হবে। আমি স্ত্রীলোক—একা যতটা করবার তা করেছি। এবার আমার আযত্তেব বাইরে চলে যাচ্ছে। এবাব আসছে পুরুষের কাজ। এবার তুমি ভাব নাও খাঁ সাহেব। আমি টাকা যোগাব, কিছু বুদ্ধিও—ভেতর থেকে যতটা পাবি সাহায্য করব।'

অনেকক্ষণ নীরব থেকে আজিমুল্লা উঠে দাঁড়ালেন। একবার ঘরের ও-প্রান্ত থেকে এ-প্রান্ত পর্যন্ত পাযচারি করে নিলেন, তার পর আমিনার সামনে এসে দাঁড়িযে বললেন, 'বেশ, এ ভার আমি নিলাম হুসেনী বেগম। কাজের কোন ত্রুটি হবে না।'

'আমি নিশ্চিন্ত রইলাম।'

অকস্মাৎ আবেগের প্রাবল্যে আজিমুল্লার কণ্ঠস্বর কেঁপে গেল, 'তোমার সব হুকুমই আমি তামিল করব হুসেনী, তোমার জন্য সব-কিছু করব। তোমার

কোন কাজ কোথাও এতটুকু আটকাবে না। শুধু তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও—আমি, আমি যে আর পারি না।'

উত্তেজনার আতিশয্যে আজিমুল্লা সহসা আমিনার কাঁধ দুটো চেপে ধরলেন। তিনি থর থর করে কাঁপছিলেন।

আমিনা সামান্য একটা ভঙ্গি করে কাঁধ দুটো মুক্ত করে নিয়ে একেবারে উঠে দাঁড়াল।

'পহ্‌লে কাম, পিছে সেলাম—মীর মুনশীজী।'

কণ্ঠে সেই বিদ্রূপের সুর।

সে বিদ্রূপ চাবুকের মত এসে আজিমুল্লাকে আঘাত করল। তিনি প্রাণপণ চেষ্টায় আবেগ সংবরণ করে নিলেন।

আমিনা আবারও বোরখাটা মুখের ওপর টেনে দিয়ে সহজ নিরুদ্বিগ্ন ভাবে মহিমময় ভঙ্গিতে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল। আজিমুল্লা পূর্বের মত সসম্ভ্রমে পিছু পিছু এসে বিদায় নিয়ে গেলেন।

'সেলাম বেগমসাহেবা, আদাব।'

'সেলাম মীর মুনশীজী, আদাব!'

ডুলিতে ওঠবার সময় আমিনা অনুচ্চকণ্ঠে প্রধান বাহককে নির্দেশ দিল, 'তান্ত্যা টোপীজীর বাড়ি।'

॥ ১১ ॥

এখন যাঁরা বিলেত যান তাঁরা ওখানকার আধুনিক রাস্তাঘাট ও যানবাহন দেখে শতবর্ষ আগেকার অবস্থা কিছুতেই কল্পনা করতে পারবেন না। গ্রামাঞ্চলের কথা ছেড়ে দিন—শহরের অবস্থাও ছিল অবর্ণনীয়। খাস লণ্ডন শহরের পাথর-বাঁধানো রাস্তারই এক-এক জায়গায় কাদাতে জুতোর অর্ধেকটা পর্যন্ত বসে যেত। অপর শহরগুলির কথা তো না তোলাই ভাল।

আজ আমরা এমনিই একটা শহর—ডোভারের কথা বলতে বসেছি। ডোভারের অবস্থা অনেক বেশী খারাপ। কারণ এই শহরটি হল, বিলাতে গেলে, ইউরোপে যাওয়ার সদর দরজা। ইংলিশ চ্যানেলের ওপারে ক্যালে—এপারে ডোভার। ক্যালে হয়ে সারা ইউরোপের ডাক যায় এখান থেকে। যা

ছাড়াও অপর কতকগুলি ডাক সোজা ডোভার থেকে অন্যান্য বন্দরে যায়। শুধু ডাকই নয়, নানা প্রয়োজনের মানুষও আসে এখানে—ইউরোপের পথে। মাল পাঠাবার কাজে যদিও লিভারপুল, পোর্টস্‌মাউথ প্রভৃতি বন্দরগুলি বেশী প্রাধান্য লাভ করেছে এবং সরকারও সেই কারণে বাধ্য হয়ে সেখানকার পথঘাট-নির্মাণে বেশী মনোযোগ দিয়েছেন—তবু ডোভারের ভিড় এবং ঝামেলা কিছুমাত্র কমে নি।

তখনও ডাকগাড়ি বলতে ঘোড়ায়-টানা গাড়িই বোঝাত। রেলগাড়ির শুরু হলেও ঘোড়ায়-টানা 'স্টেজ কোচ' বিলুপ্ত হয় নি। বরং বেশির ভাগ লোকই ঐ গাড়িতে চলাচল করতেন। এই গাড়িগুলির একদিকের প্রধান আড্ডা ছিল ডোভার। অর্ধেক-কাঁচা পথঘাট গাড়ির চাকায় ভেঙে ও বৃষ্টির জলে গলে ভীমগাড্ডায় পরিণত হত। এক-এক জায়গায় গাড়ির চাকা এমনই বসে যেত যে, সেখান থেকে টেনে তুলতে ঘোড়া বা সহিস-কোচম্যান কুলোত না-যাত্রীদেরও মধ্যে মধ্যে এসে চাকা ঠেলতে হত।

পথের তো ঐ অবস্থা। শহরের বাসিন্দাদের অবস্থাও তথৈবচ। রাহীদের জন্য অসংখ্য সরাইখানা চারদিকে। নানারকমের লোক সেখানে এসে জড়ো হয়। মদের হুল্লোড় চলে প্রায় দিনরাত। সরাইখানাগুলিতে মদ, ঝল্‌সানো মাংস এবং আস্তাবলের গন্ধ মিলে, ভেতর তো বটেই, বহুদূর পর্যন্ত বাতাস ভারী হয়ে থাকে হৈ-হল্লা, চিৎকার এবং গালিগালাজ—এসব এখানকার লোকের সয়ে গেছে। হঠাৎ নতুন কোন লোক এলে সে কিছু বিস্মিত হয়।

আমরা যে সময়ের কথা বলছি, ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকে—ডোভারের হৈ-হুল্লোড় যেন কিছু বেড়েছে। তার কারণ ক্রিমিয়া-প্রত্যাগত হাইল্যাণ্ডার সৈন্যদের ডোভারেই জড়ো করা হয়েছে। কঠিন বন্ধুর দুর্গম হাইল্যাণ্ড বা স্কটল্যাণ্ডের পার্বত্য-অঞ্চলের এই অধিবাসীগুলি এম্‌নিতেই যথেষ্ট বুনো—বর্বর বলা চলে অনায়াসে। ওরা তখনও বিশ্বাস ও আচার-আচরণে মধ্যযুগীয় কুসংস্কারকে বহন করে চলেছে। ওদের বংশগত বিবাদের শেষ হয় না কখনও পুরুষানুক্রমে গড়িয়ে চলে। সৈন্য হিসেবে ওদের খ্যাতি খুব, কারণ প্রাণের মায়া রাখে না ওরা—প্রাণ নিতেও যেমন কুণ্ঠা নেই, তেমনি দিতেও দ্বিধা করে না।

সে বছর শীতে যে হাইল্যাণ্ডারগুলি ডোভারে এসে পৌঁছেছিল, তাদের হৈ-হুল্লোড় চরমে পৌঁছবার কারণও ছিল। ক্রিমিয়াতে তাদের কঠোর

পরীক্ষা হয়ে গেছে—ব্রিটিশ প্রেস্টিজেরই অগ্নিপরীক্ষা বলা যায়। যুদ্ধের জয়-পরাজয় জাতির জীবন-মরণের প্রশ্ন হয়েছিল। সেখানে যে লড়াইএর সম্মুখীন হতে হয়েছিল, তা কোনক্রমেই শৌখিন লড়াই নয়। এবং বলতে গেলে এই হাইল্যাণ্ডারগুলির জন্যই সেখানে কোনমতে সম্মান রক্ষা হয়েছে। সেই লড়াই থেকে ফিরে যদি তারা কিছু বেশী মাত্রাতে উদ্দাম হয়ে ওঠে তো দোষ দেওয়া যায় না। একে তো এমনিতেই তখনকার দিনে যারা লড়াই করতে যেত তাদের অধিকাংশেরই অক্ষর-পরিচয় মাত্র সম্বল—তার ওপর হাইল্যাণ্ডারদের সরস্বতীর সঙ্গে প্রায় সম্পর্কই থাকত না। অশিক্ষিত বর্বর উদ্দাম এই পার্বত্য সৈন্যগুলি, সদ্য-মৃত্যুর দরজা থেকে ফিরে এসে, যে ধরনের আচরণ এক্ষেত্রে আশা করা যায়, সেই ধরনের আচরণই করছিল। মদ্য এবং স্ত্রীলোকে তারা আকণ্ঠ ডুবে ছিল এবং বলা বাহুল্য তার সঙ্গে আনুষঙ্গিক হিসেবে যা যা থাকা স্বাভাবিক তা সবই ছিল। এক কথায় ডোভারের নাগরিকদের অবস্থা সেদিন, আর যাই হোক, ঈর্ষার বস্তু ছিল না।

এরই মধ্যে একদিন হঠাৎ খবর এল হাইল্যাণ্ডস্ রেজিমেণ্টগুলির পুনর্গঠন হবে। চীনে গোলমাল বেধেছে, তাদের সায়েস্তা করার জন্য লোক পাঠানো দরকার। এবং 'যেমন বুনো ওল তেমনি বাঘা তেঁতুল' হিসেবে এই হাইল্যাণ্ডারদেরই পাঠানো হবে। নচেৎ সে 'হল্‌দে শয়তানগুলো'র সঙ্গে পেরে ওঠা যাবে না।

স্থির হল তিরানব্বই সংখ্যক সাদারল্যাণ্ড হাইল্যাণ্ডার রেজিমেণ্ট বা সৈন্যবাহিনীটিকেই আপাতত চীনে পাঠানো হবে। তবে তাতে যথেষ্ট লোক নেই—যারা আছে তাদেরও অনেকের বয়স বেশী হয়ে গেছে—অথবা চাকরির মেয়াদ ফুরিয়ে গেছে। তা ছাড়া ক্রিমিয়ায় অনেকেই এমন আহত হয়ে পড়েছে যে, তাদের নিয়ে অন্তত আর দূর দেশে যুদ্ধযাত্রা করা সম্ভব নয়। সুতরাং উপর থেকে হুকুম এল—অশক্ত ও বয়স্কদের ছেঁটে বাদ দিয়ে নতুন তরুণদের দ্বারা সংখ্যা পুরোতে হবে, তবে হাইল্যাণ্ডারদের দ্বারাই তা পূরণ করা হবে। সেই কথামত ৪২ নং, ৭২ নং এবং ৯০ নং হাইল্যাণ্ডবাহিনী থেকে কিছু কিছু লোক চেয়ে পাঠানো হল। তবে একথাও জানিয়ে দেওয়া হল যে, যারা স্বেচ্ছায় আসতে চাইবে কেবল তারাই আসবে—অবশ্য যতক্ষণ না এই রেজিমেণ্টের এগারো শ সংখ্যা পূর্ণ হচ্ছে।

এসব কাজ দু-এক দিনে হয় না, তা বলা বাহুল্য। ফলে আরও বেশ

কিছুদিন ঐ পাহাড়ে-গোরা-সিপাইরা ডোভারে ভিড় জমাল। ডোভারের উঁচুনীচু সড়কের দু পাশে, অথবা জলের ধারের সরাইখানাগুলিতে তেমনি ভিড় জমতে লাগল। পথে-ঘাটে হৈ-হল্লা ও গুণ্ডামিও কিছুমাত্র কমল না।

এরই মধ্যে একদিন অপরাহ্নে সাতটি স্কচ সিপাই ৯৩ নম্বরের অফিসঘরের সামনে এসে জড়ো হল। এরা সকলেই ৭২ নম্বরের রেজিমেন্টের লোক, চীন-অভিযানে যোগ দিতে এসেছে। ৭২ নং রেজিমেন্টের ঘাঁটি একটু দূরে—চ্যাথামের রাস্তায়। কিন্তু এরা হেঁটে আসে নি—কোথা থেকে একটা গাড়ি যোগাড় করেই এসেছে। ফলে এদের চেহারা দাঁড়িয়েছে অদ্ভুত। কারণ নিতান্ত প্রাকৃতিক খেয়ালেই কদিন জলবৃষ্টি হয় নি—পথে কাদা নেই, তার বদলে আছে প্রচুর ধুলো। এবং সে ধুলো কতকটা সাদাটে। কারণ ডোভার শহরটি বলতে গেলে খড়ি-পাথরের পাহাড়ের গায়ে। সেই পাথরই চক্রে পিষ্ট হয়ে নিয়ত চূর্ণ-বিচূর্ণ হচ্ছে। অশ্বক্ষুর-এবং চক্রোৎক্ষিপ্ত সেই সূক্ষ্ম শ্বেতাভ ধূলি-কণা এদের কেশে, ভ্রূ-যুগলে, গুম্ফে এবং পোশাকে বেশ পুরু হয়েই জমেছে।

অফিসের বাইরে পৌঁছে এরা শুনল সেনাপতি আড্রিয়ান হোপ এবং ক্যাপ্টেন ডসন দুজনেই অফিসে আছেন—এখনই দেখা করা সুবিধা। আগন্তুকদের ভেতর ছ জনেই ভিড় করে অফিসে ঢুকে গেল—শুধু এক জন বাইরের বারান্দায় অপেক্ষা করতে লাগল।

যে ছ জন ভেতরে ঢুকল তাদের মধ্যে বেশির ভাগই ক্যাপ্টেন ডসনের পরিচিত। বিশেষত একজনকে খুবই অন্তরঙ্গ মনে হল। তাকে দেখে ডসনের মুখ মধুর হাস্যে প্রসন্ন হয়ে উঠল। তিনি বলে উঠলেন, 'কি খবর জন ম্যাকলিয়ড? লড়াইএর আশ মেটে নি?'

ম্যাকলিয়ড হাসি-হাসি মুখে জবাব দিল, 'কে আর মিটল। তাই তো আপনার খাতায় নাম লেখাতে এসেছি।'

'বেশ বেশ, ভালই তো! তোমরা থাকলে হলদে ব্যাটাদের জব্দ করতে আর বেশীক্ষণ লাগবে না। লর্ড এলগিনের কাজটা সহজ হয়ে যাবে।...আর এ'কেও তো চেনা চেনা মনে হচ্ছে—ডোনেলি না?'

ডোনেলি একটু এগিয়ে এসে বলল, 'হ্যাঁ, সার।'

'তুমিও চীনে যেতে চাও নাকি?'

'হ্যাঁ, সাব।'

'আব, তুমি? তোমাব নাম মারে, না?'

মারেব মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সে বলল, 'আপনাব মনে আছে দেখছি।'

'ওহে তোমাদেব কি ভোলা যায়। তোমাদের পাশে দাঁড়িয়ে লড়াই করতে পাবা তো সৌভাগ্য।'

সেনাপতি অনাবেবল আদ্রিয়ান হোপ এই সময় তাঁব কামবা থেকে হাতে দস্তানা পরতে পবতে বেব হয়ে এলেন। ডসন সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়ালেন সকলেই তাঁকে যথাবীতি সামবিক কাযদায সেলাম দিল।

আদ্রিয়ান হোপ বললেন, 'কি, এবা সব চীনে যেতে চায নাকি?'

'হ্যাঁ, সাব।'

'ভাল। নাম ঠিকানা সব ঠিক করে লিখে নাও। ২০শে মে আমবা রওনা হব কিন্তু—তৈরী তো?'

'আপনাব হুকুম তামিল কবতে আমরা সর্বদাই তৈবী কর্নেল।'

হোপ হাসলেন। তার পব সহসা বাইবেব দিকে চেয়ে পর্দাব মধ্যে দিয়েই অপেক্ষামান সপ্তম ব্যক্তিব অস্তিত্বটা অনুভব করে বলে উঠলেন, বাইরে কে দাঁড়িয়ে? তোমাদের সঙ্গে কেউ এসেছে নাকি?'

'হ্যাঁ কর্নেল, ও হল কোযেকাব ওযালেস।'

'কোয়েকার ওযালেস। সে আবাব কে?'

ম্যাকলিয়ড সামনে এসে আব এক দফা অভিবাদন করে বলল, 'যদি অনুমতি দেন তো বলি, ও একটি অদ্ভুত চীজ। ওব নাম ওয়ালেস নয, সেটা বেশ বুঝতে পারি, কিন্তু কী যে নাম তাও জানি না। ঐ নামেই ও পরিচয় দেয়। এমনি সিপাইএব চাকবি কবে, কিন্তু লেখাপড়া ভালই জানে। এমন কি, ল্যাটিন ফবাসী পর্যন্ত ভাল জানে।'

বাধা দিযে হোপ বলে উঠলেন, 'বল কি। ল্যাটিন ফবাসী জানে—আর সে কবে সিপাইএর চাকরি।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। কি করা যাবে বলুন, ওকে অনেকবার কর্তারা প্রমোশন দিতে চেয়েছিলেন—ও-ই নেয় না। বলে যে ও নাকি বিশেষ এক উদ্দেশ্যেই সেনাদলে নাম লিখিয়েছে, উন্নতিতে ওর দরকার নেই। তা থাকলে ও অন্য কাজে যেত।'

'তার পর ?'

'তার পর আর কি। ঐ ভাবেই থাকে। ওর যে কোন কুলে কেউ আছে তাও তো মনে হয় না। না ও কাউকে চিঠি লেখে—না কেউ ওকে চিঠি দেয়। কারুর সঙ্গে মেশে না, মদ খায় না, মুখ খারাপ করে না। রবিবারে-রবিবারে নিয়মিত উপাসনায় মন দেয়—যখন-তখন ভগবানের নাম করে। হাসি-ঠাট্টা তো কখনও শুনি নি ওর মুখে। সেই জন্যেই আমরা ওকে কোয়েকার* ওয়ালেস নাম দিয়েছি!'

'আশ্চর্য, অদ্ভুত লোক তো। আচ্ছা ও-ও কি ৯৩-তে নাম লেখাতে এসেছে?'

'তাই তো বলেছিল।'

'তবে বাইরে দাঁড়িয়ে কেন? একজন কেউ ওকে ডাক না।'

হেণ্ডারসন নামে একজন গিয়ে ওয়ালেসকে ডেকে আনল। ধীর গম্ভীরভাবে সে ভেতরে এসে অভিবাদন করে দাঁড়াল। তার সেলাম করা ও দাঁড়ানোর ভঙ্গি নিখুঁত।

ডসনই প্রথমে প্রশ্ন করলেন, 'তুমিও কি তিরানব্বুইতে নাম লেখাতে চাও?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।' শান্তকণ্ঠে উত্তর দেয় ওয়ালেস।

'তা হলে বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলে কেন?'

'নাম লেখাবার আগে আমার একটা প্রশ্ন জানবার ছিল। খবরটা পেলে তবে নাম লেখাতুম। সেই জন্যেই আগে এসে বিরক্ত করি নি। এঁদের কাজ চুকে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করছিলুম।'

'এদের কাজ চুকে গেছে। এবার বল কী জানতে চাও।'

'আচ্ছা, হোপ বলে কি কেউ এই রেজিমেণ্টে নাম লিখিয়েছে?'

'হোপ?' কর্নেল হোপ চমকে ওঠেন।

'মাপ করবেন কর্নেল হোপ, আপনাকে কে না চেনে। আমি একজন সাধারণ সৈনিকের কথা জিজ্ঞাসা করছি। সেও বাহাত্তর নম্বর দলে ছিল।'

'আচ্ছা দেখছি।'

ডসন কতকগুলো খাতাপত্র দেখে বললেন, 'হ্যাঁ এই তো, কালই সে এখানে এসেছিল।'

* অত্যন্ত গোঁড়া ধার্মিক এবং নীতিবাগীশ একটি খ্রীষ্টান সম্প্রদায়

'তা হলে আমারও নামটা লিখে নিন। দয়া করে যদি হোপ যে কোম্পানিতে থাকবে আমাকেও সেই কোম্পানিতে রাখেন তো বড় বাধিত হব।'

ডসন একটু বিস্মিত হয়ে তাকালেন। বললেন, 'আমার কাছেই আছে দেখছি। আচ্ছা তোমার নামও আমি এইখানে লিখে রাখলাম। বল—পুরো নাম ধাম বিবরণ।'

লেখার হাঙ্গামা চুকে গেলে ডসন প্রশ্ন করলেন, 'হোপ তোমার বিশেষ বন্ধু বুঝি?'

কয়েক মুহূর্ত মৌন হয়ে রইল ওয়ালেস। বোধ হল যেন তার চোখ দুটো বারেক হিংস্র শ্বাপদের মত জ্বলে উঠল। কিন্তু পরক্ষণেই সে মাথা নামিয়ে শান্তকণ্ঠে উত্তর দিল, 'না, ঠিক তা নয়।'

তার পর আর বাদানুবাদের অবসর না দিয়ে পুনশ্চ অভিবাদন করে বেরিয়ে এল।

কর্নেল হোপ দ্বারপ্রান্তেই অপেক্ষা করছিলেন। তিনি প্রায় তার পিছু পিছুই বের হয়ে এলেন। পিছন থেকে ডাকলেন, 'ওয়ালেস, শোন।'

ওয়ালেস ঘুরে দাঁড়াল।

'তুমি নাকি খুব ভাল ল্যাটিন ও ফরাসী জান?'

'আজ্ঞে সে কিছু নয়—সামান্যই।'

'হিব্রু জান নাকি?'

'সে আরও কম—কাজ চলার মত।'

'আশ্চর্য, এত লেখাপড়া করে, শেষ পর্যন্ত···আচ্ছা, এই সিপাইএর কাজ ভাল লাগে তোমার?'

'ভাল লাগবে বলেই তো এসেছি কর্নেল—জীবনে আর কিছুই ভাল লাগার নেই আমার।'

বোধ করি সেনাপতির প্রতি সম্মানবশতই আরও কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করে ওয়ালেস তাঁকে পুনশ্চ অভিবাদন জানিয়ে চলে গেল।...

আদ্রিয়ান হোপ যদি সে সময় তার পশ্চাদনুসরণ করতেন তো দেখতে পেতেন, ওয়ালেস সেখান থেকে বেরিয়ে তার সঙ্গীদের মত 'তিন ভল্লুক চিহ্নিত' পানালয়ে ঢুকে মদ্যপান করতে বসে নি। সে সেখান থেকে বের হয়ে কিছু

দূরে সমুদ্রের ধারেই গিয়ে দাঁড়িয়েছে। সেখানে আর কেউ নেই। খড়ি-পাথরের পাহাড়ের যে অংশটা খাঁড়া সমুদ্রের ওপর ঝুলে আছে, সেই বড় পাথরের চাঁইটার ওপরই গিয়ে দাঁড়িয়েছে ওয়ালেস। তার পায়ের নীচে—অনেক নীচে বড় বড় নৌকোগুলো থেকে মদমত্ত কোলাহলের রেশ ভেসে আসছে—কিন্তু তার কান বা দৃষ্টি সেদিকে নেই। সে চেয়ে আছে দূর সমুদ্রের ঢেউগুলোর দিকে। সেখানে একটা জাহাজের মত বড় নৌকা শুভ্র পাল তুলে দূর চক্রবালে মিলিয়ে যাচ্ছে। ওয়ালেসের চোখের দৃষ্টি স্থির, বোধ করি বা পলকও পড়ছে না। তার দীর্ঘ ঋজু দেহটাও তেমনি অনড়—শুধু বাতাসে তার মাথার চুল ও গায়ের কামিজটা সামান্য উড়েছে মাত্র। পশ্চিমের অস্তরাগ তার মুখের শুভ্র ধূলিকণায় পড়ে অপূর্ব এক বর্ণ-বিপর্যয় ঘটিয়েছে।

অনেকক্ষণ সেইভাবে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবার পর কামিজের মধ্যে হাত ঢুকোল সে। গলায় ঝুলোনো সূক্ষ্ম চেন-এ বাঁধা একটি ক্রস আর তার সঙ্গে সুকৌশলে লাগানো একটি লকেট। ওয়ালেস লকেটটি বের করে খুলতেই দেখা গেল তার ভেতর এক রমণীর চিত্র সযত্নে অঙ্কিত রয়েছে। কঠোর-হৃদয় সংযত-চরিত্র ওয়ালেসের এই গোপন রহস্যটুকুর সন্ধান পেলে, শুধু হোপ কেন, অনেকেই বিস্মিত হতেন। এ হেন সম্পূর্ণ অপরিচিত এক ওয়ালেস। তার চালচলন ভাবভঙ্গির সঙ্গে কোনমতেই স্ত্রীলোকের যোগাযোগ ভাবা যায় না। বিশেষত যে পুরুষ নারীর প্রতিকৃতি বুকে ঝুলিয়ে রাখে, সে ধরনের পুরুষ ওয়ালেসের ঘৃণার পাত্র—এই কথাই সকলে এতকাল ভেবে এসেছে। আরও বিস্মিত হতেন তাঁরা, যদি তার কাঁধের পেছন থেকে উঁকি মেরে ছবিখানা দেখবার সুযোগ তাঁদের মিলত। কারণ ছবিটি কোন শ্বেতাঙ্গিনী নারীর নয়—অ-ইউরোপীয় কোন মহিলার।

ওয়ালেস অনেকক্ষণ একদৃষ্টে ছবিটির দিকে তাকিয়ে থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার লকেটটি বন্ধ করে জামার মধ্যে পুরে ফেলল। তাকে এখনই ব্যারাকে ফিরতে হবে। দিবাস্বপ্নের সময় কোথা?

॥ ১২ ॥

তাত্যা টোপীর বাড়ি থেকে অনেকরাত্রে আমিনা যখন নিজের মহলে ফিরে এল, তখন তার কতকটা উদ্‌ভ্রান্তের মত অবস্থা। সন্ধ্যাবেলাকার সেই নিরুদ্বিগ্ন শান্ত ভাব নেই। চোখের কোলে যেন কে কালি লেপে দিয়েছে। বিলেতী প্রসাধনের প্রলেপ ভেদ করেও ললাটে ফুটে উঠেছে সারি সারি দুশ্চিন্তার রেখা। তাকে যৎপরোনাস্তি ক্লান্তও দেখাচ্ছিল। কিন্তু নিজের ঘরে ফিরেও একান্তে বিশ্রামের অবসর পেল না। মহলের প্রবেশ-পথেই সংবাদ পাওয়া গেল—আজিজন বিবি তার সঙ্গে দেখা করবার জন্য ঘরের মধ্যেই অপেক্ষা করছেন।

ঈষৎ উদ্বিগ্ন মুখে আমিনা শুধু প্রশ্ন করল, 'পেশোয়াজী ?'

মুসম্মৎ হেসে বলল, 'ভয় নেই, তিনি আদালার ঘরে গেছেন।'

যে সংবাদে অপর কোন স্ত্রীলোকের ঈর্ষিত হবার কথা, সে সংবাদে যে তার মালেকান খুশী হন—এ তথ্যটি মুসম্মৎ ইতিমধ্যেই সংগ্রহ করেছিল।

কতকটা নিশ্চিন্ত হয়ে আমিনা নিজের ঘরে এসে ঢুকল। বোরখাটা খুলে মুসম্মতের হাতে দিয়ে একটা বড় গালিচায় একেবারে শুয়ে পড়ে সে আদেশ করল, 'জুতোটা খুলে নে, আর বনফসার শরবৎ তৈরী করে দিতে বল্—জলদি !'

আজিজন আমিনার মুখের দিকে চেয়ে উদ্বিগ্ন হলেও সে উদ্বেগ প্রকাশ করল না। সে বুঝেছিল যে অপরিসীম ক্লান্তি ও দুশ্চিন্তার কোন কারণ ঘটেছে, নইলে আমিনা এত বিচলিত হত না। সুতরাং সর্বাগ্রে তাকে বিশ্রামের অবকাশ দেওয়া প্রয়োজন।

খানিক পরে বলকারক বনফসার শরবৎ পান করে আমিনা কতকটা সুস্থ হয়ে উঠল। একটা তাকিয়ায় ভর দিয়ে খানিকটা কাৎ হয়ে বসে বলল, 'কি খবর আজিজন ?'

'টীকা সিং আর শামসুদ্দিন খাঁ কুঁয়ার সিং-এর কাছে গিয়েছিল।'

'তার পর ?'

'কুঁয়ার সিং আমাদের দিকে যোগ দিতে রাজী হয়েছেন—কিন্তু একটি শর্তে।'

'কী শর্ত ?'

'বাহাদুর শা বা নানাসাহেব—যে খুশি দোয়াবের মালিক হ'ন তাঁর তাতে আপত্তি নেই। কিন্তু দোয়াবের পূর্ব দিকে পাটনা পর্যন্ত তাঁর চাই। এবং তিনি সেখানে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করবেন।'

আমিনা হাসল—ক্লান্ত ম্লান হাসি।

বলল, 'আশ্চর্য! এখনও এরা এই সব শর্তে বিশ্বাস করে! মুখে শর্ত করতে কি নানা কোনদিন পেছপা হবে? তার পর সে শর্ত মানবে কি না—সে তো ঠিক হবে গায়ের জোর বুঝে। কুঁয়ার সিং-এর যদি সে জোর থাকে তো তিনি পাবেন বৈকি।'

তার পর একটু চুপ করে থেকে বলল, 'আজিজন, তুই তো কুঁয়ার সিংকে দেখেছিলি—কেমন লোক?'

আজিজন বলল, 'খাঁটি ইস্পাত। সে লোক তুমি নানার এই সব মোসাহেব-দের দেখে কল্পনা করতে পারবে না দিদি। অমন সাঁচ্চা মানুষ আমি খুব কমই দেখেছি। তা ছাড়া এত বয়স হয়েছে—শালের চারার মত সোজা আছেন এখনও। কে বলবে বুড়ো। কোন মানুষকে তো পরোয়া করেনই না—যমকেও না।'

আমিনা আর কথা বলল না। কিছুক্ষণ একদৃষ্টে আজিজনের ভেলভেটের পাজামার প্রান্তে সলমা-চুমকির কাজটার দিকে চেয়ে বসে রইল। চোখের দৃষ্টিতে যেন কোন্ এক সর্বনাশের ছায়া ঘনিয়ে আসছে—যে দৃশ্য তার সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তা ভীষণ অথচ মনোমুগ্ধকর। ললাটে চিন্তার রেখাগুলি আবারও একে একে স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল।

আজিজন তা লক্ষ্য করল, কিন্তু কোন প্রশ্ন করল না। স্থির হয়েই বসে রইল।

অনেক—অনেক ক্ষণ পরে আমিনা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল, 'তাই তো ভাবছি আজিজন, এই সব লোকগুলোকেও এর মধ্যে জড়িয়ে ফেলছি! বেশ ছিল ওরা, হয়তো এমনিতে ভালই থাকত। ওদের এই নিশ্চিত মৃত্যুর মধ্যে টেনে আনছি—ভাবতে বড় খারাপ লাগছে আজিজন।'

আজিজন কোন উত্তর দিল না। চুপ করেই বসে রইল। এমন ভাবান্তর আমিনার একেবারে নতুন নয়। এ ভাব আবার আপনিই কেটে যাবে।

খানিক পরে আজিজন বলল, 'তুমি তাত্যা টোপীর বাড়ি গিয়েছিলে?'

'হ্যাঁ।' নড়ে-চড়ে বলল আমিনা, 'সেইখানে গিয়েই মনটা খারাপ হয়ে গেল।'

'কেন?'

'ওখানে ছিলেন হেডমাস্টার গঙ্গাদীন। তাঁকেই তাত্যা পাঠিয়েছিল ঝাঁন্সিতে। রানী লক্ষ্মীবাঈ রাজী হয়েছেন আমাদের দিকে যোগ দিতে। অবশ্য খানিকটা দেখে—অবস্থা বুঝে। আগেই নিজেকে জড়াতে তিনি চান না, তবে সহানুভূতি আছে ষোল আনা, গোপনে সাহায্যও করবেন বলেছেন।'

'সে তো আনন্দের কথা!'

'ঠিক আনন্দের কথা নয়, আজিজন। এ যুদ্ধের পরিণাম কি আমি জানি না ভাবছিস? দিব্য চোখে দেখতে পাচ্ছি ইংরেজই শেষ পর্যন্ত জিতবে। কতকগুলো ইংরেজ মরবে—এইটে দেখবার নেশায় এ কি ছেলেমানুষি করে ফেললুম! যে আগুনে জ্বলবে, সে আগুনে আমরা পুড়ি, নানাসাহেবের মত লোক পোড়ে তাতে তো দুঃখ নেই, কিন্তু লক্ষ্মীবাঈ, কুঁয়ার সিং এঁদের কথা যে আলাদা। বেচারী লক্ষ্মীবাঈ—ছেলেকে সিংহাসনে বসাবে এই শুধু স্বপ্ন। সে স্বপ্নের কী পরিণাম তা যদি জানত!' বলতে বলতে আমিনা আবার নীরব হয়ে গেল।

আরও কিছুক্ষণ একদিকে স্থিরদৃষ্টিতে চুপ করে তাকিয়ে থাকবার পর আমিনা পুনরায় বলল, 'আমি—তাত্যাকে অনুরোধ করলাম, লক্ষ্মীবাঈকে এই আবর্তের মধ্যে টেনে না আনতে। অনুনয় করলাম—কিন্তু তাত্যা রাজী হল না। সে হেসে বলল, ঐ জন্যেই স্ত্রীলোক এসব কাজের অনুপযুক্ত। অত বাছবিচার করতে গেলে চলে না। আমাদের প্রাণ কি প্রাণ নয়? লক্ষ্মীবাঈ-এর প্রাণেরই কি এত বেশী মূল্য!'

আবারও একটু ম্লান হাসি হাসল আমিনা।

এবার আজিজন কথা বলল, 'ঠিকই বলেছে তাত্যা, দিদি। মানুষের পাপের ভরা যখন পূর্ণ হয়, তখনই খোদা দৈব-দুর্বিপাক আনেন। আসে বান—ওঠে ঝড়—ভূমিকম্পে মাটি কেঁপে ফেটে বসে যায়। ঈশ্বরের সেই কোপ যখন পড়ে, তখন কি তুমি বলতে চাও, শুধু অপরাধীরাই শাস্তি পায়, আর নির্দোষরা বেঁচে যায়? তা হয় না দিদি। যখন গ্রামকে গ্রাম ভাসিয়ে নদীর বন্যা আসে, তখন যে-সব ঘরবাড়ি ধুয়ে মুছে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, তার মধ্যে কি কোন সাধু-সন্ত-ফকিরের আস্তানা পড়ে না? নিশ্চয়ই পড়ে। ঐ সব

বৃহৎ কাজে, ভয়ঙ্কর আয়োজনে নিতান্তই তুচ্ছ হৃদয়াবেগের কোন মূল্য নেই দিদি। মরবে বৈকি—কুঁয়ার সিং, লক্ষীবাঈ—সবাই হয়তো মরবে। আর দেখ, এ কি নিতান্তই আমরা ওদের এর মধ্যে জড়াচ্ছি? ওদের লোভই ওদের জড়াচ্ছে। আশি বছরের কুঁয়ার সিং স্বপ্ন দেখছে সমগ্র বিহারের মসনদ—লক্ষীবাঈ স্বপ্ন দেখছে স্বাধীন ঝান্সির সিংহাসন। সেই লোভেই ওরা আসছে। তুমি মিছে মন খারাপ করে কী করবে?'

আমিনা যেন একটা ঘুম থেকে জেগে উঠল।

'ঠিক বলেছিস তুই। এসব আর ভাবব না। ইন্ধন—ওরাও ইন্ধন মাত্র। যজ্ঞ এখনও অপূর্ণ—এখন এসব ভাববার সময় নেই।'

আজিজন বলল, 'তাত্যাকে কেমন দেখলে?'

'তাত্যা ঠিক আছে।' আমিনা হেসে ফেলল, 'তাত্যাও কি আমাদের জন্যে এগোচ্ছে? তাত্যারও স্বপ্ন আছে আজিজন—সেও চোখের সামনে দেখছে সেই মারাঠা সাম্রাজ্য—এক ব্রাহ্মণ সেখানে সম্রাট! কিন্তু ব্রাহ্মণ কি নানা ধুন্ধুপন্থ? বোধ হয় না। সেই অখণ্ড ভারত-সাম্রাজ্যের সিংহাসনে তাত্যা নিজেকেই মনে মনে কল্পনা করছে—এ আমি বাজি রেখে বলতে পারি, আজিজন! তার স্বপ্নে বাহাদুরও নেই—নানাও নেই!'

আজিজনও হাসল। বলল, 'মানুষের এই লোভ-ঈর্ষা প্রভৃতি গুণগুলো আছে বলেই তো আমাদের সুবিধে দিদি! এরাই তো আমাদের প্রধান সহায়।'

আজিজন তার ওড়না গুছিয়ে নিয়ে উঠে পড়ল।

আমিনাও সঙ্গে সঙ্গে উঠে তার পাশে এসে দাঁড়াল। তার পর তার গলাটা জড়িয়ে ধরে বলল, 'আসল কথাটা কি জানিস বহিন? আজ সন্ধ্যার পর আজিমুল্লার বাড়ি থেকে বেরিয়ে তাত্যার ওখানে যেতে যেতে এক আশ্চর্য খোয়াব দেখেছি। খোয়াবই বা বলি কেন—আমি তোকে সত্যিই বলছি, আমি একটুও ঘুমুই নি। ডুলির চার দিকে তো ঘেরাটোপ দেওয়া—ভেতর অন্ধকার, আমি বেশ জেগেই ভাবতে ভাবতে চলেছি—'

এই পর্যন্ত বলে আমিনা চুপ করল। ততক্ষণে তার দু চোখ বর্ষাতুর হয়ে উঠেছে, তারই মধ্যে সমস্ত মুখে ফুটে উঠেছে এক সর্বনাশা আন্তরিক প্রেমের করুণ ব্যাকুলতা। সে যেন তখনও দেখছে সেই ছবি—যা কিছুক্ষণ পূর্বে অন্ধকার ডুলিতে দেখেছে। তার চোখের সামনে থেকে—জীবনের সামনে থেকে

আর সব কিছুই যেন ধুয়ে মুছে গিয়েছে—আছে শুধু সেই স্বপ্ন। সে অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ হয়ে থেকে যেন সমস্তটা আদ্যন্ত আর একবার দেখে নিয়ে ফিস্ ফিস্ করে বলল, 'তারই মধ্যে স্পষ্ট দেখতে পেলুম তাকে, যেন একটা সাদা পাথরের ওপর দাঁড়িয়ে সে আমার দিকে চেয়ে আছে। তার দু চোখে অনুনয়, সে যেন বলতে চাইছে—ফিরে যাও, ফেরো, তুমি এ-সবে এসো না। এ সর্বনাশের আগুন জ্বেলো না।···একেবারে স্পষ্ট চোখের সামনে দেখলাম!'

বলতে বলতে আমিনার সেই মৃদু কণ্ঠস্বরও কেঁপে উঠল বার বার। শুধু গলা নয়, সারা দেহই কাঁপতে লাগল।

শুনতে শুনতে আজিজনের মুখও বিবর্ণ হয়ে উঠেছিল। তার মসৃণ উজ্জ্বল ললাটে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে উঠল—ঠোঁট দুটি কিছুক্ষণ ধরে থর থর করে কাঁপল। তার পর যেন প্রাণপণ চেষ্টায় নিজেকে সংযত এবং কঠিন করে নিয়ে শুষ্কস্বরে বলল, 'ডুলিতে যেতে যেতে ঘুমিয়েই পড়েছিলে দিদি, আর—আর তোমার বোধ হয় শরীর খারাপ হয়েছে। তাইতেই ঐরকম খোয়াব দেখেছ।'

আমিনার বাহুপাশ থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে আজিজন ধীরে ধীরে বার হয়ে গেল।

তার এই কঠিন সংযমে ঘা খেয়ে আমিনার হৃদয়াবেগ লজ্জিত, সংকুচিত হয়ে পড়েছিল। সে যেন নিজেকে গোটাকতক ঝাঁকানি দিয়ে প্রকৃতিস্থ করে নিল। ছিঃ ছিঃ! এ কী করছে সে! সত্যিই সে পাগল হয়ে গেল নাকি!···

খানিকটা সেই ভাবে দাঁড়িয়ে থেকে কণ্ঠস্বরকে সহজ করে নিয়ে মুসম্মৎকে ডেকে আদেশ করল, 'গোসলখানায় গরম পানি দিতে বল্, আমি স্নান করব।'

'স্নান করবেন! এত রাত্রে?'

'হ্যাঁ। আমার শরীরটা ভাল নেই—স্নান না করলে ঘুমোতে পারব না। আর শোন্, হাকিমের কাছ থেকে যে ঘুমের ওষুধ আনিয়েছিলুম, তার খানিকটা আছে তো? আমাকে রাত্রে দুধের সঙ্গে সেই ওষুধ একটু দিস্ মনে করে।'

॥ ১৩ ॥

সুখ বস্তুটা সংসারে বুঝি শান্তির মতই দুষ্প্রাপ্য। আমাদের হীরালাল এ কথাটা আজকাল কতক কতক বুঝতে শুরু করেছে।

অথচ কিছুদিন আগেও যে অবস্থাটা সুখের সর্বপ্রধান অন্তরায় বলে বোধ হয়েছিল, সে অবস্থা এখন আর নেই। চাকরি পেয়েছে। চৌধুরীর পরামর্শ ঠিক ঠিক খেটেছে—কতকটা দৈববাণীর মতই। কাজ ভাল—বেতন আরও ভাল। মৃত্যুঞ্জয় একদা যে বেতনে কাজে ঢুকেছিলেন তার চেয়েও পাঁচ টাকা বেশী বেতনে সে বহাল হয়েছে, সেজন্য মৃত্যুঞ্জয় প্রকাশ্যেই একটু ঈর্ষিত—যদিচ ভাগ্নেকে একটু একটু যেন সমীহ করে চলছেন আজকাল। তবু হীরালালের মনে তেমন সুখ নেই।

প্রথমত মামার ঈর্ষায় সে ব্যথিত। বেশ একটু অসুবিধাও বোধ করে। কারণ সময়ে-অসময়ে কোথা দিয়ে যে তাঁর মর্মভেদী বাণ এসে বেঁধে তার ঠিক নেই।

কিন্তু সেটাও বড় কথা নয়।

আসলে ইদানীং একটা চিন্তা তাকে যেন পেয়ে বসেছে, সে তার জীবন-দাত্রীর চিন্তা।

কে এই হুসেনী বেগম? বার বার নিয়তির মতই তার জীবনে আবির্ভূতা হচ্ছেন। এ কি সত্যই ঈশ্বরের অনুগ্রহ? তার মা প্রত্যহ মা-কালীকে ডাকেন, তাঁর পটের সামনে জবাফুল না দিয়ে কোনদিন জল খান না। আবার তুলসী-তলাতেও নিত্য সন্ধ্যায় প্রদীপ দেন, নিত্য প্রত্যূষে জল দেন, মার্জনা করেন। এই দৈব অনুগ্রহ কি তারই ফল? এক-এক বার মন সেইটেই বিশ্বাস করতে চায়, আবার সংস্কারাচ্ছন্ন হিন্দুমন তার—প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কুণ্ঠিত সংকুচিত হয়ে পড়ে। হিন্দু দেবীদের কোন অনুচরীকে মুসলমান মহিলারূপে কল্পনা করে অপরাধ করে ফেলছে না তো! মা-কালীর কোন ডাকিনী-যোগিনীকে কল্পনা করা হয়তো তত দোষের নাও হতে পারে, কিন্তু এই দেবী-প্রতিমার মত সুন্দরী মহিলার সঙ্গে সে রকম যোগাযোগ ভাবতেও ঠিক মন চায় না। এবং এই প্রসঙ্গে এমন কথাও তার মনে এক-এক সময় উঁকি মারে—এই ধরনের

সুদূরতম কল্পনাতেও সে, হয়তো মুসলমান নবী বা পীরদের কাছে-কিছুটা অপরাধী হয়ে পড়ছে। ওদের দেব-দেবী নেই—ঈশ্বর আছেন, আর আছেন পীররা। এই কথাই সে জানে। মোট কথা তার অপরিপক্ক অপরিণত মনে প্রশ্নটা নিয়ে অশান্তির আর অবধি নেই।

এই যখন অবস্থা, তখন সহসা হীরালালের ওপর বুঝি ঈশ্বর আবারও প্রসন্ন হলেন। মীরাট থেকে কতকগুলি মাল কানপুর গ্যারিসনে পাঠানো হবে, তার সঙ্গে সিপাহী-সার্জেণ্ট তো যাবেই—একজন বাবুকেও যেতে হবে, এখান থেকে হিসেব বুঝে নিয়ে সেখানে বুঝিয়ে দেবার জন্যে। জেনারেল বাহাদুর এই কাজের জন্যে হঠাৎ হীরালালেরই নাম করে বসলেন। মেজর সাহেব তাকে ডেকে জেনারেলের ইচ্ছা জানিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'তুমি যাবে তো? কোন আপত্তি নেই?'

হীরালাল মনিবের এই সুনজরের মধ্যে ঈশ্বরেরই অনুগ্রহ দেখতে পেল। কিছুদিন ধরেই সে ভাবছিল যে, যদি কখনও কানপুর যাবার সুযোগ-সুবিধা মেলে তো সে একবার হুসেনী বিবির খোঁজ-খবর করবে। অবশ্য তাঁর ঠিকানা জানে না হীরালাল—তিনি ঠিকানা দেনও নি। কিন্তু তাঁকে যে সুপারিশ-চিঠি পাঠিয়েছিলেন, তা এসেছিল কানপুর গ্যারিসন থেকে। কানপুর থেকেই সেই লোকটি এসেছিল উক্ত চিঠি বহন করে। সুতরাং মনের মধ্যে একটা ক্ষীণ আশা তার ছিল যে, ওখানে গেলে একটা হদিস পেলেও পেতে পারে। তবে সেই সুযোগ যে এমন অপ্রত্যাশিতভাবে এত তাড়াতাড়ি মিলবে তা ভাবে নি। মনে মনে আর এক বার সে মাকে তথা মা-কালীকে ধন্যবাদ জানিয়ে মুখে বলল, 'নিশ্চয়ই সাহেব, মনিবের আদেশ পালন করতে আমি সর্বদাই প্রস্তুত।'

সাহেব খুশী হলেন। মাথা নেড়ে বললেন, 'দ্যাট্‌স্ গুড! দ্যাট্‌স্ দ্য প্রপার অ্যাটিচ্যুড। অল রাইট্, তুম্ যাও, সুবহ্ রওনা হোনে পড়েগা। তৈয়ার হো লেও।...ইউ মে গো, চ্যাটার্জি।'

অফিসের ফেরৎ হীরালাল বাসায় ফিরে দেখল সংবাদটা তার আগেই সেখানে পৌঁছে গেছে। ফলে নরক গুলজার হয়ে উঠেছে একেবারে। জেনারেল সাহেবের এই নির্বাচন পক্ষপাতেরই নামান্তর। অতএব ছোকরার যে বরাত ফিরে গেল, তাতে আর সন্দেহ নেই। এই পক্ষপাতের হেতু নিয়েই জল্পনা-

আলোচনা শুরু করেছেন। কী সূত্রে কেন সে বড় সাহেবের নজরে পড়ল—এইটেই সকলের আলোচ্য।

চৌধুরী বললেন, 'অল্প বয়স, ফুটফুটে দেখতে, মন দিয়ে কাজ করে—তাই সাহেবের চোখে লেগেছে। এতে আর অত গভীর অর্থ খোঁজার কী আছে।'

মুখুয্যে মাথা নেড়ে বললেন, 'রেখে ব'স দিকি, ভারি ফুটফুটে। সাহেবের কাছে আবার বাঙালী ফুটফুটে।'

'না, মানে বাঙালী যারা আছে তাদের মধ্যে তো—'

'উঁহু, উঁহু, অত সহজ নয় রে বাবা। আর কোন ব্যাপার আছে। সেই যে-সাহেব ওকে চিঠি দিয়েছিল, সে নিশ্চয়ই জেনারেল হুজুরের কোন প্রিয় বন্ধু।'

'তাতে কি? প্রিয় বন্ধু লিখেছে, চাকরি দিয়েছে—ফুরিয়ে গেছে ব্যাপার।' দত্তমশায় বলে উঠলেন, 'তার জন্য এ-রকম আ-দেখলে কাণ্ড করবে কেন? আমরা এতগুলো লোক থাকতে আমাদের ডিঙিয়ে, ও ছোকরাকে এ ভাব দেবার মানেটা কি? কী কাজ জানে ও? কতদিন এসেছে, বয়সই বা কত?… এখনও মুখে দুধের গন্ধ, তেঁতুলতলায় গেলে গলায় দই বসে।...তাই কি ওরই লাভ হবে? এই যে যাওয়া-আসা, এর ভেতর কত দিক থেকে কত উপরি রোজগার হতে পারে সে জ্ঞান ওর আছে? ওরও লাভ হবে না—আমাদেরও লোকসান গেল।' সক্ষোভ দীর্ঘশ্বাস ছাড়েন দত্তমশাই।

'এ সেই মোচলমান মাগী।' হুঙ্কার ছেড়ে ওঠেন মৃত্যুঞ্জয় গাঙ্গুলী, 'আসলে সেই মোচলমান মাগীর কাণ্ড, এটা বুঝলে না বাপু? কে জানে সে বেটী কার কে—হয়তো জেনারেল সায়েবের সঙ্গেই তার আশনাই আছে।…কিংবা তাকে খুশী করলে জেনারেল সায়েবের লাভ। মোদ্দা সেই মাগীই আছে এর মধ্যে এই আমি বলে দিলুম। তা নইলে আমরা সবাই থাকতে ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাবে কেন? এমন ছিষ্টিছাড়া আহেলা কাণ্ড বাপের জন্মে দেখি নি।… বলি কাজের ও জানেই বা কি—বোঝেই বা কি। কাজের দরকার থাকলে আমাদেরই ডাকত।'

সত্যিই, এ-কথাটা তো হীরালাল ভেবে দেখে নি।

তবে কি এর মধ্যেও সেই দেবীর কোন হাত আছে? তবে কি—তবে কি, তারই আশা সফল হতে চলেছে?

'এই যে বাপু নবাব-সায়েব এসেছ! শোন এদিকে—শুনে রাখ। যা বলছি মন দিয়ে শোন। হঠাৎ বড়সায়েবের নজরে পড়ে গেছ বলে যেন ধরাকে সরা দেখো না। ও আমরা অমন ঢের দেখলুম। আজ সুনজরে আছ, কালই হয়তো বুটের ঠোকর মারবে। কথাতেই বলেছে—"বড়র পীরিতি বালির বাঁধ. ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেকে চাঁদ।" কাজেই এখন যা বলি মন দিয়ে শুনে রাখ। যখন দিন দিয়েছেন ভগবান, দিন কিনে নাও!'

এই বলে মৃত্যুঞ্জয় বিস্তৃত এবং সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম নির্দেশ দিতে লাগলেন: কোন্ বস্তুর চোরাবাজারে কী মূল্য—কোন্ বস্তু কী ভাবে সরাতে হয়—সাহেবদের হিসাব বোঝানো কত সোজা—হিসাবের মার-প্যাঁচ কত রকমের আছে—মালের রক্ষকদের সঙ্গে কী বন্দোবস্ত—কতব বেশী ভাগ দিলে বাজার খারাপ হয়—এরই বিস্তৃত তথ্যবহুল বিবরণ দিতে দিতে একসময় রাত ঘনিয়ে এল। অন্য বাবুরা অনেক আগেই পূজো-আহ্নিকে চলে গেছেন। সেই অবসরে সর্বশেষে সর্বাধিক মূল্যবান উপদেশটি দিলেন—গলা খাটো করে বললেন, 'টাকা-কড়ি উপরি যা পাবে নিজের কাছে রেখো না, ধরা পড়লে বিপদ। আমার কাছে রেখে দিও। মারা তো যাবে না।'

তার পর কণ্ঠস্বর এক পর্দা চড়িয়ে বললেন, 'খাওয়া-দাওয়াটি খুব সাবধান বাপু। দুটো পয়সা রোজগারের জন্যে বিদেশে এয়েছ; তাই বলেই যে জাতধর্ম খোয়াতে হবে, তার কোন মানে নেই।...হিন্দু সেপাইদের জন্যে রান্না হবে বটে, তা তাদের সঙ্গেও না-ই বা খেলে। নিজে দুটো ভাতে-ভাত গাছতলায় ফুটিয়েই খেও। বলে তো বামুন ও বেটাদের কি জাতের ঠিক আছে! বিশ্বাস তো হয় না।'

এই বলে তিনি উঠে পড়লেন।

'শ্রীহরি। শ্রীহরি। পরমানন্দ মাধব।...নাও, তুমিও এবার মুখ হাত ধুয়ে সন্ধ্যেটা সেরে নাও। তোমাকে আবার রাতের মধ্যেই গোছগাছ করে নিতে হবে তো। যাই, আমিও পূজোয় বসি গে। তোমার সঙ্গে বকতে বকতে বাপু সন্ধ্যে হয়ে গেল। এখন আর পূজো না সেরে দুধটা খেতে পারব না। জয় মা।'

তিনি চলে গেলেও হীরালাল বসে রইল। কত কী ভাবতে লাগল বসে বসে। নতুন কাজ, নতুন কর্তব্য। একদিকে গুরুজনদের অসাধু উপদেশ—আর একদিকে অন্তরের উচ্চ আদর্শ, যার নির্দেশ—'অধর্ম ক'র না কখনও,

সত্যপথে থাকবে, অধর্মের পয়সা কখনও থাকে না।' এক সময় মনে হল—না গেলেই হয়, অসুখের অছিলায় স্বচ্ছন্দে কাটিয়ে দিতে পারবে। কিন্তু নতুন দেশ দেখার মোহ, তাও কতকটা আছে বৈকি। আর আছে তার সঙ্গে একটা আশা, হয়তো এবার সে তার জীবনদাত্রীর দেখা পাবে আর এক বার।

খড়মে খটাখট শব্দ তুলে পট্টবস্ত্র-পরিহিত মুখুয্যে বের হয়ে এলেন, বললেন, 'কি বাবাজী, এখনও ওঠ নি। নাও নাও, সন্ধ্যেটা সেরে নাও। একটু দুধ আর মোহনভোগ মুখে দাও। তোফা মোহনভোগ করেছে ঠাকুর।'

তার পর এদিক-ওদিক চেয়ে গলাটা নামিয়ে বললেন, 'মাইনেই বল, আর উপরিই বল—মামার হাতে যেন ভুলেও ধরে দিও না। যা পাবে নিজের কাছে রাখবে, নয়তো আজকাল ডাকে দিব্যি যাচ্ছে—পাঠিয়ে দেবে। নইলে এদেশের বেনিয়াদের গদিতে জমা দিয়ে হুণ্ডি নেবে। মামার খপ্পরে পড়েছ কি গিয়েছ। সে পয়সার মুখ আর দেখতে হচ্ছে না।

এই পর্যন্ত বলে আবারও এদিক-ওদিক দেখে নিলেন তিনি, তার পর গুন্‌গুন্ করে একটি টপ্পা গাইতে গাইতে নিজের ঘরে চলে গেলেন।

হীরালাল উঠল বটে, তবে তার তখন অভিভূতের মত, মোহাবিষ্টের মত অবস্থা। এক-এক বার সকলের অজ্ঞাতসারে মাথাটা ঝাঁকি দিয়ে দেখতে লাগল—সে প্রকৃতিস্থ আছে তো?

পরের দিনই যাত্রা শুরু হল। কিছু জরুরী মাল আছে —নৌকোয় বা বলদে-টানা গাড়িতে পাঠানো চলবে না। ঘোড়ায়-টানা মালগাড়িতেই পাঠানো ব্যবস্থা হয়েছে। মালের সঙ্গে আটজন সিপাহী এবং এক জন সার্জেন্ট যাবে। তারাও ঘোড়ায় চড়ে যাবে। হীরালাল ঘোড়ায় চড়তে জানে না— মেজর হুকুম দিয়েছেন, সে একটা মালের গাড়িতে চালকের পাশে বসে যাবে। হীরালাল বেঁচে গেল। তবে তার সঙ্গে যে সার্জেন্ট যাচ্ছিল, সে সাহস দিয়ে বলল, 'ডোন্‌ট্ ফিয়ার বাবু, হাম্ তুম্‌কো তিন রোজমে শিখলায় দেগা। সম্‌ঝা?'

হীরালালও প্রতিজ্ঞা করেছে—সার্জেন্ট সাহেবের এই অনুগ্রহ সে অবহেলা করবে না, ঘোড়ায় চড়াটা সে শিখেই নেবে।

যাত্রার প্রথম কয়েক দিন কতকটা একঘেয়ে ভাবেই কাটল। প্রত্যুষে যাত্রা শুরু হয়—বেলা দ্বিতীয় প্রহর পর্যন্ত একটানা গাড়ি চলে। তার পর একস্থানে ভাল দোকান-বাজার দেখে ঘোড়া খোলা হয়। পথেই সহিস পাওয়া

যায়—তারা ঘোড়াগুলিকে খাওয়ানো ও দলাই-মলাইয়ের ভার নেয়। সিপাইরাও দু দলে রান্না করতে বসে। সার্জেণ্টটি মুসলমান সিপাইদের ভাগে পড়েছে—হীরালাল পড়েছে হিন্দুর দলে। মামার নির্দেশ সে রাখতে পারে নি, রাখতে চায়ওনি। সিপাই রামলগন তেওয়ারীকে তার মামার চেয়ে শুদ্ধ ব্রাহ্মণ বলেই বোধ হয়েছে। তার হাতে খাওয়ায় আপত্তি কি? রামলগনেরই বরং গোড়ার দিকে আপত্তি ছিল। কারণ একে সে মছলি-খোর বাঙালী, তায় সে আবার 'চাওল' বা ভাত-খোব। তার জন্যে ভাত ফুটোতে হয়। সে গজগজ করে। শুধু সার্জেণ্টের শাসনে ও হীরালালের বিনয়-ব্যবহারেই সে বাজী হয়েছিল। অবশ্য খাওয়া বলতে ডাল আব ভাত এবং একটা আলুব তরকাবি, কিন্তু তাতে হীরালালেব বিশেষ আপত্তি ছিল না।

আহারাদির পর তৃতীয় প্রহবে আবার গাড়ি ছাড়া হয। রাত্রির প্রথম প্রহর পর্যন্ত চ'লে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ স্থানে—মিলিটারি ঘাঁটি বা কোন থানায় পৌঁছলে তবে যাত্রা বিরতি ঘটে। তখন আবাব সেই ঘোড়ার পরিচর্যা, আহার্য-প্রস্তুত এবং শয়ন। এই-ই চলছিল।

অকস্মাৎ একটু বৈচিত্র্য দেখা দিল পঞ্চম দিনে মেচু* পৌঁছে। সন্ধ্যাব পর এসে ঘাঁটিতে পৌঁছনো হয়েছে। প্রাথমিক ব্যবস্থাদির পর হীরালাল নিশ্চিন্ত হয়ে একটা গাছতলায় আশ্রয় নিযেছে—অর্থাৎ কম্বলখানা বিছিযে সটান হয়ে শুযেছে। সারাদিন গাড়িব চালে বসে কোমরেব যা অবস্থা হয় তা অবর্ণনীয়। এখন ভুক্তভোগীও কেউ নেই যে বুঝবেন। তখন পাকা সড়ক বলতে কিছু খোয়া বা পাথর-বিছানো রাস্তা বোঝাত। তার ওপর দিযে লোহা-বাঁধানো চাকা গড়িয়ে আসার সময় যে ঝাঁকানি লাগে তা এখনকাব পিচ-বাঁধানো পথে রবার-টায়ার চাকার গাড়িতে চড়ে অনুমান করা সম্ভব নয়। হীরালাল সারাদিন ধরে এই মুহূর্তটিব স্বপ্ন দেখে—কখন কোমরটা সোজা করে গড়াতে পারবে।

অন্যদিন এই ভাবে শোবার সঙ্গেই ঘুম পায়। আজ কে জানে কেন পায় নি। সে শুয়ে শুয়ে অলসভাবে চেয়ে ছিল দূরের বড় আমগাছটার তলায় —যেখানে সিপাই রামলগন তেওয়ারী রান্না চড়িয়েছে এবং গজানন্দন চৌবে আটা সানছে—সেইদিকে। অকস্মাৎ লক্ষ্য করল—অন্ধকারে ছায়ামূর্তির

* বর্তমান মায় হাবরাস।

মত আরও দু-তিনটি লোক তাদের কাছে এসে বসল। চেনা লোক এবং সজাতি নিশ্চয—নইলে বিনা প্রতিবাদে 'চৌকা'র কাছে বসতে দেবার কথা নয়। সুতরাং হীরালালের তখন কোনও কৌতূহল না। লোকগুলি অনেকক্ষণ ধরে এই দু জনের সঙ্গে কথাবার্তা চালাল—কিন্তু খুব নীচু গলায়। একেবারে কাছে না হলেও হীরালাল খুব দূরেও ছিল না, তবু একটি শব্দও সে শুনতে পেল না—একটা অস্পষ্ট গুঞ্জন ছাড়া। সেদিকে চেয়ে থাকতে থাকতে তার চোখের পাতা অবশেষে বুজেই এল।

একেবারে ঘুম ভাঙল আহারের ডাক আসতে। দুজন মুসলমান সিপাহীদেরও খানা তৈরী হয়ে গেছে—একটা চাদর বিছিয়ে তারাও আহারে বসেছে। সার্জেন্টের দেখা নেই। সে এখানেই কোথায় শৌণ্ডিকালয় আবিষ্কার করেছে, সুতরাং অচিরে ফেরবার আশা কম। তার রুটি ও কাবাব সবানো আছে।... হীরালাল দূর থেকে তাদের বার্তা নিয়ে আমগাছতলায় এসে খেতে বসল। প্রত্যেকেরই থালার পাশে এক-একটা লোটা ছিল। নিজের লোটা নিযে একটু দূবে গিয়ে চোখেমুখে জল দিযে এল হীরালাল। গাড়ি থেকে নেমেই মুখহাত ধুয়ে সন্ধ্যা-গায়ত্রীটা সেরে নিয়েছিল। কিন্তু কাপড ছাড়া হয় নি। এত কাপড় মুসাফিরিতে কাচা ও শুকানো অসম্ভব। প্রত্যূষে সকলের সঙ্গে সেও স্নান সেরে যাত্রা করে—পথে যেতে যেতেই ভিজে কাপড় শুকোনো চলে। ওসব আর বার বার সম্ভব নয়।

আহারে বসবার সময় পর্যন্ত ঘুমটা ভাল করে ছাড়ে নি। খানিক পরে ছাড়ল। দৃষ্টি পরিষ্কার হলে দেখল তাব অদূরে বসে যারা খাচ্ছে তাদেব মুখভাব অস্বাভাবিক গম্ভীর। কারণটা বুঝতে না পেরে সে রুটি চিবোতে চিবোতে বার বার সেদিকে তাকাতে লাগল (রাত্রে কেউ আর ভাতের হাঙ্গামা করে না, তার জন্য অনভ্যস্ত রসনায় রুটি চিবোতে বহু বিলম্ব হয়), কিন্তু তবু ও-পক্ষ থেকে কোন সাড়া এল না। অবশেষে অনেকক্ষণ পরে রামলগন স্তব্ধতা ভেঙে নীচু গম্ভীর গলাতেই বলল, 'বাংগালী বাবু, একঠো বাত বোলেঙ্গে। লেকিন কসম খাও পহ্‌লে, কোইকো বোলোগে নেহি!'

উৎসুক—কিছু বা উৎকণ্ঠিত ভাবেও মুখ তুলে চাইল হীরালাল। মাথা নেড়ে বুঝি সম্মতি জানাল। তখন গলাটা সাফ করে নিয়ে রামলগন আসল কথাটা পাড়ল।

হিন্দুস্তানের সিপাইরা সব মন স্থির করেছে—তারা আর বিধর্মী আংরেজের

শাসনে থাকবে না। আকাশের থমথমে ভাব দেখে কিছু বোঝা যাচ্ছে না, কিন্তু শীগগিরই ঝড় উঠবে। নিঃশব্দে ও অলক্ষ্যে তার আয়োজন চলছে। সে মহাপ্রলয়ে ক্রিস্তান কেউ ভারতে থাকবে না—তা একেবার নিশ্চিত। এখন কথা হচ্ছে যে, সেরকম সময়ে বাংগালী বাবুরা কী করবে—সিপাইদের দিকে যোগ দেবে, না বেইমানি করবে?

কথাটা এতই অবিশ্বাস্য—অন্তত হীরালালের কাছে যে, সবটা মাথার মধ্যে ধারণা করে নিতে কিছু সময় লাগল। তার পর মুখের খাদ্যটা যত শীগগির সম্ভব গলাধঃকরণ করে বলল, 'কিন্তু এইটেই যে বেইমানি!'

'কোন্‌টা?'

'এই ইংরেজদের সঙ্গে লড়াই করাটা।'

'কেন?'

'আমরা তাদের নিমক খাই। মাইনের চাকর।'

'সে মাইনে তারা কোথা থেকে দেয়?...তারা বেইমানি করে এদেশের রাজগী নেয় নি? তারা কী করতে এসেছিল? মুঘলদের কাছ থেকে ভিক্ষে করে এক টুকরো জমি নিযে দোকান খুলতে! বেইমানদের সঙ্গে আবার ইমানদারি কিসের?' গঙ্গানন্দন বেশ বক্তৃতার ভঙ্গিতে বলল।

হীরালাল খানিকটা চুপ করে রইল। তার পর বলল, 'সে বিচার ভগবানের। কিন্তু আমরা ওদের চাকরি করি, আমরা ওদের নিমক খাই—এটা তো ঠিক? আমরা কেমন করে নেমকহারামি করব?'

'তা হলে তোমরা কেউ আমাদের দিকে আসবে না? দুশমনি করবে?'

'সকলের কথা কেমন করে বলব? তা ছাড়া তোমাদের দিকে না এলেই বা দুশমনি করব কেন? কিন্তু মনে মনে ইচ্ছা থাকলেও…তোমরা তো মহাভারত পড়েছ, ভীষ্ম ভগবান কি পাণ্ডবদের ভালবাসতেন না? রাজত্ব তো তাদেরও, কিন্তু তবু দুর্যোধনের কাছে বেতন নিয়েছিলেন বলে তার হয়েই লড়াই করতে হল—পাণ্ডবদের দিকে যেতে পারলেন না। তবে?'

বোঝা গেল এরা মহাভারত পড়ে নি, অথবা তাকে প্রামাণ্য বলে মনে করে না। সুতরাং সে কথায় তারা বিশেষ আমল দিল না। বরং আপসে গুজ-গুজ করে বেশ একটু উত্তেজিত ভাবেই কী সব বলাবলি করতে লাগল। তার মধ্যে থেকে 'ভ্রস্‌ট্' 'বেইমান' 'বে-শরম' প্রভৃতি বিশেষণগুলি মাত্র হীরালালের কানে গেল। সে গোলমাল করল না, করে লাভও নেই।

এরা পাঁচ জন আর সে একা—সুতরাং নীরবে বসে বাকী আহারটুকু সম্পূর্ণ করে নিল। একেবারে লোটা ও থালা হাতে যখন সে উঠে দাঁড়িয়েছে, তখন রামলগন আবার কথা বলল, 'দেখ, কসম খেয়েছ মনে রেখো, কথাটা কাউকে বলবে না। আর যদি বল তো তোমার জানের কোন দাম থাকবে না, হুঁশিয়ার!'

হীরালাল বলল, 'দোস্তির এটাই যে বড় কথা তা জানি ভাই। চুকলি আমি খাব না কিছুতেই। কিন্তু তোমরা কথাটা ভেবে দেখ এখনও।'

'বহুৎ ভেবে দেখেছি আমরা। এখন তোমরা ভাব। আসলে তোমরা ভীতু, তাই সাহেবদের সঙ্গে লড়াই শুনলেই কেঁপে ওঠ, কেমন করে গোলমালটা এড়াবে তাই ভাবতে বস।'—একজন টিটকিরি মেরে বলল।

থালা মেজে থালা ও লোটা জমা করে দিয়ে হীরালাল এসে নিজের আসনে বসল। এখনও বেশ ঠাণ্ডা—ঘরেই শোবাব ব্যবস্থা হয়েছে। কিন্তু সে তখনই কম্বল গোটাল না, সেখানেই বসে বসে কত কী ভাবতে লাগল।

একটা গোলমালেব আভাস সে মীরাটেই পেয়েছিল সাহেবদের চোখে-মুখে, বাবুদের কথার টুকরোয়। কিন্তু সেটা যে এত আসন্ন এবং এমন অবশ্যম্ভাবী তা তো কল্পনাও করে নি।

অনেকক্ষণ সেই ভাবে স্থির হয়ে বসে রইল সে—তবু তাব ক্লান্ত দেহে তন্দ্রার আভাস পর্যন্ত নামল না।

॥ ১৪ ॥

আরও দিন তিনেক পরে কানপুর পৌঁছবাব মুখে এক অঘটন ঘটে গেল।

আর মাত্র একদিনের পথ তখন বাকি। আগামীকালই মধ্যাহ্নে কানপুর পৌঁছনো যাবে ভেবে হীরালালের মনটা খুশী। ফেরার মুখে দায়িত্ব থাকবে না—ক্লান্তিও কম হবে। খালি গাড়ি অনেক দ্রুত টেনে নিয়ে যাবে ঘোড়ারা। সেখানে ফিরে অবশ্য অদৃষ্টে দুঃখ আছে, কারণ উপরি সম্বন্ধে মামার উপদেশ-নির্দেশ একটাও সে কাজে লাগাতে পারে নি। সিপাহীরা উশখুশ করেছে—ওর ভাবগতিক দেখে মুখ ফুটে কিছু বলতে পারে নি; ফলে আরও বেশী রকম বিরক্ত হয়ে উঠেছে তার ওপর তাও সে জানে। তবু পারে নি। মামার তিরস্কার একরকম গা-সওয়া হয়ে গিয়েছে—তা আর বেঁধে না।

বিবেকের তিরস্কার আরও প্রাণঘাতিক, সেটার হাত এড়াতে পেরেছে—এই জন্যই সে কতকটা তবু নিশ্চিন্ত।

যা হোক, সে রাত্রে সে একটু হাল্কা মনেই ছিল। ঘোড়া খোলা হলে মালের পাহারা ঠিক আছে কিনা দেখে সে নিজের বোঁচকা-বুঁচকি সিপাইদের কাছে রেখে গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে বাইরে এল এবং লক্ষ্যহীনভাবে ঘুরতে ঘুরতে ডাকখানার* পাশের বিরাট আমবাগানটায় ঢুকে পড়ল। অন্ধকার রাত ঠিক নয়—শুক্লপক্ষের প্রথম দিক। তাই তখনও আমগাছগুলির ডগায় ডগায় অস্তগামী চাঁদের লালচে আলো লেগে আছে—বাগানের মধ্যে পায়েচলা-পথটা বেশ স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, হাঁটতে কোন অসুবিধা নেই। তা-ছাড়া এদের লোক আমবাগানেরও 'পাট' করে—অদৃষ্টের ওপর ছেড়ে রাখে না—ফলে গাছতলাগুলি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। ঘাস-পাতার চিহ্নমাত্রও নেই। ঘনপল্লব গাছগুলির পাতার ফাঁক দিয়ে দু এক জায়গায় প্রতিফলিত আলোতে চমৎকার আলো-আঁধারির সৃষ্টি করেছে। হীরালালের তরুণ মন এখনই একেবারে টাকা-আনা-পাইএর মধ্যে নিজের সমস্ত কিছু বাঁধা দিয়ে বসে নি—তাই প্রকৃতির বিচিত্র রূপ আজও তাকে আকৃষ্ট করে, আজও সে প্রতিদিন সূর্যোদয়-সূর্যাস্তের সময় বিস্মিত উন্মনা হয়ে ওঠে।

সেদিনও এই আম্রবীথির মধ্য দিয়ে এই নিঃসঙ্গ অনর্থক ঘুরে বেড়ানো ভারি ভাল লাগছিল। এমন কি, এক সময় তার নিজের কণ্ঠের গুন্‌গুন্‌ সঙ্গীতও কোলাহল বলে বোধ হল। চারদিকের নির্জন নিস্তব্ধতার সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করতেই বুঝি সে চুপ করে গেল এবং নিঃশব্দ লক্ষ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

এই ভাবেই কতক্ষণ যে ঘুরেছে তার নিজেরও খেয়াল নেই। অকস্মাৎ তার খুব কাছে—একেবারে পেছনেই—মৃদু পদশব্দ শুনে চমকে উঠল। মুখ ফেরাতে দেখল—কে একজন মানুষই বটে, তবে অন্ধকারে ভাল করে কিছুই ঠাওর হল না। সে ভাবল যে, সে বুঝি এমনি অনেকক্ষণ বেড়িয়েছে—ইতি-মধ্যে সিপাহীদের রান্না শেষ হয়ে গেছে, তাই তারা ডাকতে পাঠিয়েছে কাউকে।

সে বলল, 'কে ভাই, রামলগন?'

* ঘোড়ার ডাক বদল করার আড্ডা।

সাড়া মিলল না। যে আসছিল সে গতি কমালেও সোজা তার দিকেই আসছে।

'গঙ্গানন্দন?

সাড়া নেই।

'আশরফীলাল?'

তবুও সাড়া নেই।

অকস্মাৎ গা-টা ছম্‌ছম্‌ করে উঠল। চোর-ডাকাতও হতে পারে! তবে তার কাছে কী-ই বা আছে—চোর-ডাকাত কেন পিছু নেবে? যা সামান্য কাপড়-চোপড় তাও তো ডাকখানায় সিপাইদের হেফাজতে। তবে? তবে কি ওঁয়া'দের কেউ? না, এত নির্জনে অন্ধকার বনপথে এতক্ষণ থাকাটা তার ঠিক হয় নি। দেখতে দেখতে গলাটা শুকিয়ে উঠল। গায়ত্রী জপ করলে নাকি এ রকম অবস্থায় সুরাহা হয় খানিকটা—অন্তত এ-কথাটা সে বহুবার বয়োজ্যেষ্ঠদের মুখে শুনেছে। কিন্তু অদৃষ্ট এমনই খারাপ—ঠিক এই মুহূর্তে তার গায়ত্রীও মনে পড়ল না।

কিন্তু এসব চিন্তায় তার কয়েক পলকের বেশি যায় নি। এদিকে যে আসছিল, অমোঘ নিয়তির মতই সে একেবারে কাছে এসে দাঁড়াল। ক্ষীণ পাণ্ডুর জ্যোৎস্না—কিন্তু তারই অস্পষ্ট আলোতে আগন্তুকের যতটা চোখে পড়ল তাতেই হীরালালের হাত-পা হিম হয়ে এল। তার সন্দেহই ঠিক। এ কোন অপদেবতা! সাধারণ ভূতও নয়—খারাপ রকমের কোন প্রেত। কারণ যে আকার ধারণ করে এসেছে সে—সেটা দৈত্যাকৃতি। দীর্ঘ স্থূল দেহ, ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, একরাশ দাড়ি-গোঁফ এবং ক্ষুদ্র চোখের মধ্যে ভয়ঙ্কর দৃষ্টি (এটুকু হীরালালের অনুমান)। সে প্রেতটা যে কেন সেই মুহূর্তেই তাকে ধরে ঘাড়টা মটকে দিল না, তা বুঝতে না পেরে শুধু তার দিকে বিহ্বল দৃষ্টিতে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে।

কিন্তু অপদেবতাই হোক আর যা-ই হোক, যে এসেছিল সে মানুষের মতই কথা বলল। বরং আকৃতি হিসাবে কণ্ঠস্বরটা যেন কিছু মোলায়েমই শোনাল। বিশুদ্ধ হিন্দুস্থানীতে প্রশ্ন করল, 'আপনিই হীরালালবাবু?'

বিস্ময়ের ওপর বিস্ময়। উপর্যুপরি বিস্ময়ের আঘাতে হীরালাল হতভম্ব। কোনমতে মাথা নাড়ল সে। কিন্তু সে মাথা-নাড়া প্রেতটার চোখে পড়ল না। সে কিছু অসহিষ্ণু ভাবেই বলল, 'হীরালাল চ্যাটার্জি আপনি?'

এতক্ষণে কণ্ঠে স্বর ফুটল—হ্যাঁ।'

'ঠিক হয়েছে। আমার সঙ্গে আসুন।'

'কো-কোথায় যাব?' কোনমতে প্রশ্ন করে হীরালাল।

'মালেকান আপনাকে ডেকে নিয়ে যেতে বলেছেন।'

'কে—কে বলেছেন?'

'মালেকান—হুসেনী বেগমসাহেবা।'

এক সঙ্গে বুঝি মনের সেতারে সব-কটি তারে ঝঙ্কার উঠল। হীরালালের মনে হল সে চীৎকার করে ওঠে।

'হুসেনী বেগম? হুসেনী বিবি?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ—তিনিই।' একটু অসহিষ্ণু ভাবেই উত্তর দেয় লোকটা।

'তিনি—মানে তিনি এখানে?'

'হ্যাঁ—হ্যাঁ।'

'কোথায়?'

দূরে একটা ক্ষীণ আলোর দিকে আঙুল দেখিয়ে লোকটা বলল, 'এই বাগানের বাইরে ঐখানে একটা বাড়িতে তিনি অপেক্ষা করছেন।'

'ও, তা চল।'

হীরালাল সাগ্রহেই তার সঙ্গে চলল। কোন বদ্ মতলবে কেউ তাকে ভুলিয়ে নিয়ে যেতে পারে—একথাটা একবারও তার মাথাতে গেল না। কারণ তার এত কী দাম। তা ছাড়া হুসেনী বিবি বা হুসেনী বেগমের নাম গত কয়েকদিন ধরে বলতে গেলে সে জপ করেছে। হুসেনী বিবির দেখা মিলবে এ সম্ভাবনা ছিল একেবারেই সুদূর। কানপুর বিরাট শহর—সেখানে শুধু হুসেনী বেগম বললে কে তাকে সন্ধান দেবে?…এসব প্রশ্ন বারবারই তার মনে জেগে তাকে নিরুৎসাহ করেছে। সেই হুসেনী বেগম অপ্রত্যাশিত ভাবে তাকে নিজে এসে দেখা দেবেন—এ যে তার স্বপ্নেরও অগোচর। অত্যধিক আগ্রহে কোন প্রকার অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনার একটি কথাও তার মনে জাগল না। সে সেই জীবন্ত দানবটার পিছু পিছু যথাসম্ভব দ্রুতই চলতে লাগল।…

আমবাগান পার হয়ে সংকীর্ণ একটা রাস্তা, তারই ওপর একতলা খাপরার চালের একটি এ-দেশী বাড়ি—অর্থাৎ জানালাহীন গারদখানার মত পদার্থ একটা। বাড়িটার সামনে পাঁচিল দেওয়া একটা 'হাতা' বা খালি জায়গা পড়ে আছে।' ফটক দিয়ে সেই হাতাতে ঢুকতেই নজরে পড়ল সামনে [illegible]

ভেলভেটের ঘেরাটোপ দেওয়া একটা ডুলি। তার চার জন বাহক ডুলিটার মতই নিশ্চল নিস্তব্ধ ভাবে অপেক্ষা করছে। অর্থাৎ মালেকানের এটা বাসস্থান নয়—তিনিও এখানে আগন্তুক।

বাড়িটা খাঁ খাঁ করছে—একান্তই জনহীন পোড়ো বাড়ি বলে মনে হয়। শুধু বারান্দার সিঁড়ি দিয়ে উঠে সামনেই যে ঘরটা, তারই ভেতর আলো জ্বলছে। সেই আলোটাই বাগান থেকে নজরে পড়েছিল।

পথপ্রদর্শকের নির্দেশক্রমে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে হীরালাল সেই দরজাটার সামনে থমকে দাঁড়াল। ভেতরে যিনি ছিলেন তাঁকে দেখা গেল না। কিন্তু তিনি ওর উপস্থিতি টের পেলেন, বললেন, 'এস—ভেতরে এস।'

ঘরে একটা কুলুঙ্গিতে জোড়া মোমবাতি জ্বলছে। তার আলো খুব বেশি না হলেও অন্ধকার থেকে আসার জন্য হীরালালের কাছে সেইটেই যথেষ্ট উজ্জ্বল লাগল। এক লহমা চেয়েই সে বুঝল তার অনুমানই ঠিক—বাড়িটা পোড়ো বাড়িই। বহুকাল থেকেই খালি পড়ে আছে নিশ্চয়—ঘরের মেঝেতে পুরু হয়ে ধুলো জমে আছে। সে ধুলো কেউ পরিষ্কার করবারও চেষ্টা করে নি। ঘরে আসবাবপত্রও বিশেষ নেই—মাঝখানে শুধু একটা খাটিয়ার ওপর কে একটা ছোট জাজিম বিছিয়ে দিয়েছে। তারই ওপর, খাটিয়ার একদিকের কাঠে সোজা হয়ে সন্তর্পণে বসে আছে হুসেনী বেগম। আর ঠিক তারই সামনাসামনি একটা কাঠের বাক্স—তার ওপরও সাদা চাদর পাতা। সেই অদ্বিতীয় আসনটিই আঙুল দিয়ে দেখিয়ে মধুর হাস্যে ও মধুর কণ্ঠে হুসেনী বলল, 'ঐটেতেই ব'স—আর তো জায়গা নেই!'

যে দৈত্যটা পথ দেখিয়ে আনছিল সে আর ভেতরে ঢোকে নি—অন্ধকারকে যেন গাঢ়তর করেই বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল। তাকে উদ্দেশ করে হুসেনী বলল, 'সর্দার, তুই বাইরে থাক—আর দোরটা ভেজিয়ে দে। কেউ যেন না ভেতরে আসে।'

বাইরের অন্ধকার থেকে একখানা হাত ভেতরে এসে কপাটের দুটি পাল্লাই টেনে বন্ধ করে দিল। নির্জন ঘরের মধ্যে রইল শুধু হীরালাল ও হুসেনী বেগম।

'কৈ, ব'স। বসছ না কেন? অমন করে অবাক হয়ে তাকিয়ে কী দেখছ?'

হুসেনীর কথায় হীরালালের যেন চমক ভাঙল। সত্যই সে বড় অভদ্রের

মত তাকিয়ে আছে। কিন্তু না তাকিয়েই বা উপায় কী ছিল। হুসেনীকে সে এর আগে আর একবার মাত্র দেখেছে, কিন্তু তখন ভাল করে দেখবার মত অবস্থা বা মনোভাব ছিল না। সাধারণ সুশ্রী চেহারার একজন মহিলা—এই পর্যন্ত একটা ধারণা ছিল। সে যে এমন অসামান্য সুন্দরী, এমন অসাধারণ লাবণ্যবতী—তা যেন সে এই প্রথম দেখল। সে-রূপ আর সে-রূপসজ্জা অভিভূত করে দেওয়ার মতই। সুতরাং হীরালালকে বিশেষ কোন দোষ দেওয়া যায় না।

হীরালাল আত্মসংবরণ করে চোখ নামাল, তার পর নমস্কার করবে কি সেলাম জানাবে আজও তা ঠিক করতে না পেরে দুটোর মাঝামাঝি একটা ভঙ্গি করে বাক্সটার ওপর গিয়ে বসল।

হুসেনী আবারও হাসল। মধুর অভয়ভরা হাসি।—'কি বাবুজী, আমাকে চিনতে পার?'

নিমেষে কত কী উত্তর ভিড় করে হীরালালের কণ্ঠে ঠেলাঠেলি করতে লাগল। সে যেন চিৎকার করে, বলতে চাইল, 'চিনতে? আপনাকে চিনতে পারব না? তবে দিনরাত কাকে ধ্যান করেছি এতকাল? যার দয়ায় আজও বেঁচে আছি, যে আমাকে দু-দু বার প্রাণে বাঁচিয়েছে—তাকে চিনতে পারব না। আপনাকে কি ভোলা সম্ভব?' কিন্তু কেমন একপ্রকার সংকোচ তার কণ্ঠ রোধ করে ধরল। এসব কিছুই বলা হল না। শুধু নীরবে ঘাড় নাড়ল মাত্র।

'আমার লোক মীরাটে যে চিঠি তোমাকে পৌঁছে দিয়েছিল, তাতে কাজ হয়েছে কিছু? না আগেই নৌকরি পেয়ে গিয়েছিলে?'

'না।' এতক্ষণে গলার স্বর ফুটল, 'আপনার চিঠি না গিয়ে পৌঁছলে কিছুই হত না।' তার পর কেমন একটা অসংলগ্ন ভাবে বলে উঠল, 'আমি—আমি সেদিন হতাশ হয়ে গঙ্গায় ডুবে মরতে যাচ্ছিলাম।'

খিলখিল করে হেসে উঠল হুসেনী। তারপর মুখে একটা মমতাসূচক শব্দ করে বলল, 'এত ছেলেমানুষ তুমি! দুদিন এসে চাকরি পেলে না তো গঙ্গায় ডুবে মরতে হবে।...তোমাদের বুকের ছাতি বড় ছোট। ছিঃ! পুরুষ মানুষ, কত কী-ই তো করবার আছে। ক্ষেতে কাজ করে, দোকান দিয়ে, পাথর ভেঙে—কত রকমে অন্নসংস্থান করতে পারতে। দরকার হলে এক্কা হাঁকাতে—তাতেও শরম ছিল না।' ইংরেজদের নৌকরিতে এত সুখ তোমাদের? ছিঃ।'

হীরালাল অধোবদনে বসে রইল। তার অবস্থা কেমন করে বোঝাবে সে? তাদের সমাজের, তাদের, পরিবারের কথা। চাকরিই যে তাদের একমাত্র আশা এবং ভরসা।

'ইংরেজের কাছে চাকরি করে এত সুখ পাও তোমরা? এরা দু দিন আগে কী ছিল তা জান বাবুজী? ঐ মুঘলদের কাছে, মারাঠাদের কাছে হাঁটু গেড়ে বসে এতটুকু করুণা ভিক্ষা করেছে। তুমি তো ব্রাহ্মণ, ওরা তো ম্লেচ্ছ—ওদের কাছে চাকরি কর কী করে?'

'ওরা রাজার জাত। রাজা দেবতা।'

'কিসের রাজা ওরা, আজও বাহাদুর শা বসে আছেন তখ্‌তের ওপর।... ওরা বেনে—ব্যবসা করতে এসেছিল। যেমন ইরাণী সার্থবাহরা আজও আসে—তেমনি। কৈ, তাদের তো রাজা বল না। ছলনা প্রবঞ্চনা করে, নানা রকমের বেইমানি করে ওরা বাদশাকে কোণঠাসা করে বাদশা হয়ে বসেছে—ওরা রাজা?'

হীরালাল এবার মুখ তুলল। বলল, 'আমার বয়স কম। আমি বেশী দিনের কথা জানি না। আমি জ্ঞান হয়ে দেখছি যে, ওরাই এ-মুলুকের মালিক। মুঘল-বাদশার নাম এদেশে আমরা শুনছি—আমাদের দেশে আজ কেউ নামও জানে না।'

'তবু নামে আজও তিনিই মালিক্। ইংরেজ এখনও মালিকের নাম নিতে সাহস করে নি।'

হীরালাল চুপ করে রইল। এসব তর্কের জন্য সে প্রস্তুত হয়ে আসে নি। প্রাণদাত্রীর দেখা পেলে কৃতজ্ঞতা জানাবে—শুধু এই কথাই এত কাল ভেবেছে। তাঁর কাছে তিরস্কৃত হবে—একথা তার কল্পনারও অতীত।

বোধ করি হুসেনী তার মনোভাব বুঝল। সে কণ্ঠস্বর নরম করে আনল। 'শোন বাবুজী, তোমাকে ডেকে এনেছি—তার কারণ আছে। তুমি একদিন ঋণের কথা তুলেছিলে। আমি বলেছিলাম যে, সময় হলে আমি একদিন কড়ায়-গণ্ডায় সে ঋণ শোধ করে নেব। মনে আছে?'

'আছে বৈকি!' আবেগে হীরালালের গলা কেঁপে গেল, 'আপনি জানেন না—আমি জানি যে, আপনি এক বার নয়—দু বার আমার প্রাণ রক্ষা করেছেন। সে ঋণ আমি প্রয়োজন হয় তো প্রাণ দিয়েই শোধ করব।'

আবারও খিল খিল করে হেসে উঠল হুসেনী। মুক্তাঝরা সে হাসি।

হাসলে মানুষকে এত সুন্দর দেখায় তা হীরালালের জানা ছিল না। একজোড়া মোমবাতির আলোতে যে এমন মোহ ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে পারে, তাও ছিল স্বপ্নের অগোচর।

'না না অত ভয়ানক কিছু করতে হবে না তোমাকে। আর যা করতে হবে, তা একদিক দিয়ে তোমার কর্তব্য।'

এই বলে একটু চুপ করল হুসেনী। তার পর পুনশ্চ বলল, 'শোন বাবুজী, তোমরা যত সহজে ইংরেজকে মেনে নিয়েছ, আমরা তত সহজে পারি নি। তামাম হিন্দুস্তানের অনেকেই পারে নি। সিপাইরা ক্ষেপে উঠেছে, কারণ তাদের ধর্ম নষ্ট করবার কথা হচ্ছে। রাজারা ক্ষেপেছেন, কারণ তাঁদের বংশগত অধিকার ও মর্যাদায় হাত পড়েছে। হিন্দুস্তানব্যাপী আয়োজন চলছে একটা বিরাট অগ্নিকাণ্ডের. সেই অগ্নিতে পুড়ে শুদ্ধ হয়ে, পবিত্র হয়ে, স্বাধীন হয়ে বেরিয়ে আসবেন দেশমাতা।'

'কিন্তু—কিন্তু সে যে বিদ্রোহ।'

'কিসের বিদ্রোহ? কে কার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে? ন্যায্য অধিকার দাবি করা কি বিদ্রোহ? ইংরেজ যেদিন মুঘলদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেছে, সেদিন সে বিদ্রোহ করে নি? যেদিন মারাঠামুলুকে পেশোয়ার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল, সেদিন সে বিদ্রোহ করে নি? মহীশূরে টিপু সুলতানকে উচ্ছেদ করা বিদ্রোহ নয়? আজ যদি বাদশা তাঁর অধিকার ফিরে পেতে চান—সেইটে হবে বিদ্রোহ?'

হীরালাল বিব্রত মুখে বলল, 'দেখুন, অত কথা আমি জানি না। তবে শুনেছি, লড়াই এমনি ওঁরা বাধান নি সব সময়ে। এদের তরফ থেকেও চুক্তি-ভঙ্গ এসব ছিল।'

'ঝুট্!' যেন গর্জন করে ওঠে হুসেনী, 'বেইমানি বিশ্বাসঘাতকতা এরাই শিখিয়েছে। এদের চেয়ে আর কেউ এসব বেশী জানে?'

বাইরে এই সময় খুব মৃদুভাবে শিকল নড়ে উঠল। যে দানবটা হীরালালকে ধরে এনেছিল, সে-ই বোধ হয় কপাটে মুখ রেখে বলল, 'মালেকান, ওদের খাবার এতক্ষণে তৈরী হয়ে গিয়ে থাকবে। বেশী দেরি করলে বাঙালী বাবুকে হয়তো খুঁজতে বেরোবে ওরা।'

'ঠিক আছে সর্দার। আমি তাড়াতাড়ি সেরে নিচ্ছি।'

তার পর হীরালালের চোখের ওপর চোখ রেখে আমিনা বলল, শুধু আর

তোমার জীবন রক্ষা করেছি, তুমি নিজেই স্বীকার করেছ। তার বদলে দুটি জিনিস আমি চাইছি। তা হলেই আমার ঋণ শোধ করা হবে।'

হীরালাল কথা বলল না, কেবল ব্যগ্র অথচ একটু ভীত দৃষ্টিতেই তার মুখের দিকে চেয়ে রইল। সে যেন কেমন করে মনে মনে বুঝতে পেরেছে যে, যে হিসেব-নিকেশের জন্য সে ব্যস্ত, তার শেষ জমাখরচ অত সহজে হবে না।

হুসেনী বলল, 'সিপাইদের সম্বন্ধে আমরা নিশ্চিন্ত। আজও যাদের দ্বিধা আছে, তাদের দ্বিধা আর থাকবে না। শুধু কমিসারিয়েট নিয়েই গোলমাল, কেননা ওটা পুরোপুরি আছে ইংরেজ আর বাঙালীদের হাতে। তোমাকে দুটি কাজ করতে হবে—প্রথম, বাঙালী বাবুদের বুঝিয়ে আমাদের দলে আনতে হবে ; দ্বিতীয়, যখন দরকার হবে—কোথায কি আছে রসদ-টসদ আমাদের খবরটা জানাবে। দেখ, এই দুটি কাজ করে দিলেই তোমার ছুটি—ঋণ শোধ!'

সে একটু উদ্বিগ্ন উৎসুক চোখে স্থির দৃষ্টিতে হীরালালের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

হীরালালের সুগৌর মসৃণ ললাটে অনেকক্ষণই ঘাম দেখা দিয়েছিল—কতকটা ঘরের বদ্ধ আবহাওয়াতেও বটে, কতকটা উত্তেজনাতেও বটে। এখন সেই ঘর্মবিন্দুগুলি বড় বড় মুক্তার আকারে ঝরে পড়তে শুরু করল। তার সমস্ত মুখখানায় কযেক মুহূর্তের মধ্যে পর পর অনেকগুলি বর্ণ খেলে গিয়ে শেষ পর্যন্ত তা একেবারে শোণিতহীন বিবর্ণ হযে উঠল।

এ কি যুগপৎ পরম সৌভাগ্য ও একান্ত দুর্ভাগ্য তার!

ঋণ শোধ করবার কাম্য সুযোগ সামনে—অথচ তার কী চরম উপায়হীনতা! ভগবান এ কি বিপদে তাকে ফেললেন!

তার মুখের সেই বর্ণান্তর সামান্য বাতির আলোতেও হুসেনীর চোখ এড়ায় নি। সে কিছুক্ষণ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকে লক্ষ্য করে তীক্ষ্ণতর বিদ্রূপের সুরে বলল, 'কি, চুপ করে রইলে যে?'

এবার হীরালালকে কথা বলতেই হল। স্খলিত কণ্ঠে উত্তর দিল, 'কী বলব তাই তো ভেবে পাচ্ছি না। কিন্তু আবাল্য এই শিক্ষাই পেয়েছি, বেইমানি বা নিমকহারামির তুল্য পাপ নেই। ইংরেজদের নুন খেযেছি আমি—সে নুনের অপমান করতে পারব না।'

'কিন্তু সে নুন যে আদৌ ইংরেজের নয়।···আমাদেরই নুন—ইংরেজ চুরি করেছে।'

আবারও পুরাতন যুক্তি দিতে হল।

'দেখুন, আমরা হিন্দু। মহাভারত আমাদের কাছে অতি পবিত্র বই। সে বইএর সবচেয়ে বড় চরিত্র হচ্ছেন ভীষ্ম। কৌরবরাও পাণ্ডবদের রাজ্য অধর্ম করে ভোগ করছিল। ভীষ্ম সেই সময়ই কৌরবদের কাছে চাকরি করেন—যদিও সে রাজ্যে সকলের আগে সবচেয়ে বেশী অধিকার ছিল ভীষ্মদেবেরই। তিনি তা স্বেচ্ছায় ত্যাগ করেছিলেন, তবুও তিনি যুদ্ধের সময় পাণ্ডবদের দিকে যেতে পারলেন না। অথচ পাণ্ডবদেরই তিনি ভালবাসতেন। তিনি চেয়েছিলেন ওদেরই জয় হোক। তিনি যেতে পারলেন না এই একই কারণে—কৌরবদের নিমক খেয়েছিলেন বলে।'

এক নিশ্বাসে—কতকটা বক্তৃতার ধরনে কথাগুলো বলে অপ্রতিভ হয়ে চুপ করে গেল হীরালাল।

সে মাথা হেঁট করে ছিল, নইলে দেখতে পেত—হুসেনীর মুখভাব কঠিন হয়ে উঠেছে। সে কঠিন কণ্ঠেই বলল, 'তা হলে এই তোমার ঋণ-শোধের আগ্রহ। আমার ঋণ কি কিছুই নয়? ইংরেজদের নুন কি আরও বড়?···'

হীরালাল পরিধেয় ধুতিরই এক প্রান্ত তুলে ঘামটা মুছে নিল। তার পর ধীরে ধীরে বলল, 'আপনি প্রাণ দিয়েছেন আমাকে। আপনার জন্য প্রাণ দেওয়া আমার পক্ষে ঢের সহজ। হয়তো তাই দিয়েই আমাকে প্রমাণ করতে হবে যে, আপনার ঋণ আমি শোধ করতেই চেয়েছিলাম।'

'থাক!' বিদ্রূপের সুরে বলে হুসেনী, 'তোমার ও প্রাণের এত দাম নেই। তোমার প্রাণ নিয়ে তুমি মার আঁচলের তলায় লুকিয়ে থাক গে।'

এই সমস্ত সময়টাই কিন্তু হুসেনীর তীক্ষ্ণদৃষ্টি একবারও হীরালালের মুখ থেকে সরে যায় নি। এখনও কথাটা বলে সে তেমনি ভাবেই চেয়ে রইল।

আবারও একবার আরক্ত হয়ে উঠল হীরালালের মুখ। কিন্তু কিছু পরে তেমনি বিবর্ণ হয়ে গেল। সে যেন কী জবাব দিতে গেল—কিন্তু দিতে পারল না। খানিকটা ইতস্তত করে সে একেবারে উঠে দাঁড়াল। হাত জোড় করে বলল, 'আমি হতভাগ্য, আপনার কাছে পেয়েই গেলাম—কিছু দিতে পারলাম না। আমাকে ক্ষমা করতেও পারবেন না তা জানি। কিন্তু

ঈশ্বর জানেন, আমার উপায় নেই।···আপনার সামনে থেকে অকারণ আর বিরক্তি বাড়াতে চাই না। আমাকে বিদায় দিন।'

'দাঁড়াও।' তীব্র তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে ওঠে হুসেনী—যেন এক লাফে কাছে এসে দাঁড়ায়। দু হাতে হীরালালের দুটো কাঁধ চেপে ধরে বলে, 'এখনই গিয়ে সাহেবদের খবরটা দেবে তো? প্রচুর ইনাম পাবে—না?'

'ছিঃ!' জিভ কেটে হীরালাল বলে, 'আমি অপদার্থ, কিন্তু ঠিক অতটা অমানুষ নই বেগমসাহেবা। আমার দেহে এক ফোঁটা রক্ত থাকতে একথা কেউ শুনবে না।'

'তোমার কাছ থেকে এটুকুও আমি আর আশা করি না। তবু তোমাকে ছেড়েই দিলাম, 'নইলে—' একটু থেমে কঠিন এক রকমের হাসি হেসে সে বলল, 'নইলে ঐ বাইরে যে দাঁড়িয়ে আছে—তোমার মুণ্ডুটা শুধু হাতে করে ছিঁড়ে নিতে ওব এক লহমার বেশী সময় লাগত না।'

তাব পর ছাডতে গিয়েও আবার সে হীরালালকে একেবারে নিজের দিকে টেনে নিল—মুখের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ফিস্‌ফিস্ করে বলল, 'দেখ—এখনও ভেবে দেখ। ঋণ শোধ ছাড়াও আরও কিছু পেতে পারতে। আমার দিকে তাকিয়ে দেখেছ? ভাল করে চেয়ে দেখ। আমি তোমার বাঁদী হয়ে থাকব। আমি! যেমন খুশী আমাকে কাজে লাগাতে পারবে।···অথচ, ভেবে দেখ, এতে তোমার লোকসান কিছু হত না। আমরা জিতলে তুমি বড চাকরি পাবে—ইংরেজ জিতলেও কিছু টের পাবে না, যেমন আছ তেমনি থাকবে। এতে তোমাব ক্ষতি কিছু নেই—লোকসান নেই। সবই লাভ। না হয় দুটো দিন ভাববার সময় নাও।'

সে সস্নেহে নিজের বেশমী ওডনা দিয়ে হীরালালেব মুখ মুছিয়ে দিয়ে দাড়িটা ধরে ওর আনত দৃষ্টি নিজের চোখের দিকে ফিরিয়ে ধরল।

হীরালালের সমস্ত দেহটা থর থর কবে কেঁপে উঠল সে স্পর্শে। কিছুক্ষণের মত যেন সমস্ত সম্বিৎ চলে গেল—অবশ হয়ে এল তার সব অনুভূতি।

তার পরই প্রাণপণ চেষ্টায় নিজেকে সামলে দুটি হাত জোড় কবে বলল, 'আমাকে মাফ করবেন। আমি আপনার কোন কাজেই লাগলুম না। শুধু যদি এই অপদার্থ প্রাণটাকে কোন দিন আপনার দরকার হয় তো আদেশ করবেন—দেখবেন এক মুহূর্তও বিলম্ব হবে না তা আপনার সেবায় লাগাতে।···

আপনি আমার জীবনদাত্রী, আপনি দেবী, আমি আপনাকে সেই চোখেই দেখি—সেই চোখেই দেখব চিরকাল।'

এই বলে কাঁধটা সংকুচিত করে কোনমতে হুসেনীর হাত ছাড়িয়ে একরকম ছুটেই দরজার কাছে এসে কপাটটা খুলে ফেলল।

কিন্তু তখনই বার হবার কোন উপায় ছিল না। সামনেই অচল পাহাড় একটা—সর্দার খাঁ পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে। সে প্রশান্ত কণ্ঠে সম্বোধনেই প্রশ্নটা করে নিল, 'মালেকান?

পাথরের মূর্তির মত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল হুসেনী। তেমনি ভাবেই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ভাবলেশহীন কণ্ঠে জবাব দিল, 'যেতে দে।'

সেখান থেকে একরকম ছুটেই বার হয়ে এল হীরালাল। বারান্দা থেকে নেমে হাতাটা পার হয়ে আমবাগানে পড়েও সেই ভাবেই খানিকটা দ্রুত হেঁটে চলল সে। তার পর একেবারে যখন পা দুটো কোনমতেই চলতে চাইল না, তখন অবসন্ন মূর্ছিতের মত একটা গাছতলাতেই বসে পড়ল।

দূরের সে আলোটা ততক্ষণে নিভে গেছে।

॥ ১৫ ॥

হীরালালের সেদিন সারা রাত ঘুম হল না। সমস্ত রাত বসে বসে শুধু এই কথাটাই সে ভাবতে লাগল যে, আমবাগানে তন্দ্রার মধ্যে একটু আগে সে কোন স্বপ্ন দেখে এল,—না কি এসব সত্যই ঘটে গেল তার জীবনে? তার মত সামান্য প্রাণীকে কেন্দ্র করে এত বড় একটা নাটক অভিনীত হবে, এ যে একেবারেই অবিশ্বাস্য! তার এই অল্প কটি বছরের জীবনে কোন প্রকার বৈচিত্র্য বা নাটকীয়তায় কোন ইতিহাসই কোথাও নেই—নিতান্তই অতি সাধারণ জীবন। অখ্যাত, অজ্ঞাত, নামমাত্র-শিক্ষিত দরিদ্র বালক সে, কোনমতে দিন-গুজরানের একটা উপায় হয়ে গেলেই যথেষ্ট। এর অধিক কোন কামনাও তার নেই। কিন্তু ভগবান তারই জীবনে এ সব কী গোলমাল বাধিয়ে তুললেন?

যদি এ স্বপ্ন না হয়, যদি সত্যই এইমাত্র যা সে দেখল ও শুনল—তা সত্য সত্যই দেখে বা শুনে থাকে তো এটা তার জীবনে একটা গুরুতর সমস্যা

হয়েই দেখা দিল বৈকি! একদিকে তার স্নেহ-মমতাময়ী জীবনদাত্রীর অনুরোধ আর একদিকে কর্তব্যের ভ্রূকুটি। যদিচ সে তাঁকে উপেক্ষা করেই এসেছে এবং কর্তব্যকেই শ্রেয় বলে মেনে নিয়েছে, তবু মন মানে কৈ! একজোড়া ভুবন-ভোলানো চোখের মিনতি, সুন্দর একজোড়া অধরোষ্ঠের কোণে কঠিন বিদ্রূপ, বাঁশির মত কণ্ঠস্বরে একই সঙ্গে অনুনয়ন ও ব্যঙ্গ—এ কি সহজে ভোলা যায়। বিশেষত হীরালালের এই নবীন বয়স, এই বয়সে ঐ রকম চোখের মিনতি নিয়তির মতই দুর্লঙ্ঘ্য ঠেকে। এ বয়সে এমনি—কারও জন্যে কিছু করতে না পারলে জীবন ব্যর্থ মনে হয়। কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিক্ষণ—আত্মত্যাগ এই বয়সেরই ধর্ম।

কিন্তু—

কিন্তুটাও যে অনেকখানি। বিধবা মায়ের সন্তান সে। তিনি সমস্তক্ষণ কাছে কাছে রেখে নিজে আদর্শমত মানুষ করেছেন। সে শিক্ষা, সে আদর্শ তার মজ্জাগত হয়ে গেছে। যা অন্যায় বলে জেনেছে তাকেই বা মেনে নেয় কেমন করে?...

সারা রাত ভেবেও এ সমস্যার কোন কূলকিনারা হল না। লাজের মধ্যে রাত্রি-জাগরণ ও অনিদ্রায় তার দু চক্ষু আরক্ত হয়ে উঠল, সুন্দর মুখে কে যেন কালি মেড়ে দিল। সিপাহীরা তার এই ভাবান্তর এবং রূপান্তরকে ভীতি-জনিত দুশ্চিন্তা মনে করে, কাপুরুষতার চরম নিদর্শন ভেবে তাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বিদ্রূপ-বাণে জর্জরিত করে ফেলল। এমন কি বাঙালী মাত্রেই যে বে-শরম এবং ভীতু—একথাও বার বার শুনতে হল।

তার পরের দিন সকালবেলাই তারা কানপুর পৌঁছে গেল। কানপুরে পৌঁছে সে যেন বাঁচল। ভিড়ের মধ্যে কর্মব্যস্ততার মধ্যে নিজেকে আবার মানুষ বলে বোধ হতে লাগল। আগের দিনের দুঃস্বপ্ন এবং দুর্ভাবনার মধ্যে একরকমের হতাশা ও আত্মধিক্কার যেন তাকে একেবারে গ্রাস করতে বসেছিল। আজ কাজের মধ্যে আবার সে নিজেকে ফিরে পেল।

তারা ভোরে স্নান সেরেই যাত্রা করে। আজও করেছিল। সুতরাং কানপুরে পৌঁছেই মেজর সাহেবের কাছে এত্তেলা পাঠাল, তারা প্রস্তুত, তিনি দয়া করে এখন মালপত্র বুঝে নিলে তারা অব্যাহতি পায়। মেজর অবশ্য বললেন যে, ওরা আহারাদি করে বিশ্রাম করুক—তিনি বিকেলেও মাল ও

হিসেব বুঝে নিতে পারবেন। কিন্তু না সিপাহীরা আর না সার্জেন্ট—কেউই রাজী হল না। কানপুর ভারী শহর—রং-তামাশার আয়োজন চারিদিকে। সকালে কাজটা সেরে ফেলতে পারলে বিকেলটা হাতের মধ্যে পাওয়া যায়। অগত্যা মেজর সাহেব তখনই বার হয়ে এলেন।

মালপত্র বুঝে নিতে বেশ খানিকটা বেলা হয়ে গেল। মেজর সাহেব একটু বিস্মিতও হলেন। তাঁর এতকালের অভিজ্ঞতায় তিনি এমন কখনও দেখেন নি যে, সরকারী মাল সব ঠিকঠাক এসে পৌঁছয়। এত কাল ধরে পথের বিবিধ ও বিচিত্র বিপদ এবং ক্ষয়ক্ষতির যে সব বিবরণ শুনে এসেছেন—এই তরুণবয়স্ক বাবুকে তার একটাও না বলতে দেখে বেশ একটু সকৌতুকেই তার দিকে তাকালেন, তার পর বললেন, 'তুমি বুঝি একেবারে নতুন ঢুকেছ কমিসারিয়েটে ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।' হীরালাল সবিনয়ে উত্তর দিল।

'বোঝা যাচ্ছে যে, তোমাকে তৈরী করবার লোকও বিশেষ ছিল না মীরাটে—কী বল ? হাউএভার, তোমার সততাকে পুরস্কৃত করবার সরকারী কোন ব্যবস্থা যখন নেই, তখন সে ত্রুটি আমিই ঢেকে নিচ্ছি।'

তিনি পকেট থেকে পাঁচটি টাকা বের করে, হীরালালের অনিচ্ছুক হাতের মধ্যে প্রায় গুঁজে দিয়ে বললেন, 'সততার পুরস্কার বরাবরই কম। কিন্তু সততাই সততার পুরস্কার বাবু—এটা একদিন যেন বুঝতে পার। উইশ ইউ গুডলাক্ !'

সিপাহী, এমন কি সার্জেন্টেরও অগ্নিদৃষ্টির মধ্যে দিয়ে মাথা হেঁট করে সেখান থেকে সরে এল হীরালাল। এই পাঁচটা টাকা ওদের মধ্যে ভাগ করে দিলে যদি ওরা খুশী হয় তো এখনই দিতে রাজী আছে সে। কিন্তু তা হবে কি ? ভাগে যে একটা করে টাকাও হয় না। তা ছাড়া সে-প্রস্তাব করতেও তার সাহসে কুলোয় না।...

আহারাদির পরও হীরালাল বিশ্রামের চেষ্টা করল না। গত রাত্রির অনিদ্রার ফলে তার দু চোখের পাতা ভারী হয়ে রয়েছে, তবু শুতে তার সাহস হল না। মনে হল নিরালায় বিশ্রাম করতে গেলেই গত রাত্রির সমস্ত সমস্যা আবার তাকে তেমনি করে ঘিরে ধরবে।

তা ছাড়া—তা ছাড়া তার মনের একান্তে আর একবার সেই জীবনদাত্রীকে দেখবার অসম্ভব দুরাশা জেগেছিল কি না—তাই বা কে বলবে ! সে

খাওয়া-দাওয়ার পর সেই দুপুর রোদেই কানপুরের পথে পথে ঘুরতে বের হয়ে পড়ল।

সেকালের পশ্চিমে শহর। শহর বলতে বাজারের দিকটাকেই বোঝাত। সুতরাং হীরালাল ঘুরতে ঘুরতে বাজারের দিকেই এসে পড়ল। সংকীর্ণ পথের দু দিকে অসংখ্য বিপণি। পথের ওপরও বহু লোক পসার সাজিয়েছে। কিন্তু শুধু দোকানী বা ফেরিওয়ালা নয়, আরও নানা রকমের লোকও এ বাজারে দু পয়সা কামাচ্ছে। বেদে আছে—তারা ঝুলির মধ্যে থেকে এটা-ওটা বের করে জাদুর খেলা দেখাচ্ছে। জুয়াওয়ালারা আছে—তারা একটু আড়াল দেখে ঘুঁটি ও ছক পেতে বসেছে। সারেঙ্গী-সমেত পথের নাচওয়ালীরা আছে—ইউরোপের 'ক্যাবারে নটী'দের মত যেখানে-সেখানে ঘাঘরা উড়িয়ে এক পাক নেচে পয়সা কুড়োচ্ছে। আর আছেন জ্যোতিষীরা। পথের পাশে পাশে খুড়িপুঁথি নিয়ে, কেউ বা ধুলোর ওপর ভাগ্যচক্রের ছক এঁকে, কেউ বা খাঁচার মধ্যে কয়েকটি পাখি কিংবা দড়িতে একটা বাঁদর বেঁধে নিয়ে বসেছে। এই ধারাটা শতাব্দী পার হয়েও অব্যাহত আছে। কলকাতার পথে যাঁরা হাঁটেন, তাঁদের আর বলে দিতে হবে না।

হীরালাল অনেকক্ষণ ধরে এই ভিড়ের মধ্যে ঘুরে বেড়াল। ফলে শুধু যে শ্রান্তিতে তার পা-দুটো ভেঙে এল তা-ই নয়, অসম্ভব পিপাসা বোধ হতে লাগল।

সে এদিক-ওদিক দেখে একটা দুধের দোকানে গিয়ে এক পয়সা দিয়ে এক পোয়া গরম দুধ কিনল এবং দুধের ভাঁড়টা হাতে নিয়ে দোকানের সামনেপাতা চারপাইটাতেই ধপাস্ করে বসে পড়ল। প্রথমটা অত সে খেয়াল করে নি, নিজের পিপাসা-নিবারণেই ব্যস্ত ছিল, কিন্তু অকস্মাৎ 'সিপাহী' শব্দটা কানে যেতেই সচেতন হয়ে উঠল। আগে থেকেই দুধওয়ালার দোকানের ভেতর তিন-চারটি লোক বসে নিম্নস্বরে কী আলাপ করছিল—হীরালাল সেদিকে চেয়েও দেখে নি। এখন ভাল করে তাকিয়ে দেখল। অপেক্ষাকৃত ভদ্র চেহারা লোকগুলির—অর্থাৎ নিতান্ত পথের লোক নয়। ওরা এতক্ষণ আলাপটাকে নিম্নস্বরের মধ্যে আবদ্ধ রেখেছিল, কিন্তু এখন ঈষৎ উত্তেজনায় সতর্কতার বাঁধ ভেঙেছে। হীরালাল কান খাড়া করে শুনল—এবং যা শুনল তা একেবারে বিচিত্র খবর তার কাছে। ঝড়ের সঙ্কেত নাকি

উঠেছে—রুটি চলতে শুরু করেছে—ইংরেজের আর রক্ষা নেই। হিন্দুস্তানের তখ্‌তে অবশ্যই বাহাদুর শাহ্‌ বসবেন—কিন্তু মোটের ওপর হিন্দুরাজ প্রতিষ্ঠিত হল বলে—আর দেরি নেই।

এই রুটি-চলাটা যে কী বস্তু তা হীরালাল ঠিক বুঝল না। তবে এটুকু বুঝল যে, সিপাইরা গত সন্ধ্যায় যতটা গোপনীয়তার শপথই নিক না কেন, কথাটা আর গোপন নেই।···শুধু তাই নয়—সারাটা দেশেই একটা আলোড়ন জেগেছে। দুশ্চিন্তাটা একরকমই ভুলেই ছিল এতক্ষণ। এখন আবারও হীরালালের ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে উঠল। সে দুধের শূন্য ভাঁড়টা নিয়ে স্থির নিষ্পলক চোখে সামনের নিমগাছটার দিকে চেয়ে বসে রইল।

নিমগাছটার দিকে চেয়ে রইল বটে, কিন্তু নিমগাছটা তার দৃষ্টিগোচর হয় নি অনেকক্ষণ। ধীরে ধীরে চোখের মধ্যে দিয়ে দেখার খবরটা যখন মস্তিষ্কে গিয়ে পৌঁছল, তখন সে প্রথম অনুভব করল যে, গাছতলাটাতে একটু অস্বাভাবিক রকমের ভিড়। আর একটু ভাল করে চেয়ে দেখল যে, ভিড়টা ঠিক সাধারণ বেকার পথিকের ভিড় নয়। দু চারখানা ডুলিও আশেপাশে দাঁড়িয়ে আছে। অর্থাৎ কিছু কিছু সম্ভ্রান্ত লোকও সেখানে ভিড় জমিয়েছে। এবং সে ভিড় যে একটি কোন বিশেষ লোককে কেন্দ্র করে—তাও বলে দিতে হল না।

হীরালাল দুধওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করল, 'ওখানে বুঝি কোন বৈদ্য ওষুধ দিচ্ছে?'

'না, না!' সে একটু বিস্মিত হয়েই তাকাল হীরালালের দিকে, 'ওখানে সাধুবাবা হাত দেখছেন যে।'

'সাধুবাবা?'

হ্যাঁ, এক সাধুবাবা আছেন। খুব ভাল হাত দেখেন। তবে বড় খাঁই—বড়লোক ছাড়া কেউ ঘেঁষতে পারে না। পাঁচ আনা করে পয়সা দিতে হয় পুজোর জন্যে—তবে উনি হাত দেখেন।'

'খুব ভাল গোনেন নাকি?'

'খুব ভাল। লোকে বলে উনি সর্বদর্শী—ত্রিকালজ্ঞ। লোকের উপকারের জন্যে এসে বসেন ওখানে।'

হীরালাল ভাঁড়টা ফেলে একটু জল চেয়ে হাত ধুলো। তার পর কৌতূহলী হয়ে সাধুবাবার চারদিকের ভিড় ঠেলে কাছে গিয়ে দাঁড়াল। সাল

কাপড়-পরা একটি মধ্যবয়সী লোক। দীর্ঘ চুল এবং দীর্ঘতর দাড়ি-গোঁফ। গলায় রুদ্রাক্ষ ও শঙ্খের মালা। অর্থাৎ তান্ত্রিক। তার মামার বাড়ির দেশে শ্মশানকালীর মন্দিরে এক তান্ত্রিক সাধক থাকেন—তাঁকে বহুবার দেখেছে হীরালাল। তান্ত্রিক সে মোটামুটি চেনে।

অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে তাঁর গণনা দেখল।···নানা লোককে নানা কথা বললেন। কারও মুখে হাসি ফুটল—কারও মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। পরিষ্কার এ-দেশোয়ালী বুলিই তিনি বলছেন। তবু হীরালালের কেমন একটা সন্দেহ হল যে, সাধুবাবাটি বাঙালী।

বেশ খানিকটা পরে—সন্ধ্যার কিছু পূর্বে ভিড় অনেকটা পাতলা হল। এই সময় হঠাৎ একবার মুখ তুলে তাকিয়েই সাধুবাবা হীরালালকে দেখতে পেলেন। একবার ভাল করে চেয়ে দেখলেন। তার পর আরও যে দু-এক জন অবশিষ্ট ছিল তাদের সোজা হাঁকিয়ে দিলেন, 'আজ তোমরা যাও। আজ আর আমি দেখব না।'

তারা একটু-আধটু মিনতি করল, কিন্তু বেশী কিছু বলতে সাহস করল না। বোঝা গেল যে, সকলেই 'বাবাকে' একটু ভয় করে। সকলে চলে যেতে তিনি ইঙ্গিতে হীরালালকে কাছে ডাকলেন।

'তুমি বাঙালী—না বাবা? তোমার বাড়ি কোথায়?'

'আমার বাড়ি কলকাতাতেই।'

'এখানে? চাকরি উপলক্ষে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। আমি মীরাটে কাজ করি। অফিসের কাজে এসেছি।'

'খুব সাবধানে থেকো বাবা তিন-চারটে মাস। খুব হুঁশিয়ার থেকো।'

হীরালালের মুখ শুকিয়ে উঠল। সে তাঁর সামনে বসে পড়ে বলল, 'আজ্ঞে, তা হলে কি—'

হ্যাঁ, লড়াই বাধবে। বিষম লড়াই। দেখি তোমার হাতটা—'

হীরালাল সাগ্রহে হাত বাড়িয়ে দিল।

তিনি অনেকক্ষণ ধরে তার ডান হাতখানা দেখলেন। সূর্য অস্তগামী হলেও আলো একেবারে যায় নি। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে হাতটা দেখে একবার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে হীরালালের কপালের দিকে তাকালেন। তার পর বললেন, 'না, তোমার ভয় নেই। বরং তোমার উন্নতিই হবে। তবে বিপদে পড়বে তুমি—অপরের জন্য। বোধ করি এক স্ত্রীলোকের জন্য!'

'আচ্ছা তার—তার কী হবে?

'কার? সেই স্ত্রীলোকের?'…আর একবার হীরালালের কপালের দিকে চাইলেন, 'সে কি মুসলমানী?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'তারও ঘোরতর সংকট-যোগ আছে। এ-রকম যোগ থাকলে সাধারণত অপঘাত হয়।'

'এর অন্যথা হয় না?'

'হয় বৈকি বাবা। পুরুষকার দৈবকেও লঙ্ঘন করে মধ্যে মধ্যে। তবে সে খুব কম ক্ষেত্রেই সম্ভব হয়।'

'আচ্ছা, এ লড়াইএর পরিণাম কী?

'ইংরেজ জিতবে। বরং তাদের রাজত্ব আরও দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হবে। আরও প্রায় শতবর্ষ-কাল তারা এদেশে রাজত্ব করবে।'

হীরালাল কিছুক্ষণ মৌন থেকে বলল, 'কিন্তু আপনি এখানে কি করে মানে—আপনার বাড়ি কোথায়?'

'আমাদের পূর্বশরীরের কথা বলা নিষেধ বাবা। ঘটনা-চক্রে এখানে এসে পড়েছি। ইচ্ছা আছে এখানে মার একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করব। কী হবে তা জানি না, হুকুম হলে কালই হয়তো এখান থেকে চলে যেতে হবে। তবু চেষ্টা করে দেখছি।…পয়সা চাই কিছু—সেই জন্যই এই দোকান দেওয়া। বসে বসে পয়সা কুড়োচ্ছি।'

হীরালাল আর কথা বলল না। হুকুমটা কিসের বা কার তা সে বুঝল না—প্রশ্নও করল না। পিরানের একটা জেব ছিল—তার মধ্যে থেকে সত্ত-পাওয়া পাঁচটি টাকার একটা বের করে তাঁর পায়ের কাছে রেখে প্রণাম করল।

সাধু টাকাটা গ্রহণ করলেন। বরং মনে হল খুশীই হলেন। হাত তুলে আশীর্বাদ করে বললেন, 'ব্রহ্মময়ী তোমার কল্যাণ করুন। তুমি শান্তি লাভ কর।…কিন্তু বাবা, ঐ মুসলমানীটি থেকে দূরে থেকো। তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি। আর কী দরকারই বা—তোমার এই বয়স, এখন থেকে…তার ওপর ব্রাহ্মণ-সন্তান!'

হীরালালের মুখ রাঙা হয়ে উঠল। কিন্তু সে প্রতিবাদ করে সাধুর ভুল ভাঙবার চেষ্টা করল না। সে নিজে যখন খাঁটি আছে, তখন মিছিমিছি এদের বিশ্বাস-উৎপাদনের জন্ত সময় নষ্ট করে লাভ কি?

॥ ১৬ ॥

সাধুবাবার কাছ থেকে উঠে হীরালাল একটু দ্রুতপদেই ছাউনির রাস্তা ধরল সে রাতটা তার ছাউনিতেই কাটাবার কথা। সেখানে আইন-কানুন বড় কড়া—সন্ধ্যার পরই দরজা বন্ধ হয়ে যায়। সেই সঙ্গে আহারের দফাও ইতি। অবশ্য সে বিদেশী—এখানে অতিথি—এখানকার নিয়ম তার ওপর প্রযোজ্য না-ও হতে পারে, কিন্তু যদি হয়? বিদেশ-বিভুঁই জায়গা—রাত কাটাবে কোথায়?

সে হন হন করেই চলেছে, অকস্মাৎ কাঁধের ওপর কোথা থেকে একটা ভারী হাত এসে পড়ল।

বিস্মিত হয়ে ফিরে দেখল—একটা দানো।

কাল রাত্রির অন্ধকারে দেখা হলেও চিনল, গত রাত্রের সেই দৈত্যটা—সর্দার খাঁ।

সর্দার খাঁ তার অভ্যাসমত বিনা ভূমিকাতেই বলল, 'মালেকান আর এক বার তোমার সঙ্গে দেখা করতে চান। আর একটা কি কথা বলবেন।'

'কিন্তু—' ভয়ে হীরালালের তালু শুকিয়ে উঠেছে। অহেতুক একটা ভয়। সে কোনমতে শুষ্ককণ্ঠে বলল, 'কিন্তু আমাকে যে ছাউনিতে ফিরতে হবে। এর পর তো আর ঢুকতে দেবে না।'

'আচ্ছা, সে ভার আমার। আমি রাত দশটাতেও ঢুকিয়ে দিতে পারব। তুমি নির্ভয়ে এস।'

'কোথায়?'

'এই কাছেই—উকিলপাড়ায়।'

কাল এই ব্যক্তির হাত থেকে মুণ্ডটা অল্প একটুর জন্য বেঁচে গেছে। সে কথা মালেকান স্বয়ং স্বীকার করেছেন। হয়তো বা সেই ভুলটুকু সংশোধনের জন্যই এই আয়োজন—নতুন একটা ফাঁদ। হীরালালের সমস্ত বুদ্ধি তাকে বার বার নিষেধ করল এই ফাঁদে পা দিতে—অকারণে অজ্ঞাত বিপদের পথে পা বাড়াতে। এটা শহরের প্রকাশ্য রাজপথ—এখান থেকে কিছু জোর করে নিয়ে যেতে পারবে না, এখনও সময় আছে বাঁচবার। কিন্তু বুদ্ধিরও ওপরে

একটা বস্তু আছে—সেটার নাম আবেগ, তার বাসাটা হৃদয়ে। সেই বস্তুটিরই জয় হল। আর এক বার সেই জীবনদাত্রী দেবীকে দেখবার জন্য সমস্ত প্রাণটা উন্মুক্ত হয়ে উঠল। সে মুহূর্তকয়েক ইতস্তত করে বলল, 'চল, কোথায় যাবে—আমি যাচ্ছি।'

তার যে বয়স, সে বয়সে কেউ বিপদকে বিশ্বাস করে না ঠিক। আর এ বয়স হিসাব-নিকাশেরও ধার ধারে না।

কয়েকটা গলি-ঘুঁজি ঘুরে একেবারে নির্জন একটা পথে এসে পড়ল দুজনে। জনমানবশূন্য জায়গাটা। দু দিকে বাড়ি থাকলেও, মনে হয় যেন সব কটি বাড়িরই পিছন দিক এটা, অথবা কোন বাড়িতে কেউ বাস করে না। ওরই মধ্যে একটা পোড়ো খাপরার চালের বাড়ির দরজার সামনে এসে সর্দার খাঁ তিনটে টোকা মারল।

হীরালালের এতক্ষণে দারুণ ভয় হয়েছে। এই জনহীন পথ, এই পোড়ো বাড়ি—সবই তো তাকে বধ করবার পক্ষে অনুকূল! হায় হায়, তার বিধবা মা যে তার মুখ চেয়েই এতকাল এত লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সয়েছেন! তাঁর সঙ্গে বুঝি আর এক বার দেখাও হল না।

সে বেশ একটু কম্পিত কণ্ঠেই বলল, 'এ—এ আমরা কোথায় এলাম?'

সর্দার খাঁ হাসল—সেই ভয়ঙ্কর মুখের হাসিটাও বুঝি ভয়াবহ। আবছা অন্ধকারে মনে হল—একটা ক্ষুধার্ত দানব দন্তবিকাশ করছে। সে হেসে বলল, 'ভয় নেই। তোমাকে মারবার দরকার হলে ঐ বড় শড়কেই শেষ করে দিতে পারতাম। আমাকে কেউ বাধা দিতে সাহস করত না। কিন্তু মারবার জন্য মালেকান ডাকেন নি। তোমার কোন বিপদ আপদ না ঘটে—আমার ওপর এই হুকুমই আছে।'

বিশ্বাস করবার কোন কারণ নেই, তবু হীরালাল কথাগুলো বিশ্বাসই করল। মালেকান সম্বন্ধে এই ধরনের বিশ্বাস করতেই যে ভাল লাগে। আশ্বস্তই হল খানিকটা। তাই একটু পরেই যখন নিঃশব্দে কপাট জোড়াটা খুলে গেল এবং একটা প্রদীপ হাতে এক বৃদ্ধা পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল, তখন সে বিনা দ্বিধায় তার পিছু পিছু বাড়ির ভেতর প্রবেশ করল।

বাড়িটা সত্যই পোড়ো বাড়ি। বোধ করি কাচের গুদাম-টুদাম হবে, কারণ উঠোনময় ভাঙা ও গুঁড়ো কাচ ছড়ানো। তার ভেতর দিয়ে বৃদ্ধাটা

সাবধানে তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল। সর্দার খাঁ সঙ্গে আসে নি—খুব সম্ভব বাইরে দাঁড়িয়েই পাহারা দেবার হুকুম আছে তার ওপর।

সংকীর্ণ উঠানটা পার হয়ে একটা গলিপথ-মত অতিক্রম করে একটা খাড়া পাথরের সিঁড়ি ভেঙে এক সময়ে একটা পাকাবাড়ির দ্বিতলে এসে হাজির হল হীরালাল। এবার বুড়ীটাও থামল। আঙুল দিয়ে পাশের একটা ঘর দেখিয়ে আলোটা সেখানেই রেখে বসে পড়ল এবং নিমেষমধ্যে মুখের ঘোমটাটা আর একটু টেনে দিয়ে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে চোখ বুজল। তার গতিক দেখে বোধ হল, সেই এক মুহূর্তের ভেতরেই সে ঘুমিয়ে পড়েছে।

কিন্তু সেদিকে চেয়ে দেখবার সময় নেই। বুড়ী যে দরজাটা দেখিয়ে দিয়েছে—ধীরে ধীরে তার সামনে গিয়ে দাঁড়াল হীরালাল। কপাট ভেজানো ছিল, ঠেলে ঢোকা উচিত হবে কিনা ভাবছে—এমন সময় ভেতর থেকে পূর্ব-রাত্রিতে-শোনা সেই বিশেষ শব্দ কটিই যেন এক দিনরাত্রির ব্যবধান নিমেষে পার হয়ে কানে এসে পৌঁছল—'ভেতরে এস।'

সেই শব্দসমষ্টি, এবং সে-ই অপূর্ব কণ্ঠস্বর! সঙ্গীতের মতো মিষ্টি না হোক —জাদু আছে সে কণ্ঠস্বরে। হীরালালের দেহ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল—কয়েক পলকের মত যেন অবশ হয়ে এল সমস্ত শরীর।...কিন্তু দুর্বলতাকে সে বেশীক্ষণ প্রশ্রয় দিল না। মনে জোর এনে দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকল।

ফরাস-পাতা একটা সাধারণ ঘর। তারই মাঝখানে একটা কাঠের বাক্স এবং সেই বাক্সের ওপর জ্বলছে ডবল পলতের একটা আলো। বাক্সের পাশেই একটা তাকিয়া ঠেস দিয়ে হুসেনী বেগম বসে আছে। ঘরে আর কেউ নেই। আলোটা পাশে পড়ায় তার মুখখানা পড়েছে আলো-আঁধারিতে। ভাল করে দেখা যায় না—আর গেলেও বোধ করি সেদিকে মুখ তুলে চাইতে হীরালালের সাহসে কুলোত না। সে ঘাড় হেঁট করে দাঁড়াল।'

আমিনা তার সামনেটা দেখিয়ে বলল, 'ব'স। ভয় নেই—প্রতিজ্ঞা ভাঙবার জন্যে তোমাকে ডাকি নি। নির্ভয়ে ব'স।'

তার পর হীরালাল বসতে না বসতেই অকস্মাৎ প্রশ্ন করল, 'গণককে হাত দেখাচ্ছিলে বুঝি? কী বললে সে? শীগগিরই রাজা হবে, ভাল শাদি হবে, খুবসুরত বিবি হবে—এই তো! তা কত দিতে হল?'

হীরালাল স্তম্ভিত। তার বাক্যস্ফূর্তি হল না। এ কে? মায়াবিনী জাদুকরী, না সত্যিই স্বর্গের দেবী?

খিল খিল করে হেসে উঠল আমিনা। বলল, 'না গো বাংগালী বাবু, না। জীন কি চুরি কিছু নই আমি। তুমি যখন তন্ময় হয়ে হাত দেখাচ্ছিলে, তখন আমি তোমার সামনের রাস্তা দিয়েই ডুলি করে এসেছি। তুমি টের পাও নি। তা ছাড়া সর্দার খাঁ সারাটা দিনই তোমার পিছনে আছে—ছাউনি থেকে বেরোনো পর্যন্ত। এ শহর ভারি খাবাপ জায়গা—নানারকম বিপদ ঘটতে পারে। তাই ওকে একটু নজর রাখতে বলেছিলুম।'

হীরালাল এবাব চোখ তুলে চাইল।

কৃতজ্ঞতা, ভক্তি, অনুরাগ—দৃষ্টিতে যতটা নিবেদন করা যায়, ততটাই বুঝি সে ঢেলে দিতে চাইল এই মুসলমানীর পায়ে—এই মাত্র যার সংসর্গ এড়িযে চলতে সন্ন্যাসী উপদেশ দিয়েছিলেন।

আমিনা পুনশ্চ প্রশ্ন করল, 'কিন্তু কী বললে গণৎকার—তা তো বললে না?'

হীরালাল সব সংকোচ ঝেড়ে ফেলে কণ্ঠস্বরে বেশ একটু দৃঢ়তা এনে বলল, 'ঐ গণক একজন নাম-করা সাধু। খুব ভাল জ্যোতিষী। এখানে সকলে তাই বললে।'

'তাই নাকি।' আমিনা সোজা হয়ে বসল, আগ্রহেব স্বরে বলল, 'কী বললে সাধু?'

'বললে যে, ভাবী লডাই বাধবে, কিন্তু ইংরেজ হারবে না, বরং তার শক্তি আরও বাড়বে।'

ঈষৎ অবজ্ঞায় আমিনাব ওষ্ঠকোণ দুটো কুঞ্চিত হয়ে উঠল। বলল, 'এ আমিও বলতে পারতাম বাবুজী। এর জন্য সাধু কি জ্যোতিষীর দরকার ছিল না।'

'তবে—তবে কেন আপনি এব ভেতব যাচ্ছেন?' সামনের দিকে ঝুঁকে বেশ একটু আবেগেব সঙ্গেই সে বলল, 'আমি আপনার কথাও জিজ্ঞাসা কবে-ছিলাম। তিনি বললেন, আপনি এর ভেতর এসে বড্ড বিপদে পডবেন—হয়তো, হযতো—'

'আমাব মৃত্যুও হতে পারে—এই তো?' আমিনা খুবই সহজভাবে বলল, 'তাতে আর আমাব ভয় নেই।'

'কিন্তু কেন আপনি এই ঝুঁকি ঘাড়ে নিচ্ছেন—সব আয়োজন বৃথা জেনেও? আমি অনুনয় করছি আপনি এখনও ফিরুন। ছিছিমিছি এই

নিশ্চিত বিপদের মধ্যে যাবেন না। এ আপনার কাজ নয়। যারা করে তারা করুক—আপনি এর ভেতর নিজেকে জড়াবেন না।'

আমিনার আয়ত ও বিস্ফারিত দুটি চোখের দৃষ্টিতে বোধ করি কিছু বিস্ময়ই ফুটল। সে খানিকটা অপলক নেত্রে হীরালালের মিনতি-ভরা চোখের দিকে চেয়ে থেকে বলল, 'আমি মারা গেলে তুমি দুঃখিত হবে বাবুজী? তুমি—তুমি আমার জন্যে ভাবো?'

বলতে বলতে তার কণ্ঠস্বর আশ্চর্য কোমল হয়ে এল। তার দু চোখে যেন স্নেহ উপচে উঠল। তার পর সে কতকটা ছেলেমানুষের মতই বলে উঠল, 'তবে—তবে তুমি কেন আমাকে এটুকু সাহায্য করছ না?'

যেন কোন্ অদৃশ্য মন্ত্রবলে হীরালালের সব সংকোচ, সব কুণ্ঠা আজ দূর হয়ে গেছে—সে নিজের অজ্ঞাতেই আর একটু কাছে সরে এল। তেমনি আবেগের সঙ্গেই বলল, 'আপনার জন্যে ভাবি বলেই আপনাকে সাহায্য করতে রাজী নই। ভাবি বলেই অনুনয় করছি—আপনি এ সবের বাইরে থাকুন। আপনি এর ভেতর যাবেন না। আপনি নিরাপদে থাকলেই আমি খুশী—আর কারুর জন্যে ভাবি না।'

খানিকটা চুপ করে বসে রইল আমিনা। অন্যমনস্ক হয়ে যেন সেই অল্প সময়টুকুর ভেতরেই কত কী ভেবে নিল, অতীতের অনেকগুলি ছবিই বুঝি তার চোখের সামনে দিয়ে দ্রুত ভেসে গেল—তার পর একটু ম্লান হেসে মাথা নেড়ে বলল, 'আমার ফেরবার কোন পথ নেই বাবুজী—নিরাপদে বেঁচে থাকতেও আমি চাই না। আমার কথা তুমি ঠিক বুঝবে না। এখন... আমাকে এই দিকে একটু সাহায্য করলেই এখন আমার প্রকৃত উপকার করা হবে। আর তাতে তোমার কোন বিপদ নেই—তা থাকলে আমি তোমাকে কোন অনুরোধই করতাম না। তুমি এটুকু করতে পারবে না আমার জন্যে?'

সেই অবিশ্বাস্য মধুভরা কণ্ঠে ঐকান্তিক মিনতি!

এর কাছে বিবেক, সংস্কার, সত্য, ইহকাল, পরকাল সবই তুচ্ছ মনে হয়। আজও হীরালালের ললাটে স্বেদবিন্দু জমে উঠল। তার মনে হল—ঘরে আরও দু-একটা দরজা থাকলে ভাল হত, বাতাস বড় কম। সে পিরানটার গলার কাছে আঙুল দিয়ে টানাটানি করতে লাগল।

আমিনা নিঃশব্দে বসে আছে।

তার চোখে শুধুই মিনতি—শুধুই মায়া!

আরও অনেক কিছু বোধ করি আছে সে চোখে—যার কোন সংজ্ঞা নেই, যাকে কোন বিশেষণে অভিহিত করা যায় না। বিচিত্র সে চাউনি। হীরালাল বহুবার চেষ্টা করলে সে চোখে চোখ রাখতে—চোখে চোখ রেখে দৃষ্টির মধ্যে দিয়ে অন্তরের দৃঢ়তা বুঝিয়ে দিতে, কিন্তু কিছুতেই পারল না। একবার মাত্র সে চাউনি স্পর্শ করেই তার চোখ দুটো ঘরের দেওয়ালে দেওয়ালে কোণে কোণে ছুটোছুটি করে বেড়াতে লাগল।

উত্তর একটা দেওয়া উচিত, আর দিতেই হবে শেষ পর্যন্ত—তা সে বোঝে। কিন্তু উত্তরটা যে যোগায় না। শুধু অনর্থক আকুলতাতে কয়েক মুহূর্তকেই কয়েক যুগ বলে বোধ হয়।

অবশেষে তাকে বাঁচিয়ে দিলেন বোধ হয় মা-কালীই!

খোলা দরজা দিয়ে নিঃশব্দে কে একজন ঘরে প্রবেশ করলেন। সম্ভ্রান্ত নাগরিকের পোশাক, বয়স পঞ্চাশের কিছু কমই হবে হযতো, প্রশান্ত ও প্রশস্ত ললাটে সকালের 'ফুরি' বা সিন্দুর-বিন্দু এখনও লেগে আছে। টুপির ভেতর দিয়ে টিকির প্রান্ত প্রকাশ পাচ্ছে—অর্থাৎ আগন্তুক হিন্দু।

তাঁকে দেখে আমিনা অভ্যর্থনা জানাল, 'আসুন বাবুজী।'

তার পর হীরালালের দিকে তাকিয়ে বলল, 'এঁরই বাড়ি—বাবু নানকচাঁদ।'

হীরালাল মাথা হেঁট করে নমস্কার করতে তিনিও প্রতি-নমস্কার করলেন। তার পর বসে বিনা ভূমিকাতে একেবারেই কাজের কথা পাড়লেন, 'দেখ বেগমসাহেবা, এ বাঙালী ছোকরাকে আমি চিনে নিয়েছি। মানুষ চরিয়ে খাই, আর যত রাজ্যের বদ্‌মানুষ—একে চিনতে আমার দেরি হয় নি। যতই যা কর, বেইমানি একে দিয়ে করাতে পারবে না। তার চেয়ে আমি যা বলি সেইটাই শোন।'

তার পর হীরালালের দিকে ফিরে বললেন, 'দেখ বাবুজী, আমিও তোমারই দলের। আমি বিশ্বাস করি না যে আংরেজ হারবে। সিপাইরা অন্তত যে জিতবে না এটা নিশ্চিত। কিন্তু কী করব, প্রথমত এদের—মানে এই বেগমসাহেবাদের আমি স্নেহ করি, একেবারে এদের কথা এড়াতে পারি না। তা ছাড়া যদি চারদিকে আগুন জ্বলে—সোজাসুজি এদের বিরুদ্ধাচরণ করে বাঁচা মুস্কিল। তাই আমাকে কিছু কিছু সাহায্য করতেই হয়।... তুমি এঁকে স্নেহ কর অথবা ভক্তি কর—তা দেখতেই [illegible]। সুতরাং

তোমার ইমান-সত্য থেকে ভ্রষ্ট না হয়ে যেটুকু উপকার করা সম্ভব সেটুকু তুমি এদের জন্যে করবে তা আশা করতে পারি তো?'

পরম আগ্রহের সঙ্গে হীরালাল বলে উঠল, 'নিশ্চয়—নিশ্চয় করব।'

'তবে শোন। তুমি তো দু-এক দিনের মধ্যেই মীরাট রওনা হবে? তুমি যেদিন পৌঁছবে তার অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই নানা ধুন্ধুপন্থও মীরাট পৌঁছবেন। তাঁকে তোমার নাম-ঠিকানা দেওয়া আছে। তিনি হয়তো তোমার খোঁজ করে তোমার সঙ্গে গোপনে দেখা করবেন। তিনি যাচ্ছেন খবর নিতে যে, সত্যিই সিপাইরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়তে সাহস করবে কিনা শেষ পর্যন্ত—অর্থাৎ সত্যিই তারা ক্ষেপেছে কিনা। এটা—তুমি যা শুনেছ এবং জেনেছ-সেটুকু বলতে পারবে তো? তুমি যদি জেনে থাক যে সিপাইরা ক্ষেপেছে, সেটা তাঁকে বলতে দোষ কি? এটা তো কারুর সঙ্গেই নিমকহারামি হল না—ইংরেজদের সঙ্গেও না, সিপাইদের সঙ্গেও না। কারণ তুমি তাদের দলের লোককেই খবরটা দিচ্ছ। যদি তোমার ছাউনির সম্বন্ধে কোন খবর জানতে চান তো তুমি সটান ব'ল যে, তুমি তা বলতে পারবে না—অথবা তুমি নতুন এসেছ, কিছু জান না। যা ভাল মনে কর তাই ব'ল। তোমাকে নিমকহারামি করতে আমি বলব না—শুধু তুমি ঐ খবরটি তাঁকে দিও। কেমন, রাজী আছ তো?'

হীরালাল মন দিয়ে কথাগুলি শুনছিল। শুনতে শুনতেই ঘাড় হেঁট করেছিল। নানকচাঁদের কথা শেষ হতেও অনেকক্ষণ সেইভাবে বসে রইল। তার পর সংক্ষেপে শুধু বলল, 'রাজী।'

আমিনার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সে একবার সকৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে নানকচাঁদের দিকে তাকিয়ে হীরালালকে বলল, 'আর একটি কথা—বেইমানি ঠিক নয়, ছোট একটা মিছে কথা, যদি আমার জন্যে বলতে পার তো তোমার কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ থাকব বাবুজী। খুব মিছেও নয়—একথা, যদি পার তো বিশ্বাস ক'র, এর মধ্যে অনেকটাই সত্য আছে। নানাসাহেবকে ব'ল যে, "সিপাইরা আপনার মুখ চেয়েই আছে। তারা আপনাকেই তাদের নেতা বলে মনে করে।"—পারবে বলতে?'

তেমনি ঘাড় হেঁট করেই হীরালাল জবাব দিল, 'পারব।'

তার পর সে সোজা উঠে দাঁড়াল। বলল, 'এবার তা হলে আসি। ছাউনিতে ফিরতে হবে আমাকে।'

'ভয় নেই বাবুজী, সর্দার খাঁ ঠিক পৌঁছে দেবে। না ফিরলেও তোমাকে কেউ কিছু বলত না। তোমার সঙ্গে যারা এসেছে, তারা কেউ আজ রাত্রে ছাউনির ভেতর কাটাবে না—বাইরেই তাদের প্রলোভন বেশী।'

'আমি কিন্তু ফিরব।' তাড়াতাড়ি বলল হীরালাল।

আমিনা সামনে এসে দাঁড়াল। তার ওষ্ঠের প্রান্তে সেই ভুবন-ভোলানো হাসি—চোখে সেই স্নেহ-মেশানো বিদ্রূপ। সে হেসে বলল, 'তুমি একেবারে ছেলেমানুষ বাবুজী। ভয় পাচ্ছ কেন? আমি তোমাকে বাইরে রাত কাটাতে বলছি না। আমি জানি সে প্রকৃতির লোক নও তুমি। চল, তোমাকে নীচে পৌঁছে দিয়ে আসি।'

তার পর নিজের চম্পকাঙ্গুলি থেকে একটা বড় চারকোণা লাল পাথরের আংটি খুলে হীরালালের হাতে দিয়ে বলল, 'এই আংটির জোড়া যে তোমাকে দেখাবে, বুঝবে সে-ই আমার লোক। সে-ও তোমাকে চিনতে পারবে এই আংটি দেখালে। বুঝেছ? এই আংটি যে দেখাবে তুমি তার সঙ্গে নির্ভয়ে চলে যেও। সে-ই তোমাকে নানার কাছে নিয়ে যাবে।'

হীরালাল ঘাড় নেড়ে সায় দিল। কিন্তু পরক্ষণেই একটা কথা মনে পড়ায় ঈষৎ উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলল, 'কিন্তু এ আংটি ফেরত দেব কেমন করে আবার? নানাসাহেবের হাতেই দেব কি?'

'না, না—নানাসাহেবকে তো নয়ই।' তার পর আর একটু হেসে আমিনা বাঁ-হাতখানা হীরালালের কাঁধে রেখে ডান হাতে নিজের রেশমী ওড়না দিয়ে আজও সযত্নে তার ললাট ও কণ্ঠের ঘাম মুছে নিয়ে বলল 'ফেরত না-ই বা দিলে! আমার আংটিটা কাছে রাখতে কি ঘেন্না করবে তোমার?'

হীরালালের মুখ অরুণবর্ণ হয়ে উঠল। কিন্তু সে কোন উত্তর দিল না, শুধু আংটিটা একবার নিজের মাথায় ঠেকিয়ে সযত্নে পিরানের জেব্-এ রেখে দিল।

আমিনা অল্পক্ষণ নিঃশব্দে তার আনত মুখের দিকে চেয়ে রইল। তার পর একটা ছোট্ট দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সস্নেহ কণ্ঠে বলল, 'চল বাবুজী, তোমাকে সর্দারের জিম্মা করে দিই।'

হীরালাল দু জনকেই নমস্কার জানিয়ে আমিনার পিছু পিছু বের হয়ে এল।

॥ ১৭ ॥

অবশেষে এক সান্ধ্য-মজলিসে নানাসাহেব তাঁর অন্তরঙ্গ দু-এক জন 'বড় সাহেব-এর কাছে খবরটা ভাঙলেন। তিনি দিনকতকের জন্য একটু বাইরে ঘুরতে যাবেন—কাল্‌পী, লক্ষ্মৌ, দিল্লী, মীরাট। মাসখানেকের মধ্যেই অবশ্য ফিরবেন। ততদিন এঁদের একটু বিরহদশা ভোগ করতে হবে।

নানাসাহেব সাধারণত কানপুর ছেড়ে বড় একটা কোথাও নড়েন না। সুতরাং তাঁর ভ্রমণের সংবাদে তাঁর ইংরেজ বন্ধুরা বেশ একটু বিস্মিত হলেন বৈকি।

কিন্তু নানাসাহেব সকলকেই এক কথা বলে কৌতূহল পরিতৃপ্ত করলেন—'এবার আদায়-আগুাম বড়ই খারাপ হয়েছে। কোনমতে সরকারী খাজনাটাই উঠেছে মাত্র। কিন্তু তাতে তো আমার চলবে না!' তার পর একটু ম্লান হেসে বলছেন, 'এখন তো আর বাঁধা সরকারী পেনশন নেই—যা করে ঐ জমিজমাগুলোর আয়। এখন একটু দেখাশোনা করতে হবে বৈকি। তা ছাড়া কি জানেন, মাঝে মাঝে মালিক না গেলে গোমস্তা-তহসিলদাররা পেয়ে বসে। মনের সাধে চুরি শুরু করে দেয়। প্রজারা দিচ্ছে না—নাকি ওরাই চুরি করছে, সেটাও দেখা দরকার তো।'

এর পর আর কথা বলা চলে না। এমন কি একথাও জিজ্ঞাসা করা চলে না যে, কোথায় কোথায় তোমার এত জমিদারি আছে, আর উত্তর ভারতেই বা এত জমিজমা কে কখন খরিদ করল। আর একথাও সত্য যে এখন তো আর বাৎসরিক আট লাখ টাকা পেনশন নেই—এমন রাজার হালে চলে কি করে? নিশ্চয়ই বেশ কিছু জমিজমা আছে।

তবু ম্যাজিস্ট্রেট হিলার্সডন সাহেব একবার প্রশ্ন তুলেছিলেন, 'আপনার তো এত কর্মচারী রয়েছে, যারপরনাই মিস্টার টোপীই রয়েছেন—তবু আপনাকে যেতে হবে?'

নিজের হাতে তাঁর স্ফটিকপাত্রে মূল্যবান বিলাতী সুরা ঢেলে দিতে দিতে নানা ধুন্দুপন্থ জবাব দিয়েছিলেন, 'কৈ, ওদের দ্বারাও তো হচ্ছে না। যেখানে লাখ টাকার ওপর উসুল হবার কথা, সেখান থেকে এসেছে মাত্র ন হাজার টাকা।'

তার পর মুখ টিপে হেসে বলেছিলেন, 'তা ছাড়া এই ফাঁকে একটু
আসাও হবে। এমনি তো বেড়ানো হয় না—কী বলেন?'

'নিশ্চয়, নিশ্চয়। মাঝে মাঝে একটু বেড়ানো ভাল—খুব ভাল।' হিলার্স'র্ডন
সাহেব মাথা নেড়ে বলেন।

কেবল এখানে নবাগত ফাইনান্স কমিশনার গাবিন্‌স্ সামান্য ভ্রূ কুঞ্চিত
করে প্রশ্ন করলেন, 'কিন্তু আপনি যেসব স্থানগুলোর উল্লেখ করলেন—দিল্লী,
মীরাট, লক্ষ্ণৌ—সবই তো শহর। আপনার জমিজমা সব নিশ্চয়ই শহরে
নেই?'

'না—না!' তাড়াতাড়ি জবাব দিলেন ধুন্ধুপন্থ, 'শহরের নাম করলুম—
আপনারা সহজে চিনবেন বলে। দেহাতেও যাব বৈকি। তার আগে শহরে
গিয়ে কর্মচারীদের ডাকাব—তাদের কৈফিয়ত শুনব, তার পর সন্দেহ হলেই
দেহাতে যাব। যেতে হবে বৈকি।'

গাবিন্‌স্ শুষ্ককণ্ঠে শুধু বললেন, 'ওঃ।'

নানা এক ফাঁকে একবার তাঁর মুখের দিকে আড়ে তাকিয়ে নিলেন। কিন্তু
গাবিন্‌স্-এর মুখের প্রশান্তি তাতে নষ্ট হল না।

যথারীতি পান-ভোজন আদর-আপ্যায়নের পর সাহেবরা বিদায় নিলে
নানাসাহেব ইঙ্গিতে আজিমুল্লাকে কাছে ডাকলেন। তাঁর মুখে বেশ একটু
মেঘ ঘনিয়ে এসেছে ইতিমধ্যেই। আজিমুল্লা তাঁর পাশে এসে বসলে চিন্তিত
মুখেই বললেন, 'গাবিন্‌স্-এর কথাগুলো শুনলে? ওর গলার আওয়াজ বা
মুখের ভাব কোনটাই ভাল বোধ হল না। ও কি কিছু সন্দেহ করেছে?'

আজিমুল্লা মুখে একটা তাচ্ছিল্যসূচক শব্দ করে উত্তর দিলেন, 'আপনি
বড় সামান্যতেই বিচলিত হন পেশোয়াজী। গাবিন্‌স্ কী-ই বা সন্দেহ করবে?
কতটুকু আপনি করেছেন? আপনি তো সত্যই এখনও কোন কাজে হাত
দেন নি—কোন ষড়যন্ত্র করেন নি। গাছের পাতা নড়লেই যদি আপনি
ঝড়ের আভাস পান, তা হলে আমরা নাচার।'

নানাসাহেব ঈষৎ অপ্রতিভ হয়ে বললেন, 'না, তা নয়, ও লোকটা বড়
ধূর্ত!'

'তা ঠিক।' আজিমুল্লাও সায় দেন সেই কথাতে, 'এই গাধাগুলোর মধ্যে
ওরই যা একটু বুদ্ধি-সুদ্ধি আছে, কিন্তু তাতে ভয় পাবার কিছু নেই। ওর
কথা শুনে সতর্ক হবে—এমন বুদ্ধিও এদের নেই যে।'

নানাসাহেব চুপ করে বসে রইলেন কিছুক্ষণ। ভবিষ্যতের অনিশ্চিত এবং বিপজ্জনক নানা চিত্রই বোধ করি এই অত্যল্প সময়ের মধ্যে দ্রুতবেগে তাঁর মানসচক্ষুর সামনে দিয়ে সরে সরে গেল।

এইভাবে আরও কতকাল বসে থাকতেন কে জানে, অকস্মাৎ দূর থেকে তাত্যা টোপীকে আসতে দেখে তাঁর চমক ভাঙল। তিনি আজিমুল্লার দিকে ঈষৎ হেসে চুপি চুপি বললেন, 'দেখ, একটা কথা, হুসেনীর সঙ্গে তো তোমাব যোগাযোগ আছে, তার সঙ্গে নিশ্চয়ই তোমার দেখাও হয়—তাই না?'

নানাসাহেব জানেন তাঁরা একই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছেন—এটা আজিমুল্লা আকারে-ইঙ্গিতে টের পেয়েছেন বহু বারই। কিন্তু ঠিক কতটা তাঁদের ঘনিষ্ঠতা তিনিও কোনদিন মুখ ফুটে জিজ্ঞাসা করেন নি, আজিমুল্লারও জবাব দেবার প্রয়োজন হয় নি। আজ অকস্মাৎ এই প্রশ্নে আজিমুল্লার অপরাধী মন একটু চমকে উঠল কি?

উঠলেও তা অন্তত তাঁব শান্ত কণ্ঠস্বরে ধরা পড়ল না। তিনি মুহূর্ত কয়েক চুপ করে থেকে বললেন, 'দেখা তো প্রকাশ্যেই হয়।'

'আড়ালে?'

'হ্যাঁ, তাও একবার করতে হয়েছে। আপনারই প্রয়োজনে পেশোয়া।'

'না, না—আমি সেজন্যে কোন দোষ ধরছি না। আমার প্রশ্ন হচ্ছে—তাকে তোমার কী মনে হয়?...আমার জন্যে তার এত কী মাথা-ব্যথা?'

আজিমুল্লা উত্তর দিলেন, 'দেখুন, মেয়েদের মনের পুরো খবর স্বয়ং খোদাতালাও রাখেন কিনা সন্দেহ। তবে আমার যা মনে হয়েছে তা আমি বলতে পারি, কিন্তু সে আমারই বিশ্বাস, আপনাকে আমি জোর দিয়ে কিছু বলছি না—আপনি জানেন হুসেনী বেগম আপনার দাসী, উপপত্নী; কিন্তু সে শিক্ষিতা মেয়ে, সে আপনাকে স্বামী বলেই জানে। হিন্দুস্তানের কোন্ নারী না চায় স্বামীর অপমানের শোধ নিতে—কোন্ নারী না চায স্বামীকে উচ্চাসনে বসাতে? আমার মনে হয় এটা হুসেনী বেগমেব আপনার প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রেমেরই নিদর্শন!'

নানার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বোধ করি কথাটা তাঁর আন্তরিক বিশ্বাসের সঙ্গে মিলল। তিনি বললেন, 'তা বটে। কিন্তু—'

বক্তব্যটা শেষ হল না, তাত্যা টোপী এসে জোড়হাতে নানাকে প্রণাম জানিয়ে নানারই ইঙ্গিতে সামনে বসলেন।

নানা প্রশ্ন করলেন, 'সব প্রস্তুত তো ?'

'সব। কাল ভোর চারটেতে গাড়ি তৈরী হয়ে আপনার দোরে হাজির থাকবে। লোক বেশি দিলুম না। আপনার তিন জন চাকর আর পঁচিশ জন সওয়ার—এই হলেই চলবে আশা করি।'

'খুব—খুব।'

আরও দু-একটি খুচরো আলাপের পর নানা উঠে দাঁড়ালেন—'আজিমুল্লা, তুমি আমাকে এদিকের খবর দিয়ে রোজ একখানা করে খত পাঠবে। টোপীজী আপনিও। আমাদের যা সঙ্কেত আছে, সেই মত লিখবেন—আমি বুঝে নেব। এখন উঠি। কাল চারটের আগে স্নান-পূজা সেরে নিতে হবে। এধারে তো বারোটা বাজে!'

তাত্যা প্রশ্ন করলেন, 'আপনি আদালা বেগমের ঘরে থাকবেন তো? কোথায় গিয়ে ডাকবে আপনাকে?'

'আদালা? না—না। আমি হুসেনী বেগমের ঘরে থাকব।'

নানা চলে গেলেন। তাত্যা হুসেনীর নাম শুনে হয়তো কিছু বিস্মিত হলেন, কিন্তু আজিমুল্লার ওষ্ঠের প্রান্তে একটু কৌতুকের হাসিই ফুটে উঠল।

তাত্যা টোপী খানিকটা নিষ্পলক নেত্রে আজিমুল্লার মুখের দিকে চেয়ে থেকে একটা নিশ্বাস ফেলে বললেন, 'যাঁর জন্য এত করছি তাঁর যদি তোমার অর্ধেকও বুদ্ধি আর আর সাহস থাকত আজিমুল্লা!'

আজিমুল্লা ঈষৎ মাথা নত করে ধন্যবাদ জানালেন, 'মনে হয় খোদাও মাঝে মাঝে ভুল করে বসেন। যে মনিব হতে পারত, তাকে পাঠান কর্মচারী করে—আর কর্মচারী হবার যার যোগ্যতা তাকে করেন মনিব। আমি ভাবি—যদি আপনার মত বুদ্ধি আর সাহস পেতাম টোপীজী!'

তাত্যা টোপী মুখ টিপে হাসলেন একটু।

নানাসাহেব বিদেশ-যাত্রার পূর্বরাত্রিটা প্রিয়তমা আদালা বা আউলা বেগমের ঘরে না কাটিয়ে হুসেনীর ঘরে কাটাবেন, এটা কেউ অনুমান করতে পারে নি—শুধু হুসেনী ছাড়া। হুসেনীর বসে থাকবার ভঙ্গিতে নানাসাহেবের মনে হল সে যেন তাঁরই অপেক্ষা করছিল।

'তুমিও এখনও ঘুমোও নি হুসেনী?'

'না। আপনার প্রতীক্ষা করছিলাম।'

'তুমি আমাকে আশা করেছিলে ?' নানাসাহেব সত্যিই বিস্ময় বোধ করলেন।

'করেছিলাম বৈকি। পেশোয়াজী, আদালা বেগম আপনার নর্মসহচরী, কিন্তু কর্মসহচরী একমাত্র আপনার এই দাসী। আপনার মর্যাদা, আপনার প্রতিভা, আপনার শৌর্যের উপযুক্ত মূল্য বোঝবার মত শিক্ষা আদালার নেই। সে জানে না যে পুণ্যশ্লোক বিশ্বনাথ রাও, মহান্ বাজী রাও, কর্মবীর বালাজী রাও, দেশভক্ত মাধব রাওএর রক্ত আপনার ধমনীতে বইছে। সে জানে না যে ঈশ্বর আপনাকে সিংহাসনে বসে কোটি কোটি মানুষকে শাসন করবার জন্যই পাঠিয়েছেন—সুন্দরী নারীর আলিঙ্গনে দিন কাটাবার জন্তে নয়। আপনার জীবনে ক্রীতদাসীর স্থান আছে বটে—কিন্তু সে রণাঙ্গনের বিশ্রাম-মুহূর্তে শুধু !'

খুশী হলেন নানাসাহেব।

ঈষৎ হেসে পাগড়িটা খুলে তার হাতে দিলেন। সেটা সদ্যঃক্রীত একটা বিলেতী মেহগ্‌নি টেবিলের ওপর রেখে হুসেনী তাঁর কোমরবন্ধ, আঙরাখা ইত্যাদি খুলে নিল।

তার পর নানাসাহেব আরাম করে একটা দিওয়ানে বসলে সে তাঁর পা থেকে নাগরাটা খুলে নিয়ে একজোড়া ভেলভেটের চটি পরিয়ে দিয়ে ঈষৎ উচ্চকণ্ঠে ডাকল, 'মুসম্মৎ, তামাকু !'

মুসম্মৎ নানাকে আসতে দেখেই কলকেতে 'আগ চড়িয়েছিল'—কলকেতে তামাকু-টিকে সাজানোই থাকে—এখন গুড়গুড়িটা রেখে সসম্মানে ও সসংকোচে ফরসির মুখটা নানাসাহেবের হাতে ধরিয়ে দিয়ে চলে গেল। কিছুক্ষণ নিঃশব্দে ধূমপান করবার পর মুখ থেকে নলটা সরিয়ে নানাসাহেব বললেন, 'তুমি ঠিকই ধরেছ হুসেনী, আজ আর আদালাকে আমার প্রয়োজন নেই। আজ তোমাকেই আমার দরকার। তোমাকে আমার একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবার আছে।'

হুসেনীর মুখভাবে মনে হল সে প্রশ্নটাও অনুমান করতে তার বিলম্ব হয় নি। কিন্তু সে মুখে শুধু বলল, 'এখন খাবেন কিছু ? মহারাজকে কিছু আনতে বলব আপনার জন্তে ? একটু দুধ ?'

'না—না, তুমি ব্যস্ত হয়ো না। আমার যা খাবার তা আমি সন্ধ্যেবেলাই খেয়ে নিয়েছি।…হুসেনী, আজ একটা খবর পেলাম, তাতে আমি বড় বিচলিত

বোধ করছি। তুমি নাকি মাঝে মাঝে মুন্সী নানকচাঁদের বাড়ি যাও? একি সত্যি? আমার তো বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয় না।'

হুসেনী একটু হাসল। মধুর সে হাসি—কিন্তু তার অন্তরালে কিছু বিদ্রূপ বোধ করি ছিল। সে বলল, 'খবরটা কার কাছ থেকে পেয়েছেন তাও আমি জানি। ডুলিওয়ালাদের ডেকে আমার গতিবিধি সম্বন্ধে জেরা করেছেন। পেশোয়াজী, যদি আমার একথা গোপন করবার প্রয়োজন হত তো আমি ডুলিওয়ালাদের নিষেধ করতাম। আর তা হলে—কেটে দুখানা করে ফেললেও আপনি ওদের কাছ থেকে এ খবর বার করতে পারতেন না। হ্যাঁ, আমি নানকচাঁদের বাড়ি মধ্যে মধ্যে যাই। কিন্তু এতে এত বিচলিত হবার মত কী হল পেশোয়াজী?'

শেষের দিকে কণ্ঠস্বরটা একটু তীক্ষ্ণই শোনাল।

ধুন্ধুপন্থ একটু অপ্রতিভ হয়ে পড়েছিলেন, কিন্তু তবু তিনি বেশ উত্তেজিত ভাবেই বললেন, 'বিচলিত হব না। নানকচাঁদের সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক তা তুমি জান না। কিছুই তো পেলাম না—যা আছে সামান্য, পৈতৃক ধুলিগুঁড়ি, তারই লোভে স্বর্গত পেশোয়ার ভাগ্নেরা আমাকে তিতবিরক্ত করে তুলেছে। ⋯ পঞ্চাশটা মকদ্দমা চালাচ্ছে। নীচের আদালতে হারলে ওপরের আদালত—সেখানে হারলে আবার নতুন করে নীচের আদালতে ফিরে আসছে। তাদের কী সাধ্য যে, আমার সঙ্গে এই শত্রুতা করে—এতকাল ধরে? শুধু ঐ নানকচাঁদ আর চিম্‌নে আপ্পা। আপ্পা টাকা যোগাচ্ছে—আর নানকচাঁদটা তদ্বির করে বেড়াচ্ছে। তার সঙ্গে আমার হিতাকাঙ্ক্ষিণী প্রেয়সীর যোগাযোগ—এটা খুব সুখবর কি?'

নানা ধুন্ধুপন্থ রীতিমত উত্তেজিত হয়ে উঠলেন।

হুসেনীর মুখের হাসি কিন্তু মিলোয় নি। সে হেসেই জবাব দিল, 'মালিক, আপনি রাজপুত্র, রাজা—মানুষের চরিত্র সম্বন্ধে আপনার এর চেয়ে ঢের ঢের বেশী খবর রাখার কথা। নানকচাঁদ পাকা ব্যবসাদার, টাকা ছাড়া সে আর কিছুই চেনে না এ পৃথিবীতে। তবে তার একটি গুণ আছে—যার কাছে যেটুকু খায়, তার সেটুকু কাজ বিশ্বস্ত ভাবেই করে। ঋণটার পুরো উশুল দেয়।⋯ চিম্‌না আপ্পার টাকা খেয়ে সে আপনার বিরুদ্ধে যতটা তদ্বির করছে—আপনার টাকা খেলে ঠিক ততটাই তদ্বির করবে চিম্‌না আপ্পার বিরুদ্ধে। হয়তো দু জনের কাজ একসঙ্গেই করবে, কিন্তু একের কথা অপরকে জানাবে না। নানকচাঁদের

সঙ্গে আমার প্রয়োজনের সম্পর্ক। ষড়যন্ত্রের কাজে নানা মানুষকে প্রয়োজন হয় পেশোয়া—নানকচাঁদও সে প্রয়োজনের বাইরে নয়। তার যেটুকু কাজ সে ঠিকই করে এবং সে কথা কোন দ্বিতীয় প্রাণী জানতে পারে না। কালই সে আমাদের এক মহা উপকার করে দিয়েছে—কিন্তু সে কথা থাক। সে বিশ্বাস করে না যে আমরা জিতব, ইংরেজরা হারবে, তবু আমাদের যেটুকু দরকার সেটুকু উপকার সে ঠিকই করে দিচ্ছে। অবশ্য—টাকা খেয়েই।'

ধুন্ধুপন্থ নিঃশব্দে ধূমপান করছিলেন, আরও কিছুক্ষণ তেমনিই বসে রইলেন তার পর বললেন, 'কী করছ তোমরা, তা তোমরাই জানো। কী বিপদে শেষ অবধি পড়তে হবে তা কে জানে!'

হুসেনী তাঁর পায়ের কাছে এসে বসেছিল। এখন তাঁর পায়ে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলল, 'খোদা পয়মান, কিছুই আটকাবে না পেশোয়া। এটা তো জানেন, পলাশীর লড়াইএর পর ঠিক এক শ বছর পুরো হয়েছে। এইটেই ইংরেজের পতনের বছর।...আর এইটেই আপনার উত্থানেরও বছর।'

সে নানাসাহেবের চোখে চোখ রেখে একটু আবেগের সুরেই শেষের কথা-গুলি বলল। নানাসাহেব তার গাল নেড়ে আদর করে বললেন, 'আপনার বলছ কেন—বল আমাদের উত্থান। আমি একা উঠব না হুসেনী, তুমিও উঠবে। যদি গণপতি ভগবান দিন দেন, সুদিন আসে—তোমাকে ভুলব না।'

হুসেনী নড়েচড়ে বসল। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, 'রাত একটা বাজে। আর তিন ঘণ্টা বাদেই আপনার গাড়ি হাজির হবে। কাজের কথাগুলো এই বেলা সেরে নিই।...এই কাগজপত্রগুলো রাখুন। কোন্ কোন্ ছাউনিতে আমার কোন্ কোন্ লোক আছে, কোথায় কাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারেন—তার পুরো বিবরণ, তাদের নাম-ধাম সব লেখা রইল। কিন্তু খুব সাবধান, এ কাগজ আপনার কাছছাড়া করবেন না মোটে। করলে এ লোকগুলির তো জান যাবেই, আমাদের জানও খুব নিরাপদ থাকবে না।'

নানাসাহেব সবগুলি দেখে পড়ে ভাঁজ করে আঙরাখার জেবে রাখলেন। তার পর বললেন, 'আর সেই যে তুমি বলেছিলে, কমিসারিয়েটের একজনকে হাত করবে—ওখানকার খবর—'

হুসেনী উত্তর দিল, 'বড় মুস্কিল পেশোয়াজী, ওখানে সাহেব আর বাঙালী —এই-ই বেশি। বাঙালীরা বড় বেশি ইংরেজের ভক্ত, বিশেষ করে এই কেরানীরা। একটি ছেলেকে খানিকটা হাত করেছি, তবে সে কতটা খবর

আপনাকে দিতে পারবে তা জানি না। যাই হোক, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আপনি বিঠাটে পৌঁছলে আমার লোক তাকে আপনার কাছে হাজির করে দেবে। তার নাম হীরালাল। খুবই কম বয়স—বালক বললেই হয়। সুশ্রী চেহারা—নম্র শান্ত ছেলে। তবে জোর করে তার কাছ থেকে কিছু আদায় করার চেষ্টা করবেন না। সে ভাঙবে কিন্তু মচকাবে না।'

নানাসাহেব তাকিয়াতে এলিয়ে পড়লেন।

তন্দ্রাজড়িত কণ্ঠে বললেন, 'তোমার এধারের কী কী কাজ বাকি রইল—তা তো বললে না? আজিমুল্লা যে অনেক টাকা চাইছিল।'

'টাকাটার হুকুম দিয়ে রাখবেন খাজাঞ্চীকে। কাজের ফিরিস্তি আপাতত থাক। ঘুমে আপনার চোখ ঢুলে আসছে। আপনি ঘুমোন।'

হুসেনী লঘু কোমল হাতে তাঁর পায়ে হাত বোলাতে লাগল।

একটু পরেই নানাসাহেবের নিশ্বাস নিয়মিত হয়ে এল। গাঢ় ঘুমে তিনি আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছেন। হুসেনী এবার নিঃশব্দে তাঁর পদতল থেকে উঠে দাঁড়াল। তার পর পা টিপে টিপে একেবারে বাইরে এসে মৃদুকণ্ঠে ডাকল, 'মুসম্মৎ।'

'জী মালেকান!'

সর্দার খাঁকে খবর দে—আমার জন্যে যেন একটা ঘোড়া তৈরী রাখে। ভাল ঘোড়া। পেশোয়া রওনা হবার এক-ঘড়ি বাদে আমিও রওনা দেব।'

'একা?'

'না, সর্দারও সঙ্গে যাবে।'

'আমি না গেলে তোমার অসুবিধে হবে মালেকান!'

'তুই ঘোড়ায় চড়তে পারবি?'

'পারব—অভ্যাস আছে, তবে মরদের পোশাকে।'

'আমিও মরদের পোশাকে যাব। বেশ, তাই বলে দে।'

'কী কী সঙ্গে নেব মালেকান?'

'একটা করে আওরতের পোশাক—আর টাকা। আর কিছু দরকার নেই। আর শোন্, একটা খত আছে, আজিমুল্লা খাঁকে পাঠাতে হবে। এই নে।'

জামার ভেতর থেকে একখানা চিঠি বের করে দিল হুসেনী।

নানা ধুন্ধুপন্থ নানা জায়গা ঘুরে যখন লক্ষ্মৌ পৌঁছলেন, তখন সেখানকার হাওয়া রীতিমত গরম হয়ে উঠেছে। পর পর কদিনে অনেকগুলি ঘটনা ঘটে গেছে কিছুদিন পূর্বে আউটরাম বিদায় নিলে সরকার অযোধ্যায় চিফ কমিশনার রূপে পাঠিয়েছিলেন কভারলি জ্যাকসনকে। জ্যাকসন কড়া মেজাজের লোক —রূঢ় ব্যবহারের জন্যই বিখ্যাত। অযোধ্যা, বিশেষ করে লক্ষ্মৌ, তখনও ওয়াজেদ আলি শাকে নবাবি থেকে চ্যুত করার কথাটা ভুলতে পারে নি। ওয়াজেদ আলি শার যতই চারিত্রিক দোষ থাক, শাসন-ব্যাপারে যতই তাঁর শৈথিল্য থাক, তিনিই অযোধ্যার সিংহাসনের ন্যায়সঙ্গত অধিকারী। তাঁর নবাবি কেড়ে নেওয়াতে হিন্দু-মুসলমান কোন ভূমধিকারীই সুখী হন নি। তাঁদের নিজেদের ভয়ও বোধ করি ছিল কিছু কিছু—কে জানে আংরেজ সরকারের মতিগতি শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে পৌঁছবে। তাঁদের জমিজায়গা গুলো টিকলে হয়!

ফলে অসন্তোষের আগুন শুধু সাধারণ নাগরিকদের মধ্যে নয়—তাঁদের ছোঁয়াচে ও প্রভাবে তা সরকারী কর্মচারীদের মধ্যেও সংক্রামিত হয়েছিল। একে মা মনসা—তায় ধুনোর গন্ধ। এলেন জ্যাকসন। তিনি ইংরেজী সুশাসনের বড়ি দেশবাসীকে একরকম জোর করেই গেলাতে শুরু করলেন। তাঁর সঙ্গে আবার যোগ দিয়েছিলেন ফাইনান্সিয়াল কমিশনার গাবিন্স্। উভয়ে, পরস্পরের সঙ্গে রেষারেষির ফলে সুশাসনের তাণ্ডবনৃত্য জুড়ে দিলেন। বহু জমিদারের খাজনা বাড়ল। চাষীদের হয়তো কিছু সুবিধা হল, কিন্তু তা বোঝবার মত অবস্থা তাদের নয়। নূতন সেট্‌লমেণ্টে কাগজপত্র না দেখতে পারায় বহু জমিদারের খাস-জমি বাজেয়াপ্তও হল। নবাব-পরিবারের অনেকের পেনশন বন্ধ হল। নবাব অপসারিত হলে তাঁর বিরাটসংখ্যক মোসাহেব ও পারিষদের দলও বেকার হয়ে পড়েছিল; তাঁর সিপাহীদের চাকরি গিয়েছিল; তাঁর অমিতব্যয়িতার প্রধান সহায় ছিল যেসব ব্যবসায়ীরা, তাদের অবস্থাও শোচনীয় হয়ে উঠেছিল। ফলে পথে-ঘাটে অসন্তোষের বীজ ছড়াবার লোকের অভাব ছিল না। তাদেরই সহায়তায় মৌলবী অত সহজে এখানে গণ্ডগোল

পাকিয়ে তুলতে পেরেছিলেন। এ ছাড়া জ্যাকসন তাঁর উদ্ধত নির্বুদ্ধিতায় আরও কতকগুলি হঠকারিতা করে ফেলেছিলেন, হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই কতকগুলি দেবোত্তর সম্পত্তি কেড়ে নিয়েছিলেন—পুরাতন প্রাসাদ কেড়ে নিয়ে তাতে সরকারী দফতর বা দাওয়াখানা খুলেছিলেন—ভগ্ন সমাধি-মন্দির ধূলিসাৎ করে বাগান বসিয়েছিলেন।

এর ফলে অযোধ্যার অবস্থা যে শোচনীয় হয়ে উঠেছিল তা বলাই বাহুল্য। অবশেষে ক্যানিং-এরও টনক নড়ল। তিনি জ্যাকসনের ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে হেনরী লরেন্সকে এনে বসালেন। কিন্তু অযোধ্যা প্রদেশের অবস্থা তখন বোধ করি চিকিৎসার বাইরে চলে গেছে। লরেন্স এসে যথাসাধ্য করেছেন। অনেকের পেনশন আবার মঞ্জুর করেছেন, অনেকের জমি ফিরিয়ে দিয়েছেন। প্রতিপত্তিশালী লোকদের সঙ্গে দেখা করে মিষ্টবাক্যে তাদের প্রসন্ন করবার চেষ্টা করেছেন—কিন্তু তবু অসন্তোষ মেটে নি। একদিন তো প্রকাশ্যেই—লক্ষ্ণৌ শহরের রাজপথে একটা লোক খোদ লরেন্সের মুখেই কাদা ছুঁড়ে মারল। অপর কোন কমিশনার হলে আগুন জ্বলে যেত, কিন্তু লরেন্স অসীম ধৈর্যে সব সহ্য করলেন। তিনি বৃহত্তর আগুনের পূর্বাভাস পেয়েছিলেন—বুঝেছিলেন সামান্য ব্যক্তিগত অপমানকে প্রাধান্য দেবার সময় সেটা নয়।

এ সব খবরই নানাসাহেব পেয়েছেন।

আরও একটি জোর খবর পেয়েছেন। মিলিটারী সার্জন ডাঃ ওয়েলস্ ইতিমধ্যে এক কাণ্ড করে বসেছেন। শরীর অসুস্থ হওয়ায় একদিন হাসপাতালে ঢুকে তৈরী মিক্‌স্‌চারের বোতল মুখে লাগিয়ে তা পান করেছেন। এদেশের হালচাল তিনি জানেন না—এই সামান্য ব্যাপারের সুদূরপ্রসারী ফলাফল অনুমান করার মত অভিজ্ঞতা বা বিদ্যাবুদ্ধিও কিছু তাঁর নেই। কিন্তু এই খবরটি যথাস্থানে প্রচার করবার মত লোকের অভাব ছিল না। মৌলবী বন্দী হয়েছেন, কিন্তু আমিনা বেগম ও আজিমুল্লার বেতনভুক্ লোকের সংখ্যা খুব কমে নি। দেখতে দেখতে সংবাদটা ব্যারাকে ব্যারাকে ছড়িয়ে পড়ল। বিধর্মী ম্লেচ্ছ রাজশক্তি নানা ফন্দিতে তাদের ক্রেস্তান করতে চায়। ক্রেস্তানের উচ্ছিষ্ট ওষুধ খাইয়ে ক্রেস্তান করবার প্রয়াস তাদের পূর্ব-নির্ধারিত পরিকল্পনারই একটা কার্যক্রম মাত্র। সিপাহীরা আগুন হয়ে উঠল। ওয়েলস্ শুধু গোরুখোর নয়—শূয়োর-খোরও। সুতরাং তাঁর উচ্ছিষ্ট হিন্দু-মুসলমান সকলের কাছেই সমান অশুদ্ধ।

সিপাহীদের অসন্তোষের সংবাদ যথা সময়ে লরেন্সের কাছে পৌঁছল। তিনি তখনই নিজে হাসপাতালে গিয়ে ওষুধের বোতলটি কয়েক জন সিপাহীর সামনে আছাড় মেরে ভাঙলেন, ওয়েলস্‌কে সর্বজন-সমক্ষে তিরস্কার করলেন, তাঁকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করবারও ভয় দেখালেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। এটাকেও লোকে অভিনয়ের অঙ্গ বলে ধরে নিল। অসন্তোষের বহ্নি ধূমায়িত হয়েই রইল। অবশেষে সে বহ্নির বহিঃপ্রকাশ হল দিন-তিনেক পরে—সে আগুনে ডাঃ ওয়েলসের বাংলো পুড়ে ছাই হয়ে গেল।

সেই দিনই নানাসাহেব লক্ষ্ণৌ পৌঁচেছেন।

নিশীথরাত্রের সেই বহ্ন্যুৎসব তিনি নিজের চোখেই প্রত্যক্ষ করলেন।

অন্ধকারে দূর প্রাসাদের অলিন্দে দাঁড়িয়ে নানাসাহেব একদৃষ্টে সেই আগুনের দিকেই চেয়েছিলেন। অত দূরে থেকেও তার রক্তাভা তাঁর ভ্রূকুটিবদ্ধ মুখকে আরক্ত করে তুলেছিল। তিনি স্থির হয়েই দাঁড়িয়েছিলেন। আগুন কোথায় আর কেন লেগেছে সে সংবাদ আনতে তিনি লোক পাঠিয়েছিলেন। সে লোক ফিরে এসে খবরও দিয়েছে। তার পর থেকে কোন উদ্বেগ বা কৌতূহল তাঁর মুখে প্রকাশ পায় নি—আশ্চর্য রকমের স্থির হয়ে গেছেন।

আগুন অনেকক্ষণ ধরেই জ্বলল। সাহেবের বাংলো—কাঠ-কাঠরা আসবাব-পত্রের অভাব নেই। এবং যতক্ষণ তার রক্তাভা সেই তামসী রাত্রীর অন্ধ আকাশের এক প্রান্ত আলোকিত করে জ্বলতে লাগল, ততক্ষণ নানাসাহেব কোথাও নড়লেন না। বরং সেই অগ্নিকাণ্ডকে উপলক্ষ্য করে যে পৈশাচিক উল্লাস-কোলাহল উঠেছিল, দূরোত্থিত সেই কোলাহলের দিকে যেন একাগ্রচিত্তে কান পেতে ছিলেন। ক্রমে ক্রমে কোলাহল ও আলো দুই-ই মিলিয়ে এল। এবার নানাসাহেব তাঁর পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠলেন। এবং সঙ্গে-সঙ্গেই লক্ষ্য করলেন—কখন দীর্ঘকায় একটি লোক নিঃশব্দে তাঁর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। একটু চমকেই উঠলেন, কারণ রাজদরবারের সমস্ত আবহাওয়াই হল সন্দেহ ও সংশয়ের; ষড়যন্ত্র, হত্যা—এসব, নানাসাহেব যে পরিবারে ও যে যুগে মানুষ হয়েছেন, সে যুগে ও সে পরিবারের প্রতিদিনকার জীবনযাত্রার মতই সহজ ঘটনা। সুতরাং ভয়ও পেলেন—চকিতের মধ্যে হাতটা তাঁর কোমরে চলে গেল। সেখানে একটি পিস্তল গোঁজা।

অন্ধকার হলেও তাঁর কোন ভঙ্গি আগন্তুকের চোখ এড়ায় নি। তিনি নিজের

হাত দুটি স্থির রেখে ঈষৎ অভিবাদনের ভঙ্গিতে ঘাড় হেলিয়ে বললেন, 'বন্দেগী পেশোয়াজী, আমি আপনার বান্দা—মহম্মদ আলি খাঁ।'

'ও, খাঁ সাহেব! আসুন, আসুন, ঘরে চলুন!'

স্পষ্ট স্বস্তির আভাস তাঁর কণ্ঠস্বরে।

মহম্মদ আলি খাঁ বললেন, 'এখানেই ভাল—ফাঁকা ও নির্জন। ঘরে কথা কইলেই আড়ি পাতবার ভয় থাকে। বসুন না এখানে—চৌকি তো আছেই।'

তিনি পেশোযার দিকে একটা চৌকি এগিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

ধুন্ধুপন্থ নিজে বসে মহম্মদ আলি খাঁকেও বসতে ইঙ্গিত করলেন।

'তার পর?' প্রশ্নটা প্রায় নিজের অজ্ঞাতসারেই নানার মুখ দিয়ে বের হয়ে এল।

'কেমন দেখছেন আর শুনছেন বলুন। আপনি নিজে যে সরেজমিনে খোঁজ করতে বেরিয়েছেন এ আমাদের কাছে বড় ভরসার কথা পেশোয়াজী। উপযুক্ত সেনাপতির যোগ্য কাজ। কিন্তু সে যাই হোক, আপনার মোটামুটি ধারণা কী হল, সেইটেই শোনাবার জন্য কৌতূহল হচ্ছে'

'ধারণা?' কথাটা উচ্চারণ করে নানা কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন।

'ধারণা তো ভালই। সবই তো লক্ষণ দেখছি আমাদের অনুকূলে। সত্য কথা বলতে কি, কাজটা যে এতটা এগিয়েছে, তা আমি এতদিন ভাবতেই পারি নি। অবশ্য এর সবটাই যে আজিমুল্লা বা আপনাদের দ্বারা হয়েছে—এ-ও আমি বিশ্বাস করি না। কতটা আপনিই হয়েছে। তাই মনে হচ্ছে খাঁ সাহেব, এ যেন ভগবানেরই নির্দেশ। ইংরেজদের পাপ সহ্য করতে না পেরে স্বয়ং গণপতি ভগবানই যেন এই আগুন জ্বালিয়েছেন। না খাঁ সাহেব, এতদিন যেটুকু দ্বিধা আমার ছিল, আজ এইমাত্র তা চলে গিয়েছে। এবার থেকে আমি মনে-প্রাণে আপনাদেরই দিকে।'

মহম্মদ আলি খাঁ নিঃশব্দে হাসলেন। অন্ধকারে তাঁর ভ্রমর-কৃষ্ণ শ্মশ্রু ভেদ করে সে হাসির ঝিলিক দেখা গেল না। তা ছাড়া মুখের হাসি কণ্ঠেও ধরা পড়ল না। বেশ গম্ভীর কণ্ঠেই বললেন, 'কিন্তু পেশোয়াজী, উন্মত্ততা যুদ্ধ নয়। হঠাৎ আচমকা মারপিট করে কখনও একটা শক্তিকে হারানো যায় না। মুষ্টিমেয় আংরেজ এত বড় দেশটা দখল করেছে—তাদের শক্তিকে ছোট করে ভাবাও উচিত নয় কোনমতে।…আমি দু-দু বার [illegible] ঘুরে

এসেছি পেশোয়াজী—এদের আমি চিনি। অবজ্ঞা বা অবহেলা করবার মত শক্র এরা নয়।'

কথাটা বোধ করি পেশোয়ার ভাল লাগল না। তিনি ঈষৎ অসহিষ্ণু ভাবেই বললেন, 'আপনি কী বলতে চান?'

মহম্মদ আলি খাঁ তাঁর বিরক্তি লক্ষ্য করলেন বলে বোধ হল না। তিনি বরং আরও একটু গলায় জোর দিয়ে বললেন, 'প্রবল শক্রর সম্মুখীন হতে হবে—এই ভাবেই কাজে নামবেন। আগে থাকতে ভেবেচিন্তে কাজের ছক কেটে নিতে হবে আমাদের। কোথায় কোথায় আমরা ঘাঁটি করব সেটা ভেবে নেওয়া দরকার। ওদের একত্র হতে দিলে চলবে না। যেমন ছড়ানো আছে তেমনি ভাবেই শেষ করতে হবে। সেটা অবশ্য সহজ। কিন্তু কাজ তো ঐখানেই মিটবে না পেশোয়াজী। এত বড় সাম্রাজ্য ওরা এক কথায় ছেড়ে দেবে না। সেজন্য প্রস্তুত হতে হবে। কোথায় কী ভাবে ঘাঁটি করবেন, কে কোন্ দিক আগলাবে—এসব আগে থাকতেই ঠিক হওয়া দরকার। তা না হলে এত আয়োজন এত রক্তপাত সব পণ্ড হবে।'

নানাসাহেবের বিরক্তি ঢাকা থাকে না। তিনি বললেন, 'আপনি বড় বেশী দূর চিন্তা করেন খাঁ সাহেব। এত ভবিষ্যৎ ভাবলে কোন কাজই চলে না। মুষ্টিমেয় ইংরেজ এদেশ দখল করেছে ঠিকই, কিন্তু সে কাদের জোরে? তেলেঙ্গী সিপাইরা না থাকলে ক্লাইভ কিছুই করতে পারত না। যা করেছে দেশী সিপাইরাই। আমরা উজবুকের মত হাতে করে দেশটা ওদের হাতে তুলে দিয়েছি। আপসে ঝগড়া করে বাইরের শক্র ডেকে এনেছি। যদি সত্যিই আমরা এক হয়ে নিজের ক্ষমতা বুঝে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারি তো ওরা আর এদেশের মাটিতে নামতে সাহস করবে না। এই কটা ইংরেজ মরলেই যথেষ্ট শিক্ষা হবে ওদের। ওদের দেশ শুনেছি এতটুকু একরত্তি—হিন্দুস্তানের সব লোক রুখে দাঁড়ালে তাদের নজরেই ওরা ভয়ে কুঁকড়ে যাবে। হাতী নিজের দেহটা সব দেখতে পায় না—এই তো আফসোস।'

মহম্মদ আলি খাঁ বেশ একটু বিদ্রূপের সুরেই জবাব দেন, 'সে-ও যেমন আফসোস, কুয়ার ব্যাঙ তার কুয়াটাকেই জগৎ ভাবে—সেও তেমনি।'

নানাসাহেব এই রূঢ় বাক্যে যেন আঘাত খেয়ে সোজা হয়ে বসলেন, মহম্মদ তা লক্ষ্যও করলেন না। তিনি বলে চললেন, 'ইংরেজদের দেশ এতটুকু তা ঠিকই, কিন্তু ঐটুকু দেশেরই ক-জন লোক শুধু হিন্দুস্তানে নয়—তামাম

দুনিয়ার সব জায়গাতেই আজ তাদের রাজত্ব ফেঁদে বসেছে। ওরা ভীরু নয়, ওরা বোকা নয়—এ দুটোই মস্ত বড় কথা পেশোয়াজী। যদি আমরা এক হয়ে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারি, তা হলে অনেক কিছুই করতে পারব তা আমিও মানি। কিন্তু এ "যদি"টা অনেকখানি "যদি" পেশোয়াজী। এ দেশের মানুষ এক হয়ে দাঁড়াবে—এ আপনি আশা করেন? মানুষগুলো কি রাতারাতি পালটে যায়? সিন্ধিয়া, হোলকার, গায়কোয়াড়—সহজে আপনার কর্তৃত্ব মানবে? আপনি মানবেন বাহাদুর শাহের বাদশাহি? সবাই চাইবে এই সুযোগে নিজের নিজের দিন কিনে নিতে।…নিজেকে বড় শত্রুকে ছোট দেখবেন না পেশোয়াজী—তা হলে নিজের সর্বনাশকে নিজে ডেকে আনা হবে।…আপনি বলছেন, সবাই যদি এক হয়ে দাঁড়ায়—কারা কারা এক হবে তা খবর নিয়েছেন? বাঙালী, তেলেঙ্গী, রাজপুত, শিখ—এদের খবর রাখেন কী?'

বোধ করি মহম্মদ আলি খাঁর যুক্তিতে যত না হোক, তাঁর কণ্ঠস্বরের দৃঢ়তায় খানিকটা নরম হয়ে এলেন ধুন্ধুপন্থ। একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'তা আপনি কী করতে বলেন?'

'আপনারা—যাঁরা এর নেতা, তাঁরা বসে এসব কথা আলোচনা করুন, যদি প্রতি-আক্রমণ আসে তো কোথা দিয়ে কেমন করে আপনারা আত্মরক্ষা করবেন চিন্তা করুন। চারিদিকে ছড়িয়ে থাকলে সামলানো শক্ত হবে। দিল্লী থেকে শুরু করে আরা, ওধারে ঝান্সি পর্যন্ত—এই তো দেখছি আমাদের মূল ঘাঁটি। এর ভেতরেই আমাদের সমস্ত শক্তি সংহত করা উচিত। সাবধানে হিসাব করে সমস্ত কার্যক্রমের ছক কেটে ফেলুন। ইংরেজ খুব সহজ শত্রু নয়—আর এক বার সে কথাটা মনে করিয়ে দিচ্ছি পেশোয়া।'

নানাসাহেব আবারও কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, 'ইংরেজ সহজ নয় তা আমিও খানিকটা জানি বৈকি খাঁ সাহেব। তাইতো আমার এত সতর্কতা। আমি এখনও ওদের বিরুদ্ধে কোন কাজ করি নি—একটি আঙুলও তুলি নি। আসলে আমি এখনও সহকর্মীদের ঠিক বুঝতে পারছি না। বাজিটা খুব লোভনীয় বটে—মুক্তি আর রাজশ্রী, কিন্তু আর একদিকে সর্বনাশ, তাও ভুললে চলবে না। যথাসর্বস্ব পণ করতে হবে এই জুয়াখেলায়।'

মহম্মদ আলি খাঁ হঠাৎ প্রশ্ন করে বসলেন, 'আপনি কি তামাম হিন্দুস্তানের তখ্ত চান পেশোয়া ?'

নানাসাহেব অলক্ষ্যেও শিউরে উঠলেন। অন্ধকারেই, দূর আকাশের নির্বা-পিত-প্রায় অগ্নিশিখার আভাসে মহম্মদ খাঁর মুখখানা লক্ষ্য করবার চেষ্টা করে বললেন, 'না না—তেমন কোন লোভ আমার নেই। বাহাদুর শাহ বাদশা—তখ্ত তাঁর। তবে মহারাষ্ট্রের আমি ন্যায্য অধিকারী—নয় কি ? আপনি কী বলেন ?'

মহম্মদ আলি খাঁ হাসলেন। এবার আর সে হাসি চাপা রইল না। শুভ্র দন্তপংক্তি গুম্ফ শ্মশ্রু ভেদ করে বিকশিত হয়ে উঠল। তবে সে হাসিতে শব্দ ছিল না—বিদ্রূপের হাসিও ঠিক নয়। সে যেন নানাসাহেবের ছেলেমানুষির প্রতি এক চরম ধিক্কার।

তিনি বললেন. 'সকলেই একটা জিনিসের ওপর লোভ করবেন না পেশোযা—ভাগ করে নিতে শিখুন। অতি-লোভেই আমরা বার বার সব হারিয়েছি।' মহম্মদ আলি খাঁ উঠে দাঁড়ালেন।

'আপনি চললেন কোথায় ? কথাবার্তা তো কিছুই শেষ হল না !'

একটু যেন ব্যস্ত হয়েই ওঠেন নানাসাহেব।

'কথার তো কিছুই নেই। আমি নিজের ইমান ও ইসলামের নামে শপথ করে আপনাদের দিকে এসেছি। ইংরেজ আমার দুশমন—কত বড় দুশমন তা আপনি জানেন না। তাদের আমি ঘৃণা করি। যেমন করে হোক তাদের সর্বনাশই আমার লক্ষ্য। আমার কথার নড়চড় হবে না। যখন আগুন জ্বলবে, তখন বান্দাকে ঠিকই পাশে হাজির দেখবেন। রাজগীতে আমার লোভ নেই। কাজেই ওসব চিন্তা আপনারা করুন—সলাপরামর্শ যা করবার তাও আপনারাই করবেন। কাজের সময় আমি ঠিক থাকব—সেই সময়েই আমার দরকার। তবে যা বুঝেছি, আপনাদের ভালর জন্যই তা খোলাখুলি বলেছি—যদি ধৃষ্টতা হয়ে থাকে তো মাপ করবেন।'

'বসুন, বসুন—আর একটু বসুন।' নানাসাহেব একরকম তাঁর হাত ধরেই টেনে বসান, 'আচ্ছা, ইংরেজদের সঙ্গে আপনার এত দুশমনির কারণ কি ? অনেক দিনই জিজ্ঞাসা করব ভাবি—'

'দুশমন !' দূর আকাশের দিকে চেয়ে কতকটা অন্যমনস্কভাবেই বললেন মহম্মদ আলি খাঁ, 'দুশমন ! হ্যাঁ পেশোয়া—ইংরেজ আমার দুশমন ! সেই

জন্তেই আপনাদের দিকে এসেছি। নইলে আপনাদের ওপর শ্রদ্ধা আমার এতটুকু নেই। আমি জানি আপনাদের দৃষ্টি সংকীর্ণ, বুদ্ধি সংকীর্ণতর। ক্ষুদ্র স্বার্থবুদ্ধিতে আপনাদেব চিন্তাশক্তি আচ্ছন্ন। হিন্দুস্তানের স্বাধীনতা, শান্তি, সমৃদ্ধি—কোনটাই আপনাদের লক্ষ্য নয়। আপনারা যা চান সেটা আপনাদেরই সুবিধা। তবু, আমি আজ আপনাদের তাঁবেদাবি করছি—শুধু ঐ এক কারণে। ইংরেজ আমার দুশমন। যদি ওদেব রাজত্ব নষ্ট করতে না পারি, যদি ওদের জাতের সর্বনাশ করতে না পারি—অন্তত কয়েক জন ইংরেজকেও তো ঘায়েল করতে পারব। তবু খানিকটা জ্বালা মিটবে। এই এক লক্ষ্য আমাব।'

বলতে বলতেই মহম্মদ আলি খাঁর দৃষ্টি হিংস্র হয়ে ওঠে। সমস্ত মুখখানা কেমন একপ্রকার পৈশাচিক প্রতিহিংসায় বিকৃত দেখায়।

'কিন্তু—', নানা পুনরায় প্রশ্ন করলেন, 'এ দুশমনির কারণটা তো জানতে পারলাম না খাঁ সাহেব।'

কতকটা উদ্‌ভ্রান্তের মত নানাসাহেবের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে প্রাণপণ চেষ্টায় যেন বাস্তবে নেমে আসেন মহম্মদ আলি খাঁ, 'কারণ—হ্যাঁ, কারণ আছে বৈকি।··সব কথা হয়তো আজ বলতে পারব না, কিন্তু যা পারব তাও যথেষ্ট। আমি ইংরেজের হাতে-গড়া জিনিস নানাসাহেব, ছেলেবেলায় মিশনারীদের হাতে মানুষ হয়েছি, বেরিলী কলেজে সাহেবের কাছেই ইংরেজী পড়েছি। ওখানকার পড়া শেষ করে রুড়কিতে গিয়েছি ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে। প্রথম হয়ে বেরিয়েছি সেখান থেকে। বিদ্যাবুদ্ধিতে কোন ইংরেজের চেয়েই আমি কম নই।··কিন্তু পাস করে বেরিয়ে কোম্পানির চাকরি নিয়ে কী দেখলুম?··· দেখলুম সেখানে আমি জমাদার মাত্র এবং একেবারে মূর্খ এক ইংরেজ সার্জেন্ট আমার অফিসার। সে তার দেশে বোধ হয় মজুরের কাজ করত, ইঞ্জিনিয়ারিং তো কিছুই জানে না, তার মাতৃভাষাতেও কিছুমাত্র লেখাপড়া করে নি। অথচ ঐ মূর্খ লোকটা আমাদের সঙ্গে ঠিক কুকুর-বেড়ালের মত ব্যবহার করত, যেহেতু সে ইংরেজ, রাজার জাত—আর আমরা কালা আদমী। আমার টাকার অভাব নেই তা আপনিও জানেন। আমি চাকরি করতে গিয়েছিলুম—টাকার লোভে নয়। কাজ শিখেছি ভাল করে, ভাল কাজ দেখাব—এই আমার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু দেখলুম একদল মজুর নিয়ে পথে পথে মাটি কাটা ছাড়া কোন কাজের ভারই আমার উপর দেওয়া হল না। লেখালেখি করলাম, কোন ফল হল না। বরং ঐ লোকটা চটে গিয়ে আরও দুর্ব্যবহার করতে

লাগল। বিশ্বস্ত সেবার পুরস্কার পেলাম অপমান আর লাঞ্ছনা।…অগত্যা কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে এলাম। সেই দিনই প্রতিজ্ঞা করলাম—ইংরেজের কাছেই যে বিদ্যা শিখেছি তা একদিন ইংরেজের বিরুদ্ধে কাজে লাগিয়ে বুঝিয়ে দেব তার মূল্য। আমাকে অবহেলা করার দাম কড়া-ক্রান্তিতে বুঝে নেব।'

বলতে বলতেই আবার মহম্মদ আলি খাঁর মুখ-চোখের চেহারা উদ্‌ভ্রান্তের মত হয়ে উঠল। চোখের চাউনিতে তেমনি উদগ্র হয়ে ফুটে উঠল ঘৃণা। তিনি অস্থির হয়ে উঠে দাঁড়ালেন, 'মাপ করবেন পেশোয়া, এসব কথা এখন থাক, এসব কথা ভাবলে আমার জ্ঞান থাকে না। আমি এখন যাই।'

'এখন কোথায় যাবেন আপনি?'

'আমার বিবি আছে, দুটো বাচ্চাও আছে। তাদের আমিই এ দুনিয়াতে এনেছি। তাদের ওপর আমার কর্তব্য আছে একটা। জানি না কী আগুন জ্বলবে—কতদূর ছড়াবে তার শিখা। আমরা জিতলেও হয়তো আমি পড়তে পারি ওদের হাতে—হয়তো মারা যেতেও পারি। সেক্ষেত্রে আমার বাড়ি খুঁজে বার করা দুশমনদের পক্ষে কঠিন হবে না।… তাই ওদের দূর দেহাতে কোথাও সরিয়ে রেখে আসতে যাচ্ছি, যেখানে ইংরেজের গোয়েন্দা তাদের খুঁজে বার করতে পারবে না—আর আমি যদি কোন দিনই না ফিরি তো সেখানে তারা দুখানা রুটির অভাবে শুকিয়ে মরবে না।'

'আবার কবে আপনার দেখা পাব?'

'লড়াই যখন সত্যি-সত্যিই বেধে উঠবে, তখন আমি নিজেই ছুটে আসব। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন পেশোয়া, আজিমুল্লাকে আমি জবান দিয়েছি।…এখন চলি—বন্দেগী।'

নানাসাহেব তাঁর সঙ্গে সিঁড়ির মুখ পর্যন্ত এলেন। প্রশ্ন করলেন, 'কিন্তু আপনি কেন এসেছিলেন তা বললেন না।'

মহম্মদ আলি ফিরে দাঁড়ালেন। তাঁর মুখে বিচিত্র এক হাসি। সে হাসি এক শ বাতির ঝাড়ের আলোতে নানাসাহেবের চোখে না পড়বার কোন কারণ নেই। তিনি এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে নানাসাহেবের চোখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এসেছিলুম দুটি কারণে। তার মধ্যে মুখ্য কারণ হল আপনাদের কাছে ছুটি নেওয়া।'

'আর গৌণ কারণটা?' হাসি-হাসি মুখেই নানাসাহেব প্রশ্ন করেন।

'গৌণ কারণটা হল—' মহম্মদ আলি খাঁর মুখের হাসি ও চোখের দৃষ্টি বিচিত্রতর হয়ে ওঠে, 'আপনাদের চোখেই আপনাদের ললাট-লিপিটা পড়তে চেয়েছিলাম।'

'কী পড়লেন ?' যেন সাগ্রহে প্রশ্ন করেন নানাসাহেব। তাঁর মুখের হাসি তখন মিলিয়ে আসছে।

বাইরের তামসী প্রকৃতির দিকে আঙুল দেখিয়ে মহম্মদ আলি খাঁ বললেন, 'অন্ধকার! ঐ অমনি জমাট-বাঁধা অন্ধকার।...আপনি এখন আগুনটার দিকে তাকিয়ে ছিলেন না পেশোয়া? ঐখানেই ভবিষ্যৎলিপি পাঠ করে নিতে পারতেন। হঠাৎ আগুন জ্বলল—লাল হয়ে উঠল আকাশ। কিন্তু তার পর? যে তিমির সেই তিমির। অনেক পাপ আপনাদের সঞ্চিত আছে পেশোয়া—যুগ যুগ ধরে সেই পাপ জমছে। আপনারা দেশবাসীর বুকের রক্ত শোষণ করে এনে মা ভবানীর চরণে পুজো দিয়েছেন। আমরাও কম যাই নি। বিধাতার শাস্তি আজ মাথা পেতে নিতে হবে বৈকি! কোথাও কোন আশা নেই—কোথাও কোন আশা নেই!'

তার পর স্তম্ভিত নানাসাহেবকে উত্তর দেবার অবকাশ না দিয়েই মহম্মদ আলি দ্রুতগতিতে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলেন।

॥ ১৯ ॥

মহম্মদ আলি খাঁ রাস্তায় পড়ে বেশ দ্রুতপদেই হাঁটছিলেন। তাঁর গন্তব্যস্থানে পৌঁছতে চকের মধ্যে দিয়ে পথটাই সোজা হয়। পাড়াটা ভাল নয়, "রেণ্ডিমহল্লা" বলে মহম্মদ আলি খাঁর বরং ঘৃণাই ছিল, কিন্তু আজ একটু তাড়া আছে। তাই খানিকটা ইতস্তত করে তিনি সেই পথই ধরলেন।

শহরের সর্বত্রই আজ উত্তেজনা। সে উত্তেজনার ঢেউ এ পাড়াযও এসে পৌঁছেছে। দোকানপাট অন্যদিন এ সময় বন্ধ হয়ে যায়—আজ এত রাত্রেও সবগুলিই প্রায় খোলা আছে। বাজারের মাঝে-মাঝেই জটলা। সংকীর্ণ গলিপথে সবটুকু জুড়েই সে জটলা চলছে। ভিড় ঠেলে যাওয়াই শক্ত। 'ইংরেজ-রাজ' শেষ হয়ে এল, দরাজ-দিল নবাব ওয়াজিদ আলি শা আবার ফিরে আসছেন—অধিকাংশ জটলারই আলোচ্য বিষয় এই। এ সব আলোচনা

মহম্মদ আলি খাঁর কান ছিল না। তিনি অন্যমনস্ক ভাবেই পথ হাঁটছিলেন। পথের ভিড়ে বার বার গতি ব্যাহত হওয়াতে একটু অসহিষ্ণু হয়েও উঠেছিলেন। মাঝে মাঝে বেশ রূঢ়ভাবেই লোকজন সরিয়ে পথ করতে হচ্ছিল। গুজব-বাজদের এতে চটবার কথা, কেউ কেউ রোষ-কষায়িত নেত্রে তাকাচ্ছিলেনও, কিন্তু সেই গুজবচক্রে ব্যাঘাতকারীর দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহ, উগ্র ভ্রূকুটিবদ্ধ দৃষ্টি এবং কটিবন্ধে তরবারির দিকে তাকিয়ে কেউই শেষ পর্যন্ত তাঁকে ঘাঁটাতে সাহস করল না। তিনি কিছু বিলম্বে হলেও নির্বিবাদেই পল্লীর শেষ পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছলেন।

কিন্তু এই অবধি এসেই সহসা বাধা পেলেন তিনি।

চকবাজারের শেষপ্রান্ত থেকে যে রাস্তাটা বের হয়ে মচ্ছিভবনের অপেক্ষাকৃত চওড়া রাস্তাতে মিশেছে, সেই মোড়টায় পৌঁছে মহম্মদ আলি খাঁ লক্ষ্য করলেন, দুটি ঘোড়সওয়ার একরকম পথ জোড়া করেই দাঁড়িয়ে আছে। কিছু দূরে আরও এক জন। শেষ ব্যক্তিটির হাতে একটা ছোট মশাল। সেই আলোতে তার মুখখানা দেখা যাচ্ছে। এমন বীভৎস ও কদাকার মুখ মহম্মদ আলি খাঁ আর আগে কখনও দেখেন নি। তবু—মুখখানা যেন সম্পূর্ণ অপরিচিতও নয়।

পথটা এখানে একেবারেই নির্জন। কাছাকাছি পল্লীও বিশেষ নেই। বেশির ভাগই মাঠ ও সবজিবাগান। যা দু-একটা বাড়ি এদিকে আছে, তার অধিবাসীরা নিশ্চয়ই সকলে শহরে গিয়েছে তামাশা দেখতে ও উত্তেজনার মাধ্বী সুরা পান করতে। এই জনহীন পথে এমন ভয়াবহ দানবাকৃতি লোককে নিঃশব্দে স্থিরভাবে অপেক্ষা করতে দেখে যেমন ধারণা হয়—মহম্মদ আলির সেই রকমই হল। তিনি কোমরের তলোয়ারে হাত দিলেন।

আলোটা পিছনে—সুতরাং সামনে যে দু জন ছিল তাদের মুখে সে আলোর ছায়াই পড়েছিল—ফলে এতক্ষণ সে মুখ দুটি একেবারেই দেখা যায় নি। তারা এ পর্যন্ত কথাও বলে নি একটিও। নিঃশব্দে যতদূর সম্ভব স্থির হয়েই দাঁড়িয়েছিল। এবার এক জন কথা বলল, 'ভয় নেই মহম্মদ আলি খাঁ আমরা আপনার দুশমন নই। আপনি নির্ভয়ে এগিয়ে আসুন। তলোয়ার খোলার দরকার হবে না!'

নারীকণ্ঠ! পরিচিত—হ্যাঁ, পরিচিত বৈকি!

শুধু তাই নয়—এই বিশেষ বিদ্রূপের ভঙ্গিটিও যেন বহু বছরের বহু বিস্মৃতি পার হয়ে স্মৃতির দুয়ারে এসে একটা আচমকা ঘা দিল। সে আঘাতে মহম্মদ

আলি যেন চাবুক খাওয়ার মতই চম্‌কে উঠলেন। নিজের অজ্ঞাতসারে মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল—'আম্মিনা!'

ততক্ষণে অশ্বারোহিণীও ঘোড়া থেকে নেমে পড়েছে। একটু এগিয়ে বিমূঢ় মহম্মদ আলি খাঁর সামনে এসে ঈষৎ অভিবাদনের ভঙ্গিতে মাথা নুইয়ে সে বলল, 'আমি আপনারই অপেক্ষা করছিলাম খাঁ সাহেব।'

এবার আর বিদ্রূপের সুর নেই কণ্ঠে—বরং কেমন যেন একটা কুণ্ঠাই প্রকাশ পাচ্ছে।

মহম্মদ আলি খাঁও ততক্ষণে আঘাতটা সামলে নিয়েছেন। বরং সামান্য একটা ভ্রূকুটির আভাসও তাঁর মুখে ফুটে উঠেছে। তিনি শান্তভাবে প্রশ্ন করলেন, 'আমাকে আপনার কী দরকার বেগমসাহেবা?'

আম্মিনা তখনই জবাব দিতে পারল না। 'বেগমসাহেবা' শব্দটা তাকেও চাবুকের মত আঘাত করেছে। সেটা পরিপাক করতে সময় লাগল। তার পর বিনম্র নতমুখে জবাব দিল, 'একটা সাহায্য চাইবার ইচ্ছা ছিল—তাই।'

'কী সাহায্য বলুন?' নিস্পৃহ নিরাসক্ত কণ্ঠে মহম্মদ আলি খাঁ উত্তর দেন।

'লক্ষ্ণৌএর হাওয়া যথেষ্ট গরম হয়ে উঠেছে। সামান্য চেষ্টা করলেই এখন মৌলবী সাহেবকে উদ্ধার করা যায়। এ সময় তাঁকে বড় দরকার। তিনি এখানকার কয়েদখানাতেই আছেন।'

কিছুক্ষণ স্থির হয়ে থেকে মহম্মদ আলি খাঁ উত্তর দিলেন, 'বেগমসাহেবা, আমাদের লক্ষ্য এক—পথও হয়তো অনেকটা এক। কিন্তু আপনার প্রত্যক্ষ কোন কাজে আমি আসতে পারব না—মাফ করবেন।...প্রতিহিংসা পুরুষের কাজ, সে ভার আমিই স্বেচ্ছায় কাঁধে তুলে নিয়েছিলুম। তার জন্য আপনাদের এত নীচে, এত পাঁকে না নামলেও চলত। যা দেখলুম তা দেখবার জন্য বেঁচে থাকার প্রয়োজন ছিল না। এ দেখতে হবে জানলে বহুদিন আগেই এ দুনিয়া ছেড়ে খুদার দরবারে গিয়ে দাঁড়াতাম।...না বেগমসাহেবা, আপনার পথ আর আমার পথ এক হলেও একরকম নয়। মাফ করবেন। আমার ভরসায় আপনি এ পথে নামেন নি। আমিও আপনার কাছ থেকে কোন সাহায্য পাবার ভরসা রাখি না।... যা পারেন আপনিই করুন!'

মশালের আলোটা তখনও পিছনে। সুতরাং হুসেনী বেগমের মুখখানা আঁধারেই রইল আগাগোড়া। মহম্মদ আলি খাঁর কথাগুলো শেষ হতে না

প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল তা বোঝা গেল না। শুধু পাষাণ-প্রতিমার মত খানিক দাঁড়িয়ে থেকে কেমন একপ্রকার স্খলিত ভগ্নকণ্ঠে সে বলল, 'আপনার মত ধৈর্য আমার নেই মহম্মদ আলি খাঁ। তা ছাড়া আপনি কবে কী করবেন তার জন্যে অপেক্ষা করবারও কোন উৎসাহ পাই নি। আপনি বিয়ে করলেন, আপনার ছেলে-মেয়ে হল—নিশ্চিন্ত নিরাপদ সম্মানের জীবন আপনার। আমাদের আর কোন্ পথ খোলা ছিল—তাও জানি না। যদি দিশেহারা হয়ে এই পথেই নেমে থাকি তো আমাদের দু বোনের কারুরই লজ্জিত হবার কোন কারণ আছে বলে মনে করি না। জ্বালা আমাদেরই বেশি—নয় কি?··· তা ছাড়া আজ তিরস্কার করছেন, কিন্তু আপনার মধুময় দাম্পত্যজীবনের কোনও এক অবসরে আমাদের খবর নেওয়ার কথা মনে এসেছিল কি আপনার?

মহম্মদ আলি খাঁর মুখ এতক্ষণ উত্তেজনায় আরক্ত ছিল। এবার বিবর্ণ হয়ে উঠল। তিনি কিছুক্ষণ যেন কোন কথাই খুঁজে পেলেন না। তার পর ঈষৎ মাথা হেলিয়ে স্বীকার করলেন, 'হয়তো অপরাধ আমারই বেগমসাহেবা, কিন্তু তবু আপনার পাশে দাঁড়িয়ে কাজ করতে আর পারব না। সারা জীবনই উৎসর্গ করেছি এই কাজে। বাঁচবার আশা বা ইচ্ছা কোনটাই রাখি না, কিন্তু দূরে থেকেই আপনার সেবা করব।···মৌলবী সাহেবের মুক্তি আপনার পক্ষে ছেলেখেলা, তাও আমি জানি। আমাকে আপনার দরকার হবে না। আচ্ছা আদাব।'

তার পর—এ পক্ষ থেকে আর কোন উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করেই ঘোড়াগুলোকে পাশ কাটিয়ে তিনি নিজের পথে এগিয়ে গেলেন। অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই, সেই অন্ধকার দূর পথে তাঁর সাদা মূর্তিটা বিন্দুর মত দেখাতে দেখাতে এক সময় মিলিয়ে গেল।

আমিনা অনেকক্ষণ সেখানেই পাথরের মূর্তির মত নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তার পর একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে আবার এসে ঘোড়াতে উঠল। মুসম্মৎ কোন প্রশ্ন করল না, কারণ সে এদের কথোপকথন শুনতে না পেলেও এখন মশালের আলোতে মালেকানের বিবর্ণ মুখে ক্ষণে ক্ষণে রক্তোচ্ছ্বাস দেখে বুঝেছিল যে, এখানকার এই সাক্ষাৎকার মালেকানের পক্ষে প্রীতিকর হয় নি। তাই হুসেনী বেগম ঘোড়া ফেরাতে বিনাবাক্যে সে তার পিছু নিল। সওয়ার দুজন তেমনি ব্যবধান বজায় রেখে পেছনে পেছনে চলতে লাগল।

একটু পরেই দলটি চকবাজার ছাড়িয়ে আমিনাবাদের পথে এসে পড়ল। পথে পথে জটলা ও আলোচনার শেষ নেই—পথ চলাই দায়। আমিনার অবশ্য সেদিকে লক্ষ্যও ছিল না। সম্পূর্ণ অন্যমনস্কের মতই পথ চলছিল। ভিড় সরিয়ে মানুষ বাঁচিয়ে চলতে হচ্ছিল বটে, কিন্তু সব কাজই করছিল কতকটা যন্ত্রের মত—তাতে মন ছিল না। হয়তো বা সে নিজের বিচিত্র অদৃষ্টের কথা চিন্তা করছিল, অথবা কিছুক্ষণ আগেকার পরোক্ষ তিরস্কারের অপমানটাই সম্পূর্ণ পরিপাক করতে পারে নি।… মনটা একটা রুদ্ধ আক্রোশে দুর্ভাগ্যের দুয়ারে মাথা খুঁড়ে মরছিল, আর তারই ব্যর্থতা অসহায় চিত্ত-বিক্ষোভে মানসিক নিষ্ক্রিয়তা এনে দিয়েছিল বলে বাইরের কোন কিছুতেই মন দিতে পারছিল না!

কিন্তু সে যাই হোক, অকস্মাৎ তার মন অতীতের রোমন্থন ও চিত্তক্ষোভ থেকে একেবারে বাস্তবে ও বর্তমানে চলে এল। সামনেই যে জটলা তা ঠিক সাধারণ লোকের নয়—উত্তেজনাটাও যেন একটু অন্য ধরনের।

মনটাকে সম্পূর্ণভাবে পারিপার্শ্বিকে নিয়ে আসতে কয়েক মুহূর্ত দেরি লাগল। পুরোপুরিভাবে সচেতন হতে, দেখল কয়েকটি সিপাই একটি নিতান্ত নিরীহ লোককে ঘিরে দাঁড়িয়েছে এবং অত্যন্ত কটুভাষায় গালিগালাজ করছে।

'শালা বে-শরম কাঁহিকা—মার শালাকো।'

'বাংগালী এইসান বেইমান হ্যায়। ইংরেজ কা কুত্তা!'

চোখের পলকে আমিনা ভিড়ের মধ্যে ঘোড়া চালিয়ে দিল। সিপাইএর দল এই উপদ্রবে বিরক্ত ও রুষ্ট হলেও পথ না ছেড়ে দিয়ে তাদের উপায় রইল না। আমিনা কাছে এসে দেখল তার অনুমানই ঠিক, এদের গালাগালি ও ভীতি-প্রদর্শনের লক্ষ্যটি আর কেউ নয়—হীরালাল। এতগুলি সশস্ত্র সিপাইএর মাঝখানে অত্যন্ত বিপন্ন মুখে দাঁড়িয়ে আছে।

'কী ব্যাপার বাবুজী?' আমিনা বেশ একটু কর্তৃত্বের সুরেই প্রশ্ন করল।

হীরালাল এতক্ষণ পুরুষবেশী আমিনাকে চিনতে পারে নি। পথের আলোও এমন প্রখর নয় যে দেখা যাবে, কারণ ততক্ষণে দোকানপাট বন্ধ হয়ে এসেছে। তা ছাড়া এখানে এমন অবস্থায় সে তাকে দেখতে পাবে—এটা সুদূর কল্পনারও অতীত। যা হোক, কণ্ঠস্বরেই সে তার জীবনদাত্রীকে নিঃসংশয়ে চিনতে পারল এবং ইনি যে তার শুভাকাঙ্ক্ষিণী কোন দেবীই,

মূর্তিমতী মাতৃ-আশীর্বাদের মত সর্বদা সঙ্গে রয়েছেন সে বিষয়েও আর সন্দেহ মাত্র রইল না। সে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। সকৃতজ্ঞ আবেগে এক নিশ্বাসে সবটা বলে গেল—মীরাটের জেনারেল সাহেবের কাছ থেকে এক গোপনীয় ও জরুরী 'খৎ' নিয়ে সে লক্ষ্ণৌ এসেছিল। যথাস্থানে অর্থাৎ লরেন্স সাহেবের কাছে সে চিঠি পৌঁছে দিয়ে একটু শহর দেখতে বেরিয়েছিল। তার পর এখানের হট্টগোল ও উত্তেজনা দেখতে দেখতে রাত হয়ে গেছে, বিশেষত অগ্নিকাণ্ডটা দেখে সে একটু ভীত ও উদ্‌ভ্রান্তও হয়ে পড়েছিল—এতটা যে দেরি হয়েছে বুঝতে পারে নি। এখন পথ চিনতে না পেরে সিপাইগুলোকে দেখে পথ জিজ্ঞাসা করতে গিয়ে এই বিপদে পড়েছে। সিপাইরা জানতে চাচ্ছে—সে খতের মধ্যে কী লেখা ছিল। তারা কেমন করে যেন চিঠির খবর আগেই পেয়েছে।

'অথচ,' বিপন্ন ব্যাকুল কণ্ঠে হীরালাল বলল, 'মা-কালীর দিব্যি, আমি সত্যিই জানি না সে খতে কী লেখা ছিল—বিশ্বাস করুন। কিন্তু এরা তা মানতে চাইছে না। মেরে ফেলবে বলে ভয় দেখাচ্ছে।'

'তোমার কোন ভয় নেই বাবুজী, তুমি আমার সঙ্গে এসো।'

হুসেনীর বিচিত্র ছদ্মবেশ (কারণ এখন তাকে স্ত্রীলোক বলে চিনতে কারও অসুবিধা ছিল না) এবং মর্যাদা-ব্যঞ্জক ভাব-ভঙ্গিতে অনেকেই বেশ ঘাবড়ে গিয়েছিল। তবু ওরই মধ্যে এক জন সাহসে ভর করে কী বলতে গেল, 'লেকিন—'

আমিনা সামান্য ভ্রূভঙ্গি করে তার দিকে তাকাল। ততক্ষণে সে নিজের কোমর থেকে হাতির-দাঁতের-কাজ-করা পিস্তলটাও বের করেছে। সর্দারও বাঁ-হাতে মশাল ও ডান হাতে অস্বাভাবিক লম্বা একটা খোলা তলোয়ার হাতে বড় বেশী কাছে এসে পড়েছে। প্রশ্নকারীর মুখের প্রশ্ন মুখেই মিলিয়ে গেল।

আমিনা বললে, 'যে এর গায়ে হাত দেবে সে যেন জানের মায়া না রেখে দেয়।......নানাসাহেবের নাম শুনেছ? পেশোয়া ধুন্ধুপন্থ? তিনি লক্ষ্ণৌ এসেছেন তা জান? আমি একে তাঁর কাছেই নিয়ে যাচ্ছি—যা জিজ্ঞাসা করবার তিনিই করবেন। এসো বাবুজী!'

আমিনা একটা হাত বাড়িয়ে দিল, তার পর রেকাবে আটকানো নিজের পা-টা দেখিয়ে বলল, 'উঠে পড় শীগগির, তুমি নিশ্চয়ই এতদিনে ঘোড়ায় চড়তে শিখেছ?'

হীরালাল ঘাড় নেড়ে জানাল যে, আমিনার অনুমান ভুল নয়। কিন্তু তাই বলে সে আমিনার পায়ের ওপর পা দিতে পারল না, এমনিই এক লাফে অবলীলাক্রমে আমিনার পেছন দিকে উঠে বসল। আমিনার পায়ের ঈষৎ চাপ পেয়ে শিক্ষিত ঘোড়া চোখের নিমেষে ভিড়ের মধ্যে থেকে পিছু হটে বার হয়ে এল।······

তার পর এ-গলি সে-গলি ঘুরে আবার জনহীন পথ। আমিনার পিঠটা হীরালালের একেবারে বুকের সঙ্গে লেগে আছে। ওর বুকের স্পন্দন নিজের বুক দিয়ে অনুভব করছে সে। এ এক অত্যাশ্চর্য অভিজ্ঞতা। এ পথ আর পথ-চলা যদি জীবনে না ফুরোয় তা হলেও বোধ করি আপত্তি নেই।

'উঃ!' পিরানেরই এক প্রান্তে হীরালাল মুখের ঘাম মুছে বলল, 'আপনি এসে না পড়লে কী বিপদেই পড়তুম! আজ আর বোধ হয় প্রাণ নিয়ে ফিরতে হত না। আবারও আপনি আমার প্রাণ বাঁচালেন—বার বার তিন বার।'

'এ সব গোলমালের সময়, হাতিয়ার নিয়ে বেরোও না কেন বাবুজী? এত বড় একটা কাজে আসছ, চারিদিকে এত গণ্ডগোল—একটা পিস্তল চেয়ে আনতে পার নি?'

অপরাধীর মত মাথা চুলকে হীরালাল বলল, 'সাহেব দিতে চেয়েছিলেন, আমিই ওসব হাঙ্গামা দেখে নিই নি।'

'কাজটা ভাল করি নি বাবুজী।'

আরও কিছুক্ষণ নিঃশব্দে পথ-চলার পর হীরালাল দেখল তার এ একটা বিশ্রী রকমের অনুভূতি হচ্ছে। ঘাম যেন বেড়ে গেছে, গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে উঠেছে—বুকের মধ্যেও কেমন যেন করছে! ভয় হচ্ছে ওর ঘামে ভেজা পিরানটা থেকে হুসেনী বেগমের জামাটাও ভিজে উঠছে বোধ হয়। কী মনে করছেন না জানি উনি!

সে জোর করে কথা বলল, 'কিন্তু আমরা কোথায় যাচ্ছি এখন বলুন তো!'

নানাসাহেবের কাছেই। আমি যাব না, আমার সঙ্গে দেখা হয়েছে তাও তাঁকে বলো না···আমি লোক দিয়ে পাঠিয়ে দেব। তার পর—তোমাকে ছাউনিতে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থাও করব। ভয় নেই।'

'ভয় ? হীরালাল হঠাৎ বলে ফেলল, 'আপনার যখন দেখা পেয়েছি, তখন আর আমার কাউকেই কিছুতেই ভয় নেই।'

'তাই নাকি !' আমিনা হাসল। বিদ্রূপের সুর তার কণ্ঠে।

অন্ধকারেই হীরালাল বেচারী লাল হয়ে উঠল।

॥ ২০ ॥

হীরালাল শেষ পর্যন্ত যখন নানাসাহেবের প্রাসাদে পৌঁছল, তখন রাত শেষ হবার খুব বেশী দেরি নেই। কিন্তু নানাসাহেব সেদিন তখনও জেগে আছেন—বরং বলা চলে বেশ সজাগই আছেন।

দোতলার কোণের একটি বড় ঘর—খুবই বড়, এত বড় ঘর সাধারণত এসব দিকে দেখা যায় না—তারই মাঝামাঝি একটা চৌকি, তার ওপর দামী ফরাস বিছানো। সেই চৌকির ওপরই খুব কাছাকাছি ঘেঁষাঘেঁষি বসে জনতিনেক লোক নিম্নস্বরে আলাপ করছিলেন। তাঁদের একজন নানাসাহেব। বাকি দু জনের মধ্যে একজন বৃদ্ধ—হয়তো খুবই বৃদ্ধ বলা যেত, যদি না তাঁর তেজোব্যঞ্জক দেহ এখনও সোজা হয়ে থাকত। তাঁর চুল-দাড়ি-ভুরু যদিও সব পাকা—কপালে যদিও কুঞ্চনের অভাব নেই, তবুও তাঁর চোখের চাউনিতে গ্রীবার ভঙ্গিতে এবং মেরুদণ্ডের ঋজুতায় কী একটা ছিল—যাতে তাঁকে আদৌ বৃদ্ধ বা স্থবির বলে বোধ হয় না। অবশিষ্ট জন অর্থাৎ তৃতীয় ব্যক্তিটি আমাদের পূর্বপরিচিত—তাত্যা টোপী।

হীরালাল যখন হুসেনীর অনুচর এক অপরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে প্রাসাদদ্বারে এসে পৌঁছেছে, তখন এখানে ঘরের মধ্যে সেই প্রবীণ ব্যক্তিটিই কথা বলছিলেন, 'নানাসাহেব আংরেজের শক্তিকে ছোট করে দেখবার কোন কারণ নেই। কে মহম্মদ আলি খাঁ আমি চিনি না, কিন্তু তিনি সত্যি কথাই বলেছেন। আপনারা অনেকখানি লোভে এগোচ্ছেন, সেই সঙ্গে অনেকখানি বিপদের ঝুঁকিও ঘাড়ে নিচ্ছেন—এটা ভুলে যাবেন না।'

তাত্যা টোপী মুচকি হেসে বললেন, 'আপনি কি লড়াই শুরু হবার আগেই ভয় পাচ্ছেন সিংজী ?'

প্রবীণ ব্যক্তিটির তীক্ষ্ণ চোখ দুটিতে যেন বারেক বিদ্যুৎ খেলে গেল।

কিন্তু তিনি রাগ করলেন না, হাসলেন মাত্র। বললেন—'কুঁয়ার সিঙের ভয়! এ কথাটা কোন রাজপুত বললে আর পার পেয়ে যেত না টোপীজী। এমন কি কোন শিখ বা ফৌজীলোক বললেও তার রক্ষা থাকত না। কিন্তু মারাঠীরা সম্মুখযুদ্ধের ধার ধারে না—শৌর্যের চেয়ে কৌশলই তাদের বড় অস্ত্র। বীর বা সাহসীর মর্ম তারা বুঝবে এটা আমি আশা করি না। তাই আপনাকে ক্ষমা করলুম।'

এই বলে কুঁয়ার সিং একবার যেন নড়ে-চড়ে বসলেন, তার পর তাত্যা টোপীর দিকে একবার অবজ্ঞার দৃষ্টিতে তাকিয়ে নানাসাহেবের দিকে ফিরে বললেন, 'আংরেজ বেইমান, কিন্তু ওরাও সাহসী এবং বীর। ওদের আমি সত্যিই শ্রদ্ধা করি। সত্যি বলতে কি, আমার মত ভক্ত ওদের কেউ ছিল না। বিহারে ওদের এতদিনে শান্তিতে রাজত্ব করতে হত না—যদি না জগদীশপুরের কুঁয়ার সিং ওদের দিকে থাকত।......রেভিনিউ বোর্ডের ঐ কুকুরগুলো আমার পেছনে অকারণে লাগল বলেই না—। আর ঐ বেইমানের বাচ্ছা বেইমান হ্যালিডে সাহেব—ওরা যদি আমাকে মিছিমিছি অপমান না করত তো কুঁয়ার সিং কিছুতেই আর ওদের বিরুদ্ধে যেত না।···না নানাসাহেব আমি আপনাদের দিকে আসব জবান দিয়েছি, তবু বলছি যে ওদের আমি আজও শ্রদ্ধা করি। আমার বন্ধু টেলার সাহেবের মত সাচ্চা লোক তামাম হিন্দুস্তানে একটাও নেই।'

তাত্যা টোপী অসহিষ্ণুভাবে কী বলতে যাচ্ছিলেন, নানাসাহেব ইঙ্গিতে তাঁকে নিরস্ত করলেন। তিনি ধীরভাবেই কুঁয়ার সিংহকে প্রশ্ন করলেন, 'আপনি তা হলে কী শর্তে আমাদের দিকে যোগ দিচ্ছেন? আরার পুব থেকে সবটা আপনি চান—এই তো?'

কুঁয়ার সিঙের মুখে আবারও সেই হাসি ফুটে উঠল। সে হাসি ঔদ্ধত্যের নয়, অবজ্ঞারও নয়—অপরিসীম আত্মপ্রত্যয়ের। তিনি বললেন, 'ঐটুকু আমি নেব বলেছি, চাইনি কারুর কাছে। আংরেজকে যদি তাড়াতে পারি তো বাহুবলে ওটুকু আমি নিজের জন্য বাঁচিয়ে রাখতে পারব মামা ধুন্ধুপন্থ! তবে আপনাদের মত বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা আমার নয়। ওর বেশি আমি চাই না।'

তাত্যা টোপী আগের অপমানের জ্বালা এখনও ভুলতে পারেন নি বোধ করি। তিনি আর থাকতে না পেরে বললেন, 'এখন চাইছেন না বলে পরেও চাইবেন না—এমন কোন কথা নেই।'

'হয়তো মারাঠার নেই তাত্যা টোপী—রাজপুতের আছে। রাজপুত—বিশেষ করে যে হাতিয়ার ধরতে শিখেছে, তার কথার কখনও নড়চড় হয় না। তার জবান একটাই। আমি বেশির ভাগ রাজপুতের কথাই বলছি—দু-একটা বেইমান হয়তো আছে, তারা ধর্তব্যের মধ্যে নয়।'

তাত্যা টোপী এবার একেবারেই জ্বলে উঠলেন, 'আপনি বার বার আমাদের জাত তুলে কথা কইছেন কুঁয়ার সিং—হুঁশিয়ার।'

'সাবাস!' দাড়িতে মোচড় দিয়ে কুঁয়ার সিং আবারও বললেন, 'সাবাস। ···তবু এখনও এটুকু আত্মসম্মান-জ্ঞান যে আছে এটা দেখে সত্যিই খুশী হলুম। তাত্যা টোপী, গত দু শ বছরের ইতিহাসে নিজের জাতের কথাটা যদি একটু পড়ে দেখেন তো দেখবেন, জবান বলে কোন জিনিস আপনাদের কোন কালে ছিল না—বার বারই তা সুযোগ-সুবিধা মত বদলেছেন। কিন্তু রাজপুতের দু হাজার বছরের ইতিহাস পড়ে দেখবেন—দু একটার বেশি বেইমানির কথা খুঁজে পাবেন না সেখানে। তাও আছে কিনা সন্দেহ।··· শুনেছি ছত্রপতি শিবাজী আমাদেরই জ্ঞাতি ছিলেন। সেটা সত্যি হলে আরও লজ্জার কথা।'*

তাত্যা টোপী বিষম উত্তেজিতভাবে আর একটা কি কথা বলতে যাচ্ছিলেন, কুঁয়ার সিং কথাটা পাড়তেই দিলেন না। ইঙ্গিতে নিরস্ত করে বললেন, 'আমাকে ভয় দেখাবেন না টোপীজী। আমাকে এটুকু আশা করি আপনিও চেনেন। এই যে লড়াইতে নামছি, এ কিছুর লোভে নয়—প্রতিহিংসার জন্যই।···তাত্যা টোপী, নিজের বুকে হাত দিয়ে দেখুন দিকি, পেশোয়া ধুন্ধুপন্থের জন্যেই কি আপনার এত মাথাব্যাথা? সিংহের উচ্ছিষ্ট শৃগাল কতটা পাবে, অথবা সিংহই বা বলছি কাকে—শৃগালকে ঠকিয়ে মর্কট কতটা নিতে পারবে—এইটেই তো আপনাদের চিন্তা? আপনাদের আমি চিনি।'

অপমানে নানাসাহেবেরও মুখ কালো হয়ে উঠল, কিন্তু তিনি তাতলেন না। বরং ভ্রূকুটি করে তাত্যার দিকে চেয়ে তাঁকে ঠাণ্ডা করলেন, 'উঁহু-উঁহু, এসব ঝগড়া আর নয়। এই জাত তুলে ঝগড়া আর পরস্পরকে গালাগালি—এতেই আমরা গেছি।···আর আপনাকে কে না জানে কুঁয়ার সিং। যাক্,

* টডের মতে আলাউদ্দীনের আক্রমণকালে মহারাণা লক্ষণ সিংহের এক পুত্র সুজন সিংহ দাক্ষিণাত্যে পলায়ন করেন। তাঁরই কয়েক পুরুষ পরে এই বংশেই শিবাজীর আবির্ভাব হয়।

আপনার জবান পেয়ে আমরা অনেকটা নিশ্চিন্ত হলাম। টিকা সিং অবশ্য বলেছিল, তবু কিন্তু আপনি লক্ষ্মৌতে কেন এসেছিলেন তা তো জানা হল না।'

'নিতান্তই বিষয়কার্যে পেশোয়া। টাকা চাই তো। এখানে আমার কিছু জায়গীর ছিল, সেগুলো বেচে দিয়ে গেলাম।'

এই সময় দরজায় মৃদু টোকা দিয়ে একটি রক্ষী ঘরে প্রবেশ করল। তিন জনেই আত্মসংবরণ করে স্থির হয়ে বসলেন। রক্ষী ঈষৎ মাথা নত করে নানাসাহেবের সামনে নিজের হাতটা মেলে ধরল। সে হাতে একটি আংটি—চারকোণা লাল পাথরের আংটি।

নানাসাহেব আংটিটি দেখেই চিনলেন। একবার একটু ইতস্তত করে বললেন, 'আপনি একটু বসুন কুঁয়ার সিংজী, খুব জরুরী খবর আছে—আসছি আমি।'

তার পর তাড়াতাড়ি রক্ষীর সঙ্গেই বের হয়ে এলেন।

দ্বিতলেরই একটি ঘরে বসতে বলা হয়েছিল হীরালালকে। সে একটা কাঠের টুলের ওপর চুপ করে বসে অপেক্ষা করছিল। নানাসাহেব ঘরে ঢুকতেই সে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল।

নানাসাহেব তাকে বসতে বলে নিজেও একটা চৌকিতে বসলেন। তার পর অত্যন্ত মধুর হাসি হেসে বললেন, 'তার পর?'

হীরালাল জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাঁর মুখের দিকে চেয়েছিল। বলল, 'আপনি?'

'আমিই নানাসাহেব। নির্ভয়ে বল।'

'কিন্তু আমি তো আপনাকে চিনি না।'

বিরক্তিতে নানাসাহেবের ললাটে কুঞ্চন দেখা দিল। পরক্ষণেই তাঁর কথাটা মনে পড়ে গেল। তিনি ডান হাতের মধ্যমাঙ্গুলিটি মেলে ধরলেন। লাল চারকোণা পাথরের একটি আংটি—যেমন আংটি হীরালাল এনেছিল ঠিক তারই জোড়া। একেবারে একরকম দেখতে।

হীরালাল হাত তুলে একটি নমস্কার করে বলল, 'মাপ করবেন, আমি আপনাকে সত্যিই চিনতাম না।'

'ঠিক আছে। এখন বল—'

'আপনিই বলুন কী জানতে চান। তবে ইংরেজের ক্ষতি হয় এমন কথা কিছু বলতে পারব না।'

এবার নানাসাহেব আর বিরক্তি চেপে রাখতে পারলেন না। একটু রূঢ়স্বরেই প্রশ্ন করলেন, 'তা হলে মিছিমিছি এখানে এসেছ কেন, কী করতেই বা পাঠিয়েছে তোমাকে?...শুধু তোমার সুরত দেখতে আমি সময় নষ্ট করছি?'

তাঁর কণ্ঠস্বরের এই আকস্মিক রূঢ়তায় হীরালাল একটু ভয় পেলেও সে বিনীত দৃঢ়তার সঙ্গে বলল, 'যিনি আমাকে এখানে পাঠিয়েছেন, তিনিও জানেন যে সিপাইদের মতামত ছাড়া আমি কিছুই বলতে পারব না। আমি যাঁদের নিমক খাই তাঁদের অনিষ্ট হবে এমন কাজ করব না।'

'সিপাইদের মতামত জানালে অনিষ্ট হবে না?'

'সেটা তাঁরা আমায় জানান নি বিশ্বাস করে। তা ছাড়া সেটুকু আমি না বললেও ক্ষতি যা হবার তা হবেই।'

নানাসাহেব একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'সিপাইদের মত কী?'

'তারা কেউ আর ইংরেজ-রাজ চায় না—অন্তত বেশির ভাগই। তারা ভেতরে ভেতরে প্রস্তুত—শুধু একটা সুযোগের অপেক্ষা করছে।'

'তারা আমাকে চায়—আমাকে রাজা বলে মানতে চাইবে?'

'কেউ কেউ চায় বৈকি!...সকলে ঠিক হয়তো আপনার নাম জানে না—তারা বাহাদুর শার কথা বলছে।'

কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গেই বোধ করি আর একটা নির্দেশ—হীরালালের কাছে অলঙ্ঘনীয় আদেশ, মনে পড়ে গেল। সে নিমেষে যেন আরও ঘেমে উঠল, কথাটা ঢেকে নিতে অগত্যা সে একটা মিথ্যারই আশ্রয় নিল। বলল, 'কিন্তু আমি এটা বলছি প্রধানত মীরাটের কথা। এখানে এরা অনেকটা আপনার মুখ চেয়েই আছে।'

নানাসাহেবের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, বললেন, 'কেমন করে তুমি জানলে তা? তুমি তো এখানকার ছাউনির লোক নও?'

'আজ্ঞে, আমাকে প্রায়ই আসা-যাওয়া করতে হয়। এই তো আজই সারারাত প্রায় এখানে পথে পথে ঘুরেছি—সিপাইদের হল্লা শুনেছি। কদিন আগেও কানপুর ছাউনিতে এসেছিলুম।'

'তুমি যা বলছ তা আমি বিশ্বাস করতে পারি?'

'নিশ্চয়ই পারেন। যাঁর নির্দেশে আমাকে এখানে পাঠানো হয়েছে—তাঁর কাছে আমি মিছে কথা বলব না কিছুতেই। আর মিছে কথা বললে তো আমি আপনাকে অনেক ঝুটা খবরও দিতে পারতুম।'

নানাসাহেব কিছুক্ষণ স্থির নিষ্পলক নেত্রে তার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। তার পর বললেন, 'তোমাকে কে এখানে পাঠিয়েছেন—হুসেনী বেগম ?'

'হ্যাঁ—তাঁরই লোক। তাঁর হুকুমেই আমি এসেছি।'

মিথ্যা কথা এখনও হীরালালের মুখে সত্যিই আটকে যায়।

আরও কিছুক্ষণ স্থির হয়ে চেয়ে রইলেন নানাসাহেব। হীরালাল আগে থেকেই ঘামছিল। এখন সেই বিচিত্র দৃষ্টির সামনে বসে আরও ঘামতে লাগল। তার পিরানটা গায়ের সঙ্গে একেবারে লেপটে গিয়েছিল।

নানাসাহেব খুব মৃদু কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, 'তুমি তাঁকে খুব ভালবাস—না ?'

হীরালালের মুখ আরক্ত ছিলই—এখন প্রায় রক্তবর্ণ ধারণ করল। সে দু হাত মাথায় ঠেকিয়ে বলল, 'কে না তাঁকে ভালবাসে ? তিনি দেবী। আমি প্রত্যহ ঘুম থেকে উঠে আগেই তাঁকে প্রণাম জানাই মনে মনে।'

'কেন, হঠাৎ এত ভক্তি তোমার ? তুমি তো হিন্দু -হয়তো ব্রাহ্মণ। তিনি তো মুসলমানী।'

'তিনি দেবী। তিনি বার বার আমার প্রাণ বাঁচিয়েছেন। যখনই বিপদে পড়ি তখনই তিনি যেন মা দুর্গার মত আবির্ভূত হয়ে আমাকে রক্ষা করেন।'

'সে করেন—তিনিও তোমাকে ভালবাসেন বলে। তোমার এই কাঁচা বয়স, খুবসুরত চেহারা—ভাল তো বাসতেই পারেন।'

ইঙ্গিতটা পুরো না বুঝলেও কথাগুলো হীরালালের তত ভাল লাগল না। সে একেবারে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় যেদিন হয়, সেদিনই তিনি আমার জীবন দান করেন। তখনও তিনি আমাকে ভাল করে দেখেন নি।'

'কি রকম ? কি রকম ?' নানাসাহেব সাগ্রহে প্রশ্ন করেন।

'আমি গঙ্গায় ভেসে যাচ্ছিলাম—উনি নৌকো থেকে দেখতে পেয়ে আমাকে টেনে তোলেন। নিজের প্রাণের মায়া না করেই উনি ঝাঁপিয়ে পড়ে তুলেছিলেন।'

বলতে বলতে হীরালাল উত্তপ্ত হয়ে উঠল যেন, 'উনি মানবী নন—সাক্ষাৎ জগদ্ধাত্রী! সকলেই ওঁর আশ্রিত। সকলের ওপরই ওঁর মায়া। বিশেষ কোন কারণে আমার ওপর দয়া করেছেন তা নয়। দয়া না করে উনি থাকতে পারেন না।'

নানাসাহেব তখনও সেই বিচিত্র দৃষ্টি মেলে তার দিকে চেয়ে ছিলেন, বললেন, 'হুঁ।...তা তোমাদের দেখা হয় কখন?...তুমি তো মীরাটে থাক।'

'দেখা হয় মানে? আজ পর্যন্ত তিন-চার দিনই মাত্র দেখা হয়েছে।'

'আজ?' সঙ্গে সঙ্গে তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে নানাসাহেবের কৌতূহল, 'আজ কোথায় দেখা হল?'

হীরালাল পিরানের প্রান্তে ললাটের ঘাম মুছে বলল 'আজ দেখা হয়েছে আমি এমন কথা তো বলি নি আপনাকে।·এখন আমি যাই। ভোর হয়েছে, ছাউনিতে পৌঁছতে হবে এখন। এসব ব্যক্তিগত কথা বলার জন্যে আমি আসিও নি।'

সে ঘাড় হেঁট করে আবারও একটা নমস্কার করে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

হীরালাল চলে যাওয়ার বহুক্ষণ পর পর্যন্ত নানাসাহেব স্থির হয়ে বসে রইলেন। বিরাট এক বিপর্যয় আসন্ন। তাতে ঝাঁপ দিয়ে পড়তে হবে। একদিকে হয়তো সর্বনাশ—মৃত্যু। আর একদিকে মহারাষ্ট্রের—হয়তো বা সারা ভারতের সিংহাসন। অনেকখানি ঝুঁকি—অনেকখানি লোভ। কিন্তু এই মুহূর্তে কি তিনি ঠিক সেই কথাই ভাবছিলেন? হয়তো তা নয়। কোন্ এক বিচিত্র কারণে তাঁর মন চলে গিয়েছে—এসব জটিল এবং গুরুতর কথার বাইরে—নিতান্তই তুচ্ছ এক ব্যক্তিগত প্রসঙ্গে। সেখান থেকে মনটাকে ফিরিয়ে আনা যাচ্ছে না। কে জানে কেন—এই বালককে দেখে তিনি মনে মনে একটা ঈর্ষাই অনুভব করছেন।...এমন কি ওকে দেখবার আগেও, আজ সারা সন্ধ্যা ধরেই কোনও এক অজ্ঞাত কারণে তাঁর মনে নিজের ভবিষ্যৎ অপেক্ষাও যে প্রশ্নটা বড় হয়ে উঠেছে, সেটা হচ্ছে এই—হুসেনী কি সত্যিই তাঁকে ভালবাসে, তাঁর জন্যই এত কাণ্ড করছে? না কি অন্য কোন গূঢ় উদ্দেশ্য আছে—তাঁকে সে ক্রীড়নক হিসেবে ব্যবহার করছে মাত্র?

নানা ধুন্ধুপন্থ বুদ্ধিমান ব্যক্তি। বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রেরই ঠকবার ভয়টা বড় বেশি। কারও দ্বারা প্রবঞ্চিত হবার সম্ভাবনা আছে—একথা মনে হলেই অস্বস্তিতে মন ভরে ওঠে তাঁর। আর তিনি নির্বোধ নন বলেই হুসেনীর এই আপাত-গভীর প্রণয় নিশ্চিন্ত মনে গ্রহণ করতে পারেন না। মনে হয় হুসেনী তো তাঁর বহু রক্ষিতার মধ্যে একজন মাত্র। তার এত নিঃস্বার্থ ভালবাসার

কারণ কি? অথবা সত্যি-সত্যিই তাঁকে বাদশা করে সেই বাদশার প্রিয়তমা বলে গণ্য হবার সম্ভাবনাতেই সে খুশী?

নানাসাহেবের ললাটে আবারও ভ্রূকুটি ঘনিয়ে এল। তিনি অস্থির হয়ে উঠে দাঁড়ালেন।

ঠিক সেই মুহূর্তে ঘরের কপাট খুলে ভেতরে প্রবেশ করল আর একটি স্ত্রীলোক।

নানা চমকে উঠলেন।

'আদালা!'

'জী। আপনার বাঁদী।'

'তুমি এখানে? তুমি এখানে কেন? আমি লক্ষ্ণৌ আছি কে বললে তোমাকে?'

'বলছে আমার দুর্ভাগ্যই! আপনি চলে এলেন—আমাকে বলে এলেন না। আসবার আগের দিন একবার আমাকে দেখা পর্যন্ত দিলেন না।...ঐ সর্বনাশী আপনার সর্বনাশ করার জন্য চারিদিকে জাল পাতছে, আর আপনি বোকার মত—পতঙ্গের মত সেই জালে জড়িয়ে পড়ছেন!'

'বোকার মত' কথাটা ভাল লাগার কথা নয়—নানাসাহেবেরও লাগল না। তিনি বিরক্তির সঙ্গে বললেন, 'কত বার বলব আদালা, তুমি এসবের মধ্যে নাক গলাতে এস না। তোমার স্থান আমার শয্যায়—তার বেশি নয়। হুসেনী আমার উপযুক্ত সহচরী, তার বিদ্যাবুদ্ধির কণামাত্রও তোমার নেই—তুমি চাও তাকে হিংসে করতে!...তোমাকে পছন্দ করি আদালা তুমি বেশী সুন্দরী বলে —কিন্তু দরকার আমার হুসেনীকে বেশি!'

'ঐ রাক্ষুসী আপনাকে জাদু করেছে পেশোয়া! তাই আপনি ওর কোন দোষ দেখতে পান না। কিন্তু আমাকে যতটা বোকা ভাবেন আমি ততটা নই। আমি সব জানি। ইংরেজদের সঙ্গে লড়াই করা আপনাদের কাজ নয়, সে কথা হুসেনীও জানে। ওর নিশ্চয়ই কোন বদ মতলব আছে—তাই জেনে-শুনে আপনাকে এই সর্বনাশের মধ্যে টেনে আনছে।'

আরও বিরক্ত হয়ে নানাসাহেব বললেন, 'তুমি যা জান না আদালা, তা নিয়ে বোকার মত কথা বলতে এস না। তোমার এখানে আসা ঠিক হয় নি। কার হুকুমে তুমি বিঠুর ছেড়ে এখানে এসেছ?'

'হুসেনী কার হুকুমে এসেছে পেশোয়া?'

'হুসেনী।' বিরক্তি ছাপিয়ে নানাসাহেবের কৌতূহল প্রবল হয়ে ওঠে।

'হ্যাঁ, আপনার পেয়ারের হুসেনী। আপনি বিঠুর ছাড়বার এক দণ্ডের মধ্যেই সে বেরিয়ে পড়েছে তা জানেন কি?'

'সে তো মাঝে মাঝেই বাইরে যায়। সে কাজেই যায়।' নানাসাহেব কণ্ঠস্বরে অকারণ জোর দিলেও তাঁর সংশয় চাপা পড়ে না।

'হ্যা, কিন্তু সে ছায়ার মত আপনার পিছু-পিছুই ঘুরছে। সে আর তার সেই পেয়ারের কসাই—দানোর মত দেখতে। হুসেনী বেগমের রুচি কিন্তু বেশ।'

নানা একটু অসহিষ্ণু ভাবেই বলেন, 'ও ওর বাপের আমলের চাকর। একা ঘোরাঘুরি করবার সময় পাছে কোন বিপদ হয় তাই ওকে সঙ্গে নেয়। আমার অনুমতি নিয়েই ওকে সঙ্গে নেয় সে!...আর পেয়ারের লোক হবার মত সুরত ওর নয়!'

'তা তো নয়।' আদালার কণ্ঠস্বর থেকে যেন মধু ঝরে পড়ে, 'কিন্তু এই যে খুবসুরত ছোকরা একটু আগে বেরিয়ে গেল এ ঘর থেকে, তার চেহারা কেমন পেশোয়া?...যদি বলি যে, মাত্র কয়েক দণ্ড আগেই আপনার প্রিয়তমা হুসেনীকে আর এই ছোকরাকে এক ঘোড়ায় গায়ে গা লাগিয়ে বেড়াতে দেখেছি লক্ষ্ণৌএর রাস্তায়, যদি বলি যে, এই ছোকরার বুকে আপনার প্রিয়তমা এলিয়ে পড়েছিলেন—তবে?'

'ঝুট্‌! আদালা, তুমি বড় বেইমান। তোমার ঐ জিভ কুকুর দিয়ে খাওয়াব আমি তোমার সামনে।'

নানাসাহেবের কণ্ঠস্বর ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে।

'খোদা কসম!' আদালাও সদম্ভে জবাব দেয় 'বেশ আমার জিভই জামিন রইল। আপনি নিজে খোঁজ করুন। যদি আমার কথা মিছে হয় তো আমি নিজে হাতে এই জিভ কেটে দেব।'

নানাসাহেবের মুখের চেহারাটা যে পৈশাচিক রকমের ভয়াবহ হয়ে উঠেছে, তা বোধ হয় তিনি নিজেই বুঝতে পারলেন। তাই প্রাণপণ চেষ্টায় নিজেকে খানিকটা সামলে নিয়ে অপেক্ষাকৃত শান্তকণ্ঠে ডাকলেন, 'গণপৎ!'

কিছুক্ষণ আগে যে রক্ষীটি তাঁর কাছে এসেছিল, সে-ই প্রণাম করে এসে দাঁড়াল।

'একটু আগে যে ছোকরা এসেছিল এখানে, তাকে তোমার মনে আছে?'

'আছে পেশোয়া!'

'তুমি আর একজন কেউ—এখনই ছুটো ঘোড়া নিয়ে যাও। সে ছোকরা ছাউনির দিকে গেছে। পায়ে হেঁটেই যাবে সম্ভবত। এতক্ষণ বেশী দূরে যেতে পারে নি, তাকে ধরে নিয়ে এস। ব'ল যে খুব জরুরী একটা কথা আছে! সহজে না হয়, জোর করে এনো—দরকার হয় বেঁধে এনো।'

গণপৎ আবারও প্রণাম করে নিরুত্তরেই বার হয়ে গেল।

নানাসাহেব নিজের মুখভাবকে আরও কিছুটা সহজ হবার সময় দিয়ে বললেন, 'আদালা, তুমি এখানেই অপেক্ষা কর।'

তার পর ঘর থেকে বের হয়ে বারান্দায় পড়লেন। তাত্যা টোপী ও কুঁয়ার সিং বসে আছেন। কিন্তু তা হোক, এখনই গিয়ে তাঁদের সঙ্গে কথা কইবার মত ঠিক মানসিক অবস্থা তাঁর নয়। তিনি ঊর্ধ্বে জ্যোতির্ময় আকাশের দিকে চেয়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

ততক্ষণে ভোর হয়ে গেছে। চারিদিকে পাখী-পাখালির ডাক শুরু হয়েছে। বৈশাখের শেষ-রাত্রি। বাতাস রীতিমত ঠাণ্ডা। কিন্তু সেই হু-হু ঠাণ্ডা বাতাস এবং মধুর প্রাকৃতিক পরিবেশও নানাসাহেবের আতপ্ত ললাটকে কিছুমাত্র শীতল করতে পারল না।

॥ ২১ ॥

যে রক্ষীটি পথ দেখিয়ে নিয়ে গিয়েছিল, সে-ই আবার হীরালালকে প্রাসাদদ্বার পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে গেল। বোধ কার অজ্ঞাত কোন নির্দেশেই সে এতখানি ভদ্রতা করে থাকবে। কিন্তু যেখানে হুসেনী বেগম আছেন, সেখানে ব্যবস্থার কোন ত্রুটি হবে না--এটা কেমন করে যেন হীরালালের বিশ্বাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। কাজেই সে রাজবাড়ির প্রহরী বা রক্ষীর এতটা ভদ্রতাতেও বিস্মিত হল না। তবে প্রাসাদের বাইরে এসে সে একটু বিব্রত বোধ করল। রক্ষীটি ততক্ষণে তার কর্তব্য শেষ হতেই, কাটা ফটক বন্ধ করে সরে পড়েছে। বাইরের গলিপথটা তখনও যেন অন্ধকার এবং জনমানবশূন্য। কাকে পথ জিজ্ঞাসা করবে বুঝতে না পেরে সে বোকার মত এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল। হয়তো বা কিছু নিরাশও হল।

কিন্তু সে কয়েক মুহূর্তমাত্র। দেখা গেল হুসেনীর ওপর থেকে তাঁর বিশ্বাস টলবার মত কোন কারণ ঘটে নি। কোথা থেকে, পশাপাশি অট্টালিকাগুলির জমাট বাঁধা ছায়ান্ধকার ভেদ করে নিশীথচারী দৈত্যের মত বের হয়ে এল সর্দার খাঁ।

তবে আজ আর তাকে দেখে হীরালাল ভয় পেল না। বরং সাগ্রহে এগিয়ে এসে প্রশ্ন করল, 'বেগমসাহেবা আপনাকে পাঠিয়েছেন বুঝি? তিনি কোথায়? বাড়ি গেছেন?'

এসব প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার কোন প্রয়োজনই বোধ করল না সর্দার খাঁ, সে সংক্ষেপে শুধু বলল, 'আমার সঙ্গে চলুন।' এবং হীরালাল আসছে কিনা না দেখেই লম্বা লম্বা পা ফেলে সে নিজে চলতে শুরু করে দিল।

তার সঙ্গে তাল রেখে চলা কষ্টকর। তবু হীরালাল অনেক চেষ্টায় কতকটা তার পাশাপাশিই চলতে লাগল। কিন্তু দেখা গেল সর্দার খাঁ নির্বিকার। সে সোজা সামনের দিকে তাকিয়ে হাটছে—হীরালালের দিকে চেয়েও দেখছে না।

'খানিক পরে হীরালালই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করল. ডাকল. 'খাঁ সাহেব।'

উত্তর নেই।

'খাঁ সাহেব, তোমার সঙ্গে আমার কয়েকটা জরুরী কথা আছে।'

এবার সর্দার খাঁ তাকাল। উদ্ধত বিরক্ত দৃষ্টি। তারও এই রূপবান তরুণ সম্বন্ধে ঈর্ষিত হবার কোন কারণ ঘটেছে কিনা কে জানে।

সে বলল, 'কথার কোন দরকার নেই। পথ চল।'

হীরালাল হঠাৎ মরীয়া হয়ে উঠল, সে একটু চেষ্টা করে ঘুরে সর্দারের সামনের দিকে এসে পথরোধ করে দাঁড়াল, 'আমার কথাটা তোমাকে শুনতেই হবে খাঁ সাহেব। বহুৎ জরুরী কথা। বেগমসাহেবার কথা।'

সর্দার খাঁর লোহিতাভ দৃষ্টি রক্তবর্ণ ধারণ করল। সে রূঢ়ভাবে তাকে এক ধাক্কায় সরিয়ে দিয়ে বলল, 'ব্যস! কোন কথা নয়, পথ চল।'

হীরালাল কিন্তু ভয় পেল না। সে প্রাণপণ শক্তিতে তার একটা হাত চেপে ধরে বলল, 'কিন্তু আমার কথা তোমাকে শুনতেই হবে খাঁ সাহেব। আমি জানি তুমিও বেগমসাহেবাকে ভক্তি কর—ভালবাস! বেগমসাহেবার বড় বিপদ। তুমি একথা না শুনলে আর কাকে বলব?'

নিমেষে, দানব যেন বালকে পরিণত হল। সেই বীভৎস ভয়াবহ মুখে

একই সঙ্গে উদ্বেগ, আশঙ্কা এবং ব্যাকুলতা ফুটে উঠে তাকে আশ্চর্যরকম কোমল করে তুলল। সে শুধু বলল, 'বিপদ? বেগমসাহেবার বিপদ!'

'হ্যাঁ বিপদ, খুব বিপদ!...আমি জানি খাঁ সাহেব; তোমার চেয়ে তাঁর হিতাকাঙ্ক্ষী আর কেউ নেই। তাই তোমার সঙ্গেই পরামর্শ করতে চাই।'

'কী বিপদ বাবুজী?' যেন নিরুদ্ধ-নিশ্বাসে বলে সর্দার খাঁ।

'তুমি জান নিশ্চয় যে, এক দল লোক সিপাইদের ক্ষেপিয়ে তুলছে। তারা চায় ওদের সঙ্গে ইংরেজদের লড়াই বাধুক। আর হয়তো তা বাধবেও শীগগির। কিন্তু ইংরেজদের হারাতে এরা পারবে না।...আমি জানি পারবে না। এদের ভেতর বড় দলাদলি, সবাই চায় নিজেদের সুবিধে করে নিতে—তাতে কখনও কোন বড় কাজ হয় না। তা ছাড়া আমি গণককেও জিজ্ঞাসা করেছি। তিনি বলেছেন, ইংরেজ আরও প্রায় এক শ বছর এদেশে রাজত্ব করবে।... সে যাক গে, কিন্তু বেগমসাহেবা এইতে জড়িয়ে পড়ছেন। সবাই তাঁকে বুঝবে না। আর এরা বড় স্বার্থপর খাঁ সাহেব—এদের সঙ্গে বেগমসাহেবার মত দেবী কখনও পেরে উঠবেন না। ওঁকে বিপদের মুখে ঠেলে দিয়ে তারা অনায়াসে নিজেদের বাঁচিয়ে নেবে।...আমি সেদিন খুব বড় এক গণৎকারের কাছে গিয়েছিলুম। তিনি আমাকে চেনেন না, কিন্তু হাত দেখে সব বলে দিলেন। তিনি বেগমসাহেবার কথাও বললেন—'

'কী বললেন?' ভোরাই ঠাণ্ডা হাওয়াতেও সর্দারের কপালে ঘাম দেখা দিয়েছে। মুখে তার শিশুর মতই উৎকণ্ঠা প্রকট।

হীরালাল গলা নামিয়ে বলল, 'বললেন, বেগমসাহেবা এই লড়াইতে খুব বিপদে পড়বেন।...হয়তো ওঁর প্রাণসংশয় ঘটবে।... হয়তো ওঁর অপঘাতে মৃত্যু ঘটবে—'

আতঙ্কে উদ্বেগে হীরালালের কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে।

সর্দার খাঁ অনেকক্ষণ পাথরের মত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তার অত বড় দেহখানা থেকে সমস্ত শক্তি কে যেন নিঃশেষে হরণ করে নিয়েছে।

বহুক্ষণ পরে সে কেমন একরকম অসহায়, ভগ্ন, স্খলিত, কণ্ঠে বলল, 'কিন্তু আমি কী করতে পারি বাবুজী? উনি কি আমার কথা শুনবেন? ইংরেজকে উনি বড় ঘেন্না করেন, ওদের সর্বনাশের জন্যেই জীবন পণ করেছেন। ভয় দেখিয়ে এ লড়াই থেকে ওঁকে ফেরানো যাবে না!...'

হীরালাল আবারও সর্দারের হাতটা চেপে ধরল, 'সে আমি জানি খাঁ সাহেব। এটুকু ওঁকে আমি চিনেছি। সেই জন্তেই তোমাকে বলা। আমি তো কাছে থাকতে পারব না। তুমি ওঁর কাছে থাকবার সুযোগ পাও। তুমি ওঁকে একটু দেখো। যদি সত্যিই লড়াই বাধে, ওঁকে তুমি নজর-ছাড়া ক'র না।...আমি জানি তুমি কাছে থাকতে আর তোমার জান থাকতে ওঁর কোন ভয় নেই!'

সর্দার খাঁ হাসল। সে হাসিতে তার ঐ ভয়াবহ মুখও কেমন একপ্রকার স্বর্গীয় দ্যুতিতে যেন উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। সে বলল, 'এটুকু আমি তোমাকে অনায়াসে জবান দিতে পারব বাবুজী। আমার সামনে আমার জান থাকতে ওঁকে কেউ বিপদে ফেলতে পারবে না। আর আমি এবার থেকে আরও বেশী হুঁশিয়ার থাকব।'

'ব্যস, আমি এখন অনেক নিশ্চিন্ত।' সত্যিই স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে হীরালাল।

সর্দার খাঁ সস্নেহে হীরালালের কাঁধে একটা হাত রাখল। কোমল কণ্ঠে বলল, 'তুমি বড় আচ্ছা আদমী বাবুজী, বড় সাচ্চা আদমী!'

সর্দারের কথা তখনও শেষ হয় নি, দূর নির্জনপথে ঘোড়ার পায়ের আওয়াজ উঠল। সর্দার ভ্রূকুটি করে চেয়ে দেখল—হীরালালও একটু বিস্মিত হয়ে তাকাল। ঘোড়াই বটে। দু জন ঘোড়সওয়ার বেশ জোরে ঘোড়া ছুটিয়ে এদিকে আসছে।

ঘোড়সওয়ার এসব পথে এমন কোন আশ্চর্য দৃশ্য নয়। সুতরাং সর্দার ও হীরালাল সেদিকে মন না দিয়ে হাঁটতে শুরু করল। কিন্তু খানিক পরে ঘোড়সওয়ার দু জন আর একটু কাছে এসে হাঁকল—'এই, রোক্ যাও! ...একদম ঠাহর যাও!'

হীরালাল একটু ভয় পেল। সে রক্ষী দু জনকেই চিনেছে এতক্ষণে। এক জন গণপৎ আর-এক জন তেওয়ারী। এই তেওয়ারীই মাত্র দু দণ্ড আগে তাকে প্রসাদের দ্বার পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে গেছে। সে সর্দার খাঁর মুখের দিকে চেয়ে বলল, 'নানাসাহেবের পাইক!'

সর্দার খাঁর কোমরে তলোয়ার গোঁজা ছিল, কিন্তু সে তাতে হাত দিল না। ঈষৎ ভ্রূকুটি করে স্থিরভাবে দাঁড়াল।

একটু পরেই ঘোড়সওয়াররা কাছে এসে পড়ল। তেওয়ারী ঘোড়া থেকে নেমে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'ফিরে চল্ জল্‌দি—পেশোয়ার হুকুম!'

হীরালাল আগেই একটু ভয় পেয়েছিল। এখন তেওয়ারীর রুক্ষ ভঙ্গিতে রীতিমত ঘাবড়ে গেল। ঢোঁক গিলে বলল, 'কিন্তু আমার যে এখন ছাউনিতে ফিরতে হবে ভাই সিপাইজী। ছটায় হাজরে নেওয়া হয়, তখন ছাউনিতে না থাকলে চলবে না।'

ততক্ষণে গণপৎ নেমে পড়েছে। সে এখন হঠাৎ এসে হীরালালের একটা হাত ধরল। বেশ একটু রূঢ় কণ্ঠেই বলল, 'সে সব আমি বুঝি না। পেশোয়ার হুকুম—এখনই না গেলে জোর করে নিয়ে যেতে হবে।'

এবার সর্দার খাঁ কথা বলল। বেশ সহজ শান্ত কণ্ঠেই বলল, 'কিন্তু এ বাবু তোমার পেশোয়ার নোকর নয় গণপৎ- কোম্পানির চাকর। এর ওপর হুকুম চালানোর এক্তিয়ার পেশোয়ার নেই।'

'কিন্তু আমাদের ওপর তো আছে। আমাদের হুকুম—যেমন করে হোক, ওকে ধরে নিয়ে যেতে হবে। এই, চল—'

সে বেশ জোরেই হীরালালের ডান কনুইএর কাছটা ধরে একটা হেঁচকা টান মারল।

আর সঙ্গে সঙ্গেই হাতীর থাবার মত সর্দারের প্রকাণ্ড হাতখানা এসে পড়ল তার ঘাড়ে। নিমেষের মধ্যে হীরালালের হাতের ওপর থেকে গণপতের মুষ্টিটা শিথিল হয়ে গেল। তার পর বেড়ালে যেমন করে ইঁদুরের টুঁটি ধরে দূরে আছাড় মারে তেমনি করেই গণপৎকে ধরে সে অবলীলাক্রমে বহু দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিল। তেওয়ারী এই দৃশ্যে বোধ করি মুহূর্তকালের জন্য হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল—এখন এরা আবার রওনা হবার উপক্রম করছে দেখে এগিয়ে এল। কিন্তু সে নির্বোধ নয়—সে তার তলোয়ারখানা খুলেই অগ্রসর হল।

'এই বাংগালী বদ্‌বখ্‌ৎ, ঠাহ্‌রো!'

এবার সর্দার প্রায় ভেলকি দেখাল। সে চক্ষের মধ্যে ঘুরে দাঁড়িয়ে এক আশ্চর্য কৌশলে তেওয়ারীর তলোয়ারের ডগাটা দু আঙুলে চেপে ধরে এমন একটা ঝাঁকানি দিল যে, শিশুর হাতের খেলনার মতই তেওয়ারীর হাত থেকে তা খসে এল। তার পর সেটা শূন্যে ছুঁড়ে দিয়ে চোখের পলকে তার বাঁটটা লুফে নিয়ে একেবারে তেওয়ারীর গলায় ডগাটা ঠেকিয়ে বলল, 'যাও, ভাগো, নেহি তো—'

'নেহি তো' কী হবে—তা আর তেওয়ারীকে বিশদ বোঝাতে হল না। দূরে তখনও গণপৎ কাঠ হয়ে পড়ে আছে—হয়তো বা মরেই গেছে। এ দৈত্যটার পক্ষে সবই সম্ভব। মিছিমিছি নানাসাহেবের একটা খেয়ালের জন্য নিজের জীবনকে বিপন্ন করার মত নির্বোধ সে নয়। সে শুষ্ক মুখে দু পা পিছিয়ে গিয়ে নিজের ঘোড়াটা ধরল, তার পর যত দ্রুত সম্ভব তাতে সওয়ার হয়ে প্রাসাদের দিকে ফিরল।

ভোরাই ঠাণ্ডা বাতাসেও হীরালাল ঘেমে উঠেছিল। সে পিরানের প্রান্তে মুখ মুছে কতকটা ভয়ে ভয়ে বলল, 'কাজটা হয়তো ভাল হল না খাঁ সাহেব, পেশোয়ার হুকুম—'

ততক্ষণে সর্দার খাঁ আবার চলতে শুরু করেছে। বেশ সহজ নিরুদ্বিগ্ন গতি। সে চলতে চলতেই শান্ত কণ্ঠে উত্তর দিল, 'তা জানি না বাবুজী, আমার কাছে যার হুকুম হাজার পেশোয়ার হুকুমের চেয়েও বড—তিনি হুকুম দিয়েছেন যেমন করেই হোক তোমাকে ভোরবেলার মধ্যে ছাউনিতে পৌঁছে দিতে হবে। আমার যতক্ষণ জান থাকবে সে হুকুম আমি তামিল করব।'

হাজার পেশোয়ার চেয়েও বড এ ব্যক্তিটি কে—অনাবশ্যক বোধে হীরালাল সে প্রশ্ন করল না।

তেওয়ারী যখন ভগ্নদূতের মত এসে সংবাদটা দিল তখনও নানাসাহেব অস্থিরভাবে ঘরে পায়চারি করছেন, আর আদালা মুখে ঈষৎ বিদ্রূপের ভঙ্গি করে স্থিরভাবে বসে আছে।

'দেখলেন তো পেশোয়া, আপনার পেয়ারের হুসেনী বেগমের পেয়ারের লোক সর্দার খাঁর কত দূর আস্পর্ধা! আর বেগমসাহেবা যে লক্ষ্ণৌতে আছেন সে প্রমাণও তো পেলেন। ধোঁয়া দেখলেই আগুনের খবর মেলে!...'

তার পর ঈষৎ নাটকীয় ভঙ্গিতে একটা সেলাম করে বলল, 'আমার জিভ কিন্তু এখনও আপনার খিদমতে হাজির আছে পেশোয়াজী।'

সে কথায় কর্ণপাত না করে নানাসাহেব ভীষণ ভ্রূভঙ্গি করে বললেন, 'তোরা দু-দু জন লোক হাতিয়ার হাতে একটা বাচ্চাকে ধরে আনতে পারলি না! বেইমান কুকুরের দল! কুকুরই বা বলছি কেন—যার খায় কুকুর প্রাণপণে তার হুকুম তামিল করে।... তোদের পয়সা দিয়ে পোষা আমার একেবারেই পয়সা নষ্ট করা।'

তেওয়ারীর মুখ বিবর্ণ হয়ে গেছে ততক্ষণে। নানাসাহেবের এই রুদ্র চেহাবার সঙ্গে তার পবিচয় নেই। সে কোনমতে ঢোক গিলে বলল, 'গণপৎ তো বোধ হয় মবেই গেছে। আমি একা—ওরা দু জন—সর্দার খাঁর হাতেও তলোয়াব ছিল—'

'চুপ।' প্রচণ্ড ধমক দিয়ে উঠলেন নানাসাহেব। তার পর হাঁকলেন, 'কৌন হ্যায় দরওযাজামে?'

সঙ্গে সঙ্গে একজন রক্ষী এসে দাঁড়াল।

'মংগরকর, এই বেইমানকে হাতে কড়া পাযে বেড়ি দিযে এখনই বিঠুরে পাঠিযে দাও। সেখানে ঠাণ্ডি গাবদে থাকবে এক মাস। আর শোন, দশ জন সওয়ার পাঠাও ছাউনির পথে। সর্দার খাঁ ঐদিকে গেছে, পথেই খুঁজে পাবে। তাকে ধরে শেকলে বেঁধে নিযে আসবে। যদি সে পালিয়ে যায়, কি তাকে ধরে আনতে না পারে তো এই দশজন লোককে আমি কোতল করাব—বলে দিও। যত সব অপদার্থ ভেড়ীব বাচ্চাকে আমি পুষছি রুটি খাইযে—এই আমার কপাল।'

নানাসাহেব যতক্ষণ কথা বলছিলেন, ততক্ষণ আর এক জন যে কে নিঃশব্দে ঘরে এসে মংগরকরের পেছনে দাঁড়িযে ছিল, তা কেউ টের পায নি—এমন কি আদালাও না। যে এসেছিল সে এবাব মুখ খুলল—অত্যন্ত মধুর এবং ঈষৎ বিদ্রূপপূর্ণ কণ্ঠে বলল, 'অত কাণ্ড করতে হবে না পেশোয়া, সর্দার খাঁ না হোক, তার মনিব এখানে হাজির আছে। তাকেই তো আপনার বেশী দরকাব!'

তার পর আর একটু সামনে এসে রক্ষীদের দিকে ফিরে বলল, 'মংগরকর, তুমি দরওয়াজায ফিরে যাও। তেওয়ারী, তোমাকে পেশোয়া এবারকার মত মাফ করছেন—তুমিও কাজে যাও। আর কখনও এমন গাফিলতি ক'র না।'

তারা বেরিয়ে গেলে হতভম্ব স্তম্ভিত ধুন্ধুপন্থের সামনে আভূমিনত একটা সেলাম করে হুসেনী বলল, 'তার পর মহামান্য পেশোয়া, বাঁদীর ওপর কী হুকুম হয়—কুকুর দিয়ে খাওয়ানো, না ঠাণ্ডা-গারদ?'

এতক্ষণের প্রচণ্ড দিক্‌দাহকারী রোষ এখনও রুদ্ধ আক্রোশে মনের মধ্যে মাথা খুঁড়ছে সত্য কথা, তবু অপরাধিনীর এই আকস্মিক আবির্ভাবে এবং সহজ ও সপ্রতিভ প্রগল্‌ভতায় নানাসাহেব এতই অবাক হয়ে গিয়েছিলেন যে, তার আচরণে বাধা দেবার চেষ্টা তো দূরে থাক, মুখে উষ্মা-প্রকাশও

করতে পারলেন না। কিছুক্ষণ তাঁর মুখে কথাই সরল না—পাথরের মত স্থাণু হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তার পর যখন কথা ফুটল, তখনও কণ্ঠস্বরটা ঠিক বাঁদীর প্রতি শাসক মনিবের মত শোনাল না। কঠিন হবার বৃথা চেষ্টা করতে করতে হঠাৎ প্রশ্নটা বেরিয়ে গেল, 'তুমি—তুমি এখানে কেন?'

'কেন? এখানে আসতে বাধা কী?'

প্রশ্নের উত্তরে এই সহজ প্রশ্নটার জন্য নানাসাহেব এতটুকুও প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি আরও থতমত খেয়ে বললেন, 'তুমি আমাকে—কই—আমাকে বল নি তো?'

'সব সময়ে কি আপনাকে বলে কোথাও যাই? আমাকে তো আপনি সে স্বাধীনতা দিয়েই রেখেছেন—'

'কিন্তু তাই বলে···তুমি নাকি সেইদিনই বেরিয়েছ, আমার সঙ্গে?'

'হ্যাঁ পেশোয়া।' সহজ শান্ত স্বর হুসেনীর কণ্ঠে।

'তা হলে আমাকে জানাও নি কেন? হুকুম একটা নিতে পারতে!'

'আমার যা কাজ পেশোয়া—সেটা ঠিক আদালা বেগমের পুতুলের বিয়ে দেওয়ার মত জরুরী কাজ নয় যে, আগে থাকতে ভেবে হুকুম নিয়ে করতে হবে। আমি এই এক মাস আপনার সঙ্গে সঙ্গে প্রায় ছায়ার মতই ঘুরছি।···আপনি জানেন না পেশোয়া, কত শত্রু আপনার চারিদিকে। আপনার নিজস্ব অনুচরদের মধ্যে জীবন সব সময়ে নিরাপদ নয়। আপনার ওপর নজর রাখবার জন্যই আমার এত কষ্ট করা। আর জানেন তো পেশোয়া, আমার সব গতিবিধি লোককে সব সময়ে জানানো সম্ভব নয়।··· তা ছাড়া ঘরে পাহারা দিয়ে রাখবার মত এ দেহটার এত মূল্য এখনও আছে তা জানতুম না পেশোয়া। আমি ভেবেছিলুম যে, রূপযৌবন আপনার পিয়ারী আদালারই একচেটে।'

আদালা বোধ করি আমিনার সাহসে ও স্পর্ধায় একেবারেই বাক্যহারা হয়ে গিয়েছিল। তাই সে এত বড় খোঁটারও তখনই কোন জবাব দিতে পারল না—নির্বাক বিস্ময়ে, কতকটা ভয়ে ভয়েই চেয়ে রইল।

নানাসাহেব ইতিমধ্যেই যথেষ্ট কোমল হয়ে এসেছেন, তবু আসল জ্বালাটা একেবারে ভোলেন নি, বললেন, 'ওই বাঙালী ছোঁড়াটার সঙ্গে এক ঘোড়ায় চেপে সারারাত্ত বিহার করা—সেটাও কি তোমার পক্ষে একান্ত অপরিহার্য ছিল, হুসেনী?'

'ছিঃ পেশোয়া, ছিঃ !...সে আমাকে দেবীর মত দেখে—সন্তানের বয়সী সে !'

তার পর গম্ভীর এবং ঈষৎ কঠোর কণ্ঠেই সে বলল, 'যে এ খবরটা আপনাকে দিয়েছে, সে আর একটা খবর দিতে পারে নি যে, একদল সিপাহীর হাতে যখন তার প্রাণটা যেতে বসেছিল, তখনই না তাকে আমি উদ্ধার করে এনে সোজা এই প্রাসাদের দোরে পৌঁছে দিয়েছি।'

'তবে সে আমাকে মিছে কথা বলল কেন ?'

'আমিই তাকে নিষেধ করেছিলুম আমার কথা জানাতে। কিন্তু পেশোয়া, এই সব ব্যক্তিগত একান্ত বাজে আলোচনার সময় আর নেই। আমি তো স্বৈরিণী—আমার মত দাসী আপনার কত আছে, কত সহস্র জুটবে আরও। আমার চিন্তাতে আপনি কাজ ভুলে বসে আছেন ? ধিক !... আমারই যে লজ্জা করছে আমার জন্যে।·যান, ওঁরা এখনও আপনার প্রতীক্ষায় বসে আছেন। আপনি দেখা করুন গে। আজই বিঠুর রওনা হতে হবে। আপনার হুকুম না নিয়েই আমি বলে দিয়েছি সবাইকে সেইমত ব্যবস্থা করতে। স্নান-পূজা সেরেই রওনা হবেন আপনি।'

'কেন, কেন হুসেনী—এত জরুরী ?'

'আগুন জ্বলেছে পেশোয়া—আগুন জ্বলেছে। এবার কাজের সময়। আর বৃথা সময় নষ্ট করলে চলবে না। আপনি ফিরে যান বিঠুরে।'

কথাটা আদেশের মতই শোনাল। কিন্তু নানাসাহেব এ ধৃষ্টতা গায়ে মাখলেন না। শুধু বললেন, 'তুমি আমাদের সঙ্গে যাবে তো হুসেনী ?'

'না, আমি যেমন এসেছি তেমনি ফিরব। দু দিন পরে। আমার কাজ আছে। মৌলবীকে জেলখানা থেকে বের করতে হবে আগে।'

তার পর স্তম্ভিত অপমানিত আদালার দিকে ফিরে একটা সেলামের ভঙ্গি করে হুসেনী বলল, 'জিভটা তা হলে আপাতত মুখেই রয়ে গেল আমাদের —কি বলুন বেগমসাহেবা ? দুঃখ হচ্ছে—না ?'

॥ ২২ ॥

১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা দেশের পশ্চিমে বিভাগে—বারাকপুরের মাটিতেই কি করে যেন দাবানলের স্চনা হয়েছিল। কিন্তু তখনও তাকে দাবানল বলে চেনা যায় নি। মনে হয়েছিল একটা গাছেই বুঝি আগুন লেগেছে। সেনাপতি প্যাজেট্ সে বৃক্ষ নির্মূল করে দিযে নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন। তিনি এবং আর সকলেই মনে করেছিলেন—ঐখানেই বুঝি ঐ বহ্নিলীলার পরিসমাপ্তি ঘটল। কিন্তু পরে দেখা গেল যে, মহীরুহের শাখাপ্রশাখাগুলিই কাটা হয়েছিল শুধু—মূল কাণ্ডটি যথাস্থানেই রযে গেছে—এবং বহ্নির অস্তিত্বও লোপ পায় নি। ভস্মাচ্ছাদিত হলেও সেই কাণ্ডেরই কোন কোটরে তা এখনও ধূমায়িত হচ্ছে। একেবারে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের জানুযারী মাসে এক চাটগেঁয়ে লস্কর এসে সেই ভস্মস্তূপে ফুঁ দিতেই সেই ধূমায়মান আগুনের খবর পাওয়া গেল। ২৯শে মার্চ মঙ্গল পাণ্ডে সে আগুন নিজের মস্তিষ্কের ঘৃতে বেশ জম্‌কে তুলল।

দেখতে দেখতে তা ছড়িয়ে পড়ল বহুদূর। দাবানল জ্বললে যেমন সে আগুন শনৈঃ শনৈঃ বৃক্ষ থেকে বৃক্ষান্তরে—বন থেকে বনান্তরে ছড়িয়ে পড়ে, তেমনিই এই বহ্নিবন্যা ভারতের পূর্ব প্রান্ত থেকে পশ্চিম প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ল। মঙ্গল পাণ্ডের আত্মাহুতিরই যেন অপেক্ষায় ছিল সকলে। কারা এর ইন্ধন যুগিয়েছে, কারা সংগ্রহ করেছে এর উপকরণ—আজও পরিষ্কার কেউ জানে না। কোথা থেকে কারা চাপাটি বা রুটি বিলি করতে শুরু করল, কারা শুরু করল পদ্মচিহ্ন প্রচার করতে, কেউই সেদিন খবর নেয় নি। একই উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই ছিল না সকলের—একই স্বার্থসিদ্ধির জন্য এত বড় আগুন জ্বলে নি। আসলে ইংরেজের প্রতিই সেদিন বুঝি বিধি ছিলেন প্রতিকূল, তাই বিভিন্ন স্বার্থে সংঘাত বাধে নি—স্বার্থের উপনদীগুলি মিলে মহানদীতে পরিণত হয়েছে মাত্র। বহু শিবা ও গৃধ্র শুধু গলিত শবের লোভেও এসে জুটেছিল বৈকি!

ইংরেজ সেদিন ছিল এক আশ্চর্য সুপ্তিমগ্ন। নিজের ক্ষমতার নেশায় বুঁদ হয়ে ছিল। ভুলে গিয়েছিল—সিপাহীদের হাতে তারাই অস্ত্র তুলে দিয়েছে; যুদ্ধবিদ্যায় নিজেরাই শিক্ষিত করে তুলেছে! এ কথাটাও মনে

পড়ে নি যে ব্যক্তি খরচের অজুহাতে ইউরোপীয় সৈন্যদের এদেশে আনানো বহুকাল কমিয়ে দেওয়া হয়েছে! এখানে এখন তারা আছে—কতকটা এই দেশী সিপাইদেরই ভরসায়।* সিপাহীদের অসন্তোষের কারণগুলি যেমন তাদের অনুসন্ধান করা উচিত ছিল—তেমনি উচিত ছিল তাদের স্পর্ধা বাড়তে না দেওয়া। কিন্তু সে সব কিছুই করা হয় নি। এমন কি ঘুমন্ত মানুষ যেমন মশারিতে আগুন ধরবার আগে ঘর পোড়বার খবর পায় না—সেদিনকার ইংরেজ অফিসাররাও নিজের নিজের ছাউনিতে বিদ্রোহ শুরু হবার আগে একান্ত কাছে যে সব সিপাহীরা ছিল, তাদের মনোভাবের কোন খবরই পান নি—এমনও হয়েছে। অথচ এত বড় একটা বিপ্লব—তার আগে নিশ্চয়ই দীর্ঘ প্রস্তুতি ছিল। এত বড় আগুনের ইন্ধন অবশ্যই বহু দিন থেকে জমা হয়েছে।

প্রথম প্রকাশ্য অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দেখা দিল লক্ষ্ণৌতে। স্ফুলিঙ্গই বা বলি কেন, রীতিমত আগুনই সেদিন জ্বলে উঠল।

সেটা ১৮৫৭ সালের ১লা মে!

'সাত নম্বর আউধ ইরেগুলার ইনফ্যান্ট্রি'র রংরুটরা বেঁকে দাঁড়াল। তারা ঐ চর্বি দেওয়া কার্তুজ নেবে না। ওতে তারা হাতও দেবে না। তারা শুনেছে, বেশ ভাল লোকের মুখ থেকেই শুনেছে যে, গরু ও শুয়োরের চর্বি আছে ঐ কার্তুজে। অফিসাররা প্রাণপণে বোঝাতে চেষ্টা করলেন যে, এটা সে নতুন কার্তুজ নয়—ওরা আগে যা ব্যবহার করছিল এ সেই পুরাতন ও পরিচিত কার্তুজ। কিন্তু তার ফল হল এই যে, শুধু রং-রুটরা নয়—পরের দিন গোটা রেজিমেন্টের সিপাহীরাও বেঁকে দাঁড়াল।

সার হেনরি লরেন্স—অযোধ্যা প্রদেশের নূতন শাসনকর্তা প্রমাদ গনলেন, কিন্তু বিচলিত হলেন না। ব্রিগেডিয়ারকে আদেশ করলেন প্যারেডের ব্যবস্থা করতে। প্যারেডের মাঠে ব্রিগেডিয়ার একটি মিষ্ট বক্তৃতাও করলেন—ফল সেই একই। দু-এক জন পাণ্ডা গোছের সিপাহী বাকী সকলের মনোভাব

* ডালহৌসীর অবসর গ্রহণের প্রাক্কালে যে হিসাব পাওয়া যায় তাতে দেখা যায়—তখন কোম্পানির তাঁবে দু-লক্ষ তেত্রিশ হাজার দেশী সিপাহী এবং পঁয়তাল্লিশ হাজার তিন শ বাইশ জন ইংরেজ (প্রাইভেট ও অফিসার মিলিয়ে) কাজ করছে।

জানিয়ে দিল—'তামাম হিন্দুস্তানে কোন সিপাইই আজ আর তোমাদের ও কার্তুজ নিতে রাজী নয় সাহেব—আমরা কী করব ?'

এই হল সূত্রপাত ! লক্ষ্ণৌএর পর মীরাট।

মীরাটের বহ্নি প্রধূমিত হচ্ছিল বহুকাল থেকেই। রীতিমত রক্তাভ হয়ে উঠল এপ্রিলের শেষের দিকে। একেবারে শিখা দেখা দিল ১০ই মে রবিবার। ইংরেজ অফিসার ও তাঁদের পরিবারের সকলে যখন সান্ধ্য উপাসনার জন্য গির্জায় জড়ো হয়েছেন, তখনই দূর সিপাহী-ব্যারাকে প্রথম গুলির শব্দ পাওয়া গেল। গির্জা থেকেই দেখা গেল—কোন কোন বাংলোয় আগুন ধরেছে, তার শিখায় শেষ-বৈশাখের সান্ধ্য আকাশ রক্তিমতর হয়ে উঠেছে।

মীরাটের ব্যাপারটা প্রথম দিনই গুরুতর আকার ধারণ করল। সিপাহীরা আগেই জেলখানা ভেঙে কয়েদীদের দলে টেনে নিল। দেশী পুলিস নিঃশব্দে চোখ মেলে রইল মাত্র—বাধা দেবার কোন চেষ্টাই করল না। শুরু হল উন্মত্তের মত লুটপাট ও হত্যা। অন্য সমস্ত ছাউনির চেয়ে মীরাটেই বেশী-সংখ্যক ইংরেজ সৈন্য ও অফিসার ছিল, কিন্তু 'আপৎকালে বিপরীত বুদ্ধি'—একটির পর একটি ভুলের জন্য তারা না পারল স্থানীয় অসহায় সাহেবদের রক্ষা করতে—না পারল বিদ্রোহীদের দমন করতে—আর না পারল দিল্লীকে বাঁচাতে। মাটির পুতুলের মতই হাতিয়ার হাতে বসে রইল শুধু।

মীরাটের পরই দিল্লী। ১১ই মে শুরু হয়ে গেল দিল্লীতে।

সকালবেলা অফিসাররা 'ব্রেকফাস্টে' বসেছেন—খবর এল মীরাটের দিক থেকে এক দল সওয়ার এদিকে আসছে। ম্যাজিস্ট্রেট তখনই ব্রিগেডিয়ারকে খবর দিলেন। খবর গেল লেফটেনাণ্ট উইলোবির কাছে। তাঁর জিম্মায় ম্যাগাজিন—শত শত মন বারুদ সেখানে ঠাসা। গোলাগুলিরও অভাব নেই। ম্যাগাজিন শত্রুর হাতে পড়া মানেই মৃত্যুবাণ হাতে পড়া।...ইতিমধ্যে সাওয়াররা দিল্লীর নগর-প্রাচীর পার হয়েছে। জেলখানা ভেঙে কয়েদীদের বার করা প্রথম কাজ—তার পর সোজা এসে হাজির হল তারা লালকিল্লার ফটকে। তখনও ইংরেজদের হাতে ফটকের চাবি। কিন্তু তাতে খুব বেশী সুবিধা হবে বলে মনে হল না। গোলমাল বেড়েই যেতে লাগল। 'গোরা সিপাহী'দের ভ্রূকুটি আর কেউ গ্রাহ্য করে না। আগন্তুকরা প্রকাশ্যেই চেঁচাতে লাগল—

'মীরাটে একটিও সাহেব রেখে আসি নি—তোমাদেরও শেষ করতে দেরি হবে না।'

তবু হয়তো কিল্লায় ঢোকা তখনই সম্ভব হত না, যদি না শেষ পর্যন্ত ভেতরের কয়েক জন মুসলমান অধিবাসী গিয়ে চুপি চুপি যমুনার দিকের একটা দরজা খুলে দিত। সিপাহীর দল ও উন্মত্ত জনতা হৈ হৈ করে ঢুকে পড়ল। তার পর কোথায় কী হল, কোন্ কোন্ ইংরেজের বাসা লুট হল, কে কার হাতে মরল তা বলা কঠিন। সে প্রচণ্ড অগ্রগতির প্রতিরোধ করা অল্প কয়েক জন ইংরেজ অফিসারের কাজ নয়। তাঁরা পিছু হটতে লাগলেন। এক জন পরিখায় পড়ে জখম হলেন। আর এক জনও সেই পথে বাইরে পৌঁছে কোন মতে জনতাকে শান্ত করতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু তাঁর কণ্ঠস্বর তাদের কানে পৌঁছবার আগেই তাদের হাত তাঁর কণ্ঠে পৌঁছল এবং তা চিরতরেই নীরব হল। তার পর অল্প কয়েক জন ইংরেজ নরনারীকে খতম করতে আর কতক্ষণ?

এর ভেতর মীরাট থেকে আরও কয়েক জন এসে পৌঁছে গেছে। তারা শহরের অপর জায়গায় সাহেবপাড়ায় তাণ্ডব জুড়ে দিল। এমন কি দরিয়াগঞ্জের দেশী খ্রীষ্টান ও ফিরিঙ্গীপাড়াও বাদ গেল না। অপরাহ্নের দিকে তোপখানা বা ম্যাগাজিন রক্ষা অসম্ভব দেখে উইলোবি বারুদের স্তূপে আগুন লাগাতে হুকুম দিলেন। স্কালী নামে এক অফিসার, যিনি আগুন লাগিয়েছিলেন, তিনি সেখানেই পুড়ে মরলেন—বাকি রক্ষকদের কয়েক জন কোন মতে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যেতে পেরেছিলেন। উইলোবি সে অগ্নিক্ষেত্র থেকে উদ্ধার পেলেও পথে আততায়ীর হাতে নিহত হলেন।

ব্রিগেডিয়ার সাহেব কিল্লার একাংশ অনেকক্ষণ পর্যন্ত রক্ষা করেছিলেন, কিন্তু সন্ধ্যা নাগাত সকল চেষ্টাই নিষ্ফল হল। অগত্যা তিনি 'পিছু হটবার' হুকুম দিলেন। তখনও অবধি ছাউনির সিপাহীরা কতক কতক শান্ত ছিল, তারা এবার স্পষ্টই জানিয়ে দিল যে, সাহেবদের জানের জন্য আর তারা দায়ী থাকতে রাজী নয়। তাঁদের এখন পথ দেখাই ভাল।

অগত্যা! অবশিষ্ট অফিসার আর তাঁদের স্ত্রী-পুত্ররা পথই দেখলেন। পলায়নের চেষ্টা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মৃত্যুর চেয়েও কষ্টকর হয়ে উঠল। অনেকেই পথে প্রাণ হারাল। কেউ বা আততায়ীদের হাতে প্রাণ দিল—বাকি যারা শেষ অবধি নিরাপদ স্থানে পৌঁছতে পারল, তাদের বহু দিন সময় লাগল।

সেরে উঠতে। 'লু' লেগে তাদের গায়ে-ফোস্কা পড়েছিল। সে ফোস্কা ঘায়ে পরিণত হয়েছে—বস্ত্র ছিন্নভিন্ন, কোন মতে তাতে লজ্জা নিবারণ হওয়াই কঠিন। গায়ের রং জ্যৈষ্ঠের রোদে পুড়ে প্রায় মসীবর্ণ ধারণ করেছে। তাও সিপাহীদের হাতে না পড়ে যারা কোনমতে সাধারণ হিন্দু গ্রামবাসীর আশ্রয়ে এসে পড়তে পেরেছে—তারাই বেঁচেছে। তাদের মৃত্যুর কারণ ও ধরন এক নয়—সুতরাং আলোচনা থেকে বিরত থাকাই ভাল।

সুতরাং বহ্নিস্রোত প্রবাহিত হবার বিশেষ আর কোন বাধা রইল না। সমগ্র আগ্রা প্রদেশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে তা ছড়িয়ে পড়ল। বুলন্দসর, এটোয়া, মৈনপুরী, মুজঃফরনগর, সাহারানপুর, বেরিলী, আগ্রা, ফরক্কাবাদ—আরও কতকগুলো নাম শুনে কী হবে, মোট কথা, মে মাসের শেষে কানপুরের উত্তর-পশ্চিমের কোন শহরেই আগুন লাগতে বাকী রইল না।

॥ ২৩ ॥

আগুন না পৌঁছাক—এই বিপুল বহ্নিবার্তা কি কানপুরের অন্তরঙ্গ বায়ু-সমুদ্রে কোন কম্পন জাগায় নি?

হয়তো জাগিয়েছিল, কিন্তু ঈষৎবধির অশীতিপর বৃদ্ধ সেনাপতি সার্ হিউ হুইলার সে কম্পন অনুভব করেন নি।

ঝড়ের বেগে দূর দিক্‌চক্রবালে যে বনস্পতি আন্দোলিত হচ্ছিল, তাও তিনি দেখতে পান নি। তাঁর সবচেয়ে বড় নির্বুদ্ধিতা—তিনি নানাসাহেবের উপর ভরসা করেছিলেন। হিউএর অনেক বয়স হয়েছিল—অর্ধ শতাব্দীরও বেশি তিনি এই দেশে চাকরি করছিলেন, দেশী সিপাহীদের বিশ্বাস করতে ও ভালবাসতেই তিনি অভ্যস্ত। তাঁর অধীনে যে সব সিপাহীরা আছে, তারা কোন দিন বিদ্রোহ করবে—এ-কথা তিনি ভাবতেই পারেন নি। তিনি ১৮ই মে তারিখেও বড়লাট লর্ড ক্যানিংকে চিঠি লিখেছেন, "কানপুরের সব কুশল। কিছু কিছু উত্তেজনা থাকলেও অবস্থা মোটের উপর শান্ত। আমরা শীঘ্রই দিল্লীর দিকে রওনা হতে পারব। বিদ্রোহীদের সংখ্যা তিন হাজারের বেশি

না। 'ওদের এক জনকেও পালাতে দেওয়া ঠিক হবে না।...যাক্—ব্যাধির বিস্তৃতি বন্ধ হয়েছে এই রক্ষা।"

যত সহজে সার হিউএর চোখে ধুলো দেওয়া সম্ভব হয়েছিল, তত সহজে কিন্তু অপরকে দেওয়া যায় নি। কমিশনার গাবিন্‌স এবং হেনরি লরেন্স দু জনেই নানাসাহেবের সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ হযেছিলেন অনেক দিনই—এবার অমন আকস্মিকভাবে লক্ষ্ণৌ থেকে চলে আসায় তাঁদের সে সন্দেহ আরও বেড়ে গিয়েছিল। তাঁরা হুইলারকে কর্তব্য-বোধে সচেতনও করে দেবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু হুইলারের চেতনা হল না। বহুদিনের পরিশ্রমে স্নায়ুগুলিও বুঝি তাঁর শ্রান্ত হয়ে পড়েছিল, কোন বার্তা মস্তিষ্কে পৌঁছে দেওয়া আর তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না।...তিনি সার হেনরির চিঠির উত্তরে বরং একটু বিদ্রূপ করেই লিখলেন, 'বিঠুরের মহারাজ আজই আমাদের নিরাপত্তার জন্য তিন শ সিপাহী এবং দুটি কামান পাঠিযেছেন।"

চিঠির তারিখ—২২শে মে।

নির্বুদ্ধিতার এইখানেই শেষ নয়। নানাসাহেব হুইলারকে নানারূপ আশ্বাস দিযেছিলেন। ভরসা দিয়েছিলেন যে প্রয়োজন হলে জান দিয়েও তিনি ইংরেজদের রক্ষা করবেন। তার প্রমাণস্বরূপ তিনি বিঠুরের রাজ-প্রাসাদ ছেড়ে নবাবগঞ্জের কাছে সিভিলিয়ান পাড়ায় এসে বাসা বাঁধলেন। হুইলারকে বুঝিয়ে দিলেন, 'আমি যতক্ষণ এখানে থাকব, ততক্ষণ তো কেউ চড়াও হতে সাহস করবে না! তা ছাড়া আমার মনে কোন পাপ থাকলে আমি চারিদিকে ইংরেজদের মধ্যে এসে বাস করতে পারতুম কি? আমি তো আপনাদের হাতের মুঠোর মধ্যেই রইলুম।'

হুইলারের মনে বিশেষ কোন সংশয় কোন কালেই ছিল না। যেটুকু আভাস মাত্র থাকতে পারত তাও এতে কেটে গেল। তিনি নিশ্চিন্ত মনে ট্রেজারির ভারও তুলে দিলেন নানাসাহেবের হাতে। নানাও 'জান-কবুল' দিয়ে কোম্পানির পনেরো লক্ষ টাকা পাহারা দেবার প্রতিশ্রুতি দিলেন।... হুইলারের এতখানি বিশ্বাসের বদলে তিনি আর একটি প্রস্তাব করলেন— এখনও যদি সাহেবদের কোন ভয় থাকে, তাঁরা স্বচ্ছন্দে তাঁদের স্ত্রী-পুত্রকে বিঠুর প্রাসাদে রেখে আসতে পারেন। সেখানে তারা নিরাপদেই থাকবে। তাঁর নিজস্ব সিপাহী-সান্ত্রী তো আছেই। তারা কিছু কোম্পানির 'নৌকর' নয়, বিদ্রোহীদের সঙ্গে তাদের কোন সম্পর্ক নেই।

হুইলারের উপর সমস্তাটা নির্ভর করলে তিনি হয়তো তখনই এই ব্যবস্থায় সম্মত হতেন। কিন্তু দেখা গেল যে, বাকী সকলে স্যার হিউ্‌এর মত অতটা নির্ভরশীল নন। তাঁরা বেঁকে দাঁড়ালেন। যে লোকটির ইংরেজদের ওপর খুশী থাকবার কোন কারণ নেই, তার হাতেই নিজেদের মান-ইজ্জত সঁপে দিতে তাঁরা রাজী নন। শুধু তাই নয়, আপৎকালীন একটা ব্যবস্থা করার জন্যেও তাঁরা পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। তাঁদেরই পীড়াপীড়িতে অবশেষে একটা 'আশ্রয়' ঠিক করবার হুকুম দেওয়া হল। কোষাগার এবং অস্ত্রাগার থেকে বহুদূরে, গঙ্গাতীর বা পলায়নের সকল সম্ভাবনা থেকে বিচ্ছিন্ন, একটি পুরাতন ছোট হাসপাতাল-বাড়িকে ঘিরে একটি হাত-আড়াই উঁচু কাদার পাঁচিল দেওয়া হল। হুইলার জানতেন এসব অনাবশ্যক—তিনি এদিকে কোন নজরই দিলেন না। হিন্দুস্থানী ঠিকাদার যতটা সম্ভব ফাঁকি দিল। এক জনকে পঁচিশ দিনের মত খাদ্য-খাবার জমা করবার ঠিকা দেওয়া হয়েছিল। সে ব্যক্তি কয়েক বস্তা ময়দা ও কিছু মটরকড়াই মাত্র মজুত করেই মোটা টাকার 'বিল' নিয়ে চলে গেল। সাহেব-সুবোরা কেউ কেউ দু-চার বোতল মদ পাঠিয়ে দিলেন—কতকটা নিজেদের গরজেই। আর কোন ব্যবস্থা হল না। কুয়াটা পড়ল খোলা জায়গায়—সে কথাটাও কেউ ভাবল না। ওধারে যখন হিন্দুস্থানের সমস্ত উত্তর-পশ্চিম প্রান্ত জুড়ে প্রলয়ের মেঘ ঘনিয়ে এসেছে—মুহুর্মুহু চলেছে বিদ্যুৎস্ফুরণ, অসংখ্য ইংরেজ নরনারীর জান-মান লাঞ্ছিত ও প্রহৃত হচ্ছে, এদেশে তাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধেই একটা বিরাট রকমের সংশয় দেখা দিয়েছে—এখানে তখন এইভাবে পনেরোটা বহুমূল্য দিন একপ্রকার হাস্যকর ছেলে-মানুষিতে কেটে গেল।

॥ ২৪ ॥

পুরাতন কানপুর বা সাহেবদের ভাষায় 'নেটিভ' পাড়ার একটি কুখ্যাত পল্লীতে আজিজন বিবির বাস। সংকীর্ণ গলির দু পাশে পাথরের নীচু রেলিং দেওয়া বারান্দায় চিক্-ঝোলানো বাড়ি। একই রকমের প্রায় সবগুলি। কেবল আজিজনের বাড়িটিই তার ব্যতিক্রম। এই বাড়িটির বাইরের চেহারা

[illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] জানালায়

বহুমূল্য বিলিতী লেসের পরদা, দরজায় সিঁড়ির মুখে বিপুলকায় দারোয়ান। তার ঘরে ঝাড়ের আলো, দরজায় ভেলভেট—বাইরের বারান্দায় হরেকরকম পাখীর খাঁচা ও দাঁড়। এক কথায় ঐশ্বর্য ও বিলাসের চিহ্ন বাইরে থেকেই একরকম সুস্পষ্ট।

পাড়াটার কু-খ্যাতির জন্যই হুসেনী বেগম কোনদিন ওখানে আসতে সাহস করে না—প্রয়োজন থাকলে খবর দিয়ে আজিজনকে ডেকে পাঠায়। আজ কে জানে কেন, সর্দার খাঁকে দিয়ে আগেই খবর পাঠিয়েছে, সন্ধ্যার সময় সে আসবে, আজিজন যেন আজ বাড়ি থেকে সব 'জঞ্জাল' সাফ করে রাখে।

খৎ-খানা পেয়ে অবশ্যি আজিজনের বিস্ময়ের সীমা নেই। আমিনা এখানে আসবে কেন? এমন কি জরুরী দরকার পড়ল?

যা হোক, ব্যবস্থার ত্রুটি হল না। দারোয়ানকে ডেকে সে বলেছিল, যে-কোন রকম 'সান্ধ্য-অতিথি'ই আসুক, আজ আর কাউকেই যেন ঢুকতে দেওয়া না হয়। 'বিবি'র ভীষণ মাথা ধরেছে—এই কথা বলেই যেন সকলকে বিদায় দেওয়া হয়।

তার পর থেকে সে একটা রেশমী ওড়না জড়িয়ে, বলতে গেলে সারাক্ষণই, বারান্দায় দাঁড়িয়ে রইল। কৌতূহল তাকে স্থির থাকতে দিল না।

আমিনা এল একেবারে সন্ধ্যের মুখে। ভেলভেটের ঘেরাটোপ দেওয়া ডুলি, নামলও কালো বোরখায় সর্বাঙ্গ আচ্ছাদিত করে, কিন্তু আজিজনের চিনতে ভুল হল না। দ্রুত নেমে গিয়ে একেবারে আমিনার হাত ধরে সোজা ছাদে নিয়ে গেল। ছাদে তখনই জল ছিটিয়ে খাটিয়া পাতা হয়েছে। বড় চওড়া খাটিয়া—তাতে রাত্রে আজিজনের বিছানা পড়বে। খাটিয়ার পাশে একটা উঁচু চৌকিতে মাটির ঝাঝোরায় জল এবং একটি থালায় কিছু চামেলি ফুল।

আজিজনের ইঙ্গিতে একজন দাসী নিঃশব্দে এসে খাটিয়ার ওপর একটা নরম গালিচা বিছিয়ে দিয়ে গেল। আজিজন এতক্ষণে কথা বলল, 'ব'স—আরাম করে। ছাদেই সুবিধে, আড়ি পাতবার ভয় থাকে না।...তার পর, কী ব্যাপার—এমন হঠাৎ?'

আমিনা খাটিয়াতে বসে মুখের ওপর থেকে বোরখাটা সরাল, কিন্তু তখনই কোন কথা বলল না। আজিজন লক্ষ্য করল, তার মুখ চিন্তাক্লিষ্ট, চোখের কোলে কালি—অর্থাৎ অনিদ্রার চিহ্ন।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ঈষৎ অসহিষ্ণুভাবেই আজিজন পুনশ্চ প্রশ্ন করল, 'খবর কী ?'

আমিনা ক্লান্তকণ্ঠে বলল, 'খবরটাই যে কী তাই তো বুঝতে পারছি না।'

'এখানে এলে যে ?'

'কী করি! ওই বাড়িটায় জায়গা বড় কম। সকলেই সকলের চোখের ওপর আছি। ডেকে নিয়ে গিয়ে আড়ালে দুটো কথা কইব—সে জায়গা নেই। এক গঙ্গার ধারটায়, কিন্তু এখন চারদিকেই লোক—আর সকলেই সন্দিগ্ধ।'

'নানাসাহেবও ?'

'নানাসাহেবকেই তো ঠিক বুঝতে পারছি না। সন্দিগ্ধ তো বটেই। যতই যা করি, আদালা মাথাটি খেয়ে দিয়েছে। একটু সন্দেহ কিছুতেই যাচ্ছে না। এ আবার এক নতুন বিপদ হয়েছে আজিজন—এখন শুধু আমি কী করছি তা নিয়েই মাথাব্যথা নয়, আমি কী ভাবছি তা নিয়েও!...এখন যেন মনে হয় আমাকে ভালবাসাতেও চায় সে!'

'সেটা কি খুবই আশ্চর্য একটা কিছু ?' আজিজন আমিনার মুখখানা তুলে ধরে একটু কৌতুকের হাসি হাসল।

লাল হয়ে ওঠে আমিনা নিমেষে। সেটা কতটা লজ্জায় আর কতটা অপমানে বলা কঠিন।

'ভালবাসার সাধ নেই আজিজন। সে সম্ভাবনা আছে জানলে নানার কাছে আসব কেন ? বেচা-কেনার সম্পর্ক জেনেই তো লম্পটের উপপত্নী হতে এসেছি!'

দু জনেই কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে।

শেষে আজিজন বলে, 'এধারে কতদূর ?'

'সেইটেই তো বুঝতে পারছি না। নানাকে নিয়েই হয়েছে বড় মুস্কিল। ও ইংরেজদেরও স্তোক দিচ্ছে—আমাদেরও। আসলে নিজে এখনও মন স্থির করতে পারে নি। আমাদের বোঝাচ্ছে যে, সে ওদেরই ঠকাচ্ছে—কিন্তু আমি জানি তা নয়। এখনও দেখছে, বুঝছে।'

'কিন্তু সিপাইরা ?'

'সেই তো হয়েছে আরও বিপদ। নানা এখানকার বড় মুরুব্বী, ওর ভাবটা বুঝতে পারছে না বলে তারা এখনও ইতস্তত করছে। লক্ষ্ণৌ, মীরাট, দিল্লীর

খবর আমরা যতটা পারছি ফলাও করে প্রচার করছি। কিন্তু তবু যেন কারুর গা তাতছে না। আজিমুল্লা, টোপী, টীকা সিং—এরা তো প্রাণপণে চেষ্টা করছে নানাকে টেনে নামাবার, কিন্তু নানাকে আমি চিনি আজিজন। সিপাইরা না এগোলে ওকে নামানো যাবে না। ইংরেজদের ও ভয় করে এখনও, আর খুব নির্বোধও নয়। আবার ওর ভাব না বুঝলে সিপাইরাও এগোবে না।'

তার পর একটু থেমে আমিনা বলল, 'তুই তো সিপাইদের ভার নিয়েছিলি

'হ্যাঁ, তা নিয়েছিলুম। সে ভার এখনও বইছি বৈকি। প্রাণপণেই বইছি। কত নেমেছি তা তুমি জান না বহন্—কত পাঁকে নেমেছি! এ দেহ তুষানলে না পুড়লে আমি বোধ হয় খোদার দরবারে গিয়ে কোনদিন দাঁড়াতে পারব না।'

'জানি না, কিছুই বুঝতে পারছি না। বুঝি এ স্ত্রীলোকের কাজ নয়।··· হয়তো আমাদের উচিত হয় নি এ কাজে আসা।'

একটু হতাশার সুরেই বলে আমিনা।

'না না—অত ভেঙে পড়বার মত কিছু হয় নি। এ আমরা সফল করবই। নরকে না নামলে নরকের আগুন জ্বালানো যায় না।···আচ্ছা, আমি দেখছি।'

আরও কিছুক্ষণ চুপ করে থাকবার পর আমিনা উঠে পড়ল।

'কী বলতে এসেছিলে তা তো বললে না?'

'না, বিশেষ কিছুই না। শুধু একা একা আর পারছি না। ওরা সর্দারকে পর্যন্ত সন্দেহের চোখে দেখে।···কার সঙ্গে দুটো কথা কই বল্ তো!···অপর যারা আছে, তারা সবাই নিজের নিজের স্বার্থের চক্রে ঘুরছে! আর যেন পারছি না আজিজন। এক এক সময় মনে হয়—দিল্লী চলে যাই। সেখানে নিজের হাতে কটাকে সাবাড় করে রক্ত মেখে হিন্দুদের যোগিনী সাজি!··· রক্তের তৃষ্ণায় পাগল হয়ে উঠেছি আজিজন!'

'জানি বহন্, কিন্তু ধৈর্য ধর। আগুন যে এখনও ভাল করে জ্বলে নি। ফুঁ দিয়ে জাকিয়ে তুলি এসো। তার পর সেই আগুনে না হয় নিজেরাও পুড়ব!'

আমিনা নিঃশব্দে সিঁড়ির মুখের কাছে এসে থমকে দাঁড়াল। কতকটা

যেন চুপি চুপি বলল, 'কালও তাকে দেখেছি—এমনি সন্ধ্যায়—বাড়ির ছাদ থেকে গঙ্গার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে দেখতে পেলাম, জাহাজে পাল তুলে সে আসছে। একদৃষ্টে চেয়ে আছে আমার দিকেই। তার হাতে একটা বন্দুক—আর তার পাশে—সেও! সেই পাপিষ্ঠাও!'

আজিজন কথা বলল না। দূর পশ্চিম দিগন্তে সূর্যের রক্তাভা তখনও একেবারে মিলিয়ে যায় নি—তারই ওপর ফুটে উঠেছে 'হিমকুন্দমৃণালাভ' শুকতারা। সেইদিকে সে একদৃষ্টে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল। আমিনা আবার বোরখায় মুখ ঢেকে নীচে নেমে গেল।

॥ ২৫ ॥

আজিজন সন্ধ্যের অনেক পরে ছাদ থেকে নামল। অলস ক্লান্ত পদে এসে দাঁড়াল বারান্দায়। পাড়ার বাকী বাড়িগুলিতে দেহ-বিলাসিনীর দল অনেকেই সেজেগুজে দাঁড়িয়েছে। মুখের কাছে একটা করে চেরাগ জ্বলছে প্রায় প্রত্যেকেরই। পথিকের দলও তাই উর্ধ্বমুখ। দেশের আবহাওয়াতে যতই আসন্ন বিপর্যয়ের আভাস থাকুক, চারিদিকের আকাশে যতই মেঘ ঘনিয়ে আসুক—এ পথের পথিকদের চোখে লোভাতুর কামনার দৃষ্টি দেখে তা অনুমান পর্যন্ত করবার উপায় নেই। এখানে বোধকরি ঘৃণায় কালও প্রবেশ করে না, তাই এখানকার জীবন সেই আদিমকালেই থমকে থেমে আছে।

আজিজনের বারান্দায় আজ ঝাড় জ্বলে নি। ঘরেও একটি মাত্র শেজ্-এর আলো। তাতে আজিজনকে দেখা যায় না। সে পর্দার আড়ালে নিশ্চিন্ত হয়েই দাঁড়াল।

মোটা মোটা বানিয়ার দল এল—চলে গেল। একটি ফৌজী দল হল্লা করতে করতে এসে কয়েকটি মেয়ের সঙ্গে দরদস্তুর রসিকতা জুড়ে দিল। তার পর একে একে তারা ঐ প্রায়ান্ধকার বাড়িগুলোর রহস্যময় কোণে কোণে মিলিয়ে গেল।…কুলফিওয়ালা-ফুলওয়ালার দল হেঁকে যাচ্ছে।…ওপাশের দু-তিনটে বাড়ি থেকে মত্ত কোলাহল উঠছে। চিরপরিচিত আবহাওয়া—প্রত্যহের নরক।

কিন্তু আজিজনের কোন দিকে খেয়াল ছিল না। পথের দিকে তাকিয়ে

ছিল সে—কিন্তু কিছুই লক্ষ্য করছিল না। শ্রান্ত চোখ দুটি পথের দিকে মেলে ছিল হয়তো—দৃষ্টি ছিল বহু দূরে, হয়তো বা বহুদূর অতীতে।

অকস্মাৎ নীচের পাথর-বাঁধানো পথে এক সিপাহীর নাগরা বেজে উঠতেই যেন আজিজনের চমক ভাঙল। লোকটির দিকে তাকাতেই চোখে পড়ল—সেও সতৃষ্ণ উৎসুক নয়নে ওপরের দিকে তাকাচ্ছে। পাশের বড় পানওয়ালার দোকানের 'ডিবিয়া' থেকে তার মুখে আলো এসে পড়াতে চেনবারও কোন অসুবিধা হল না। পর্দা সরিয়ে ঈষৎ কোমল কণ্ঠেই আজিজন ডাকল, 'খাঁ মহম্মদ!'

'আপকা বান্দা বিবিসাব!' আভূমিনত সেলাম করল খাঁ মহম্মদ।

'এসো, এসো। ওপরে এসো। একটু গল্প করি। অনেকদিন দেখি নি।'

খাঁ মহম্মদের চোখ দুটি জ্বলে উঠল। কিন্তু একবার নীচের দরজার দিকে তাকিয়ে করুণ কণ্ঠে বলল, 'দারোয়ান ঢুকতে দেবে কি?'

'দেবে, দেবে। দিলওয়ার খাঁ, ছেড়ে দাও তো সিপাইজীকে।'

মুখটা বাড়িয়ে আজিজন নির্দেশ দিল দারোয়ানকে।

খাঁ মহম্মদ জুতো বাইরে রেখে পাপোশে পা মুছে সসংকোচে ভেতরে এল। আজিজন ইঙ্গিতে তাকে ফরাসের বিছানা দেখিয়ে দিয়ে নিজেও একটি তাকিয়া টেনে নিয়ে হেলান দিয়ে বসে বলল, 'তার পর খাঁ সাহেব, খবর কী? পান খাও একটা। খবর সব ভাল তো? জরু-ছাওয়াল সবাই ভাল? কটা নিকেয় বসলে আর?'

'আর কেন তামাশা করেন বিবি, পেটে খেতে পাই না—তার নিকে! দুটো ছিল—একটা মরেছে, আপদ গেছে। আর পেরে উঠছি না বিবি। কি-ই বা মাইনে—দেনায় দেনায় মারা গেলাম।'···

পানের ডিবা থেকে পান ও খানিকটা কিমাম নিয়ে সে মুখের ভেতর ফেলে দিল।

'দুঃখ ক'র না খাঁ মহম্মদ। এবার আর কোন ভাবনা থাকবে না।···বরং এক কাজ কর, এই সামনের হপ্তার মধ্যেই যে-কটা পার নিকা করে নাও। ফুর্তিটা তো লোটো—দায়-ধাক্কা আর বেশীদিন সামলাতে হবে না।'

'কেন, কেন?' রূপসী ও সর্বজনবিদিতা বারনারীর সামনে বসতে পেয়ে যেন খাঁ মহম্মদের মাথা খুলে গেছে। তামাশার সুরে বলল, 'আসমান থেকে মোহর পড়বে?'

'আসমান থেকেই পড়বে বটে, তবে মোহর নয়—গুলি!'

'সে কি!'

'আর কি! যা বলছি তাই শোন। জান তো আমার কাছে হরেক খবর আসে। আমি ঝুটা বাত বলছি না। তোমাদের জান নিয়ে আর বেশীদিন এখানে থাকতে হবে না।'

'সে কি। কেন, কেন—কী ব্যাপার?' মুখ শুকিয়ে উঠল খাঁ মহম্মদের। সে পিকদানিতে পানটা নামিয়ে মুখ হালকা করে নিল তাড়াতাড়ি।

'আর কী ব্যাপার। তোমরা আরও ঘুমোও না! মীরাটের সিপাইরা অমন একটা কাণ্ড করলে, তা তোমরা তো একটা সাড়াও দিলে না। একসঙ্গে সবাই জাগলে জানোয়ারগুলো হাওয়ায় উড়ে যেত। তোমরা তামাশা দেখছ —ওধারে ইংরেজ তৈরী হয়ে গিয়েছে। তেলেঙ্গী মুলুক থেকে গোরা ফৌজ আসছে—তারা দিল্লী যাবে। আর তোমাদের কী করা হবে জান? এই সামনের মাসের কোন এক তারিখে তোমাদের কুচকাওয়াজে ডাকা হবে। তার পর হাতিয়ার পরখ করার নাম করে বন্দুকগুলো হাতিয়ে নিয়ে তোমাদের সকলকে তোপের মুখে উড়িয়ে দেবে—যাতে আর তোমরা না ওদের পেছনে লাগতে পার।... বুঝেছ হাঁদারাম?'

'সাচ্?'

'সাচ্। তুম্‌হারা কসম!'

খাঁ মহম্মদের মুখে কিছুক্ষণ কথা সরল না। তার পর শুষ্ককণ্ঠে বলল, 'কিন্তু মীরাটের ওরাই তো সব গড়বড় করে দিল। কথা ছিল—ঈদের পর মাসের একত্রিশ তারিখে সবাই একসঙ্গে রুখে দাঁড়াবে। ওরা হঠাৎ এমন একটা ব্যাপার করলে—!... কে কী করবে—করছে, পুরো খবর তো আমরা পাচ্ছি না। নানাসাহেবের মতলবও যেন কেমন-কেমন—আমরা হুট্ করে কী করব বলুন তো! একটু সোচে সমঝে না দেখলে—'

'বেশ, ভাল করে সোচে সমঝে দেখ—তাড়া কি? তবে মাথাটা কাঁধের ওপর থাকতে থাকতে যত পার ভেবে নাও। বেশীদিন আর ভাবতে হবে না।'

খাঁ মহম্মদ বোকার মত খানিকটা আজিজনের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বার-দুই জিভ বুলিয়ে শুষ্ক ওষ্ঠ দুটিকে সরস করবার চেষ্টা করল। তার পর অকস্মাৎ এক লাফে উঠে বিনা সম্ভাষণেই একরকম ছুটে নীচে নেমে গেল।

বাইরের পাথর-বাঁধানো পথে নাল-বাঁধা নাগরার দ্রুত শব্দ আবর্তনে বোঝা গেল দৌড়োবার মত করেই হাঁটছে।

অনেকক্ষণ পরে—হয়তো বা অনেকদিন পরেই—আজিজনের মুখে প্রসন্ন হাসি ফুটে উঠল।

আজিজনের অনুমান ভুল হয় নি। খাঁ মহম্মদ তার কথা পুরোপুরি বিশ্বাস করেছিল এবং অপরকেও বিশ্বাস করাতে চেষ্টার ত্রুটি রাখে নি। সে সারারাত ঘুরে ঘুরে ব্যারাকের সিপাহীমহলে, এমন কি ক্যাভাল্‌রি লাইনেও আবহাওয়া বেশ উত্তপ্ত করে তুলল। 'খাঁ মহম্মদ কসম খেয়ে বলেছে—কথাটা একেবারে ঝুট্‌ হতে পারে না।' সকলের মুখেই এই কথা। ক্রমশ ব্যাপারটা বেশ ঘোরালো হয়ে উঠল।

এতই ঘোরালো হল যে, কথাটা কানপুর থেকে এক সময় লক্ষ্ণৌ পৌঁছল। সার হেনরী বেশ একটু চিন্তিত হলেন। তাঁর অবস্থাও খুব ভাল নয়—তবু তিনি অনেক ভেবে শ-দুয়েক গোরা সিপাহী তখনই পাঠালেন কানপুরে—ওখানকার গ্যারিসনকে সাহায্য করবার জন্য।

তারা এসে পৌঁছতে সার হিউ হুইলার হেসে খুন হবার দাখিল। তিনি তখনই এক খৎ লিখে তাদের লক্ষ্ণৌতে ফেরত পাঠালেন। লিখলেন—'এখানে এমন কোন গোলমালের ভয় নেই। তা ছাড়া নানাসাহেব আছেন, অনেকটা ভরসা। আপনাদের প্রয়োজন বেশী সুতরাং এদের ফেরত পাঠালুম। আশা করি মনে কিছু করবেন না। ধন্যবাদ।'

খবরটাও যথাসময়ে আমিনার কাছে পৌঁছল বৈকি! সে নবাবগঞ্জের বড় পীরের আস্তানায় সিন্নি পাঠাল।

॥ ২৬ ॥

মুনশী কাল্‌কাপ্রসাদের মত বিপদে বোধ হয় আর কেউই পড়েন নি।

গোলমালের খবরটা শহরেও বেশ ফলাও ভাবে ছড়িয়েছিল। যদিচ মুনশীজী জরু-গরু সবই প্রায় দেহাতে পাঠিয়েছেন, তবু নিজের প্রাণটাও তো আছে। আর নিজের প্রাণ কিছু ফেল্‌না নয়। ভেবে দেখতে গেলে সবার

তাঁর এই দুগ্ধঘৃতপুষ্ট দেহটাকেই সুদূর দেহাতে কোথাও পাঠানো উচিত ছিল—যেখানে না ইংরেজ আর না এই বেইমান সিপাহীরা—কেউ কোন কালে পদার্পণ করবে না, শহরের খবর যেখানে পৌঁছতে এক মাস সময় লাগবে। কারণ, কাল্‌কাপ্রসাদ যথেষ্ট ভেবে দেখেছেন, কিছুদিন যাবৎ দিনরাতই ভাবছেন বলতে গেলে—জানটা বাঁচলে জরু-গরু দুই-ই হবে। তিনি তো মাত্র চারটি বিবাহ করেছেন,—তার ভেতর রামশঙ্করের মেয়েটা এখনও ঘর করতেই আসে নি, সুতরাং তিনটিই ধবা উচিত। তাঁর অবস্থার লোকে আটটা বিবাহ করতে চাইলেও কখনও পাত্রীর অভাব ঘটবে না।

কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে এই যে, এই দেহটাকেই আপতত কোনক্রমে কানপুর থেকে সরানো যাচ্ছে না। তাঁর মনিব গ্রীনওযে সাহেব কারও কোন কথাতে কর্ণপাত করবাব লোক নন। দু-এক বার যে সে চেষ্টা কাল্‌কাপ্রসাদ করেন নি তা নয, তবে সে নিতান্তই অবণ্যে রোদন। লোকটার বৈষয়িব বুদ্ধি খুব —তা কাল্‌কাপ্রসাদও স্বীকার করতে বাধ্য। ব্যবসায-সংক্রান্ত ব্যাপাবে অনেকবার দেখা গিয়েছে সাহেব 'এক-বগ্‌গা ঘোড়া'র মত কাবও কোন কথায কর্ণপাত না করে নিজেব দূবদৃষ্টি এবং বুদ্ধিমত্তারই পরিচব দিয়েছেন। যাকে ফুটো জাহাজ বলে ভাবা গিয়েছে, তাই কূলে পৌঁছিয়ে, প্রমাণ করে দিযেছেন—সপ্তডিঙা মধুকর। তবে সাংসারিক ব্যাপারে সাহেব যে শিশুব মতই অজ্ঞ তাতে কাল্‌কাপ্রসাদেব বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। আসন্ন ঝড়ের সংকেত সবাই পেয়েছে—কেবল সেটা সাহেবেরই চোখে পড়ছে না। মেমসাহেবদেরও রীতিমত মুখ শুকিয়ে উঠেছে, তা কাল্‌কাপ্রসাদও ভাল করেই লক্ষ্য করেছেন, কিন্তু গ্রীনওয়ে সাহেব স্ত্রীলোকের কথায় কর্ণপাত করে সতর্ক হবেন, তেমন ভরসা নেই।

অথচ সাহেব না ছাড়লে তিনি যেতে পারছেন না। বিষম রগচটা মানুষ। দেহটা থাকলে জরু-গরু সব হবে—এটাও যেমন সত্য কথা, দেহটা রাখতে তেমনি কিঞ্চিৎ রজত-রসেরও দরকার। লোকে যতই যা ভাবুক (মন্দ লোকে মনে করে—কাল্‌কাপ্রসাদ বেশ দু পযসা জমিয়েছেন!), চারটি স্ত্রী বহন করে লোকলৌকিকতা বজায় রেখে এই বাজারে কত পড়ে তা যে ভুক্তভোগী সে-ই জানে। 'তনখা' তো মাত্র মাসিক ত্রিশটি টাকা—উপরি কিছু আছে তাই বড়মানুষি দেখিয়েও কোন মতে চলে যায়। জমবে কোথা থেকে?

[illegible] তেমনি হয়েছে তাঁর 'কুনকে-শত্রু' যুগলকিশোরটা। আজ যদি গ্রীনওয়ে

সাহেবের অনুমতি না নিয়ে তিনি গা-ঢাকা দেন তো অমনি সে গিয়ে নানাভাবে পল্লবিত করে কথাটা লাগাবে এবং তাঁর চাকরিটা খেয়ে নিজে গিয়ে সেই আসনে বসবে। তার পর—তার পরের অবস্থাটা মুনশীজী ভাবতেও পারেন না!

অথচ এধারে হাওয়া ক্রমশই গরম হয়ে উঠছে।

খানিকটা ভরসা ছিল যতদিন বন্ধু কানহাইয়ালাল এখানে ছিলেন। রোজ প্রত্যুষে গিয়ে দুটো সুখ-দুঃখের গল্প করে খানিকটা ভরসা পাওয়া যেত। গত তিন দিন হল—তিনিও নি-পাত্তা হয়েছেন। লোকটা কি অদ্ভুত—এক বার বলে গেল না পর্যন্ত! আগের দিনও কত 'সাহুকারি' করেছে, কত ভরসার কথা শুনিয়েছে। অথচ সেদিন ভোরে গিয়ে দেখেন—একেবারে ভোঁ ভাঁ, দুয়োরে একটি ভারী গোছের দেশী তালা ঝুলছে।...এদিক ওদিক কোথাও বেড়াতে গিয়েছে—এমন মনে করবার কোন কারণ নেই, কারণ তা হলে পায়াভাঙা চারপাইটা অন্তত পড়ে থাকত। সেটাও যখন নেই—

কাল্‌কাপ্রসাদ সেদিন থেকে আরও অসহায় অনুভব করেছেন নিজেকে। যতই হোক, একের বুদ্ধি—বুদ্ধিই নয়। কী যে করবেন—। গত দু দিন তো একদম ঘুমোতে পারেন নি। সামনেই বকর-ঈদ পরব—বাজারে গুজব, বকরার বদলে সেদিন সাহেবদেরই কোরবানি করা হবে। আর সেই সঙ্গে, দানের সঙ্গে দক্ষিণার মত, ওজনের সঙ্গে ফাউএর মত, তাদেরও—না, আর ভাবতেও পারেন না। ভাবতে গেলে মাথা ঝিম ঝিম করে।

•

এই যখন অবস্থা, তখন হঠাৎ বোধ করি ভগবান মুখ তুলে চাইলেন।

ঈদের ঠিক আগের দিন সাহেব ডেকে বললেন, 'সরকারের কাছে অনেকগুলো টাকা পাওনা। কালেক্‌টার বিল পাস করেও দিয়েছেন। আজই গিয়ে টাকাটা নিয়ে এসো। দু দিন আবার পরবের ছুটি পড়ে যাবে নইলে।'

জয় মহাবীরজী, জয় বাবা বজরঙ্গজী!

এক-আধ পয়সা নয়—পাঁচ-পাঁচটি হাজার টাকা!

টাকা আদায় হলে দু-পাঁচ দিন মুনশীর হেপাজতেই থাকে। এই টাকাটা যদি কাল্‌কাপ্রসাদ বাড়িতেই রাখেন তো কেউ টের পাবে না। বকর-ঈদের ঝড়টা কেটে গেলে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করলেই চলবে। তেমন হয় তো ঐ টাকাটা নিয়েই তিনি গা-ঢাকা দেবেন। নদীর ওপারে এগারো ক্রোশ দূরে

তাঁর মাসির বাড়ি।· সে কথাটা বিশেষ কেউ জানেও না।·· সেখানেই গিয়ে উঠবেন। তার পর, জান বাঁচলে ঐ টাকাটা মূলধন করেই কোন কারবার শুরু করা যাবে। এছাড়া জমি-জমা তো রইলই। বিবিদের সঙ্গেও কিছু কিছু আছে। মায়ের কাছেও কিছু পাঠিয়েছেন। সব একত্র করলে একরকম চলেই যাবে।

অনেকদিন পরে কাল্‌কাপ্রসাদের মুখে হাসি ফুটল। স্নান শেষ করে একটু দুধ খেয়ে নিয়ে তিনি পুনশ্চ বজরঙ্গজীকে স্মরণ করে ট্রেজারির দিকে রওনা হলেন। বুড়ো চাকর রামদাস এখনও কোথাও যায় নি—তাঁকে ফেলে সে যাবেও না। তাকে ডেকে বলে গেলেন—আজ তাঁর ফিরতে দেরি হবে; ফিরে আর রুটি পাকাতে বসতে পারবেন না। রামদাসই যেন খানকয়েক পুরী ও ভাজি বানিয়ে রাখে। 'পাকী' খাবারে দোষ নেই—সকলের হাতেই খাওয়া যায়।

ট্রেজারিতে পৌঁছে কিন্তু আবার বেশ খানিকটা ঘাবড়ে গেলেন। যে সব পাহারাদাররা ওখানে থাকে, যাদের সঙ্গে যৎকিঞ্চিৎ 'জান-পহ্‌চানা' আছে, তাদের কারও টিকি নেই। এ যে সিপাহীর মেলা। চার দিকেই বন্দুকধারী ফৌজী সিপাহী। এর ভেতর নানাসাহেবের লোকও কিছু কিছু আছে। কিন্তু তাদের হাতেও আর আগের মত আসাশোঁটা নেই—সব বন্দুক। মেজাজটাও—অভিজ্ঞ লোক দূর থেকে দেখেই বুঝলেন, একেবারে 'মিলিটারী'। কী করবেন, ঢুকবেন না ফিরে যাবেন—ফিরে গিয়েই বা সাহেবকে কী কৈফিয়ৎ দেবেন—পাংশু বিবর্ণ মুখে যখন এই সব চিন্তা করছেন, পেছন থেকে কার একটা ভারী হাত কাঁধে পড়ল। চমকে ফিরে দেখলেন—এমন কেউ নয়, বাবু নানকচাঁদ। তবু ভাল! আবার ধড়ে প্রাণ ফিরে এল।

'কী দেখছ কাল্‌কাপ্রসাদ? ঢুকবে—না ফিরে যাবে?'

'কিছুই তো ভেবে পাচ্ছি না উকিলসাহেব। ব্যাপারটা কী? "রাজ" পাল্‌টে গেল নাকি?'

নানকচাঁদ মুচকি হেসে বললেন, 'কতকটা তাই বটে। তার পর? এখনও আছ তা হলে, আমি বলি দেশাতে পালিয়েছ কোথাও।'

'কোথায় আর পালাব বল? কাজ-কারবার ফেলে—'

'কাজ-কারবার আর কত কাল তোমার সাহেব চালাতে পারবে মনে কর?'

'কেন বল তো নানকচাঁদ ভাই? কী শুনছ?'

'শোনবার দরকার কী—চোখ মেলে দেখই না! সামনেই তো "তিরজুরি"। কালেক্টার সাহেবের পরোয়ানাতে আর কাজ হচ্ছে না! সুবাদার টীকা সিং হয়েছে মালিক। তাঁর হুকুম হলে টাকা মিলছে—নইলে মিলছে না। সিপাইদের দয়া না হলে তো কেউ ভেতরে ঢুকতেই পারছে না।'

'তুমি গিয়েছিলে?'

'না—এখনও যাই নি। লালা ভগৎরাম এসেছিলেন একটু আগে। তা তাঁরই যা দুর্দশা দেখলুম চোখের সামনে। মোটে যাব কিনা ভাবছি।'

'তোমার পাওনা আছে কিছু?'

'সে সামান্যই। আসলে আমি হালচাল দেখতেই এসেছিলুম।..তুমি যাবে না?'

'যাব?'

'যাও না। ক্ষতি কী? জানে মারবে না—ভয় নেই। হয়তো একটু সস্নেহ অর্ধচন্দ্র দিতে পারে! আবার টাকা পেয়েও যেতে পার। মিলিটারী মেজাজ—কখন্ কী ভাবে থাকে বলা যায় না তো।'

'সেই তো ভাবছি।..আচ্ছা, নানাসাহেবের সিপাইও তো দেখছি এখানে।..তা এরা এ-রকম করছে মানে কী? নানাসাহেবও কি তা হলে সোজাসুজি ইংরেজদেব দুশমনি করছে?'

'না—নানাসাহেবই তো এখন রক্ষক। এরা তো পাহারাদার। ইংরেজদের হয়েই পাহারা দিচ্ছে!' নানকচাঁদের কণ্ঠে সামান্য একটু ব্যঙ্গের সুর থাকলেও গম্ভীরভাবেই বলেন কথাগুলো।

কালকাপ্রসাদ শুষ্ক ওষ্ঠে একবার জিভটা বুলিয়ে নিয়ে বলেন, 'তা চল না ভাই তুমিও একটু!'

'না ভাই, আমি বোধ হয় এখান থেকেই ফিরব। আমাকে অনেকেই চেনে।...সেদিন লালুরাম মুৎসুদ্দির কী হয়েছিল জান?'

'না তো—কী হয়েছিল?'...

'ও আর ওর লোকজন কিছু টাকা নিয়ে যাচ্ছিল' নানার অনেকদিনের রাগ চিমনা আপ্পার ওপর—ওর ভায়েকে মকদ্দমার খরচা যোগাচ্ছিল তো আপ্পা সাহেবই, তা মনিবকে ধরতে না পেরে চাকরকেই ধর্। ব্যস, হঠাৎ পথের মাঝে গাড়ি ঘেরাও! লালুরাম বুদ্ধিমান লোক। সে সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি থেকে পড়েই পাশের ঝোপে গা-ঢাকা! লোকজনও যারা ছুটে পালাতে পারলে,

পালাল, যারা পারলে না—মার খেলে। টাকা-কড়ি সমস্ত লুট করে নিলে নানার সিপাইরা।'

'তাই নাকি? তা হলে আমি ফিরি!'

'আরে না, না। তোমার সাহেব কি তুমি তো আর নানার সঙ্গে কোন দুশমনি কি বেইমানি কর নি! তোমাব অত ভয় কি?...কত টাকার হুণ্ডি তোমার?'

'পাঁচ হাজাব।'

'অতগুলো টাকা ছেড়ে চলে যাবে? দিনকাল ভাল নয় হে!...ঐ টাকাটা হাতে থাকলে—বুঝলে না, জান-বাঁচানোরও সুবিধা হবে। ওটা তো আর কিছু আদায় করেই সাহেবদের দফতরে জমা দিচ্ছ না।' উচ্চাঙ্গের সি হাসেন নানকচাঁদজী।

'না—মানে—ঠিক তা নয—সাহেবের টাকা যখন—তবে—'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঐ "তবে"র কথাই বলছি!'

নানকচাঁদ একরকম তাঁকে ঠেলেই দেন সামনের দিকে।

টাকা সত্যিই অনেকগুলো—বিশেষত সামনে এই আসন্ন দুর্যোগ—আসন্নই বা কেন, সমাগতও বলা চলে।

গঙ্গামায়ী এবং সংকট-মোচনকে স্মরণ করে শুষ্কতালু কাল্‌কাপ্রসাদ এগিয়ে যান পায়ে পায়ে।

ঢোকবার মুখেই এক সিপাহী মারমুখো হয়ে তাড়া দিল, 'কেয়া মাংতা? কাঁহা যাতে হো?'

'এই একটা—একটা হুণ্ডি ছিল—'

'ব্যস্, ঐখানে দাঁড়াও। হুণ্ডি দাও এখানে। সুবাদার সাহেব দেখবেন। যদি তিনি হুকুম দেন তো রুপেয়া মিলবে, নইলে নয়—সাফ কথা!'

'কেন, কালেক্টার সাহেব পাস করে দিয়েছেন। সই-সাবুদ সব আছে!'

'কে কালেক্টার সাহেব? ওসব আমরা বুঝি না। ওসব জমানা চলে গেছে। টাকা চাও তো এই কানুন! না হলে ভাগো।'

ওদিক থেকে একটি সিপাহী সামনে এসে সঙ্গীনটা সোজা কাল্‌কাপ্রসাদের বুকের সামনে খাড়া করে ধরল।

'ব্যস্, আর একটা কথা নয়।.. দিতে হয় দাও, তার পর ঐ পাশে দাঁড়িয়ে থাক। ডাক পড়ে ভেতরে যাবে—নইলে সোজা বাড়ির পথ ধরবে।'

হাত-পা হিম হয়ে আসছিল কাল্‌কাপ্রসাদের—সঙ্গীনের চেহারাটা দেখেই। নেহাত চুপ করে থাকলে সঙ্গীন আর খাড়া থাকবে না, বুকে এসে বিঁধবে—এই ভয়েই কাঁপতে কাঁপতে বিলখানা বের করে দিয়ে এক পাশে সরে দাঁড়ালেন।

প্রায় দু দণ্ড কাল সেইভাবে বলির পাঁঠার মত দাঁড়িয়ে কাঁপলেন কাল্‌কাপ্রসাদ—গ্রীনওয়ে সাহেবের দোর্দণ্ড-প্রতাপ মুনশী!

তার পর ভেতর থেকে সুবাদার সাহেবের হুকুম এল, 'মঞ্জুর।'

সঙ্গীন দিয়েই ভেতরটা দেখিয়ে দেওয়া হল, 'যাও, সোজা খাজাঞ্চীখানায়।'

কাল্‌কাপ্রসাদ একবার ঢোঁক গিললেন। ভেতরে গেলে কোপ বসাবে না তো? মতলব কি?

নেহাত এখন ছুটে পালাতে গেলেও বোধ হয় গুলি ছুঁড়বে, নচেৎ তিনি পাঁচ হাজার টাকার মায়া করতেন না। জানটাই যদি না রইল—পাঁচ হাজার পাঁচ লাখ হলেই বা লাভ কি?

ভেতরে যেতে অবশ্য যথারীতি টাকা গুনে দেওয়া হল। পাঁচ পাঁচ হাজার টাকা বড় কম নয়—গিনিতে-টাকাতে মিলিয়েও অনেক। অন্য সময় হলে এখানকার রক্ষীরাই গিয়ে গাড়িতে তুলে দিয়ে আসে, সেলাম করে দু আনা পয়সা বকশিশ নেয়। এখন সিপাহীদের কিছু বলতে সাহস হল না। টাকার থলির ভারে প্রায় বেঁকে কাল্‌কাপ্রসাদ কাঁপতে কাঁপতে ফটক পর্যন্ত এগিয়ে এলেন।

কিন্তু দেউড়িতে পড়তেই পেছন থেকে হুকুম হল, 'রোকো!'

আবার কী রে বাবা! এমনিতেই কপাল থেকে ঘাম পড়ে কাল্‌কাপ্রসাদের চোখ লবণাক্ত ও ঝাপসা হয়ে গেছে। গলা শুকিয়ে কাঠ। তার ওপর জ্যৈষ্ঠের খররৌদ্র আকাশে বেশ চড়েছে—একটু পরেই হয়তো 'লু' চলবে। কোনমতে গাড়িটা পর্যন্ত পৌঁছতে পারলে যে হয়! যদিচ সাহেবের গাড়ি, তবু সোজা নিজের বাড়িতেই নিয়ে যাওয়া যাবে—এমন হামেশাই হয়, গাড়োয়ান সন্দেহমাত্র করবে না। তার পর···রাত্রের আঁধারে রামদাসকে নিয়ে নৌকোয় চড়তে কতক্ষণ?

এতক্ষণ কোন আশাই ছিল না—সে একরকম। কিন্তু টাকাটা গুনে দিতে দেখে কিছুটা যেন ভরসা পেয়েছিলেন, কল্পনা ও চিন্তাও তাদের স্বাভাবিক গতিপথ ধরে চলেছিল। তাই কিছু কিছু আশা-ভরসার কথাই ভাবতে শুরু করেছিলেন। কিন্তু এ আবার কী হল?

এক জমাদার সাহেব এগিয়ে এলেন, 'আমাদের পাওনাটা জমা করে দিয়ে যাও—'

'কিসের পাওনা ?...বকশিশ ?' কথাটা হঠাৎ কালকাপ্রসাদের মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল। পরক্ষণেই নিজের আহাম্মকি বুঝলেন, কিন্তু তখন আর উপায় কি ? হাতের পাশা ও মুখের কথা বেরিয়ে গেলে আর ফোর না !

'বকশিশ !' জমাদার সাহেবের মুখ কালবৈশাখার আকাশের মত ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল, 'বকশিশ কে চায় তোমার মত সাহেবের পা-চাটা কুকুরের কাছ থেকে ? আমরা কি ভিখ্-মাঙ্গা ? আমরা চাইছি আমাদের পাওনা— আমাদের তহবিলের টাকাটা দিয়ে যাও।'

'তহবিল ?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ—তহবিল ! আমাদের এখন ঢের টাকার দরকার এখানে কানুন করা হয়েছে যা টাকা লোকে আদায় করে নিয়ে যাবে, তার সিকি এখানে জমা দিতে হবে। ঐ আমাদের খাজাঞ্চা বসে আছে—ঐখানে জমা করে দাও !'

পাশেই আর এক জন সিপাহী দাঁড়িয়েছিল, সে বলল, 'ছেড়ে দাও না জমাদার সাহেব—সাহেবের গদিতেই জমা হতে দাও, সবই তো আমরা পাব !'

'সে তখনকার কথা তখন হবে। এখন যা-কিছু আইন-মোতাবেক হওয়া চাই !'

এই বলে জমাদার সাহেব কালকাপ্রসাদকে একটা ঠেলা মারলেন, 'যাও, ওখানে টাকাটা বুঝিয়ে দিয়ে এস। রসিদ চাও—রসিদও মিলবে। চোরা-কারবার নেই আমাদের এখানে।'

জমাদার সাহেব নিজের রসিকতায় নিজেই হেসে উঠলেন।

শেষের ঘটনাটা একেবারে ফটকের কাছেই ঘটল বলে, কয়েক গজ দূরে শিরীষ গাছের তলায় দাঁড়িয়ে থাকলেও নানকচাঁদের চোখে ও কানে সবই গিয়েছিল। তিনি যেন এইটুকুর জন্যই অপেক্ষা করছিলেন। তিনি আর দাঁড়ালেন না—দ্রুত সেখান থেকে সরে এসে একেবারে সরকারী সড়কে পড়লেন।

তাঁর নিজস্ব একা সেখানেই অপেক্ষা করছিল, তিনি ইঙ্গিতে চালককে পেছনে সরিয়ে দিয়ে নিজেই লাগাম হাতে নিলেন এবং যত দূর সম্ভব দ্রুত-গতিতে উকিলপাড়ার বাড়িতে এসে উপস্থিত হলেন।

বাড়ি ফাঁকা। সেই পূর্ব-বর্ণিত অর্ধবধির বৃদ্ধা দাসী ছাড়া কেউই ছিল না। স্ত্রী-পুত্রকন্যাকে বহু পূর্বেই সরিয়ে দিয়েছেন। দপ্তরের কাগজপত্র বাক্সে বন্ধ করে দেহাতে চালান করেছেন—কেরানীদেরও ছ মাসের ছুটি দিয়েছেন। কেবল নিজেই এখনও মায়া কাটাতে পারেন নি। কিন্তু এবার আর দেরি করা সম্ভব নয়।

গাড়ি থেকে নেমে নানকচাঁদ বললেন, 'ইয়ার আলি, তুমি এখন ঘোড়া খুলে দাও। তুমিও খানা-পিনা কর গে। একেবারে সন্ধ্যার সময় আসবে—আমাদের ফেরিঘাটে পৌঁছে দেবে। তার পর তোমারও ছুটি। ঘোড়া নিয়ে তুমি তোমার বাড়ি চলে যেও—খবর পাঠালে আবার আসবে।'

নানকচাঁদ দরজায় আঘাত করতেই বুড়ী রামলখিয়া দরজা খুলে দিল। নানকচাঁদ ভেতরে প্রবেশ করতে সংক্ষেপে শুধু বলল, 'লোক আছে ওপরে।'

'লোক! এ সময়ে আবার কে লোক?'

বুকটা ধড়াস করে উঠল নানকচাঁদের। এক-পা পেছিয়েও গেলেন সঙ্গে সঙ্গে।

'সর্দার খাঁ।'

তবু ভাল! আশ্বস্ত হলেন, কিন্তু ভ্রূ কুঞ্চিত হয়েই বইল তাঁর। আব নয়—ওদের জন্যে ঢের করেছেন তিনি।

ওপরে উঠতে দেখা গেল সর্দার খাঁ অসহিষ্ণুভাবে তাঁর দপ্তরখানার শূন্য ঘরে পায়চারি করছে। এই লোকটিকে দেখলে নানকচাঁদের শরীরের মধ্যে কেমন করে। এই দৈত্যের মত ভয়ঙ্কর লোকটা ভিন্ন কি আর আমিনা বেগম দূত খুঁজে পায় না!

'কী খবর সর্দার খাঁ?' কণ্ঠস্বর যত দূর সম্ভব মোলায়েম করেই প্রশ্ন করেন নানকচাঁদ।

ভূমিকা করা সর্দার খাঁর অভ্যাস নয়। সে সোজাসুজি উত্তর দিল, 'মালেকান আজ আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসবেন—সন্ধ্যার সময়। ঐ দরজায় বুড়ীকে রাখবেন।'

'তাঁকে কষ্ট করতে বারণ ক'র—এখন কিছুদিন আর আমার দেখা পাবেন না।'

'জরুরী দরকার তাঁর।'

'তা হোক, আমার দরকার আমার কাছে সবচেয়ে জরুরী।'

'তা হলে কাল?'

''আর কোন দিনই নয়। তুমি মহাভারত পড় নি—নইলে বলতুম, আজ থেকে আমার অজ্ঞাত-পর্ব শুরু!'

'মানে?'

'মানে আমি আজই এখান থেকে পালাচ্ছি। হাঙ্গামা না মিটলে আর ফিরব না!'

'কোথায় যাবেন?'

'ঐটি বলতে পারব না বাপু, মাপ কর।'

'মালেকান আন্দাজ করেছেন যে, আপনি এবার ভয় পাবেন। সেই জন্যেই তিনি আসছিলেন। আপনার কোন ভয় নেই—আপনার ওপর তাঁর নজর থাকবে।'

'ওরে বাবা, তাঁর নিজের ওপর নজর রাখতে ব'ল। ঝড় উঠলে তিনিই বা কোথায় থাকবেন, আর তুমিই বা কোথায় থাকবে—কেউ কি বলতে পারে? না, সে ভরসা আমার নেই।'

'আপনি নানাসাহেবের মুনশীর কাজ করবেন—তা হলে সকল দিক রক্ষা হয়।

'না, আমি শুধু কটা মাস এখন চুপ করে বসে আরাম করব আর তামাক খাব।...বুঝেছ?...বেগমসাহেবাকে ব'ল, তাঁর যখন দরকার পড়বে, আমি নিজেই গিয়ে তাঁর পাশে দাঁড়াব—কোন ভয় নেই!'

'মালেকান বলে দিয়েছেন যে, যদি কোনমতেই আপনি এখানে থাকতে রাজী না হন তো আপনার কোন একটা ঠিকানা দিয়ে রাখতে—যেখানে অন্তত খৎ পাঠালে আপনি পাবেন। সে ঠিকানা আমি আর তিনি ছাড়া কেউ কোন দিন জানবে না—খোদা কসম!'

'ঠিক?'

'ঠিক।'

গলাটা অকারণে নামিয়ে নানকচাঁদ বললেন, 'গঙ্গার ওপারে বদরুকা বলে একটা গ্রাম আছে। সেখানে কায়েত ধর্মদাসের বাড়িতে খৎ পাঠালে সে আমাকে সেই দিনই পাঠাতে পারবে। বুঝেছ?'

'জী। আদাব।'

সর্দার খাঁ সেলাম করে চলে গেল। অতবড় দেহ, কিন্তু লোকটা চলে যেন নিঃশব্দে—কতকটা বেড়ালের মত।...

নানকচাঁদ কিছুক্ষণ স্থিরভাবে অপস্রিয়মাণ ওর মূর্তিটার দিকে চেয়ে রইলেন। একটু পরে ঈষৎ উচ্চকণ্ঠেই ডাকলেন, 'রামলখিয়া!'

বুড়ী নীচের দরজা বন্ধ করে সামনে এসে দাঁড়াল।

'আমরা আজই এখান থেকে চলে যাব। তোমার যা দামী জিনিস গুছিয়ে নাও। মাল বেশি নেওয়া চলবে না।'

'কোথায় যাবে বাবুজী?'

'আপাতত বদরুকা। তেমন বুঝলে আরও দূরে দেহাতে কোথাও।'

'বদরুকা? সেখানে কে আছে?'

'কায়েত ধর্মদাসকে মনে আছে? তোমার নানীর কে হয়?'

'ও—হ্যাঁ। এই গত মাসেও তো টাকা ধার করতে এসেছিল।'

'হ্যাঁ, এখন দরকার হবে বুঝেই তাকে টাকা ধার দিয়েছিলুম। নইলে তার কী আছে—কী দেখে অতগুলো টাকা ধার দেব?...ওর বাড়িতে থাকাই সুবিধে। দেহাতকে দেহাত—অথচ মনে করলেই এখানে আসা যাবে।...ওর যথাসর্বস্ব তমসুক করা—তা না হলে আমাকে রাখতে রাজী হত না!'

'কিন্তু লোকটা বিপদে পড়বে না তো?'

'বোধ হয় না। সে রকম বুঝলে সরে পড়ব।'

রামলখিয়ার স্তিমিত দৃষ্টিতে প্রশংসার জ্যোতি ফুটে উঠল। সে যেদিন প্রথম এ-বাড়ি এসেছে, তখন এই বর্তমান মনিবের বয়স মাত্র আট বছর। সেদিন থেকে আজও সে ওর বুদ্ধির তল পায় না। কত আগে থেকে ভেবে কাজ করে—আশ্চর্য!...

নানকচাঁদ নিজের ঘরে গিয়ে লেখবার বাক্স থেকে-গোটা-দুই খেরোবাঁধানো খাতা বের করে সযত্নে একটা কাপড়ে মুড়ে নিলেন। লেখাপড়া করেই খেতে হবে যখন, তখন এগুলো ফেলে গেলে চলবে না।

আরও কিছু কাগজপত্র গোছগাছ করে একটা ভারী পুঁটুলি বাঁধা হল। তার পর কাজ শেষ করে নানকচাঁদ একটা তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে শুয়ে পড়লেন।

বাইরে তখন বাতাসে অগ্নিকাণ্ড শুরু হয়ে গেছে। ঝাঁ-ঝাঁ করছে জ্যৈষ্ঠের দ্বিপ্রহর। তারই মধ্যে যেন দূরে কোথায় একটা হল্লা চলছে। সেদিকে কান পেতে থাকতে থাকতে নানকচাঁদ অস্ফুট কণ্ঠে নিজেকে প্রশ্ন করলেন, "সত্যিই কি আংরেজশাহি যাবে? নানাই মালিক হবে? হিন্দু না মুসলমান? বাহাদুর শাহ? আবার সেই ঝগড়া? কে জানে!"

॥ ২৭ ॥

সেদিন যে সন্ধ্যার পর থেকে শ্মশানঘাটের পাশে একটি একটি করে তিন চারটি বজরা নৌকো এসে পরস্পরের সঙ্গে ভিড়েছিল, সে ঘটনাটাতে বিশেষ কোন অর্থ কেউ আরোপ করে নি। কারণ গরমের সময় অনেকেই সন্ধ্যার দিকে নৌকো করে হাওয়া খেতে বের হয়। তার পর বন্ধু-বান্ধবদের নৌকো এক জায়গায় জড়ো করে গান-বাজনা তো বটেই, এমন কি তার কোন একটায় উঠে খোশ-গল্প করাও নতুন নয়। সুতরাং বিস্মিত হবার কোন কারণ ছিল না—অনুসন্ধিৎসু হওয়ারও না।

এই নৌকোগুলোর মাঝের বড় বজরাটিতে একটা বড় ফরাশ পড়েছে—শরবত এবং পান তামাকেরও আযোয়ন প্রস্তুত। তবে নাচ-গানের কোন আয়োজন নেই। সেটা পাশের একটা মাঝারি বজরার ছাদে ব্যবস্থা করা হয়েছে। একটা বেসুরো সারেঙ্—তার সঙ্গে ঢপঢপে তবলা—গাইয়েও জরাজীর্ণ একটি বৃদ্ধ, সম্ভবত এই তিন জন ছাড়া ওদের শ্রোতাও কেউ নেই। বস্তুত আয়োজনটা গান-বাজনা শোনবার বা শোনাবার জন্যও নয়। ওটা নিতান্তই আসল উদ্দেশ্যটাকে চাপা দেওয়ার একটা ছদ্মাবরণ মাত্র।

মাঝের নৌকোটাতে যাঁরা জড়ো হয়েছিলেন তাঁদের বৈঠক তখনও শুরু হয় নি, তাঁরা নিশ্চয়ই অপর কারও জন্য অপেক্ষা করছিলেন। প্রায় নির্বাক হয়েই বসেছিলেন তাঁরা; সম্ভবত পরস্পরের সঙ্গে কথা বলবার আর প্রয়োজনও ছিল না তাঁদের—নিজেদের মধ্যে আলোচনা শেষ হয়ে গেছে, এখন অপর পক্ষের সঙ্গে বোঝাপড়া করা দরকার।

এঁরা সকলে সমবেত হবার বেশ কয়েকদণ্ড পরে প্রায় নিঃশব্দে তিনটি ডুলি এসে নামল ঘাটের ধারে। নিঃশব্দে হলেও বজরার ছাদে যে মাঝিটি বসে ঘাটের দিকে চেয়ে ছিল—তার দৃষ্টি এড়ায় নি। সে ঘরের ভেতর মুখ বাড়িয়ে অনুচ্চকণ্ঠে শুধু বলল, 'এসে গিয়েছেন ওঁরা।' তারপর একটা ডিঙ্গি খুলে শুধু মাত্র 'লগি'র সাহায্যে পারে এসে পৌঁছল।

পার থেকে মৃদুকণ্ঠে প্রশ্ন হল, 'কে?'

'বাবা বিশ্বনাথের সেবক!'

নিশ্চিন্ত হয়ে তিন জনেই ডিঙ্গিতে উঠলেন। ডিঙ্গি আবার কয়েক মুহূর্তের মধ্যে বাঁধা বজরাগুলির সঙ্গে এসে লাগল। আগন্তুকরা নামলেন, সেই ডিঙ্গিতেই মাঝিমাল্লারা পার হয়ে গেল। সম্ভবত সেই রকমই হুকুম ছিল, আলোচনার সময় অপর কারও থাকা বাঞ্ছনীয় নয়। কেবল সেই মাঝারি বজরাটার ছাদে বসে বৃদ্ধ গায়কটি শ্লেষ্মাধরা গলায় প্রাণপণে গেয়েই যেতে লাগল। তাদের কানে কোন কথা পৌঁছনো সম্ভব নয়—তারা নিজেদের শব্দেই পরিপূর্ণ। অনেক মাথা ঘামিয়ে এদের সংগ্রহ করা হয়েছে। এই গরমের দিনে রাত্রিবেলা ভাল গান-বাজনার আভাস পেলে এর গায়ে অবাঞ্ছিত অপর নৌকোর এসে ভেড়াও আশ্চর্য নয় যে!

নৌকো থেকে বজরায় এসে নামলেন তিন জন,—নানাসাহেব, নানার ভাই বালাসাহেব এবং আজিমুল্লা। নানার ভাব-ভঙ্গি দেখে মনে হয় তিনি খুব স্বেচ্ছাসুখে আসেন নি—কেমন একটা অস্বস্তি অনুভব করছেন। তিনি ভেতরে এসে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চার দিকে তাকিয়ে দেখলেন। সবই পরিচিত মুখ—বিশেষ পরিচিত—সুবাদার টীকা সিং, নানার নিজস্ব মোসাহেব জোয়ালাপ্রসাদ, ঘোড়াওয়ালা মদদ আলি—এক কালে নানারই কর্মচারী ছিল, এখন স্বাধীন ব্যবসা করে, জমাদার শামসুদ্দীন খাঁ—এরা প্রায় সকলেই অন্তরঙ্গ শ্রেণীতে পড়ে, তবু অস্বস্তি ঘোচে কৈ?

নানা ভেতরে ঢুকতেই সকলে সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়াল। নানাসাহেব নিজে বসে ইঙ্গিতে সকলকে বসতে বললেন। তার পর মুখে একটা কৃত্রিম প্রসন্নতা টেনে এনে বললেন, 'তার পর টীকা সিং, কী খবর বল? আজকের এ জরুরী তলব কেন?'

টীকা সিং জিভ কেটে বলল, 'ছিঃ পেশোয়াজী! আপনাকে আমরা তলব করতে পারি! আমরা হলুম আপনার বান্দার বান্দা!...বিশেষ প্রয়োজনেই—'

'সেই প্রয়োজনটাই তো শুনতে চাইছি!'

'পেশোয়াজী, ভারতের সিংহাসন আপনার দোরে এসে ফিরে যাচ্ছে। সৌভাগ্য বরাবর আসে না মানুষের কাছে—মনে রাখবেন।'

নানাসাহেব ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, 'কেন—কেন? আমি কী করলাম? তোমাদের সময় হলেই—'

'আপনি ইংরেজদের অভয় দিয়েছেন, আপনার সিপাইরা তোশাখানা

থাহারা দিচ্ছে—এর দ্বারা কি বোঝায় বলুন!—সিপাইরা আপনার মনের ভাব বুঝতে পারছে না ঠিক!'

নানা আরও ব্যস্ত হলেন। বললেন, 'কিন্তু সে কি তোমাদেরই কাজ এগিয়ে রাখছি না?'

'কেমন করে বুঝব বলুন? আপনি তাদের কাছে তাদের মত বলছেন—আমাদের কাছে আমাদের মত বলছেন। কোন্‌টা আপনার মনের কথা আমরা কেউই বুঝছি না! মাফ করবেন পেশোয়াজী, আমরা জংগী লোক, রেখে-ঢেকে মিষ্টি করে কথা বলতে শিখি নি। সিপাইরা আপনার সম্বন্ধে রীতিমত সন্দিগ্ধ। তারা বলছে—আমরা এগিয়ে যাব, পেশোয়াজী যদি ভরা-তরী ডোবান!'

'তারা কী প্রমাণ চায়?'

'আপনি একটা খৎ লিখে সই করে দিন যে, আপনি সিপাইদের নেতা হয়ে ইংরেজদের সঙ্গে লড়াই করবেন!'

'নেতা তো বাদশা! বাহাদুর শাহ আজও জীবিত।'

'তা হলে আমরা তাঁর কাছেই যাব কি পেশোবা? এই আপনার শেষ জবাব? আপনার পূর্বপুরুষের তখ্‌ত্‌ আপনি ফিরিয়ে দিচ্ছেন।'

'কেন—কেন, তাতে কি এই বোঝায়?'

'হ্যাঁ, তা বোঝায় বৈকি পেশোযা। বিনাশ্রমে আপনি পুরো সুবিধাটা কববেন—তা হবে না।'

ধুন্ধুপন্থ কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। খানিক পরে বললেন, 'বিহার এখনও চুপচাপ। কুঁয়ার সিং তার মকদ্দমার ফলাফল জানবার জন্য অপেক্ষা করছেন—এখনও তাঁর টেলার সাহেবের ওপর ভরসা। এ অবস্থায় অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে ঝাঁপিয়ে পড়া কি বুদ্ধিমানের কাজ হবে?'

'বিহারও আমাদের কথা বলছে। আমরাও যদি তাই বলি, তা হলে কোন দিনই কোন কাজ হবে না। মীরাটে দিল্লীতে শুরু হয়ে গেছে—এখন আর বসে থাকবার উপায় নেই পেশোয়া ধুন্ধুপন্থ। সিংহকে খোঁচা দিয়ে তার সামনে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকা যায় না। তাকে না মারলে সে-ই আপনাকে মারবে।…না, সময় আর নেই। চারদিকে গোলমাল বেধেছে—খবর সব পাচ্ছে ওরা। সতর্ক হতেও শুরু করেছে। প্রস্তুত হতে সময় পাবার আগেই ওদের শেষ করতে হবে। চারিদিকে ছড়িয়ে থাকতে থাকতেই বিষ-দাঁত

ভেঙে দিতে হবে—জড়ো হতে দিলে চলবে না। আমরা আপনার জন্য আর অপেক্ষা করতে পারব না!'

আবারও একটা স্তব্ধতা নেমে এল। নানাসাহেব হাতের মুক্তোর আংটিটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছিলেন। চোখের সামনে ভেসে ওঠে পেশোয়ার সিংহাসন—পেশোয়ার রাজসভা—দেশ-বিদেশ থেকে দূত আসত সে সভায়, পেশোয়াদের ভ্রূকুটিতে সারা ভারত—এমন কি ইরাক, ইরান, তুর্কীস্থান অবধি কাঁপত একদিন। খুব বেশী দিনের কথা নয়—পৌরাণিক যুগের কথা তো নয়ই। হয়তো আজও সে দিন ফিরিয়ে আনা যায়—

এতক্ষণ টীকা সিং এবং নানাসাহেবই কথা বলছিলেন। এবার নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করলেন স্বয়ং আজিমুল্লা। বললেন, 'অপেক্ষা করতে পারবেন না তো কী করবেন?'

কণ্ঠে যেন একটু প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গেরই স্বর।

নানাসাহেবের দিবাস্বপ্ন ছুটে গেল। তিনি উৎসুকভাবে তাকালেন টীকা সিংএর দিকে।

টীকা সিং প্রশান্ত কণ্ঠে উত্তর দিল, 'তা হলে আমাদের শত্রু বলেই গণ্য হবেন নানাসাহেব। কারণ উনি আমাদের আনুকূল্য যখন করলেন না, তখন ওঁর পক্ষে একটা দিকই খোলা রইল—ইংরেজের সহায়তা করা। সে দিকটা অন্তত আমাদের বন্ধ করতে হবে বৈকি।'

উৎকণ্ঠিতভাবে নানাসাহেব বললেন, 'কি মুস্কিল, এসব কথা উঠছে কেন! সিপাইদের আমি জবান দিয়েছি আমি তাদের সর্বতোভাবে সাহায্য করব। সে জবানের দাম নেই? এইমাত্র টীকা সিং আমাকে পেশোয়া বলেই সম্বোধন করছিলে না? তা'হলে আর অবিশ্বাস করছ কেন? আমি রাজা তায় ব্রাহ্মণ!'

টীকা সিং নত হয়ে নমস্কার জানিয়ে বলল, 'আমার বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্নই উঠছে না। কিন্তু সিপাহীরা আপনার দস্তখত ছাড়া মানতে চাইছে না।'

'বেশ দাও, কোথায় কি সই করতে হবে—করে দিচ্ছি।'

টীকা সিং ইঙ্গিত করতেই শামসুদ্দীন খাঁ জেব-এর ভেতর থেকে একটি কাগজ বার করে দিল। নানাসাহেব কাগজখানা হাতে নিয়ে লণ্ঠনের ক্ষীণ আলোতেই হেঁট হয়ে পড়লেন। উর্দুতে লেখা একটা ইস্তাহারের মত। তাতে পেশোয়া নানা ধুন্ধুপন্থ বেইমান ইংরেজদের তাড়িয়ে দেশকে আবার

স্বাধীন করবার জন্য সিপাহীদের আহ্বান জানাচ্ছেন। সহজ ও সরল, অনাড়ম্বর ভাষা—কিন্তু নানাকে চিরকালের মত জড়িয়ে ফেলবার পক্ষে যথেষ্ট।

পড়া শেষ হয়ে গেলেও নানা বহুক্ষণ সেই দিকে চোখ মেলে চেয়ে চুপ করে বসে রইলেন। ভাবছেন, অত্যন্ত দ্রুত ভাবছেন তিনি। কারণ, সময় নেই। হ্যাঁ কি না—এক মুহূর্তের মধ্যে ঠিক করতে হবে।...ইংরেজদের তিনি এই গত কয়েক বছরে ভাল করেই চিনেছেন। শত্রু হিসেবে ওরা উপেক্ষণীয় নয় আদৌ!...শেষে কি সব যাবে? ওদের প্রতিহিংসাও যে সাংঘাতিক!

অথচ স্বর্ণ-নির্মিত মণি-মাণিক্যখচিত পিতৃপিতামহের সিংহাসন!

আজিমুল্লা একটি মস্যাধার এবং কলমদান এগিয়ে দিলেন হাতের কাছে—যেন নানাসাহেবেরই ইঙ্গিতে।

নানা ধুন্ধুপন্থ একবার অসহায়ভাবে উপস্থিত সকলের মুখের দিকে চাইলেন। স্থির পাষাণের মতই অবিচল সে সব মুখ—কঠিন, নির্মম! কারও কাছ থেকে এতটুকু দয়ামায়া পাবার সম্ভাবনা নেই। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ধুন্ধুপন্থ কলম টেনে দোয়াতে ডোবালেন এবং দস্তখত করে দিলেন। দস্তখত করতে করতে তাঁর সারা দেহ যে একবার শিউরে উঠল, তা আর কেউ না দেখুক আজিমুল্লা ঠিকই লক্ষ্য করলেন। তিনি টীকা সিংএর মুখের দিকে তাকালেন। টীকা সিংএর অধরোষ্ঠে অতি ক্ষীণ একটা হাসি ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল।

নানা সই-করা কাগজখানা টীকা সিংএর দিকে বাড়িয়ে ধরে কতকটা বাহাদুরির সুরেই বললেন, 'নাও, এবার হল তো? আর অবিশ্বাসের কোন কারণ নেই আশা করি?'

টীকা সিং কাগজখানা দু হাতে গ্রহণ করে মাথায় ঠেকাল। বলল, 'বান্দার অপরাধ নেবেন না। আমি নিরুপায়!'

নানাসাহেব একেবারে উঠে দাঁড়ালেন।

'তা হলে আমার ছুটি? চল আজিমুল্লা!'

এক সঙ্গে ডুলিতে উঠলেও তিন জনে একসঙ্গে ফিরলেন না। আজিমুল্লার ডুলি অন্য নানাপথ ঘুরে এক সময় বড় পীরের দরগায় এসে থামল। ডুলিগুলোর বিভিন্ন পথেই আসবার কথা—কারণ একত্রে গেলে লোকে সন্দেহ করবে। সতর্কতার কারণেই ডুলিরও ব্যবস্থা—নইলে গাড়ি-ঘোড়া তো ছিলই।

দরগা তখন একেবারেই জনশূন্য। পরবের দিন নয়, ঈদের পরব বহুকাল

মিটে গেছে—এ সময় কারুর থাকবার কথাও নয়। তবু, হয়তো অন্য কোন ইঙ্গিতেই, এমন কি ভৃত্যদেরও সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। বাতিগুলোরও অধিকাংশই নিভোনো।

আজিমুল্লা দরগার প্রাঙ্গণে উঠে কিন্তু সেদিকে গেলেন না। একবার মাত্র হাতটা টুপিতে ঠেকিয়ে পীর সাহেবের উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করে নিয়েই সেই আবছা আলোতে পথ দেখে দেখে চললেন উঠোনের ওদিকে—পরবের দিনে যাত্রীদের থাকবার যে সব ঘর আছে সেই দিকে।

একটি ঘরের বাইরে অন্ধকারে ঘনীভূত আঁধারের মতই দাঁড়িয়ে ছিল সর্দার খাঁ। আজও, এতদিন ধরে দেখতে অভ্যস্ত হওয়া সত্ত্বেও, আজিমুল্লা একটু চমকে উঠলেন। সর্দার খাঁ অন্ধকারে সে চমক লক্ষ্য করল না—করলেও বিস্মিত বা ক্রুদ্ধ হত কি না সন্দেহ। সে যেমন নিঃশব্দে দাঁড়িয়েছিল, তেমনি নিঃশব্দে ঘরের ভেতর দিকটা দেখিয়ে দিল।

আজিমুল্লা ভেতরে ঢুকে দেখলেন—আমিনা পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহীর মতই অস্থিরভাবে সেই ছোট্ট ঘরটার মধ্যে পায়চারি করছে। সামান্য চেরাগের আলো—কিন্তু তাতেই তার মুখের উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা ধরা পড়ে।

আজিমুল্লার পায়ের শব্দে থমকে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করল, 'খবর?'

'ভাল। সই করেছে।'

'সে কাগজ কোথা?'

'টীকা সিংএর কাছে।'...

'নানা বোঝে নি কিছু?'

'কিছু না। অভিনয় নিখুঁত! আমি টুঁ শব্দটি করি নি। যা বলেছে, টীকা সিংই বলেছে। অবশ্য সে আপনারই শেখানো কথা—মোদ্দা বলেছে ভাল!'

আমিনার মুখের ভ্রূকুটি অনেকটা সরল হল। সে একটা ছোট্ট নিশ্বাস—বোধ করি স্বস্তিরই—ফেলে বলল, কবে নাগাদ শুরু করতে পারবেন আপনারা?'

'ঠিক বলা যাচ্ছে না। সিপাইদের মনোভাব বোঝা কঠিন। ক্ষেপে উঠল তো ক্ষেপেই উঠল—নইলে নয়। তবে তিন-চার দিনের মধ্যে আরম্ভ না করলে মুস্কিল হবে। এখন যারা তেতেছে—তারা হয়তো আবার জুড়িয়ে যাবে।

'তিন-চার দিন!' কতকটা উদ্বিগ্ন ভাবেই বলে আমিনা, 'সে যে বহুৎ

দেরি! এখনও নানার ওপর কিছুমাত্র বিশ্বাস নেই…ওঁকে চিনি তো, আবার যে কী করবেন—'

'একটু নজর রাখুন—উপায় কি?'

'মুস্কিল হয়েছে যে সেখানেই! নানাসাহেব আমার ওপর নজর রাখতে শুরু করেছেন।…আচ্ছা দেখি—যাই এখন।'

আমিনা দুয়ারের দিকে দু পা অগ্রসর হল।

মনে হল আজিমুল্লা আরও কিছু বলবেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুই বললেন না—একটা অভিবাদনের ভঙ্গি করে পথ ছেড়ে দিলেন। আমিনা বাইরের অন্ধকারে মিলিয়ে যাবার পর নিজেও গিয়ে ডুলিতে উঠলেন।

তাড়া তাঁর নিজেরও বড কম নেই—এ কথাটা হুসেনী বেগম কবে বুঝবে?

॥ ২৮ ॥

নানাসাহেব প্রাসাদে ফিরে সোজা নিজের ঘরে চলে গেলেন। এই মুহূর্তে তাঁর একটু নির্জনে থাকা দরকার। কারও সঙ্গ আর তাঁর ভাল লাগছে না।

'হাতের পাশা আর মুখের কথা' একবার বার হয়ে গেলে আর ফেরে না—এ সত্য তিনি ভাল রকমই জানেন। তাই পাশাটা অত তাড়াতাড়ি ফেলবার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু—না, সব গোলমাল হয়ে গেল।

নানাসাহেব স্থির হয়ে বসতেও পারলেন না।

তিনি নির্বোধ নন। সারা ভারতের খবর সংগ্রহের জন্য তিনি মুঠো মুঠো টাকা খরচ করছেন। আজিমুল্লা ও তাত্যা ভাবে যে, কেবল মাত্র তাদের বুদ্ধির ওপর ভর দিয়েই নানা চলেন। কিন্তু তা আদৌ সত্য নয়। এমন কি, তাদের ওপর খুব বেশী নির্ভর করবার কারণ আছে বলেও তিনি মনে করেন না। তবে সে সব পরের কথা—এখন তাদেরও খানিকটা দরকার বৈকি।

দিল্লী, মীরাট, আম্বালা, লক্ষ্ণৌ, কানপুর, ফতেপুর—হয়তো বা কাশী, এলাহাবাদ, কিন্তু এইটুকু জায়গাই তামাম হিন্দুস্তান নয়। বাংলা দেশ একেবারে ঠাণ্ডা। বিহার এখনও অনিশ্চিত। শিখ বা রাজপুতদের ওপর কোন ভরসাই নেই। এক তাঁর নামে মারাঠীরা ছুটে আসবে—তাও কি সকলে [illegible]াবে? হোলকার, গায়কোয়াড়, সিন্ধিয়া—তাঁর বংশের পুরাতন শত্রুরা।

কে জানে ? কেমন যেন মাথার মধ্যে সব গুলিয়ে যাচ্ছে !

বড় সাংঘাতিক শত্রু ইংরেজরা। বড় সর্বনেশে শত্রু !

দীর্ঘদিন ইংরেজদের সংস্পর্শে থেকে ওদের উনি ভাল করেই চিনেছেন। ওরা একটু ভুল করেছে—ভারতীয়দের মানুষ বলেই গণ্য করে নি। সেই ভুলের মূল্যস্বরূপ প্রথমটায় হয়তো একটু অসুবিধায় পড়বে।···কিন্তু শেষ পর্যন্ত ?

শেষের কথাটাই ভাবছেন নানাসাহেব।···শেষরক্ষা হবে কি ?

নানা অস্থিরভাবে পায়চারি করতে লাগলেন। তাঁকে এই দুঃসময়ে ঠিক সৎ-পরামর্শ দিতে পারে, এমন এক জনও নেই। তাঁর যারা ঘনিষ্ঠ বন্ধু, তারা শুধু উত্তেজিতই করছে।—নানার নিজেরও উত্তেজনার অবশ্য যথেষ্ট কারণ আছে। হৃদয় তো অহোরাত্রই বলছে—ঝাঁপিয়ে পড়।···কিন্তু বুদ্ধি বলছে—আর একটু ভেবে দেখ, এখনও সময় আছে।···

অবশেষে এক সময় নানা মন স্থির করলেন।

কার্পেট মোড়া ঘরের মেঝে—তবু সাবধানে পা টিপে টিপে, দরজার কাছে গেলেন। কপাটটা নিজের হাতে বন্ধ করে দিলেন ভেতর থেকে। তার পর তাঁর-জন্যেই-বিলেত-থেকে-নিয়ে-আসা সেক্রেটেয়ার টেবিলটার সামনে এসে বসলেন। কাগজ ও কলম বাইরেই ছিল, টেনে নিয়ে খস খস করে এক দীর্ঘ চিঠি লিখলেন।

চিঠি লিখলেন তিনি হুইলার সাহেবকে।

সে চিঠির মর্মার্থ এই :

জেনারেল হুইলার অবশ্যই অবগত আছেন—এতদিনে এ বিষয়ে তাঁর অবহিত হওয়াও উচিত যে, দেশের চারিদিকেই বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠেছে। এদেশী সিপাহীরা বহুদিন ধরেই কোম্পানির ব্যবহারে তিক্ত-বিরক্ত হয়ে উঠেছিল—এখন তাদের সহ্যের সীমা অতিক্রম করেছে। এই সিপাহীদের সংখ্যা নগণ্য নয়—তাও জেনারেল সাহেবের জানা উচিত। সিপাহীরা একা নয়, তাদের পেছনে হিন্দুস্তানের বিভিন্ন রাজশক্তিও আছেন। কারণ এদেশী রাজন্য-বর্গেরও কোম্পানির ওপর প্রসন্ন থাকবার কোন কারণ নেই। এখন সে বিদ্রোহের ঢেউ কানপুরেও পৌঁচেছে। সিপাহীরা তাদের নেতৃত্ব করবার জন্য স্বাভাবিকভাবেই মহামান্য পেশোয়ার শরণাপন্ন হয়েছে। নানাসাহেবের সে নেতৃত্ব করার অর্থ সমগ্র মারাঠা জাতির এই বিদ্রোহে যোগ দেওয়া।

কথায় হিমাচল থেকে মহারাষ্ট্র—এমন কি সুদূর মহীশূর পর্যন্ত ইংরেজের বিরুদ্ধে একযোগে মাথা তুলবে। সে শক্তির সামনে হুইলার সাহেবের মুষ্টিমেয় স্বদেশবাসী কতক্ষণ দাঁড়াতে পারবেন—তা তাঁর মত প্রবীণ ও বিচক্ষণ সেনাপতির অনুমান করা কঠিন নয়। নানা ধুন্ধুপন্থের প্রতি কোম্পানি চরম অবিচার করেছেন—ধর্মত এবং ন্যায়ত যেটা তাঁর প্রাপ্য, সেটা থেকে বঞ্চিত করেছেন। সেক্ষেত্রে নানাসাহেবের আগেই এই যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়া উচিত ছিল। নানাসাহেব একে বিদ্রোহ বলে স্বীকার করতে রাজী নন, হিন্দুস্তানের মুঘল বাদশাব এবং পেশোয়াদের বিরুদ্ধেই কোম্পানি বরং বার বার বিদ্রোহাচরণ করেছেন। এই সাম্রাজ্য গ্রহণ ও পরিচালনায় তাঁদের কোন ন্যাযসঙ্গত দাবি নেই। যাই হোক, জেনাবেল সাহেব ও কমিশনার সাহেবের ব্যক্তিগত সখ্য এবং ভদ্র ব্যবহারের কথা স্মরণ করেই এখনও তিনি ইতস্তত করছেন। এবং সেই পুবাতন বন্ধুত্বের খাতিরেই তিনি সাহেবদের তথা কোম্পানিকে একটি শেষ সুযোগ দিতে প্রস্তুত আছেন। নানাসাহেব নিজের সিংহাসনও চান না। পৈতৃক সামান্য পেনশনের ওপর তাঁব ন্যায্য দাবি যদি কোম্পানি মেনে নিতে প্রস্তুত থাকেন, তা হলে নানাসাহেব যে কেবল এই যুদ্ধে সিপাহীদের দিকে যোগ দেবেন না তা নয়—সর্বপ্রযত্নে তিনি কোম্পানিব সহায়তা করবেন এবং সমগ্র মারাঠাশক্তি সংহত কবে ইংরেজদের এই ঘোর বিপদে রক্ষা করবারও দায়িত্ব নেবেন। এই চিঠি হুইলার সাহেবে হস্তগত হবার পর চারপ্রহর-কাল তিনি উত্তবের অপেক্ষা করে নিজের কর্তব্য স্থিব করবেন এবং কোন উত্তর না পেলে বা তাঁর প্রস্তাবের প্রতিকূল উত্তর পেলে তাঁদের নিরাপত্তার জন্যও দায়ী থাকবেন না।...

দীর্ঘ চিঠি—কিন্তু লিখতে বেশীক্ষণ সময় লাগল না। লেখা শেষ করে এক বার আদ্যোপান্ত চিঠিখানা পড়ে নিলেন—তাব পর তা সযত্নে ভাঁজ করে সাবধানে সীলমোহর লাগালেন।

রাত্রি গভীর হয়েছে। প্রাসাদের ভেতর কোন শব্দ নেই। দূরে আস্তাবল থেকে মধ্যে মধ্যে শুধু ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ এবং হ্রেষা শোনা যাচ্ছে। সেই সামান্য শব্দই চারিদিকের শান্ত নিস্তব্ধতায় প্রতিধ্বনিত হয়ে ভয়াবহ শোনাচ্ছে।

তবু নানাসাহেব সন্তর্পণেই দরজা খুলে ঘরের বাইরে দালানে এসে দাঁড়ালেন। গরমের দিন—সকলেই সম্ভবত ছাদে বা খোলা জায়গায় খাটিয়া

বিছিয়েছে, কিন্তু শুয়ে পড়লেও এত গরমে সহজে ঘুম আসে না। অনেক সময় লোকে চুপ করে পড়ে থাকে মাত্র।

নানাসাহেব জুতো খুলে ফেললেন। নগ্নপদেই দালান অতিক্রম করে একেবারে একপ্রান্তে একটি ক্ষুদ্র জানালার কাছে এসে চাপা গলায় ডাকলেন, 'মংগরকর!'

তেমনি চাপা গলায় জবাব এল, 'জী!'

মংগরকরও একেবারে নিঃশব্দে, এক অপূর্ব কৌশলে সেই গবাক্ষপথেই ভেতরে এসে প্রণাম করে দাঁড়াল।

নানাসাহেব আংরাখার মধ্যে থেকে লেফাফাখানি বার করে তার হাতে দিলেন এবং বললেন, 'এখনই এটা হুইলার সাহেবের বাংলোতে গিয়ে তাঁর হাতে দিয়ে এস। যদি ঘুমিযে থাকেন, তাঁর আর্দালীকে ব'ল যে খুব জরুরী চিঠি—এখনই এটা তাঁর পাওয়া দরকার। যাই হোক, সাহেবের নিজের হাতে ছাড়া কাউকে দিও না। দরকার হয় তো তোর পর্যন্ত অপেক্ষা ক'র। কিন্তু খুব সাবধান, এ চিঠি আর কারুর হাতে না পড়ে—বা কেউ না জানতে পারে। যদি তা হয়, তা হলে তোমার গর্দান যাবে। আর যদি চুপি চুপি কাজ হাসিল করে আসতে পার তো মোটা বকশিশ পাবে। যাও। তোমাকে কানপুর শহরে খানিকটা জমি দিয়ে দেব—বুঝলে?'

মংগরকর নিঃশব্দে শুধু মাথা হেলিয়ে জানিয়ে দিল যে, কথাটা তার বুঝতে কোন অসুবিধাই হয় নি। তার পর আবারও যুক্তকরে প্রণাম করে তেমনিই আশ্চর্য কৌশলে সেই গবাক্ষপথে বাইরের অন্ধকারে বিলীন হয়ে গেল।

এবার নানাসাহেব কতকটা নিশ্চিন্ত হলেন। পকেট থেকে উপহার-পাওয়া একখানা বিলিতী রুমাল বার করে কপাল ও গলার ঘাম মুছে ঘরে ফিরে এলেন।

নানা ধুন্ধুপন্থ সাধারণত বাইরে ঘুমোন না। ঠিক সাহস করেন না হয়তো। তা ছাড়া অধিকাংশ দিনই কাটে তাঁর কোন-না-কোন উপপত্নীর ঘরে। সেখানে টানাপাখার আয়োজন আছে—বিশেষ অসুবিধা হয় না।

কিন্তু আজ এত রাত্রে আদালা বা হুসেনী বা আর কারও ঘরেই যেতে ইচ্ছে হল না। সকলেই রাজনীতি আলোচনা করতে বসবে। এখন তাঁর মনের ভাবটা ঠিক আলোচনা করবার মত নয়।

নানা নিজেই দরজার কপাটে খিল লাগালেন। তার পর নদীর দিকে

শিক লাগানো জানালাটা ভাল করে খুলে দিয়ে 'শিবশংকর' ও 'গণপতি মহারাজ'কে স্মরণ করতে করতে এ ঘরেই বহুদিনেই অব্যবহৃত বিছানাটাতে শুয়ে পড়লেন। কিন্তু বলা বাহুল্য যে সহজে তাঁর চোখে ঘুম এল না। দূরে কম্পমান দীপশিখাটার দিকে অতন্দ্রনেত্রে চেয়ে চেয়ে প্রায় শেষ রাত্রি পর্যন্ত আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগলেন।

॥ ২৯ ॥

মংগরকর দারুণ চমকে উঠল। সে যতটা সম্ভব নিঃশব্দে এসেছে--বিড়ালের মতই শব্দহীন পায়ে, কিন্তু তার চেয়েও নিঃশব্দে এবং মার্জার-গতিতে আর একজন কেউ তাকে অনুসরণ করছে। সে কিছুই বুঝতে পারে নি এতক্ষণ—এখনও হয়তো পারত না, যদি না এইমাত্র যে সংকীর্ণতর বাঁকটা পার হয়ে এল, সেটা পার হবার সময় অনুসরণকারীর গায়ের জামাটা দেওয়ালে ঘষে যেত। সম্ভবত সে লোকটা বেশী বলিষ্ঠ—তাই অত সুঁড়ি পথে দু দিকের দেওয়াল বাঁচিয়ে আসতে পারে না। সামান্যই একটু শব্দ হয়েছে, কিন্তু হুঁশিয়ার মারাঠার পক্ষে তাই যথেষ্ট।

সে কিছুক্ষণ প্রায় নিঃশ্বাস রোধ করে স্থির হয়ে দাঁড়াল।

লোকটা একেবারে কাছে এসে পড়েছে—নিঃশ্বাসের শব্দ, যত মৃদুই হোক, শোনা যাচ্ছে বৈকি! তবে সেও স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে।

ভয়ে মংগরকরের গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল।

সে পেছনে—সে দিব্যি মংগরকরকে লক্ষ্য করছে—মংগরকরের সে উপায় নেই। হয়তো কোন হাতিয়ার আছে ওর কাছে। হয়তো কেন—নিশ্চয়ই আছে।... মতলব কী ওর?...

অতি ধীরে ধীরে মংগরকর পেছনের দিকে ঘাড়টা ঘোরাল। নীরন্ধ্র অন্ধকারে কিছুই ঠাহর হয় না। দু দিকে নিরেট দেওয়াল—পেছন দিক থেকেও কোন আলো আসবার সম্ভাবনা নেই, কারণ এইমাত্র একটা বাঁকের মুখ ঘুরছে—সামনে আর একটা বাঁক।

মরীয়া হয়ে পড়লে অনেক সময় মানুষের বুদ্ধিও খোলে। মংগরকরের ... পড়ল—সামনের বাঁকটা ঘুরতে পারলেই সামনে খোলা জায়গা পড়বে।

আর কোন আলো না থাক, নক্ষত্রের আলো তো আছেই। এত অন্ধকারের পর সেটুকু পেলেও অনেকখানি দেখা যাবে—

যেমন ভাবা প্রায় তেমনি কাজ। এতক্ষণ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবার পর অকস্মাৎ বিদ্যুৎগতিতে অগ্রসর হল মংগরকর, কিন্তু যে লোকটা পেছনে আসছিল বোধ করি তাব গতিই শুধু বেড়ালের মত নয়—দৃষ্টিও! সে এতক্ষণ ধরে স্পষ্টই দেখেছে অগ্রবর্তীকে, কেন না বাঁকের মোডটা ঘেরাবার সঙ্গে সঙ্গেই পেছন থেকে লোহার মত কঠিন ও হাতীর থাবার মত ভারী একখানা হাত কাঁধের ওপর এসে পড়ল এবং আর একটা হাত বজ্রমুষ্টিতে তার মুখখানা চেপে ধরল। না রইল মংগরকরের শব্দ করবার কোন উপায়—আর না রইল তাব পালাবার এমন কি নড়বারও কোন সুযোগ। শুধু ভয়েই নয়, অবস্থাগতিকেও কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে।

তবে সুখেব বিষয়, মংগরকরকে সে অবস্থায় বেশীক্ষণ থাকতে হল না। যে লোকটা বাঘে ছাগল ধরার মত তাকে ধবেছিল, সে অনায়াসে সেই ভাবেই, যেন শূন্যে উঠিয়ে, তাকে নিযে পাশের একটা কামরাতে ঢুকে পড়ল এবং দরজাটা বন্ধ করে দিল।

ঘরটা অন্ধকার নয়, ভেতরের কোন কুলুঙ্গিতে একটা চেরাগ জ্বলছিল। অল্প কযেক মুহূর্ত পরে—আলোটা চোখে সযে যেতে মংগরকব লক্ষ্য করল, যে লোকটি তাকে ধবে এনেছে সে স্বয়ং সর্দাব খাঁ। যখন তাকে অবলীলাক্রমে শূন্যে ঝুলিয়ে নিযে আসা হচ্ছিল, তখন এই লোকটির কথাই তার মনে পড়েছিল, আর সেই কারণেই, এখন চিনতে পারা সত্ত্বেও, ভয় কিছুমাত্র কমল না। এ লোকটার দানবসুলভ দৈহিক শক্তির কথা তার জানা আছে। হাতিয়ারের প্রযোজন নেই—এমনিই তার ধড় থেকে মুণ্ডটা ছিঁড়ে নিতে পারে ও অনায়াসে।

সর্দার খাঁ অবশ্য তাকে বেশীক্ষণ এসব কথা চিন্তা করবার অবকাশও দিল না। বিনা ভূমিকায় একেবারেই কাজের কথা পাড়ল, 'কৈ চিঠিটা দেখি!'

মংগরকর চুপ করে রইল—কাঠের মত।

'কৈ দাও চিঠিখানা?'

'না!'

'দেরি করে লাভ নেই। চিঠি আমার চাই-ই!'

'জীবন থাকতে দেব না।'

'তা হলে জীবনটাই যাবে।'

'তা যাক, মনিবের কাজ করতে গিয়ে মরতে হয় মরব। বিশ্বাসঘাতক—এ অপবাদ তো কেউ দেবে না।'

ভয় মংগরকরের কারও চেয়ে কম নয়। কিন্তু এখন যেন কেমন একরকমের অদ্ভুত সাহস তাকে পেয়ে বসল। জিদ চেপে গেল বলা যেতে পারে।

সর্দার খাঁ আবারও তার টুঁটি চেপে ধরল। বলল, 'তোমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে বেশী সময় লাগবে না আমার, কিন্তু জোর করে নিতে হলে তোমাকে বাঁচিয়ে রাখা চলবে না। সেটা তো বুঝতেই পারছ!'

মংগরকর চুপ করে রইল।

মুখে আস্ফালন করা এক জিনিস, মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়ানো আর এক।

যে লোহার মত মুঠিটা তার গলায় চেপে বসেছে, সেটা একটু হেললেই ফরসা-মট্ করে ঘাড়টি ভাঙবে। মংগরকর শুষ্ক জিভটা একবার শুষ্কতর ওষ্ঠে বুলিয়ে সেটাকে সরস করবার বৃথা চেষ্টা করল—মুখে তার কোন উত্তর যোগাল না।

কুলুঙ্গির মধ্যে চেরাগ জ্বলছিল বলে ঘরের একটা দিকে আদৌ আলো যায় নি। সুতরাং সেখানে যে তৃতীয় ব্যক্তি একজন ছিল, তা মংগরকরের লক্ষ্য করবার কথা নয়। এখন সেইদিক থেকেই অত্যন্ত পরিচিত এবং মিষ্ট একটি কণ্ঠস্বর ভেসে এল, 'ওকে ছেড়ে দাও সর্দার খাঁ। আমি দেখছি—'

হুসেনী বেগম।

ঠিকই তো। ধোঁয়া দেখলেই আগুন বুঝতে হবে। সর্দার খাঁ যখন ধরেছে, তখন, আর কার প্রয়োজন?

স্ত্রীলোক জাতটাই এমনি—পুরুষের প্রতিপদে গোয়েন্দাগিরি করাই তার স্বভাব। মংগরকরের নিজের জীবনের বহু অপ্রীতিকর অভিজ্ঞতা মনে পড়ে এই মুহূর্তে সে নানাসাহেবের প্রতি কেমন একপ্রকার অনুকম্পাই বোধ করতে লাগল।

আমিনা অন্ধকার কোণ থেকে খানিকটা সামনের দিকে এসেছে ততক্ষণে। সর্দার খাঁ মংগরকরকে ছেড়ে দিয়ে এক পাশে সরে দাঁড়াল।

সর্দার খাঁর কাছে একটা খুন ছেলেখেলা মাত্র, কিন্তু মংগরকরকে বাঁচিয়ে

রাখা চাই—তা আমিনা ভাল করেই জানে। তাই সে কাজটা নিজের হাতেই তুলে নিল।

'মংগরকর, মানুষ ভয় পেয়ে অনেক বোকামি করে বসে। তার যারা হিতাকাঙ্ক্ষী তাদের কাজ সেটা শোধরানো। ও চিঠি নানাসাহেব হুইলারকে লিখেছেন একথা জানাজানি হলে তাঁর রক্ষা থাকবে না। সেই জন্যই ও চিঠিটা আটকাতে চাই। ওটা তুমি আমাকে দাও, আমি তোমাকে শপথ করে বলছি, একথা আর কেউ জানতে পারবে না—এই আমরা দু জন ছাড়া। তুমি কাল ভোরে পেশোয়াজীকে ব'ল যে, তুমি সাহেবকে চিঠি দিয়ে এসেছ—তা হলেই হবে। নইলে পেশোয়ার বিপদের শেষ থাকবে না। আর পেশোয়া বিপদে পড়লে আমরাই বা থাকব কোথায়?'

মংগরকর আড়ে একবার সর্দার খাঁর দিকে তাকিয়ে বলল, 'কিন্তু—'

'কিন্তু কী? বকশিশ তো? পাবে বৈকি। নানাসাহেব যা বলেছেন তা তো পাবেই, তা ছাড়া শহরে খানিকটা জমি আমিও দেব তোমাকে।'

'মাফ করবেন বেগমসাহেবা, ওটা তো কাজ করবার বকশিশ—বিশ্বাসঘাতকতার বকশিশ আলাদা।'

'বেশ, কী চাও বল! যা চাইবে—সাধ্যে কুলোলে নিশ্চয় দেব।'

মংগরকর এবার চোখ তুলে আমিনার চোখের দিকে তাকাল। কেমন একপ্রকার অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, 'যা চাইব দেবেন তো—সাধ্যে কুলোলে?'

আমিনার দৃষ্টিও মংগরকরের দৃষ্টিতে স্থির রইল—একটি চোখের পাতাও বোধ করি কাঁপল না। কিছুমাত্র ইতস্তত না করে বলল, 'দেব।'

'যখন চাইব?'

'কথা দিয়েছি যখন—দেবই।'

মংগরকর জামার ভেতর থেকে মোহর-করা চিঠিখানা বের করে দিল।

চেরাগের ক্ষীণ আলোতেও ঠিকানাটা পড়তে বা হস্তাক্ষর চিনতে কোন অসুবিধা হল না। আমিনা লেফাফাটা সযত্নে নিজের কামিজের জেবে রেখে দিল। মংগরকর আর অপেক্ষা করল না। নিঃশব্দে কপাট খুলে পূর্বের মতই মার্জার-গতিতে বাইরের সূচীভেদ্য অন্ধকারে মিশে গেল।…

সর্দার খাঁ কপাটটা আবার বন্ধ করে দিয়ে ক্রুদ্ধ সাপের মতই হিস্ হিস্

করে উঠল, 'ওর মুণ্ডুটা কিন্তু আমি সত্যিই নিজে হাতে ছিঁড়ে ফেলব মালেকান—এ আমাকে একদিন করতেই হবে।'

আমিনা হাসল—মধুর কৌতুকের হাসি। বলল, 'তোরও তাহলে মনের ভাব মুখে বেরিয়ে আসে সর্দার ?'

তার পর কাছে এসে একটা হাত সর্দারের কাঁধে রেখে কেমন একপ্রকার এলিয়ে পড়বার ভঙ্গিতে তার বিশাল বুকে ঠেস দিয়ে বলল, 'এখনই এত ব্যস্ত হচ্ছিস কেন, আগে বকশিশটা দাবি করুক।'

আজও আমিনার এই সামান্যতম প্রশ্রয়ে সর্দার খাঁর উগ্র পৈশাচিক মুখ-খানা নিমেষে কেমন একরকম মাধুর্যে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। সেও হাসল। অপ্রতিভের হাসি হেসে বলল, 'না, লোকটার বড় স্পর্ধা।'

আমিনা সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে জেব-এর চিঠিখানা দেখিয়ে বলল, 'ওরে এটা যে আমার কত বড় ব্রহ্মাস্ত্র রইল তা জানিস না। এর জন্যে সত্যিই—আমি না করতে পারি এমন কাজ নেই, না দিতে পারি এমন কোন মূল্য নেই ! যেদিন এ অস্ত্র ছাড়ব সেদিন বুঝবি।'

সে ফুঁ দিয়ে আলোটা নিভিয়ে সর্দার খাঁর হাত ধরে বাইরে এল এবং সেই গাঢ় অন্ধকারেই কয়েকটা গলি-পথ ও কয়েকটি সিঁড়ি পার হয়ে অনায়াসেই নিজের মহলে গিয়ে পৌঁছল।

সর্দার খাঁও পেছনে পেছনে ছিল বৈকি।

কখনও কোন কারণে সে মালেকানকে চোখ ছাড়া করে না। মালেকান নিরাপদে মহলে পৌঁছনো পর্যন্ত আজও সে নিঃশব্দে খানিকটা দূরত্ব বজায় রেখেই অনুসরণ করেছিল। আজও যথানিয়মে মহলের দরজা তার মুখের সামনে বন্ধ হয়ে গেল। প্রয়োজন ছাড়া সর্দার খাঁর কথা ভাবার অবসর মালেকানের নেই—সে কথা সেও জানে। তাই প্রতিদিনের অভ্যাসমত, আর কোন প্রয়োজন মালেকানের স্মরণ হয় কিনা, সেই অবসরটুকু দিয়ে, আজও সে খানিকটা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে আবার অন্ধকারেই যখন সে নিজের বাসার দিকে রওনা হল, তখন তার একটা ছোট্ট দীর্ঘনিশ্বাসও পড়ল না। হয়তো ঐ পাথরের মত বুকখানায় তার নিশ্বাস পড়েও না।

॥ ৩০ ॥

নানা পরের দিন সকালে প্রায় দু প্রহর বেলা অবধি হুইলারের কাছ থেকে উত্তরের অপেক্ষা করলেন। মংগরকরকে তিনি বার বার জিজ্ঞাসা করে জেনেছেন—সে হুইলার সাহেবের হাতেই চিঠি দিয়ে এসেছে। সুতরাং উত্তর একটা এতক্ষণে আসা উচিত। 'হ্যাঁ' কিংবা 'না'—সোজাসুজি একটা উত্তর। সাহেব-জাতের ভদ্রতায় এতটুকু বিশ্বাস তাঁর এখনও আছে—চিঠির উত্তর একটা দেবেই।

কিন্তু একের পর এক প্রহর বৃথাই কেটে গেল তাঁর উৎকণ্ঠিত অপেক্ষায়—কোন উত্তর এল না।

একবার মনে হল আর কাকেও পাঠিয়ে খোঁজ করেন, কিন্তু পরক্ষণেই আত্মধিক্কার জাগল—ছিঃ, সাহেব মনে করবে গরজটা তাঁরই বেশি!

এধারে মুহূর্তে মুহূর্তে নানান্ খবর আসছে।

সাহেব-পাড়ায় ঘরবাড়ি জ্বলছে। চোরা-গোপ্তা খুনজখম তো চলছেই। ওরা যে বিষম ভয় পেয়েছে, তা মুখচোখের চেহারাতেই টের পাওয়া যাচ্ছে। কিছু স্ত্রীলোক ও অসুস্থ লোক ইতিমধ্যেই সেই মাটির কিল্লায় রাত্রে শুতে শুরু করেছে। আজিমুল্লা সে কিল্লার নাম দিয়েছে—"নাচারগড়"। বাকি যারা অস্ত্র ধরতে পারে, তারা সারারাত সশস্ত্র বসে পাহারা দিচ্ছে। দিনেরাতে ঘুম নেই কারও।

তবু তাঁর চিঠির উত্তর পর্যন্ত দিল না ওরা।

আশ্চর্য স্পর্ধা তো!

পিঞ্জরাবদ্ধ বাঘের মতই রুদ্ধ আক্রোশে ছটফট করে বেড়াতে লাগলেন নানা ধুন্ধুপন্থ। ইচ্ছে হয় প্রত্যেক ইংরেজটাকে তিনি ধরে নিজ হাতে একটু একটু করে যন্ত্রণা দিয়ে মারেন। শুধু কেবল—। বড় ভয়ঙ্কর ওরা, বড়

খবর এদিকে সবই শুভ। গত দু-তিন দিনের মধ্যে বেরিলী, বদাউন, মোরাদাবাদ সর্বত্র বিদ্রোহীদের শক্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কোথাও ইংরেজরা বাধা দিতে পারে নি। বন্যার মত এই প্রচণ্ড শক্তি একে একে সা

হিন্দুস্তান ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। কিন্তু তার পর? বন্যার জলের মতই যদি ক্ষণস্থায়ী হয় সে শক্তি?

চার দিক থেকে 'টেলিগিরাপে' সংবাদ আসছে। গতকালকার দুটি সংবাদই—পূর্ব এবং পশ্চিমের—পৌঁছেছে আজ সকালে।

মোরাদাবাদে জজ উইলসন বহুদিন অবধি বন্যাকে নিজের ব্যক্তিত্বের বাঁধ দিয়ে ঠেকিয়ে রেখেছিলেন, কিন্তু গতকাল তিনিও হার মেনেছেন। সরকারী খাজাঞ্চীখানা সিপাহীদের হাতে পড়েছে। সাহেবদের ব্যক্তিগত সম্পত্তিও কেউ কিছু নিয়ে যেতে পারে নি, তারা কোনমতে প্রাণ নিয়ে পালিয়েছে মাত্র।

তবে কি ঈশ্বর যা করেন মঙ্গলের জন্য? তাঁর কল্যাণের জন্যই হুইলার উত্তর দেয় নি? সৌভাগ্যসূর্য কি ওদের সত্যই অস্ত গিয়েছে? এখন—ইংরেজের সঙ্গে সন্ধি করলে তাঁকেও কি তাদের সঙ্গে চরম দুর্ভাগ্য, অপমান ও মৃত্যু বরণ করতে হত?

যদি সেই কথাটাই বিশ্বাস করতে পারতেন।

আজ আরও একটা সংবাদ তিনি পেয়েছেন। পূবে জেনারেল নীল এগিয়ে আসছেন। কাশীর কাছাকাছি এসে পড়েছেন।

প্রথম আঘাতের প্রচণ্ডতা ও আকস্মিকতায় ইংরেজ জাতির রণ-দুর্মদতা হয়তো খানিকটা স্তম্ভিত হয়েছে মাত্র—সময় পেলেই প্রচণ্ডতর বেগে সে আবার প্রত্যাঘাত করবে।

এক ভরসা—যদি বিহার ওদিকটা সামলে নেয়। কিন্তু পারবে কি?

সংশয়, আশঙ্কা ও দ্বিধায় নিরন্তর ক্ষতবিক্ষত হতে হতে নানাসাহেব অসহায়ভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গুনতে লাগলেন। কিছুই করা হল না।

সেদিন নানা ধুন্ধুপন্থ নিজেকে নিয়ে এত বেশী ব্যস্ত ছিলেন যে, হুসেনী বেগমের খবর নেবার অবসর পর্যন্ত তাঁর মেলে নি। নইলে জানতে পারতেন যে বেগমসাহেবা তার মহলে নেই—প্রাসাদ থেকে বহুদূরে আজিজনের বাড়ি গিয়ে সকাল থেকে বসে আছে।

নীলের অগ্রসর হওয়ার সংবাদ আমিনাও পেয়েছে। বিহার এখনও চুপচাপ। কুঁয়ার সিং এখনও টেলার সাহেবের ভরসা ছাড়তে পারেন নি। অপর সকলেও দোলাচল-চিত্ত।

যদি বিহার না ইংরেজদের ওদিকে ব্যস্ত রাখতে পারে তা হলে—

তা হলে এধারে কিছুই হবে না। নানাসাহেব যে এখনও ইতস্তত করছেন তা আর কেউ না জানুক আমিনা জানে।

ইংরেজের কোথাও কোন পাল্‌টা জয়লাভ হয়েছে—এই ধরনের একটাও সংবাদ আসবার আগে এখানে আগুন জ্বালতে হবে। দাবানল জ্বললেই ঝড় ওঠে—সেই ঝড়ের ঝাপটায় নানাসাহেবকেও উড়িয়ে এনে ফেলবে, আগুনের আবর্তে এসে পড়বেন।

নানাসাহেবের জন্য এতটুকু চিন্তিত নয় আমিনা—তার নিজের জন্যই সে ব্যস্ত।

তার মারণযজ্ঞে যে এখনও পূর্ণাহুতি পড়ে নি। তার প্রতিহিংসা যে এখনও চরিতার্থ হয় নি।

শামসুদ্দীন খাঁ যাতায়াত করছে টীকা সিংএর কাছে। তারই আগমন-প্রতীক্ষায় দু বোন উৎকণ্ঠিত হয়ে বসে আছে।

বেচারী শামসুদ্দীন।

কাল কি কুক্ষণেই যে আজিজনের ঘরে মাথা গলিয়েছিল!

আজিমুল্লার কাছ থেকে পূর্বাহ্নেই একটি মোহর বকশিশ পেয়েছিল সে—নৌকোর নাটকটা অভিনয় করার বায়না হিসেবে। তখন থেকেই তার সংকল্প স্থির ছিল। নৌকোর ফেরত সোজা এসে মোহরটি আজিজনের হাতে দিয়ে বলেছিল, 'নাও বিবি, এবার খুশী তো?'

আজিজন সুর্মা-টানা চোখে বিদ্যুৎ হেনে বলেছিল, 'তোমাকে দেখেই খুশী খাঁ সাহেব। মোহর কি আমি চেয়েছি!'

'না, তা চাও নি, সত্যি কথা। তোমার বহুত মেহেরবানি আমার ওপর—পেয়ার বলতে সাহস হয় না, কিন্তু কি জান বিবিসাহেব, তোমার ও সোনার হাতে সোনার মোহর ছাড়া মানায় না যে!'

তার পর আরও দুটো টাকা জেব থেকে বার করে ছুঁড়ে দিয়ে বলেছিল, 'তোমার নোকররা সব গেল কোথায়, কিছু মাল-টাল আনাও!'

'ব্যাপার কি খাঁ সাহেব—টাকায় ভাসছ যে আজ! কোথা থেকে এল এত?'

'আসবার এখনই কী হয়েছে! র'স, আর দু-পাঁচটা দিন সবুর কর! শাহি তো আমাদের হাতেই আসছে। আংরেজ আর ক-দিন! যত টাকা জমিয়েছে ঐ হারামখোরগুলো, আগে সব হাতে পাই, তোমার এই

ঘরের কড়িকাঠ অবধি মোহরে ঠেসে দে শিশ স্বাশা করে!' হয়ে থাকবে চিরকালের স্ফুর্তি!'

স্ফূর্তিটা কাল খুব জমেছিল ঠিকই।...

কিন্তু ভোর না হতেই তাকে ঠেলে তুলে এই যে।

টানার মত একবার ব্যারাক আর একবার বিবির বাড়ি—নাকে দাঁড় দিয়ে ছোটাচ্ছে, এইটেই যেন কেমন কেমন! অথচ ঐ খুবসুরত বিবি যদি গলা জড়িয়ে গালে গাল রেখে কোন অনুরোধ করে তো সে অনুরোধ ঠেলাই বা যায় কেমন করে।

তার ওপর আজিজন তার কথা দিয়েই তাকে জব্দ করেছে। বলেছে, 'একটু খোঁজখবর নিয়ে এসো দিকি। আর কত দিন সবুর করব? আজ ছ মাস থেকেই তো শুনছি যে—শাহিটা তোমরা নিয়ে নেবে।...কৈ? হালচাল তো সে রকম দেখছি না। ভালমানুষের মত রোজই তো তোমরা ইংরেজগুলোর হুকুম মাফিক কুচকাওয়াজ করছ—নড়ছ ফিরছ ঘুরছ।... তোমাদের যা মর্দানি তা আমার জানা আছে, মুখেই যা কিছু লম্ফঝম্ফ—তাও আমার মত মেয়ে-মানুষের কাছে।'

শামসুদ্দীনের মুখ রক্তবর্ণ হয়ে ওঠে। বলে, 'আজই, আজই শুরু হয়ে যাচ্ছে বাঘের খেল, দেখই না।'

'তা হলে তুমি ছাউনি থেকে ঘুরে আমাকে পাকা খবরটা দিয়ে যাও খাঁ সাহেব।'

'তোমার এত তাড়া কেন বল তো?'

'বাঃ, আংরেজের খাজাঞ্চীখানা তোমাদের হাতে পড়লে মোহর দিয়ে আমার ঘর ভরিয়ে দেবে—সে কথা কি ভুলে গেলে?...এরই মধ্যে যদি ভুলে যাও তো টাকা হাতে পেলে কী করবে?'

কাল প্রথম রাত্রির প্রতিজ্ঞা ও আজ প্রভাতের মধ্যে বহু বোতল মদ বয়ে গেছে—তবু ক্ষীণভাবে কথাটা মনে পড়ে বৈকি।

'ঘাবড়াচ্ছ কেন বিবি,—ঠিক পাবে তোমার মোহর।'

'মোদ্দা খবরটা দিয়ে যেও।'

'দেব। এখন প্যারেড আছে—সেরেই দিয়ে যাব।'

'ঠিক তো?'

'ঠিক।'

তা হলে এধারে কিছুই হ খেছিল।

তা আর কেউ না জানুক অ খছিল যে, সে কিছুমাত্র বাজে কথা বলে নি, আজই
ইংরেজের কোথাও . । স্বয়ং টীকা সিংহের মুখ থেকে সে খবর নিয়ে এসেছে।
সংবাদ আসবার অ াহতি পায় নি।

আজিজন অনুরোধ করেছে—সুমধুর অনুরোধ আদেশেরও বাড়া—ঠিক কখন থেকে শুরু হবে, সব কটি রেজিমেণ্ট যোগ দেবে কিনা, অথবা কোন্‌টির সম্বন্ধে এখনও কিছু সংশয় আছে সব কিছু পাকা খবর দিয়ে যেতে।

সে খবরও শামসুদ্দীন দিয়ে গিয়েছে। বৃহস্পতিবারের বিকেলের দিকটায় বুঝি দিন ভাল থাকে না—টীকা সিংএর যত কুসংস্কার—তা ছাড়া চক্ষুলজ্জার ব্যাপারও একটা আছে—সুতরাং রাত্রেই সুবিধে। কোনমতে সন্ধ্যা পর্যন্ত বিবিজান যেন ধৈর্য ধরে, আর কিছু ভাবতে হবে না।

তাতেও রেহাই মিলল না।

আজিজন তার জন্য শরবৎ ফরমাশ করবার নাম করে ভেতর থেকে ঘুরে এসে বলল, 'খাঁ সাহেব, তুমি আমার জন্য অনেক মেহনত করলে, একথা আমি কখনও ভুলব না। কিন্তু আরও একটা কথা বলব, সেটাও রাখতে হবে—আগে থাকতেই বলে দিচ্ছি।'

'আবার কী? আমাদের এখন কত কাজ সেটা বুঝছ না বিবিসাহেব!'

'ওঃ, কাজটাই বুঝি বড় হল—আমার চেয়ে? বেশ যাও, কিছু করতে হবে না!' সুন্দর অধর অভিমানে স্ফুরিত হয়। সেদিকে চেয়ে পুরুষের মাথা ঠিক রাখা শক্ত।

'বল, বল, বলে ফেল—কী ফরমাশ।'

'ঠিক কখন থেকে তোমরা কাজ শুরু করবে—আমি জানতে চাই। কিছু একটা নিশানী ঠিক করে জানিয়ে দিয়ে যেও। ব্যস, আর কিছু নয়—এই-ই আখেরী।'

'অনেক ফরমাশ খাটলুম বিবি, বকশিশ কী মিলবে তা এখনও কিছু শুনি নি!' শামসুদ্দীন দাঁত বার করে বলে।

'মিলবে কি—মিলে যাচ্ছে তো হাতে হাতে!'

'কী রকম—কী রকম?'

'এই যে যত বার আসছ, আমাকে দেখতে পাচ্ছ, আমার কথা শুনছ—সেটা লাভ নয়?'

'হ্যাঁ, তা ঠিক। তবু বান্দা কিছু উপরি বকশিশ আশা করে।'

'এইটুকু করে দাও, আজিজন বিবি বান্দার বাঁদী হয়ে থাকবে চিরকালের মত!'

'ঠিক?'

'ঠিক।'

শামসুদ্দীন খুশী হয়ে প্রায় নাচতে নাচতে চলে গিয়েছে এবং খানিক পরে টীকা সিংএর অনেক তোষামদ করে খবরটি জেনে নিয়ে পৌঁছিয়ে দিয়েছে।

'তিনটি পিস্তলের আওয়াজ হবে পর পর! তা হলে জানতে পারবে—আমরা আমাদের কাজ শুরু করলুম। হল এবার? খুশী?'

'খুশী।'

'তা হলে আমার বকশিশটা?' নাটকীয় ভঙ্গিতে সেলাম করে দাঁড়ায় শামসুদ্দীন।

আজিজন জবাবটা মুখে দেয় না—কৃতজ্ঞতা কাজেই জানায়।

এক হাতে শামসুদ্দীনের গলা জড়িয়ে, আর এক হাতে নিজের খোঁপার মধ্যে থেকে আতরের তুলিটা বের করে তার দাড়িতে ও গালে আতর লাগিয়ে দিয়ে আদর করে গাল টিপে বলে, 'অত ঘন ঘন বকশিশের লোভ ভাল নয়—বুঝলে খাঁ সাহেব!'

॥ ৩১ ॥

আমিনা আর অপেক্ষা করে নি। সে এতক্ষণ আজিজনের বাড়ি ছিল—কতকটা একা একা এই অনিশ্চয়তা সইতে পারছিল না বলেই। নানা নিজের চিন্তায় মগ্ন, আজিমুল্লা ছাউনির দিকেই কোথাও আছে এবং সে যে আজ বিষম ব্যস্ত, তা কেউ বলে না দিলেও অনুমান করতে আটকায় না। আর তা না থাকলেও, সব সময় তাঁর সঙ্গে দেখা করা সম্ভব নয়। নানা যতক্ষণ নিজের খাস কামরায় থাকেন, ততক্ষণ তাঁর কাছে কোন স্ত্রীলোকের যাওয়া নিষেধ—এমন কি স্বয়ং মহিষীদেরও। আমিনার তো প্রশ্নই ওঠে না। তা ছাড়া এখন আর তার নানার কাছে যেতে ইচ্ছে করছে না। যাওয়া মানেই তো আজিনর কান্না।

সুতরাং আমিনা সম্পূর্ণই একা আজ। এই একাকিত্ব সে আর সইতে পারছে না। সম্ভব হলে সে পুরুষ-বেশে নিজেই ছাউনিতে যেত, ঐ ক্লীব সিপাহীগুলোকে দেখে নিত সে। কিন্তু তা সম্ভব নয়। তার এই অসামান্য রূপ পুরুষের ছদ্মবেশে ঢাকা পড়বে না তা সে জানে।

নানা কদিন থেকে নবাবগঞ্জের প্রাসাদও ছেড়ে দিয়েছেন। হুইলারকে আশ্বস্ত করতে তাঁদের কাছাকাছি একেবারে ছাউনির ধারে একটা বড় বাড়িতে এসে উঠেছেন। এটা আজিজনের বাড়ি থেকে খুব দূর নয়। আমিনা বোরখাটা গলিয়ে পদব্রজেই কতকগুলি গলিপথ ঘুরে সেই প্রাসাদে এসে পৌঁছল।

গরমের দিন—সন্ধ্যা হয়েও হতে চায় না।

আমিনা নিজের মহলে পৌঁছে স্নান করল। একপাত্র বলকারক বনফসার শরবত পান করল, এক ছিলম্ তামাকু পোড়াল, তবুও অন্ধকার হয় না। অবশেষে একটু আবছা হতেই সে উঠে গিয়ে ছাদে দাঁড়াল। ভাগ্যে নানা-সাহেবের সঙ্গে তাঁর জেনানা-মহল উঠে আসে নি বিঠুর থেকে। তা হলে নিশ্চিন্ত হয়ে ছাদেও ওঠা যেত না। এমন কি আজ আদালাও নেই—প্রাসাদে ফিরেই মুসম্মতের মুখে খবর পেয়েছে—নানাসাহেব আদালাকে বিঠুরে পাঠিয়ে দিয়েছেন। নানাসাহেব বাজীরাওএর মহিষীদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করেন নি—অবশ্য এটাও ঠিক যে তাঁরাও করেন নি। স্বামীর পোষ্যপুত্রের হাত থেকে যতটা ব্যক্তিগত টাকা-কড়ি-জহরৎ বাঁচানো যায় সেই চেষ্টা করেছেন, অপর বিষয়-আশয় নিয়েও নিরন্তর বিব্রত ও বিপন্ন করেছেন। তাই শেষ পর্যন্ত নানা তাঁর জননীদের একরকম নজরবন্দী করে রাখতেই বাধ্য হয়েছেন। এমন কি ভগ্নীদের বিয়ের ব্যাপারেও তাঁদের কথা শোনেন নি। পৈতৃক পেনশনে বঞ্চিত নানাসাহেবের এই সব সম্পত্তি ও টাকাকড়িই ভরসা—এর কোন অংশ নিজের হাতের বাইরে যেতে দেবার ইচ্ছে ছিল না শুধু নয়, উপায়ও ছিল না।

কিন্তু মহিষীরা সে কথা ভোলেন নি। চারিদিকে গোলমালের আভাস, নানাসাহেবও এই গোলমালে জড়িয়ে পড়ছেন—একথা তাঁদের কানেও পৌঁছেছিল। কাজেই তাঁরা যে অন্তিম সময়ে যতটা সম্ভব নিজেদের 'ভবিষ্যৎ' ভাববেন, তাতে বিস্মিত হবার কিছু নেই। নানার অনুপস্থিতিতে প্রাসাদে বহুরকমের ষড়যন্ত্র পেকে উঠেছে—এই সংবাদ কদিন ধরেই নানা পাচ্ছেন। কথাটা আমিনার সামনেই আলোচিত হয়েছে। নানা তার

ব্যবস্থাও করেছেন, কিন্তু শুধু বাইরে থেকে ব্যবস্থা করেও সবটা সামলানো যায় না বলে ভেতর থেকে নজর রাখতে আজই আদালা বেগমকে বিঠুরে চালান করেছেন। নিজের বিবাহিতা স্ত্রীদেরও নানা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারেন না। বাজীরাওএর মহিষীদের পক্ষে বধূদের 'হাত করা' খুব কঠিন কাজ হবে না।

সে যাক, আদালাও এখানে নেই বলে আমিনা বেঁচে গেল। অসময়ে পুরুষরা ছাদে ওঠে না—উঠলেও হুসেনী বেগম আছেন শুনলে কেউ উঠবে না।...আমিনা চোখে দুরবীন লাগিয়ে একদৃষ্টে ছাউনির দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

বহুক্ষণ অপেক্ষা করতে হল আমিনাকে।

দীর্ঘ, মন্থর কয়েকটা ঘণ্টা—কালের দীর্ঘতম অনুচ্ছেদ কয়েকটি।

গ্রীষ্মের সন্ধ্যা—আলোর আভাস কিছুতেই মুছতে চায় না আকাশের প্রান্ত থেকে। 'যাই-যাই' করেও একটা ধূসর-রক্তিম আলো লেগে থাকে পশ্চিম দিকটাতে।

অবশেষে এক সময় অন্ধকার ঘনিয়ে এল। প্রাসাদের পেটাঘড়িতে আটটা বাজল, নটা, তার পর এক সময়ে দশটাও বেজে গেল

মুসম্মৎ এসে বলল, 'সারা দিনই তো কিছু খেলেন না। খানা নিয়ে আসব এখানে?'

'না, এখন ভাল লাগছে না কিছুই।'

'কিন্তু কিছু না খেলে দুবল হয়ে পড়বেন যে। হয়তো আজও সারারাত জাগতে হবে—শরীরে তাকত না থাকলে যুঝবেন কী করে?'

'আজ শরীর ঠিক থাকবে। তুই বকিস নি। বরং আর একটু শরবত নিয়ে আয়। আর দেখ, সর্দার এলে তাকে নীচে অপেক্ষা করতে বলিস।'

কথা বললেও আমিনা এক মুহূর্তের জন্যও দূরবীন থেকে চোখ সরায় নি। তার একটা কানও পড়ে ছিল ঐ দিকে।...

অন্ধকারের ভেতরেও ছাউনির দিকে একটা কর্মব্যস্ততা লক্ষ্য করছিল। বহুলোক উত্তেজিত হয়ে ঘোরাফেরা করছে—স্থানে স্থানে জটলা।...

শহরের দিকেও চঞ্চলতা কম নেই। এত দূর থেকে মনে হচ্ছে যেন সেখানে একটা হাট বসেছে।...অনেকেই কদিন ধরে কিসের জন্যে যেন অপেক্ষা করছে,

অধিকাংশ লোকই উত্তেজিত,—গৃহস্থ ও ব্যবসায়ীরা শঙ্কিত। গোলমাল-হাঙ্গামার অর্থ তারা জানে। কিন্তু মনোভাব যাই হোক, ঘুম নেই কারও চোখেই। চারিদিকেই জটলা, চারিদিকেই একটা কষ্টকর প্রতীক্ষা। যে আগুন চারিদিকে জ্বলছে, সে আগুন এখানেও জ্বলবে। যে ঝড় সমস্ত উত্তর-পশ্চিম ভারতের উপর দিয়ে বইছে, তা এখানে পৌঁছল বলে।

আজ অথবা কাল—কদিন ধরেই এমনি আসন্ন হয়ে আছে ব্যাপারটা।

সকলেই জানে, সকলেই অপেক্ষা করছে, কেবল ঐ ইংরেজগুলো অমন বাহ্য-নিরুদ্বেগ বজায় রাখে কেমন করে? সত্য বটে মেয়েছেলেদের ওরা ঐ মাটির পাঁচিল-ঘেরা জায়গাটায় পাঠিয়ে দিয়েছে, নিজেরাও সারারাত সশস্ত্র বসে থাকে, তবু বাইরের প্রশান্তি কারও তো এতটুকু নষ্ট হয় নি। নিত্যকার কাজ নিয়মিত ভাবেই করে যাচ্ছে,—যেন ভয় পাবার, সতর্ক হবার মত কোন কারণই কোথাও ঘটে নি।

এত নির্বোধ ওরা!

পরিষ্কার অদৃষ্টলিপিও পড়তে পারে না?

অথবা নিয়তি যখন ঘনিয়ে আসে তখন এমনই হয়।

ভগবান বহুদিন থেকেই ওদের হুঁশিয়ার করে দিচ্ছেন। সাহেবপাড়ায় আগুন লাগা তো প্রায় নিত্যকার ঘটনা হয়ে উঠেছে। এই সেদিনই এক জোড়া সাহেবমেমকে কে বা কারা খুন করে জলে ভাসিয়ে দিয়েছিল—সকলে স্বচক্ষে দেখেছে। তবে এত কিসের সাহস ওদের? অথবা নির্বুদ্ধিতাই?

এতদিন পালাবার উপায় ছিল। সে চেষ্টা দূরে থাক্, যুদ্ধের সময় সবচেয়ে প্রয়োজন যে দুটি জিনিসের—টাকা এবং হাতিয়ার—সেই দুটিই শত্রুর হাতে তুলে দিয়ে সবচেয়ে প্রকাশ্য স্থানে এসে আশ্রয়ের ব্যবস্থা করল। এ নিতান্তই ভগবানের মার।

যেটুকু দ্বিধা বা সঙ্কোচ এখনও হয়তো ছিল আমিনার, সেটুকুও চলে গেল। ঈশ্বরই তাকে দিয়ে এই মারণযজ্ঞের আয়োজন করাচ্ছেন, সে নিমিত্ত মাত্র।

ফট্-ফট্-ফট্!

তিনটে পিস্তলের শব্দ না?

শব্দটা এল কোথা থেকে? ছাউনির দিক থেকেই তো? আমিনার বুকের রক্ত যেন সেই তিনটি শব্দে তিনবার চলকে উঠল।

কিন্তু ওদিকে আবার কী? উত্তর দিকে আকাশে অত আলো কিসের?

আমিনা ছুটে এদিকে এল।

আলো নয়—আগুন। সাহেবপাড়ার কোন বাংলাতে আগুন লাগানো হয়েছে। তারই রক্তিম আভা। দেখতে দেখতে বহু স্থান জুড়ে অন্ধকার আকাশ রক্তবর্ণ হয়ে উঠল। একটা নয়—বহু বাংলোয় আগুন লেগেছে। ওদিকে বোধ হয় এক দল লোক এই সংকেতটারই অপেক্ষা করছিল।

অকারণ অগ্নিকাণ্ডে আমিনার রুচি নেই। সে আবার দক্ষিণ দিকে অর্থাৎ ছাউনির দিকে এসে দাঁড়াল।

একটু আগে ওদিক থেকে চাপা আলোচনার গুঞ্জন শোনা যাচ্ছিল, তা এতক্ষণে কোলাহলে পরিণত হয়েছে। জনবোল দূরশ্রুত সমুদ্রকল্লোলের মতই শোনাচ্ছে।

কাজ আরম্ভ হয়ে গেছে।

আমিনার এতদিনের সাধনা ও স্বপ্ন তা হলে সফল হতে চলেছে।

এ সময়ে এ ভাবে নিশ্চেষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা যায় না।

কানে গেল নীচের দিক থেকে অনেকগুলি লোকের কথা বলার আওয়াজ। হেঁট হয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখল—স্বয়ং নানাসাহেব ছাদে আসছেন। তিনিও বোধ করি স্বচক্ষে দেখতে চান ব্যাপারটা।

আমিনা আর দাঁড়াল না।

নানাসাহেবের সঙ্গে দেখা হওয়া এখন আদৌ অভিপ্রেত নয়। এখন তার কিছুটা স্বাধীনতা প্রয়োজন।

বড় সিঁড়ি দিয়ে নানাসাহেব উঠছেন, সেও পাশের আর একটা সিঁড়ি দিয়ে দ্রুত নীচে নেমে এল।

কিন্তু ঘরে এসেও স্থির থাকতে পারল না।

মুসম্মৎকে ডেকে প্রশ্ন করল, 'সর্দার এসেছে?'

'অনেকক্ষণ। ওদিকে দরজার বাইরে বসে আছে সে।'

আমিনা কাশ্মীরী কাঠের দেরাজটা খুলে তার সেই ছোট্ট পিস্তলটা বার করে অভ্যাসমত কোমরের কাছে গুঁজল। তার পর, ঠিক বোরখা নয়—একটা গাঢ় খয়েরী রঙের রেশমী চাদরে সর্বাঙ্গ ঢাকতে ঢাকতে বলল, 'কেউ যদি খোঁজ করে তো বলিস্ তার ভীষণ মাথা ধরেছে, নয়তো বলিস নবাবগঞ্জের বড় দরগায় সিন্নি দিতে গেছে—কি···যা হয় বলিস্। আমি চললুম।'

মুসম্মৎ ব্যস্ত হয়ে উঠল, ‘কোথায় যাবেন এমন সময়ে মালেকান? ওদিকে বিষম গোলমাল হচ্ছে—শুনতে পাচ্ছেন না?’

‘সেই জন্যেই তো যাচ্ছি। ছাউনির দিকে যাচ্ছি। এতদিন ধরে এত আযোজন করলুম—এত ঘুরলুম, আর আজই ঘরে বসে থাকব? কাঠ কুড়িয়ে মলুম—এখন আগুন-জ্বালাটা নিজের চোখে দেখব না?’

ভয়ে উৎকণ্ঠায় বিবর্ণ হয়ে মুসম্মৎ আরও কী একটা বলতে গেল, কিন্তু সে অবসর মিলল না, কারণ আমিনা ততক্ষণে ঘর থেকে বের হয়ে পড়েছে।

ঘর থেকে দালান, সেখান থেকে সেকালের অন্দরমহলের অসংখ্য সরু সিঁড়িপথ—সেগুলো পার হয়ে সিঁড়ি ও উঠোন—কোথাও আমিনা তার গতি বিন্দুমাত্র মন্থর করল না। একরকম সে ছুটেই চলেছে। এমন কি সর্দার খাঁ সঙ্গে ঠিক আসছে কি না সে খোঁজটাও করল না। সর্দারের সামনে দিয়ে এসেছে—তাই যথেষ্ট। সে নিশ্চয়ই পিছু নিয়েছে। কাকেও গোপন করে আসবার প্রয়োজন নেই—নানাসাহেব ছাদে, তা ছাড়া আজ সকলেই উত্তেজিত, উদ্‌ভ্রান্ত। কে কোথায় যাচ্ছে সে খবর নেবার কারুর অবসর নেই।

ঝোঁকের মাথায় প্রাসাদ থেকে বহুদূরে চলে আসবার পর আমিনা নিজের ভুলটা বুঝতে পারল। ‘তার-ঘর’ বা টেলিগ্রাফ অফিসের কাছ থেকেই ভিড় দুর্ভেদ্য হয়ে উঠল। দর্শকরা তো আছেই—মজা দেখবার জন্য বহু লোক এসে খালের এপারে জড়ো হয়েছে। কাজে-অকাজে বহু লোকই ছাউনিতে আসে, তার ওপর আজ আর কড়াকড়ি করবার লোক নেই—যারা কোন কালে ছাউনির ধারে-কাছে ঘেঁষতে সাহস করে না, তারাও আজ বুক ঠুকে সামনে এসে ভিড় জমিয়েছে। তারই মধ্যে দিয়ে সিপাহীরাও ব্যস্ত হয়ে ঘোরাফেরা করছে এবং তাদের অধিকাংশই ঘোড়সওয়ার। এক-একবার তারা যেমন বেপরোয়া ঘোড়া ছুটিয়ে আসছে, অমনি প্রাণের দায়ে ভিড়টা ছত্রভঙ্গ হয়ে আকস্মিকভাবে পিছনের লোকদের ওপর এসে পড়ছে—সে আরও বিপদ।

আমিনা বলল, ‘বড্ড ভুল হয়ে গেল রে, সর্দার, ঘোড়া নিয়ে বেরোনো উচিত ছিল!’

সর্দার বলল, ‘নিয়ে আসব?’

‘যাবি?···আমি একলা থাকব একেবারে? কোথায় ছিটকে পড়ব হয়তো—এসে যদি দেখা না পাস?’

একটা আমগাছের নীচে দাঁড়িয়ে ওরা কথা বলছিল। সেখানেই হঠাৎ হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল সর্দার খাঁ, 'আমার কাঁধে পা দিয়ে গাছের ওপর উঠে যান মালেকান, ওখানে নিরাপদে থাকবেন। আমি ঘোড়া আর খবর দুই-ই নিয়ে আসছি।'

তার বিপুল দেহ সত্ত্বেও সে আশ্চর্য ক্ষিপ্রগতিতে ভিড়ের মধ্যে মিশে গেল।

একটু পরেই সর্দার ফিরল। কোথা থেকে দুটো ঘোড়াও সংগ্রহ করে এনেছে—আর এনেছে স্বয়ং আজিমুল্লা খাঁকে।

আজিমুল্লাও একটা ঘোড়ায় সওয়ার হয়েছেন। তিনি কাছে এসে সযত্নে আমিনাকে নামালেন গাছের ডাল থেকে। তাঁর কয়েকটি আঙুলে মাত্র ভর দিয়ে আমিনা আশ্চর্য লঘুগতিতে একেবারে ঘোড়ার পিঠে এসে বসল।

'আপনার এই ভিড়ের মধ্যে এভাবে আসা ঠিক হয় নি বেগমসাহেবা—সর্দারকে পাঠালেই পারতেন। না-হয় আমি গিয়ে খবর নিয়ে আসতুম।... আজ বহু বদ্‌লোক এখানে জড়ো হয়েছে।' মৃদু অনুযোগ করেন আজিমুল্লা।

কোমর থেকে পিস্তলটা বের করে আমিনা আজিমুল্লার সামনে মেলে ধরল। অসহিষ্ণুভাবে বলল, 'হাতিয়ার ছাড়া আমি বেরুই না। আমি ঠিক আছি। এখন খবর বলুন।'

'খবর খুব ভাল। টীকা সিং অসাধ্যসাধন করেছে। কাল সারারাত ধরে সিপাই লাইনের মেয়েছেলে আর টাকাকড়ি দেহাতে সরিয়ে দিয়েছে—সাহেবরা সন্দেহও করে নি। আজ ওরই পিকেট-ডিউটি ছিল—সুবিধেই হয়ে গেছে। সময় বুঝে ওরই সওয়াররা আগে বেরিয়ে এসেছে। ঐ দেখুন ঘোড়-সাহেবের * বাংলো জ্বলছে। খুব নির্বিবাদে কাজ মিটে গেছে। ওরা মাল-খানা থেকে টাকা আর নিশান দখল করবার সময় এক সুবেদার মেজর বাধা দিতে গিয়েছিল—বেচারী প্রাণ দিয়ে নিজের স্পর্ধার প্রায়শ্চিত্ত করেছে। টীকা সিং-এর ঘোড়সওয়ারেরা বেরিয়ে এসে এক নম্বর ইনফ্যান্ট্রিকে ডাক দিতেই তারাও বেরিয়ে এসেছে। ওরা সোজা চলে গেছে নবাবগঞ্জের দিকে, জেল-খানা, ট্রেজারি আর ম্যাগাজিন—এগুলো দখল করতে।'

* Riding Master

'এ তো দুটিমাত্র রেজিমেন্টের কথা বললেন। বাকি? ছাপ্পান্ন আর তিপ্পান্ন?'

'একটু মুস্কিল বেধে গিয়েছে। ওরা এখনও ইতস্তত করছে—ওদের মনের ভাবটা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না বেগমসাহেবা!'

'সে কি! এখনও বোঝা যাচ্ছে না? এতকাল কী করলেন তবে?'

আমিনার কণ্ঠে হতাশা ও বিরক্তির সুর।

সে ঘোড়ার মুখ ফেরাল।

'কোথায় চললেন?' আজিমুল্লা বিব্রত হয়ে প্রশ্ন করলেন, 'আপনি আবার ওর মধ্যে অনর্থক—'

'চলে আয় সর্দার খাঁ!' আমিনা যেন আজিমুল্লার উপস্থিতি ও আশঙ্কা একই সঙ্গে উড়িয়ে দিতে চায়।...

ভিড় ঠেলে আরও খানিকটা যেতেই খোদ টীকা সিং-এর দেখা পাওয়া গেল।

'কী খবর টীকা সিং?' আমিনা স্থান-কাল-পাত্র সব ভুলে নিজেই সাগ্রহে প্রশ্ন করে।

স্ত্রীলোকের কণ্ঠস্বরে প্রথমটা ঘাবড়ে গেলেও সঙ্গে আজিমুল্লাকে দেখে টীকা সিং আশ্বস্ত হল। তখন পরিচয় জানবার সময় নেই। সে উত্তরটা আজিমুল্লাকেই দিল, 'কাম ফতে খাঁ সাহেব। ট্রেজারি আর ম্যাগাজিন দুই-ই আমাদের হাতে এখন। সবাই চলে এসেছে কেবল এই দুটো দলই বড় বেগ দিচ্ছে—তিপ্পান্ন আর ছাপ্পান্ন।'

আমিনা ঘোড়া চালিয়ে সোজা টীকা সিং-এর সামনে এসে দাঁড়াল। বলল 'শুনুন, টাকার লোভ দেখান। বলুন, এখন যদি না আসে তো ওদের বাদ দিয়েই লুটের টাকা ভাগ করা হবে—এর পর আর ওদের কোন দাবি থাকবে না।'

'লুটের টাকা?' টীকা সিং খানিকটা হতভম্ব ভাবেই প্রশ্ন করে।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ—ট্রেজারির টাকা! বলুন যে ট্রেজারির টাকা ভাগ করা হচ্ছে, না এলে ভাগ পাবে না। যা খুশি বলুন গিয়ে—মোদ্দা তাড়াতাড়ি করুন। লোহা ঠাণ্ডা হয়ে গেলে আর পিটোনো যায় না—ইংরেজিতে একটা কথা আছে। এখন যদি বেরিয়ে না আসে তো সকালবেলা ঐ ইংরেজগুলোই বেশী লোভ দেখিয়ে নিজেদের দলে টেনে নেবে। যান—দেরি করবেন না।'

নেতৃত্ব করবার জন্মগত অধিকার নিয়ে কোন কোন মানুষ জন্মায়। আমিনাও সেই শ্রেণীর মানুষ। তার কথা বলবার ভঙ্গিতেই এমন এক অলঙ্ঘ্য নির্দেশ ছিল যে, টীকা সিং সে নির্দেশ কোথা থেকে, কার কাছ থেকে আসছে, তা জানবার জন্যও থামল না। সোজা ঘোড়া ছুটিয়ে ভিড়ের মধ্যে চলে গেল তখনই।

অধৈর্য আমিনাও আর পেছনে অপেক্ষা করতে পারল না। যতটা সম্ভব ভিড় সরিয়ে একেবারে সামনের দিকে এগিয়ে গেল। যারা ঘোড়ার চাপে সরতে বাধ্য হল, তারা দু-এক জন যে রোষকষায়িত নেত্রে না তাকাল তা নয়, কিন্তু সশস্ত্র সর্দার খাঁ ও আজিমুল্লা খাঁকে দেখে আর কোন কথা বলতে সাহস করল না। মহিলার অগ্রাধিকার অগত্যা মেনে নিল।

যখন আর কিছুতেই আগে যাওয়া গেল না, তখন আমিনা এক অসম-সাহসিক কাণ্ড করল। নিজের ঘোড়া সর্দার খাঁর ঘোড়ার পাশে নিয়ে গিয়ে তার কাঁধে ভর দিয়ে সোজা ঘোড়ার ওপরই উঠে দাঁড়াল।

॥ ৩২ ॥

টীকা সিং আমিনার নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করল। গণ্ডার আওয়াজ চড়া—এমন দেখে দুজন সওয়ারকে সে পাঠাল ছাপ্পান্ন নম্বর ও তিপ্পান্ন নম্বরের লাইনে। তারা চারদিকের সব কোলাহল ডুবিয়ে নিজেদের বক্তব্য অধিকাংশের কানে পৌঁছে দিল—আমিনারই শেখানো কথা—'ভাই সব, মন দিয়ে শোন। ট্রেজারির টাকা আমরা হাতে পেয়েছি। এখানকার সিপাহীদের মধ্যেই তা ভাগ হবে। কিন্তু যারা এর মধ্যে আমাদের দলে আসবে না, বা আজ রাতে ট্রেজারিতে উপস্থিত হবে না, তারা সে টাকার কোন ভাগ পাবে না। সূর্যোদয়ের পর আর কারুর কোন দাবি গ্রাহ্য করা হবে না।'

ছাপ্পান্ন নম্বরের মধ্যে অনেকেই উসখুস করে উঠল—শুরু হল সলা-পরামর্শ। একটু পরে গুঞ্জন—তার পর একে-একে দুয়ে-দুয়ে বন্দুক কাঁধে করে এসে উঠল এধারের সড়কে, যেখানে টীকা সিং-এর অনুগামীরা দাঁড়িয়ে

অধীর আগ্রহে তাদের 'দোস্ত' আর 'ভাইয়া'দের প্রতীক্ষা করছে। দেখতে দেখতে ছাপ্পান্ন নম্বরের ব্যারাক প্রায় খালি হয়ে গেল।

বিদ্রোহীদের কোলাহল ও জয়ধ্বনি বহু দূরে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ল।

আমিনা আরও খানিকটা অপেক্ষা করে আজিমুল্লাকে পাঠাল তিপ্পান্ন নম্বরের খবর সংগ্রহ করতে। সে নিজে সেখান থেকে নড়ল না—ফিরতে তো রাজী হলই না। আজিমুল্লা অনেক অনুরোধ করলেন—প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, তিনি নিজে প্রাসাদে গিয়ে খবর পৌঁছে দেবেন, কিন্তু আমিনা কোন কথাই কানে তুলল না। বলল, 'এর শেষ না দেখে আমি নড়ব না খাঁ সাহেব—আপনি মিছেই সময় নষ্ট করছেন।'

অগত্যা আজিমুল্লাকেই হার মানতে হল।

অনেকক্ষণ পরে শেষ-রাত্রের দিকে তিনি ফিরে এসে দুঃসংবাদ দিলেন, 'তিপ্পান্ন নম্বরের হাওয়া ভাল নয় বেগমসাহেবা, ওরা বোধ হয় ইংরেজদের ছাড়বে না। ওদের মধ্যে সাত-আট জন চলে গিয়েছে, কিন্তু বাকি কারুর ইচ্ছে নেই!'

অসহিষ্ণু বিরক্তিতে আমিনা নিজেরই ঠোঁট কামড়ে ধরে রক্তাক্ত করে ফেলল।

এদিকে আজিমুল্লার কথা শেষ হবার আগেই প্যারেডের বিউগ্‌ল বেজে উঠল। শেষ-রাত্রেই প্যারেড ডাকা হয়েছে—কতকটা অবশিষ্ট সৈন্যদের বিশ্বস্ততা পরীক্ষা করার জন্যই। আমিনা উদ্‌গ্রীব হয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল। তিপান্ন নম্বর এবং ছাপ্পান্ন নম্বরেরও কয়েক জন যথারীতি এসে মাঠে সারি দিচ্ছে।

আমিনার চোখ দুটো সেই আবছা অন্ধকারে হিংস্র শ্বাপদের মত জ্বলতে লাগল। অকস্মাৎ সে দাঁতে দাঁত চেপে আজিমুল্লাকে বলল, 'আর এক ঘণ্টার মধ্যেই তিপ্পান্ন নম্বরও আপনাদের সঙ্গে মিলবে খাঁ সাহেব—আমি ব্যবস্থা করছি!'

সে আর দাঁড়াল না—কিছু খুলে বললও না। প্রাণপণে—বলতে গেলে ঊর্ধ্বশ্বাসে, ঘোড়া ছুটিয়ে প্রাসাদের দিকে রওনা হল। এমন কি, যাওয়ার আগে একটা বিদায়-সম্ভাষণ পর্যন্ত জানিয়ে গেল না আজিমুল্লা খাঁকে।

আরও আধঘণ্টাখানেক পরে উদ্বিগ্ন, কিংকর্তব্যবিমূঢ় হুইলার সাহেবের আর্দালী এসে সাহেবের হাতে লেফাফায় আঁটা এক চিঠি দিল—চিঠির ওপর পরিচ্ছন্ন ইংরেজিতে হুইলার সাহেবের নাম লেখা। আর্দালী জানাল—কে এক বোরখা-পরিহিত স্ত্রীলোক এসে তার হাতে এই চিঠিখানা দিয়েই চলে গেছে।

হুইলার সাহেব তখন একা তাঁর টেবিলে এক পেয়ালা ঠাণ্ডা কফি সামনে নিয়ে চুপ করে বসেছিলেন। সংবাদটা তাঁর মাথায় ঢুকতেই কিছু বিলম্ব হল। তিনি বিস্ময়-বিহ্বল দৃষ্টিতে আর্দালীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমার নামে চিঠি এনেছে? মেয়েছেলে? বোরখা পরা স্ত্রীলোক? কী লিখেছে সে চিঠিতে?'

আর্দালী মাথা চুলকোতে চুলকোতে বলল, 'আজ্ঞে, তা বলতে পারব না। খামে-আঁটা চিঠি। এই যে—'

সে চিঠিখানা বাড়িয়ে ধরল।

হুইলার সাহেব চিঠিটা হাতে করে আরও বিস্মিত হলেন। পরিচ্ছন্ন ইংরেজিতে খামের ওপর নাম লেখা। মুক্তার মত হরফ—তবু বুঝতে বিলম্ব হয় না যে, কোন স্ত্রীলোকেরই লেখা।

ইংরেজি, জানা আর কে এমন স্ত্রীলোক এখনও শহরে আছে? আর কীই বা সে চায় তাঁর কাছে?

খামখানা খুললেই সন্দেহভঞ্জন হয়—তবু হুইলার সাহেব কয়েক মুহূর্ত সেটা হাতে করেই বসে লেখিকার নাম অনুমান করবার চেষ্টা করেন। মিসেস গ্রীনওয়ে? মিসেস টেলর? আর কে হতে পারে?

অবশেষে খামখানা ছিঁড়তেই হল।

তেমনি মুক্তার মত হস্তাক্ষরে পরিচ্ছন্ন চিঠি। নির্ভুল ইংরেজিতে লেখা। ছোট্ট চিঠি, কয়েক ছত্র মাত্র—

"প্রিয় জেনারেল হুইলার, বিদ্রোহীদের মধ্যে বন্দোবস্ত হয়েছে—এক দল সৈন্য বিশ্বস্ত থাকবার ভান করে আপনাদের অবরোধের মধ্যে থাকবে। তার পর কোন এক অসতর্ক মুহূর্তে ভেতর থেকে আপনাদের আকস্মিক আক্রমণে বিপর্যস্ত করবে। সতর্ক থাকবেন।—জনৈক বন্ধু।"

চিঠিখানা পড়ে হুইলার অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন। তার পর আর্দালীকে পাঠিয়ে লেফটেনান্ট ম্যাশেকে ডেকে আনালেন।

ম্যাশে আসতে নীরবে চিঠিখানা তাঁর হাতে দিলেন হুইলার। ম্যাশের পড়া শেষ হলে প্রশ্ন করলেন, 'কী বুঝলে?'

'কে লিখল চিঠিখানা, আর কী মতলব—তাই ভাবছি।'

'আমার মনে হয়, নানাসাহেবের যে কে-এক ইংরেজি-জানা বেগম আছে শুনেছি—এ চিঠি তারই লেখা!'

'হতে পারে। কিন্তু তা হলে এ চিঠি কি খুব নির্ভরযোগ্য মনে হয় আপনার?'

'কেন নয়? শুনেছি কন্‌ভেন্টে পড়েছে, ইংরেজদের সে ভালবাসে—তার পক্ষে একটু সময় থাকতে আমাদের হুঁশিয়ার করে দেওয়াটাই তো স্বাভাবিক।'

ম্যাশে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'তা হলে কী করবেন ভাবছেন?'

'দুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভাল। বেশির ভাগই তো গেছে—ও-কটাকেও তাড়িয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া যাক্। এমনিই হয়তো যাবে—আজ না হয় কাল, মিছিমিছি এ অনিশ্চয়তা আর সহ্য হচ্ছে না—সব যাক্।'

'তা বলে আমরা স্বেচ্ছায় ওদের ঠেলে দেব ঐ বিশ্বাসঘাতকগুলোর মধ্যে? যদি সত্যিই ওরা বিশ্বস্ত হয়?'

'যদি না হয়? যদি এই চিঠিই সত্যি হয়? ঘরের শত্রু পুষে রাখা কি ভাল? বরং যে কজন আছি, নিজেরা নিজেদের জোর বুঝে নিশ্চিন্ত হয়ে আত্মরক্ষা করাই ভাল।'

ম্যাশে খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'তা এখন আমাকে কী করতে বলেন?'

হুইলার হঠাৎ যেন বিরক্ত হয়ে উঠলেন, 'আমাকেই সব বলতে হবে? কেন তোমরা কি কেউ কোন ঝুঁকি নিতে পার না? বেশ, আমি বলছি, যাও, ওদের ওপর গোলা চালাও—সোজা।'

ম্যাশে নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারলেন না।

'ওদের ওপর গোলা চালাব? কামান থেকে?'

হ্যাঁ, হ্যাঁ—কানে কম শুনছ নাকি?'

নিজের ঠোঁট দুটোয় একবার জিভ বুলিয়ে নিয়ে একবার ঢোঁক গিলে ম্যাশে তবু বললেন, 'বেচারীরা হয়তো এখন নিশ্চিন্ত মনে রসুই পাকাতে বসেছে, এ সময়—সেটা কি ভাল হবে?'

'ওঃ, বড় যে দয়া দেখছি! আমরা যখন নিশ্চিন্ত মনে খেতে যাব, ওরা যদি সে সময় আমাদেরও পর গুলি চালায় সেইটেই বড় ভাল হবে—না? শয়তান বেইমানের জাত ওরা—সব সমান। যাও, যা বলছি তাই কর গে।'

য্যাশে নীরবে অভিবাদন জানিয়ে বের হয়ে গেলেন।

তিপ্পান্ন নম্বর রেজিমেণ্টের তখন সত্যিই রসুই চড়েছিল। কেউ বা উর্দি খুলে তেল মাখতে বসেছে—কেউ বা উর্দি পরেই বসে তামাক টানছে।

এমন সময় কে একজন খবর দিল ছাপ্পান্ন নম্বরের যারা কাল চলে গিয়েছিল, তাদেরই কয়েক জন এসে তোশাখানা থেকে সিন্দুক বার করে ভাঙছে এবং নিশানগুলো জ্বালিয়ে দিচ্ছে। একজন সার্জেণ্ট বাধা দিতে গিয়েছিল—তাকে কেটে ফেলেছে।

একজন হাবিলদার সবে গুড়গুড়ি মুখে তুলেছিল, সে সেটা নামিয়ে রেখে কোমরে বেল্ট আঁটতে আঁটতে ছুটল—'আডজুটাণ্ট' সাহেবকে খবর দিতে। এমন সময় অকস্মাৎ একসঙ্গে তিনটি কামান তাদের দিকে মুখ করেই অগ্ন্যুদগার করে উঠল।

গুম্—গুম্—গুম্।

সকলে স্তম্ভিত—হতচকিত।

তাদেরই কামান তাদেরই ওপর ছোঁড়া হচ্ছে।

তারা ভুল দেখছে না তো?

তাদের এই সংশয়ের জবাব দিতেই বোধহয় কামানগুলি আবারও গর্জন করে উঠল।

গুম্—গুম—গুম।

তার পর আরও এক বার। আর সংশয়ের অবকাশ রইল না।

যে যেদিকে পারল ছুটল। যেমন অবস্থায় ছিল সেই অবস্থাতেই। যারা শুধু কপ্‌নি পরে তেল মাখছিল, তারা জামা-উর্দি পরবারও অবসর পেল না। কোনমতে এক হাতে সেগুলো আর এক হাতে বন্দুকটা আঁকড়ে ধরে সেই হাস্যকর অবস্থাতেই দৌড়ল।

দেখতে দেখতে ব্যারাক খালি হয়ে গেল। তবে একেবারে নয়। তবু রয়ে গেল কয়েক জন। যাদের কাছে জানের চেয়ে নিমকের মূল্য বেশি, তারা

কিছুতেই ব্যারাক ছেড়ে নড়ল না। ম্যাশে ইঙ্গিতে গোলন্দাজদের নিরস্ত করলেন—আর নয়।

সেদিক থেকে ফিরে দাঁড়িয়ে জামার হাতায় কপালের ঘাম মুছতে মুছতে ম্যাশে তাঁর বন্ধু ও সহকর্মী টমসনকে বললেন, 'অনেক নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিলাম আমরা এই ক'দিনে—একের পর এক। কিন্তু আজকের এইটেই বোধ হয় চরম। ইতিহাসে এর দ্বারাই আমরা সবচেয়ে বড় বেকুবদের মধ্যে স্থান করে নিতে পারব।'

॥ ৩৩ ॥

নানা ধুন্ধুপন্থও সেদিন সারা রাত ছাদের ওপর থেকে নামলেন না। প্রায় সমস্তক্ষণই একটা দূরবীন চোখে দিয়ে ছাউনির দিকে চেয়ে কাটিয়ে দিলেন। অনুচরদেরই প্রাণান্ত—বেচারী গংগরকর আর তেওয়ারীকে মুহুর্মুহু ছুটতে হচ্ছে ছাউনিতে—সর্বশেষে এবং নির্ভুল সংবাদের জন্য, আবার তেতলা ভেঙে সে সংবাদটা নানাকে পৌঁছে দিতে হচ্ছে।

আরও মুস্কিল এই যে, যাদের ওপর নানার বেশী ভরসা, যারা ওঁকে অবিরত উৎসাহ দিয়ে তাতিয়ে রাখে—আজ তাদের কারও পাত্তা পাচ্ছেন না। অবশ্য তাদের এমন দিনে প্রাসাদে পাবেন—এরকম আশাও করেন নি। এত দূর থেকে দূরবীন দিয়েও দেখা শক্ত—বিশেষত এই অন্ধকারে, তবু যেন নানার ধারণা, ঘোড়সাহেবের ঘর যখন পুড়ছিল, আগুনের আভায় তাত্যা ও আজিমুল্লা দুজনকেই তিনি দেখেছিলেন। বোধ হয় টীকা সিং-এর সঙ্গে দাঁড়িয়ে মন্ত্রণা করছিলেন দুজনে।

আমিনার খোঁজেও একবার লোক পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু খবর এল যে, বেগমসাহেবার মাথা ধরেছে। খবরটা শুনে নানা হেসেছিলেন। এ মাথাধরার অর্থ নানাসাহেব বোঝেন। এমন দিনে হুসেনী ঘরের কোণে বসে থাকতে পারবে না—তা তিনি ভাল করেই জানেন।

কিন্তু শেষরাত্রে যখন এক সময় তেওয়ারী এসে খবর দিল যে, হুসেনী বেগমসাহেবা ও আজিমুল্লা খাঁকে সে ছাউনির ভেতর এক জায়গায় পাশাপাশি ঘোড়ার ওপর সওয়ার হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছে, তখন নানার ভ্রূ কুঞ্চিত

হয়ে উঠল। কিছুক্ষণ আগেকার সে সস্নেহ প্রশ্রয়ের ভাবটা আর একদম রইল না। খানিকটা গুম খেয়ে থেকে আর একটা লোককে ডেকে হুকুম করলেন, হুসেনী বেগমের ঘরের সামনে মোতায়েন থাকতে এবং বেগমসাহেবাকে ফিরতে দেখলেই সংবাদ দিতে।

এর পর থেকে ঘণ্টাখানেক কাল নানাসাহেব আরও অস্থির হয়ে রইলেন। ওধারের খবরও খুব ভাল নয় এখনও। সত্য বটে, এক তিপ্পান্ন নম্বর ছাড়া আর সব রেজিমেণ্টই বেরিয়ে এসেছে এবং প্রথম করণীয় হিসেবে যা কিছু করা দরকার সবই করেছে—জেলখানা খুলে দেওয়া, ট্রেজারি লুট করা, মহল্লায় আগুন লাগানো—কোনটাই বাদ যায় নি, তবু তিপ্পান্ন নম্বর ও'দিক থেকে গেলে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় কই? একে তো মুষ্টিমেয় সাহেবই যথেষ্ট, তার ওপর যদি একটা পুরো রেজিমেণ্ট তাদের সঙ্গে থাকে তো রীতিমত বেগ দেবে—তাতে সন্দেহ নেই। তা ছাড়া আরও একটা সংশয় নানাসাহেবকে প্রথম থেকেই সুস্থির থাকতে দিচ্ছে না। তাঁর স্বদেশীয় সেনাদের মোটামুটি তিনি চেনেন—লুটপাট এবং অরাজকতার স্বাদ পেলে আবার কি তাদের সহজে শৃঙ্খলার মধ্যে আনা যাবে? শেষ অবধি তাঁর কোন সুবিধা হবে কি? কতকগুলো লুটেরার দুষ্কৃতির সাক্ষী হয়ে থাকার কোন অর্থ হয় না। লক্ষ্ণৌতে সেই প্রথম দিন রাত্রে মহম্মদ আলি খাঁর কথাগুলি তিনি ভোলেন নি। যুদ্ধ আর অরাজকতা এক নয়। লুটতরাজ ও বিদ্রোহে অনেক তফাত। পিতার কাছে নানাসাহেব ভারত-ইতিহাসের অনেক কথাই শুনেছেন। বাদশা, নবাব বা রাজা—যিনিই সৈন্যদের যথাসময়ে বেতন দিতে না পেরে বা অন্য কোন কারণে তাদের খুশী করবার উদ্দেশ্যে লুটের পথ দেখিয়েছেন, তিনিই বিপন্ন হয়েছেন। সে কথা জানার পরও—তাঁরাও আবার সেই ভুল করে বসছেন না তো?

আর এই হুসেনী বেগম?

আশ্চর্য। এই এক প্রবল ঘূর্ণাবর্তের সামনে দাঁড়িয়েও তিনি পুরোপুরি সেই ঝড়ের কথাটা ভাবতে পারেন না কেন? এখন, এই চরম সংকটকালে তুচ্ছ হুসেনী বেগমের অন্তরের কথাটাই এত বড় হয়ে দাঁড়ায় কেন?

হুসেনী বেগম ও আজিমুল্লা?

না, এটা নিতান্তই সহকর্মীর ঘনিষ্ঠতা। নানাসাহেব মনকে এত ছোট হতে দেবেন না। আর হুসেনীর মত সেবিকার অভাবই বা কি?

ললাটের ঘাম মুছতে মুছতে নানাসাহেব উনিকে প্রবোধ দেবার চেষ্টা করেন।…

তবু চিন্তাটা কাঁটার মত খচ খচ করতেই থাকে। তিনি নিজে ত্যাগ করেন সে কথা আলাদা। কিন্তু তাঁরই দুজন বেতনভোগী নরনারী তাঁকে বোকা বানাবে এ চিন্তাও যে অসহ্য।…

ওদিকে জনরোল ক্রমশ প্রবল হয়ে উঠছিল। নানা কান পেতে শোনেন —"দীন। দীন!" "আল্লা হো আকবর!" "হর হর মহাদেও!" এবং "বাদশা বাহাদুর শাহ্‌কী জয়!" এই শব্দের সঙ্গে যেন একবার "পেশোয়া নানা ধুন্ধুপন্থ কী জয়"-ও শোনা গেল না?

এই প্রথম!

আনন্দে নানাসাহেবের চোখে জল এসে গেল।

তিনি ওপরের দিকে দু হাত তুলে ইষ্টদেবকে প্রণাম জানালেন।

উদ্বেলিত চিত্তে নানাসাহেব নিজেই নীচে আসবার উদ্যোগ করছেন, গণপৎ এসে সংবাদ দিল—হুসেনী বেগম মহলে ফিরে এসেছেন। নানাসাহেবের বুকটায় আবারও খচ করে একটা কিছু বিঁধল কি? বিঁধলেও তা অনুভব করবার জন্য তিনি থামলেন না—জোর করে প্রশ্নটা মন থেকে দূর করে দিয়ে প্রধানত খবরটা শোনবার কৌতূহলেই প্রথম বয়সের মত একসঙ্গে দু-তিনটা ধাপ সিঁড়ি অতিক্রম করে দ্রুতবেগে নেমে এলেন এবং বাকি পথটুকু প্রায় ছুটেই পার হয়ে আমিনার ঘরে পৌঁছলেন।

আমিনা তখনও তার গায়ের চাদর খোলে নি—সেখানা তখন তেমনি সর্বাঙ্গে জড়ানো। বহুলোকের পদক্ষেপে ও অশ্বক্ষুরে ছাউনির কাছটা কুয়াশার মতই ধুলোয় আচ্ছন্ন হয়েছিল। সে ধুলো তার সুন্দর মুখে, বঙ্কিম ভ্রূতে এবং ঘনকৃষ্ণ কেশদামের ওপর পুরু হয়ে জমেছে। দ্রুত আসার ফলে ললাট ও কণ্ঠ স্বেদাক্ত হয়ে উঠেছে। সে ঘাম ধুলোর সঙ্গে মিশে কাদার মতই দেখাচ্ছে। কিন্তু আমিনার সে সব কোন দিকে লক্ষ্য নেই, মুখটা মোছবার কথাও তার মনে পড়েনি। সে যেমন এসেছে, তেমনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাউকে বোধ হয় একটা চিঠি লিখছে। চেয়ার টেবিল আছে, কিন্তু দেরাজ থেকে কাগজ বার করে টেবিলে বসে লেখার যেটুকু বাড়তি সময় তাও সে নষ্ট করতে রাজী নয়। দেরাজের ওপরই কাগজটা রেখে খস্‌খস্‌ করে অত্যন্ত দ্রুতবেগে লিখছে।

নানাসাহেব হাসিহাসি মুখে ঘরে ঢুকে কাছে এসে দাঁড়ালেন।

'হুসেনী, আমি অনেকক্ষণ ধরে তোমাকে খুঁজছি!'

হুসেনী এদিকে না চেয়ে বা কলম না থামিয়েই শুধু বাঁ হাতের তর্জনী তুলে ছোট্ট শিশুর মতই তাঁকে নিরস্ত করল, 'চুপ।'

নানাসাহেব স্তম্ভিত।

চিঠি অবশ্য প্রায় তখনই শেষ হয়ে গেল। একটা খামে মুড়ে সেইভাবেই দাঁড়িয়ে হুসেনী প্রাপকের নাম লিখল।—তার কাঁধের ওপর দিয়ে মুখ বাড়িয়ে নানাসাহেব নামটা পড়লেন—সার হিউ হুইলার।

সর্বনাশ!

নানা আরও বিস্মিত হয়ে বলতে গেলেন, 'হুসেনী, এ কি ব্যাপার! এ চিঠি—'

'চুপ। চুপ করুন।'

আমিনা এইবার সেই রেশমী চাদরটা গা থেকে খুলে ফেলল। তার পর ছুটে আলনার সামনে গিয়ে দু-তিনটে জামা-পাজামা ছুঁড়ে সরিয়ে একটা সাধারণ বোরখা বার করল এবং সেটা মাথায় গলাতে গলাতেই ছুটল দরজার দিকে।

কিন্তু নানাসাহেব তার পৌঁছবার আগেই ক্ষিপ্রতর গতিতে গিয়ে পথ রোধ করে দাঁড়ালেন, 'কোথায় যাচ্ছ হুসেনী—তোমাকে যে আমার দরকার।'

হুসেনী অসহিষ্ণু কঠিন কণ্ঠে বলল, 'পথ ছাড়ুন। আমি এখনই ফিরে আসছি।'

'তুমি যাচ্ছ কোথায়—তাই আগে শুনি।'

'হুইলার সাহেবকে এই চিঠিটা পৌঁছে দিতে।'

'হুইলার সাহেবকে? তুমি চিঠি পৌঁছে দেবে?'

'আঃ পেশোয়া, সরুন, ছেলেমানুষি করবেন না। আর আধঘণ্টার মধ্যে তিপ্পান্ন নম্বরকে ওদের কাছ থেকে বার করতে না পারলে সর্বনাশ হবে। এ কাজের ভার আর কাউকে দিয়ে আমি স্বস্তি পাব না। আর কেউ হয়তো সাহস করে যেতেও চাইবে না'

'হুসেনী, তোমার আচরণ এবং ভাষা দুই-ই সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে।' বিদ্বেষ আর নানাসাহেবের কণ্ঠে চাপা থাকে না, 'কাল সারারাত কোথায় কি-ভাবে কাটিয়েছ, আমি তার কৈফিয়ত চাই। আমার বিনা হুকুমে তুমি গিয়েছিলে

কোথায়? আমি একেবারে শিশু নই—খবর আমার কানেও পৌঁছয়! আজিমুল্লার সঙ্গে অত কিসের গলাগলি তোমার? হাজার হৌক সে আমার চাকর—তার সঙ্গে তোমার অত ঘনিষ্ঠতা শোভা পায় না, বুঝেছ?'

'বাঃ, চমৎকার পেশোয়া! এই তো আপনার উপযুক্ত কথা! আমরা আপনাকে সিংহাসনে বসাবার জন্য প্রাণান্ত করছি, আর আপনি কোন কাজ তো করছেনই না—ঈশ্বর সে শক্তিও বোধ কবি দেন নি আপনাকে—এই সব তুচ্ছ কথা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন। ··আজিমুল্লা আপনার চাকর ঠিকই, কিন্তু সেই চাকরের অর্ধেক বুদ্ধি এবং কর্মশক্তি যদি আপনার থাকত পেশোয়া তো আপনার সিংহাসনটা সম্বন্ধে আমি নিশ্চিন্ত হতে পারতুম। মহারাজ, যখন এক লহমার মূল্য একটা রাজ্যখণ্ড, তখন আপনি এই হাস্যকব তুচ্ছতায় সময় নষ্ট করছেন—একথা শুনলে আপনাব চাকব- বাকবরা তো বটেই, আপনার পোষা কুকুর-বেড়ালগুলো পর্যন্ত বোধ হয় হাসাহাসি করবে। ..আপনি চুপ করুন, সরে দাঁড়ান, আর কোন কাজ না থাকে তো বরং আদালার ঘরে যান। সে-ই আপনার যোগ্য সহচবী, পাশে বসে আপনার কাছে নতুন নতুন অলঙ্কারের ফর্দ পেশ করবে, আর আপনি শুয়ে শুযে সেগুলোর মূল্য হিসেব করবেন মনে মনে—তবু একটা কাজ পাবেন।'

সে একরকম নানাসাহেবকে ঠেলেই সবিয়ে বার হযে গেল।

প্রথমটা নিজেরই রক্ষিতা উপপত্নীর এই ঔদ্ধত্যে ও অসহ স্পর্ধায নানা-সাহেবের চোখমুখ ভয়ঙ্কর হযে উঠেছিল, কী একটা কঠিন আদেশ দেবাব জন্য বোধ হয় একবার মুখও খুলেছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে উদ্যত বসনা আপনিই স্তব্ধ হয়ে গেল। হুসেনীর সমস্ত আচরণে এবং বাক্যে যে দৃঢ়তা, আত্মপ্রত্যয এবং নানার স্বার্থ সম্বন্ধে সত্যকার নিষ্ঠা প্রকাশ পেল—তাতে সত্যি সত্যিই নিজেকে তার কাছে বড ক্ষুদ্র বোধ হতে লাগল। কিল খেয়ে যেমন সময় সময মানুষ সে কিল চুরি করে—তেমনি ভাবেই বহুক্ষণ নীরবে নতমস্তকে সেখানে দাঁড়িয়ে থেকে নানা নিজেকে সামলে নিলেন। তার পর ধীরে ধীরে মাথা নীচু করেই এক সময় সে ঘর থেকে বের হয়ে এলেন।

নানাসাহেব ওখানে থেকে এসে স্নান সেরে পুজোয় বসলেন। আজ তাঁর জীবনে এক নতুন দিন শুরু হতে চলল—ইষ্টপূজা না করে সে দিন শুরু করা তাঁর উচিত মনে হল না।

কিন্তু পূজোয় বসলেও পূজোয় মন দিতে পারলেন না। নিজের মানসিক উত্তেজনা তো আছেই ; গতকাল সারা রাত ধরে যে দৃশ্য দেখেছেন—তা তাঁর কাছে এক অভূতপূর্ব ঘটনা, কল্পনাতীত ব্যাপার, সমস্ত অভিজ্ঞতার বাইরে। তিনি জ্ঞান হওয়া অবধি দেখেছেন ইংরেজ এদেশে প্রভু, সর্বশক্তিমান—সকলেরই ভীতি ও সম্ভ্রমের পাত্র। সেই ইংরেজ-শক্তির মূলে এমন ভাবে নাড়া দেওয়া যায়, এ কথা বিশ্বাস করবার মত কোন কারণই জানা ছিল না এতকাল। তাই যে উচ্চাশা মনের মধ্যে অঙ্কুরিত হতে গিয়েও সংশয় ও ভয়ের আওতায় এতকাল কোন মতে মাথা তুলতে পারে নি, আজ তাই যেন আকাশের দিকে সহস্র বাহু বিস্তার করেছে।

অন্যমনস্কতার কারণ কিন্তু বাইরেও যথেষ্ট।

কোলাহল ক্রমেই প্রবল হচ্ছে। সে জন-কোলাহল যেন বিক্ষুব্ধ সমুদ্রতরঙ্গের গর্জন বলে বোধ হচ্ছে এখন। মনে হচ্ছে যে সে সমুদ্রের ঢেউ এদিকেই আসছে।

এরই মধ্যে এক সময় পর পর তিন বার কামানের শব্দ তাঁর কানে এল।

বিষম চমকে উঠলেন নানাসাহেব।

এ তো ম্যাগাজিনের কামান নয়। সিপাহীরা নিশ্চয় এরই মধ্যে সেগুলো এখানে এনে ফেলতে পারে নি। তা ছাড়া শব্দ শুনে মনে হচ্ছে এ ছোট ছোট কামানের গোলা—সম্ভবত 'নাইন পাউণ্ডার'। ছাউনির ভেতরের কামান এগুলো।

তবে কি এর মধ্যেই ইংরেজরা প্রস্তুত হয়ে গেল ?

ঐ মুষ্টিমেয় ইংরেজ—প্রায় নিরস্ত্রই বলা চলে, তাঁদের আক্রমণ করতে সাহস করল ?

বিবর্ণ হয়ে উঠল নানাসাহেবের মুখ। বিশ্বাস নেই—ওরা সব পারে!

ছুটে বাইরে যেতে গিয়েও আত্মসংবরণ করলেন নানা। ইষ্টপূজা অসমাপ্ত রেখে ওঠা উচিত হবে না!

ইংরেজের চেয়ে ভগবান কম শক্তিশালী নন।

নানা আবার চোখ বুজে ধ্যানে মন দিলেন। কিন্তু বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। একটু পরেই বালাসাহেব দরজার বাইরে থেকে খবরটা দিয়ে গেল—কণ্ঠে তার উল্লাস ও বিজয়গর্ব কোন মতেই চাপা থাকছে না, 'দাদা, শুনেছ, মরণকালে নাকি বিপরীত বুদ্ধি হয়—তাই হয়েছে ঐ শুয়োরের বাচ্চাগুলোর ! তিপ্পান্ন নম্বর রেজিমেণ্ট—না—এদের ভয় দেখানোতে, আর না লোভ

দেখানোতে—কিছুতেই টলে নি, এতক্ষণ অবধি নিমক বজায় রেখেছিল—
—তাদের ওপরই কিনা কামান চালাল ব্যাটারা!...আমি তো প্রথমটা নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারছিলুম না!'

জয় গণপতি ভগবান!

নানাসাহেব মাথা নুইয়ে একটা অতিরিক্ত প্রণাম জানালেন। তার পর কথা না বলার চেষ্টায় একটা 'হুঁ-উঁ-উঁ' শব্দ করলেন—অর্থাৎ প্রশ্ন করতে চাইলেন, 'তার পর কী হল?'

সে প্রশ্ন বালাসাহেব বুঝল।

সে বলল, 'হবে আর কী? ওরা হুড়মুড় করে পালাচ্ছে। বেশ হয়েছে —উচিত শিক্ষা হয়েছে। দেশের লোক হল না ওঁদের আপন, ওঁরা বেশী বেশী নিমকহালালি দেখাতে গিয়েছিলেন—উপযুক্ত পুরস্কারই পেয়েছেন!'

বালাসাহেব আবারও ছুটে ওপরে চলে গেল দেখতে।

অকস্মাৎ নানাসাহেবের মনে পড়ে গেল হুসেনীর কথাটা—'আর সময় নেই, আধঘণ্টার মধ্যে ওদের বার করতে না পারলে—'

তা হলে কি এই আপাত উন্মত্ত আচরণের মূলে হুসেনীই আছে? ঐ চিঠিটার এলেই কি হুইলার সাহেব এমন কাজ করে বসলেন···কী ছিল সে চিঠিতে কে জানে।

নিশ্চয়ই তাই। সে রকম আত্মপ্রত্যয় না থাকলে হুসেনী তাঁর সঙ্গে অমনভাবে কথা বলতে পারত না। বাহবা হুসেনী। বহুত বহুত বাহবা!

আজও সখেদে মনে হল, হুসেনী যদি মুসলমানী না হত মহিষী হবার উপযুক্ত মেয়ে। তামাম হিন্দুস্তানের তখ্‌তে বসবার মত।

ওধারে গর্জন বেড়েই চলেছে।

সিপাহীরা বোধ করি দল বেঁধে এদিকেই আসছে।

নানাসাহেব ব্যস্ত হয়ে পুজোর আসন থেকে উঠে পড়লেন। পট্টবস্ত্র ছেড়ে তাড়াতাড়ি নিজের অভ্যস্ত পোশাক পরে নিতে হবে। ওরা বোধ হয় প্রাসাদে এসে পড়েছে—এখনই হয়তো তাঁর দেখা চাইবে!···

আর ঘটলও তাই। তাত্যা টোপী প্রায় ছুটতে ছুটতে এসে তাঁর সেই ভেতরের ঘরেই ঢুকে পড়লেন।

'পেশোয়া, পেশোয়া, ওরা এখনই একবার আপনার দেখা চাইছে, কোন কথা শুনতে চাইছে না। ঐ শুনুন ওরা কী বলছে।'

'ওরা মানে—সিপাইরা ?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আর কারা ! কান পেতে শুনুন !'

ভাল করেই শোনবার চেষ্টা করলেন পেশোয়া। কিন্তু মেঘগর্জনের মত বহু লোকের কোলাহল—কিছুর পরিষ্কার বোঝা গেল না। শুধু নিজের নামটা বারকতক কানে গেল—

'নানাসাহেব !'

'পেশোয়া নানাসাহেব !'

'নানা ধুন্ধুপন্থ পেশোয়া !'

নানাসাহেব প্রসন্ন গম্ভীর মুখে বললেন, 'তুমি যাও, বল গে ওদের—আমি এখনই যাচ্ছি।'

কোনমতে তাড়াতাড়ি পোশাকটা পরে নিলেন নানাসাহেব। তার পর মাথায় উষ্ণীষ এঁটে, কোমরে তরবারি ঝুলিয়ে একেবারে নরপতির উপযুক্ত সাজে নেমে এলেন।...

বাইরে আসতেই যে দৃশ্য চোখে পড়ল, তাতে চোখ জুড়িয়ে গেল তাঁর। সামনের খালি জায়গাটা, তার পরও বহু দূর পর্যন্ত, এমন কি সড়কটা পার হয়ে সাহেবদের থিয়েটার-ভবন অবধি সিপাহীতে ভরে গিয়েছে—সুসজ্জিত, সুশিক্ষিত, সশস্ত্র সিপাহী। যে-কোন রাজার যে-কোন সরকারের গর্ব করবার মত। যে-কোন যুদ্ধে যে-কোন শত্রুর সম্মুখীন হতে পারে এরা। দু রেজিমেন্ট অশ্বারোহী, দু রেজিমেন্ট পদাতিক—তার সঙ্গে তার একদল গোলন্দাজ।... সেদিকে চেয়ে নানাসাহেবের ধমনীর প্রায়-শীতল রক্তও চঞ্চল হয়ে উঠল। তাঁর নিজেরও অভিজ্ঞতা নেই সত্যকথা, কিন্তু তাঁর পূর্ব-পুরুষরা কিছুদিন আগেও যুদ্ধযাত্রা করেছেন। তাঁর রক্তকণা থেকে পিতৃপিতামহের শৌর্যের সে স্মৃতি আজও সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় নি। সেই ঐতিহ্যই আজ বোধ করি তাঁর রক্তে নতুন নেশা ধরাল। এই বাহিনীর নেতৃত্ব করবার আগ্রহে তিনি উন্মুখ ও অধীর হয়ে উঠলেন।

কে এক জন—সম্ভবত বালাসাহেবই ইতিমধ্যে ঠিক প্রাসাদ-দ্বারের সামনে একটা চৌকি পেতে তার ওপর সিংহাসনের মত একখানা ভেলভেট-মোড়া কুর্সি সাজিয়ে রেখেছিল। নানা ধীর মর্যাদাব্যঞ্জক পদক্ষেপে সেই চৌকির ওপর উঠে অভ্যস্ত ও অভিজ্ঞ সেনানায়কের মতই দৃপ্ত ভঙ্গিতে দাঁড়ালেন।

ইতিমধ্যে সিপাহীদের সেই সারি থেকে নেতৃস্থানীয় কয়েক জন সামনের দিকে এগিয়ে এল। তাদের মধ্যে একেবারে পুরোভাগে যারা তাদের তিনি চেনেন—সুবাদার টীকা সিং, জমাদার দুলগুঞ্জন সিং, এবং সুবাদার গঙ্গাদীন। এদের পেছনে পেছনে যে সব সওয়ার এসে দাঁড়িয়েছিল, তাদের মধ্যে শামসুদ্দীন খাঁর চেহারাটাও যেন তাঁর নজরে পড়ল।

ওরা নানার বেদীর সামনে এসে সামরিক কায়দাতেই অভিবাদন করে দাঁড়াল।

সুবাদাব গঙ্গাদীন একটা হাত তুলে পেছনের কোলাহল বন্ধ করতে নির্দেশ দিয়ে বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে বললেন, 'মহারাজ, আমরা আপনাকে আমাদেব নেতৃত্বে করবার আমন্ত্রণ জানাতে এসেছি। এই বিজয়ী সৈন্যবাহিনী আপনারই আদেশের ও নির্দেশের অপেক্ষা করছে। মহামান্য পেশোয়া, এক বিশাল রাজ্যখণ্ড এবং শক্তিশালী সিংহাসন আপনার জন্য অপেক্ষা করছে জানবেন— যদি আপনি আমাদের আনুকুল্য করেন। আর যদি আপনি বিশ্বাসঘাতকতা কবেন বা প্রতিকূলতা কবেন তো আপনাকে অপসাবিত কবেই আমাদের জয়-যাত্রা শুরু করতে বাধ্য হব আমরা।'

বক্তব্য শেষ করে আবারও সামরিক কায়দায় সে অভিবাদন করল।

পেছন থেকে সেই অগণিত সিপাহীদের দল গঙ্গাদীনের জয়ধ্বনি করে উঠল।

গঙ্গাদীনেব শেষের কথাটায় নানাসাহেব একবাব ভ্রূ কুঞ্চিত করেছিলেন, কিন্তু সে নিমেষের জন্য, কেউই তা লক্ষ্য করে নি।

এখন তিনি মুখভাব যতটা সম্ভব প্রশান্ত রেখে হাত তুলে সকলকে স্থির থাকবার ইঙ্গিত কবে বললেন, 'তোমরা আমার দেশবাসী, আমার আত্মীয়— আমি তোমাদেরই নেতা, তোমাদেরই সেবক। ইংরেজ আমার দুশমন—তাদের সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক?'

আবাবও এক বিপুল কোলাহল উঠল। উঠল নানাসাহেবের জয়ধ্বনি।

এবার টীকা সিং কথা বলল। গম্ভীর কণ্ঠে বলল, 'শপথ করুন পেশোয়া যে এর অন্যথা হবে না।'

এই নূতন অভূতপূর্ব পরিস্থিতির নাটকীয়তা নানাসাহেবকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। তিনি অঙ্গুলিসঙ্কেতে তাদের কাছে আসতে বললেন। তার পর তারা ঘোড়া থেকে নেমে নতমস্তকে আশীর্বাদ-প্রার্থনার ভঙ্গিতে কাছে এলে,

দাঁড়ালে তিনিও সেইভাবেই সামনের দু জনের মাথায় হাত রেখে ঈষৎ ঊর্ধ্ব-দৃষ্টিতে প্রায় গদ্‌-গদ্‌ কণ্ঠে বললেন, 'আমি ব্রাহ্মণ, রাজা। তোমাদের মধ্যেও নারায়ণ আছেন—এই তোমাদেব মস্তক স্পর্শ কবে শপথ করছি. যত দিন দেহে প্রাণ থাকবে, অথবা যত দিন না শেষ ইংবেজ এদেশ থেকে বিদায় গ্রহণ করবে তত দিন অবিরাম লড়াই করব। আমি তোমাদেরই, চিব দিন তোমাদের মধ্যে তোমাদের পাশে দাঁড়িয়ে সেই লড়াই চালিয়ে যাব—যতক্ষণ ভারত এই বিধর্মী ইংরেজদের অধীনতা থেকে মুক্তি না পায়। প্রয়োজন হয় তো দেশমাতাব এই কলঙ্ক নিজেব বক্ত দিয়ে ধুয়ে দেব। আজ থেকে তোমাদের ব্রত আব আমাব ব্রত এক।'

আবারও নানাসাহেবেব জয়ধ্বনি উঠল।

একসঙ্গে সহস্রকণ্ঠেব সে জয়ধ্বনিতে এবাব নানাসাহেবেব ভাই, আত্মীয় এবং পরিজনারাও যোগ দিলেন নিঃসংকোচে।

তিন বাব পর পব গগনভেদী জয়ধ্বনি উঠল।

তাব পর আনন্দ-কোলাহল ঈষৎ শান্ত হতে টীকা সিং বলল, 'মহারাজ, আজই তা হলে যাত্রা শুরু কবতে হয়।'

'যাত্রা?' নানাসাহেব যেন স্বপ্নবাজ্য থেকে হঠাৎ বাস্তবে এসে পড়েন, 'কোথায় যাত্রা করবে?'

'দিল্লী। দিল্লীতে গিয়ে সমস্ত সৈন্য একসঙ্গে মিশবে—সেইটেই তো দবকার। শাহী তখ্‌তে আবাব মুঘল বাদশা বসেছেন, লাল কিল্লায় উড়েছে তাঁব পতাকা—সেখানে ছাড়া কোথায় যাব বলুন। আবাব শাহেনশাহের বিপুল ফৌজে হিন্দুস্তানের মাটি কাঁপবে—তাব সামনে দাঁড়াতেও ভয় পাবে দুশমন। দিল্লীই এখন আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত।'

সহস্র কণ্ঠে টীকা সিং-এর প্রস্তাব সমর্থিত হল।

'দিল্লী চল। চল দিল্লী!'

'বেশ, তাই চল। আমি তোমাদেব খিদ্‌মতে সদাই প্রস্তুত জানবে। কখন যাবে বল?' নানা উদারভাবে বলেন।

আবার জয়ধ্বনি ওঠে নানাসাহেবের।

টীকা সিং আব এক দফা অভিবাদন করে বলে, 'যদি আপনাব অনুমতি হয় তো আমরা এবেলার খাওয়াটা সেরে নিয়েই রওনা দিতে পাবি।' আর তা হলে সন্ধ্যার আগেই কল্যাণপুর পৌঁছতে পারব। ওখানে রাতটা মত

বিশ্রাম করার যথেষ্ট ফাঁকা জায়গা মিলবে। তা ছাড়া ওখানে পৌঁছলে আমরা আর সব ঘাঁটির খবরও কিছু কিছু পাব।'

নানাসাহেব বললেন, 'বেশ, তাই যাও তোমরা। তোমরা রওনা হয়েছ খবর পাবার চারদণ্ডের মধ্যেই আমি রওনা হব। সন্ধ্যার আগেই আমি কল্যাণপুর পৌঁছতে পারব।'

আবারও জয়ধ্বনি দেয় সকলে। এই তো সেনাপতির মত, রাজার মত কথা।

গঙ্গাদীন দু হাত জোড় করে বলল, 'তা হলে পেশোয়াজী, আমাদের অনুমতি দিন আর আশীর্বাদ করুন—'

নানাসাহেব বরাভয় দানের ভঙ্গিতে ডান হাত তুলে বললেন, 'গণপতি ভগবান তোমাদের কল্যাণ করুন।'

॥ ৩৪ ॥

আমিনা হুইলার সাহেবের আর্দালীর হাতে চিঠিটা পৌঁছে দিয়ে তখনই ফিরে আসতে পারে নি। চিঠিখানার ফলাফল শেষ অবধি কী হয়—তা নিজের চোখে না দেখেই ফেরে কেমন করে? সে খানিকটা দূরে গিয়ে খুঁজে খুঁজে উঁচু-মত একটা জায়গা বেছে নিল এবং সেইখানেই একটা বড় নিমগাছে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল। কাজটা খুব ভাল হচ্ছে না, তা সে-ও বুঝল; চারদিকে উন্মত্ত এবং উচ্ছৃঙ্খল জনতা—একে তো ফৌজী সিপাহীদের ভিড় চারদিকে, তা ছাড়াও, এই সব অরাজকতার সময় যত রাজ্যের বদমাইশ-গুণ্ডা লোকও ভিড়ের সঙ্গে মিশে যায়—একাকী যুবতী স্ত্রীলোকের পথে দাঁড়িয়ে থাকা আদৌ নিরাপদ নয়। সঙ্গে পিস্তল আছে সত্য কথা, কিন্তু এখানে বেশির ভাগ লোকের হাতেই বন্দুক—এইটুকু পিস্তল এখানে আত্মরক্ষার কোন কাজেই আসবে না, বড়জোর বেগতিক দেখলে বে-ইজ্জত হবার আগে আত্মহত্যা করা চলতে পারে।

এ সবই জানে আমিনা—তবু নড়তে পারল না।

ঐ একটা রেজিমেণ্টও ইংরেজের দিকে থাকতে সে নিশ্চিন্ত হতে পারবে না। সে চারিদিকের কৌতূহলী জনতার বক্র চাউনি এবং বক্রোক্তিতে ভ্রূক্ষেপ

না করে বোরখার অক্ষিগোলকের মধ্যে দিয়ে উৎকণ্ঠিত নির্নিমেষ নেত্রে দূর ব্যারাকের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

অবশ্য তার ধৈর্য পুরস্কৃত হতেও বেশি সময় লাগল না। একটু পরেই কামান ঘুরল, তিপ্পান্ন নম্বরের লাইনে গোলা বর্ষিত হল। হতভম্ব বিমূঢ় সিপাহীর দল সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত অবস্থায় কোনমতে প্রাণ নিয়ে বেরিয়ে এল—এ সবই নিজের চোখে দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে প্রাসাদের দিকে ফিরল আমিনা।

কিন্তু এবার আর পা চলে না। গত দিনরাত্রির উদ্বেগ, অনাহার ও অনিদ্রা অশ্বপৃষ্ঠে সারারাত কাটাবার ক্লান্তি—সব মিলে যেন এবার পা দুটোকে ভারী ও দুর্বল করে দিল। শ্রান্তিতে তার সমস্ত স্নায়ু অবশ। কোনমতে শুধুমাত্র প্রবল ইচ্ছাশক্তিতেই সে তার প্রায়-অপটু পা দুটোকে টেনে টেনে এক সময় প্রাসাদে পৌঁছল এবং কতকটা মাতালের মতই টলতে টলতে নিজের ঘরে পৌঁছে মূৰ্ছিত হয়ে পড়ল।

মূর্ছা কি নিদ্রা—মুসম্মৎ তা বুঝল না।

তবে অপরিসীম মানসিক এবং দৈহিক ক্লান্তির কারণ আছে, এটা সে জানে বলে টানাটানি করে মূর্ছা ভাঙাবার চেষ্টা করল না। কোনমতে বোরখাটা খুলে নিয়ে ভিজে গামছায় আমিনার চোখ মুখ মুছিয়ে দিয়ে বসে বসে বাতাস করতে লাগল।

আমিনার সংজ্ঞা যখন ফিরল, তখন তৃতীয় প্রহরও উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। শরবত প্রস্তুতই ছিল, চোখ মেলে উঠে বসতেই মুসম্মৎ পাত্রটা মুখের কাছে ধরল। সত্যিই তৃষ্ণায় তার ছাতি ফেটে যাচ্ছিল, সে সকৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে মুসম্মতের দিকে চেয়ে পাত্রটা হাত বাড়িয়ে নিল এবং এক নিশ্বাসে সবটা নিঃশেষ করল। তার পর 'আঃ' বলে একটা দীর্ঘ আরামসূচক শব্দ করে আবারও এলিয়ে পড়ল।

কিন্তু সে মুহূর্তমাত্র।

তার পরই উঠে বসে প্রশ্ন করল, 'পেশোয়া—পেশোয়া কোথায়?'

'ওমা, পেশোয়া যে বিঠুরে গিয়েছেন! ওখান থেকেই রওনা হয়ে যাবেন।'

'রওনা হবেন? সে আবার কোথায়?'

'কেন, উনি দিল্লী যাচ্ছেন যে!'

'দিল্লী ? সে কি ! দিল্লী কেন ?'

মুসম্মৎ তার অজ্ঞতায় একটা সস্নেহ কৌতুক অনুভব করে হেসে বলল, 'কত কাণ্ড হয়ে গেল এখানে, তার কিছু খবর রাখেন ?'

সে আনুপূর্বিক সকলের সব ঘটনা বিবৃত করল। তার পর বলল, 'সিপাইরা চলে যাবার পর আর একটুও তো সময় পান নি—কাগজপত্র নিয়ে পড়েছিলেন। কতক ছিঁড়ে ফেলে দিলেন, কতক বাক্সে বোঝাই করে তুলে রাখলেন—কতক বা সঙ্গে নিলেন। তার পর কোনমতে দুটি ভাত মুখে দিয়েই বিঠুরে চলে গেলেন—ঐখান থেকেই হাতীতে চেপে কল্যাণপুরে রওনা হবেন।'

আমিনার ঘুম ছুটে গেছে, তার দু চোখে আগুন—'মূর্খ, নির্বোধ। আমাকে একবার বলে যাওয়ার কথাও মনে হল না তাঁর !'

মুসম্মৎ তাড়াতাড়ি বলল, 'না না, ও-কথা বলবেন না। দু বার লোক পাঠিয়েছিলেন,—এক বার নিজেও এসেছিলেন—তা আপনার তো কোন সাড়া-শব্দই ছিল না।'

তিরস্কারের দৃষ্টিতে মুসম্মতের দিকে তাকিয়ে আমিনা বলল, 'বেশ হয়েছিল। তা তুমি আমাকে ডেকে দিতে পার নি ?'

'বাঃ! শুধু আমি কেন, খোদ পেশোয়াজীই তো কত টানাটানি করলেন, কাঁধ ধরে কত ঝাঁকানি দিলেন। আপনি যে একেবারে অজ্ঞানের মত ঘুমোচ্ছিলেন মালেকান।'

'ইস।' নীচের ঠোঁটটা চেপে মুহূর্ত-কয়েক স্থির হয়ে বসে রইল সে, তার পর বলল, 'আজিমুল্লা—আজিমুল্লা কোথায় ?'

'সে-ও এইখানেই তার ঘরে পড়ে ঘুমোচ্ছে।·· পেশোয়া নাকি তাকেও ডাকতে গিয়েছিলেন, সে সাফ্ বলে দিয়েছে, পেশোয়া যেন ওখান থেকে একাই রওনা হয়ে যান, আজিমুল্লা সন্ধ্যায় বেরিয়ে পথের মধ্যেই ওঁদের ধরে ফেলবে।'

আমিনা উঠে দাঁড়িয়ে চটিটা পায়ে গলাল।

'ও কি, স্নান করবেন না—খাবেন না ? চললেন কোথায় ?'

'তুই জল তৈরী রাখ—আমি আসছি।'

সে একরকম ছুটেই বের হয়ে গেল।

ক্রোধে ও বিরক্তিতে আমিনা প্রায় দিগ্বিদিক্-জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল।

এই নির্জন রৌদ্রদগ্ধ অপরাহ্ণে একা নিঃসঙ্গ আজিমুল্লার শয়নগৃহে যাওয়া যে তার কোনমতেই শোভন নয়, এবং এমন একটা কাণ্ড করবার কোন প্রয়োজনও ছিল না—আজিমুল্লাকে লোক দিয়ে ডেকে পাঠালেই চলত—এসব কথা তাই তার একবারও মনে পড়ল না। এমন কি, বিগত রাত্রির ধুলো যে এখনও তার মুখে মাথায় জমে আছে, কেশ ও বেশ দুই-ই অসংবৃত—এসব কথাও তার মনে হল না। সে কোন দিকে না তাকিয়ে, কোন ভৃত্য মারফত এত্তেলা দেবারও অপেক্ষা না করে সোজা গিয়ে ঢুকল আজিমুল্লার ঘরে।

আজিমুল্লা তখনও অঘোরে ঘুমোচ্ছিলেন।

আমিনা তাঁর কাঁধটা ধরে বেশ জোরে-জোরেই ঝাঁকানি দিতে লাগল।

'খাঁ সাহেব, ও খাঁ সাহেব! শুনছেন? খাঁ সাহেব!'

'অ্যাঁ!' রক্তপূর্ণ বিহ্বল চোখ মেলে আজিমুল্লা তাকালেন, 'কে—কী?'

তার পরই আমিনাকে ভাল করে নজরে পড়ল।

ধুলিধূসর দেহ আমিনার—কিন্তু তার যে কান্তি তা ধুলোয় ম্লান হয় না। বরং অসংবৃত বিস্রস্ত বেশবাস, নিদ্রারক্ত দুটি চোখের কোলে রাত্রি-জাগরণের ঈষৎ কালিমা, অবিন্যস্ত বিপুল কৃষ্ণকেশদাম, ললাটে বিন্দু বিন্দু স্বেদরেখা—সবটা মিলিয়ে সেই মুহূর্তে এই রমণী তাঁর তখনও তন্দ্রাবিহ্বল দৃষ্টিতে পরম রমণীয় এবং একান্ত লোভনীয় বলেই বোধ হল। তাঁর চৈতন্য তখনও অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনার মত যথেষ্ট উদ্বুদ্ধ বা সচেতন হয় নি—ব্যাপারটা কি ভাল করে বোঝাবারও পূর্বে হয়তো—আজিমুল্লার বুকের রক্ত দ্রুততর হয়ে উঠল, বহুদিনের নিরুদ্ধ বাসনা তার উদগ্র ক্ষুধায় দেহের প্রতি লোমকূপে আগুন ধরিয়ে দিল—তিনি অকস্মাৎ আমিনাকে আকর্ষণ করে বুকের ওপর এনে ফেললেন।

এক লহমা মাত্র—

বিস্মিত আমিনার ঘটনাটা বুঝতে যেটুকু দেরি—তার পরই সে এক প্রবল ঝটকায় নিজেকে ওঁর আলিঙ্গন থেকে মুক্ত করে নিয়ে আজিমুল্লাকে সজোরে এক চপেটাঘাত করল।

এবার আজিমুল্লার ঘুম ভাল করেই ভাঙল।

তিনি কয়েক-মুহূর্ত পাথরের মত পড়ে থেকে বোধ করি শিথিল চৈতন্যকে সংহত হবার সময়টুকু মাত্র দিয়েই—এক লাফে উঠে বসলেন! কিন্তু কিছুতেই আমিনার দিকে ভাল করে তাকাতে পারলেন না। অপমানে তাঁর কান-মাথা

ঝাঁ ঝাঁ করছে—আত্মগ্লানিতে সমস্ত দেহে একটা জ্বালা অনুভূত হচ্ছে। কিন্তু এ অপমান নিজের কাছেই—এ আঘাত নিজেই করেছেন নিজেকে। একটা প্রবল আত্মধিক্কারে তাঁর আকণ্ঠ পূর্ণ হয়ে উঠল।

আমিনাও ততক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়েছে। সে নিজের বস্ত্রাদি যথাসম্ভব সামলে নিতে নিতে কণ্ঠে তীব্র ব্যঙ্গ ঢেলে দিয়ে বলল, 'দুটো একসঙ্গে হয় না আজিমুল্লা খাঁ সাহেব। সৌভাগ্যলক্ষ্মী কখনও সতীন সহ্য করেন না। তাঁর সাধনা একাগ্র হয়ে করবার সাধনা।···আমাদের দু জনেরই লক্ষ্য এক—তাই পাশাপাশি এসে দাঁড়িয়েছি। পরস্পরের দিকে তাকালে সামনের দিকে তাকানো যায় না খাঁ সাহেব—অগ্রগতি হয় ব্যাহত, মনে রাখবেন।'

আজিমুল্লা দূরের দেওয়ালটার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমার অপরাধ হয়ে গেছে বেগমসাহেবা, মাফ করবেন।···কিন্তু কী জন্য আমাকে দরকার হয়েছিল, তা এখনও বলেন নি।'

'শুনুন, এধারে কী কাণ্ড হয়েছে শুনেছেন?'

'কৈ না তো, কী কাণ্ড?'

'নানাসাহেব সিপাইদের সঙ্গে দিল্লী রওনা হয়েছেন।'

'হাঁ, তা শুনেছি বৈকি।···আমারও তো যাবার কথা। আমি সন্ধ্যার পর রওনা হব।'

'হায়, হায়।' অসহিষ্ণুকণ্ঠে আমিনা বিলাপ করে ওঠে, 'এইজন্যে কি এত কাণ্ড করলুম আমরা? তা হলে এত দিন ধরে এত কাঠখড় পোড়াবার কি দরকার ছিল?'

এবার আজিমুল্লা বিস্মিত হয়ে আমিনার মুখের দিকে চাইলেন। আম্‌তা আম্‌তা করে বললেন, 'কিন্তু—মানে, এইটেই কি স্বাভাবিক ও সঙ্গত নয়?'

'অজিমুল্লা খাঁ সাহেব, আপনাকে বুদ্ধিমান বলে জানতুম!···কী করতে নানাসাহেব দিল্লী যাচ্ছেন বলতে পারেন? সেখানে বাহাদুর শাহ্‌ বসে আছেন—তিনিই দিল্লীর শাহেনশাহ্‌। আরও বহু দেশ থেকে বহু সেনাপতি বহু রাজা গিয়ে মিলবেন—তাঁরা সকলেই মুঘল বাদশার কর্মচারী বলে গণ্য হবেন। নানাসাহেব গেলে তিনিও তাঁদের একজন বলে পরিচিত হবেন—তার বেশী কিছু নয়। যদি সত্যিই ইংরেজ-শক্তির অবসান হয় তো তখন মুঘল বাদশাহ্‌

নামেই সারা দেশের শাসন চলবে—বড়জোর নানাসাহেব একটা মনসবদারি পাবেন, কি একটা জায়গীর! চিরকালের শত্রু মারাঠীকে স্বেচ্ছায় শক্তিতে প্রতিষ্ঠিত করবেন না বাদশা। আর তা হলে তখন আবার নতুন করে আমাদের পথ করতে হবে।'

বোধ করি দম নেবার জন্যই একটু থামল আমিনা। তার পর পুনশ্চ বলতে লাগল, 'শুধু তাই নয়, পেছনে হুইলার আর এই সব গোরা অফিসারদের রেখে যাওয়ার অর্থ কী জানেন? এদের অক্ষত রেখে যাওয়া মানেই শীগগিরই ওরা আবার কানপুরের মালিক হয়ে বসবে। শত্রুর শেষ রাখতে নেই, তা কি জানেন না আপনারা? ওদিকে নীল এগোচ্ছে—হয়তো দু-চার দিনের মধ্যেই তারা কানপুরে এসে পড়বে, দু দল মিলিত হলে কি প্রচণ্ড শক্তিশালী দল গঠিত হবে—বুঝতে পারছেন? এদের অস্ত্রবল, লোকবল তো অটুট থাকছেই।...তখন লক্ষ্ণৌ দখল করতে ওদের কতটুকু সময় লাগবে? মাঝখান থেকে মহারাষ্ট্রের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ একেবারে ছিন্ন হয়ে যাবে!'

আজিমুল্লা লজ্জা অপমান সব ভুলে প্রশংসামুগ্ধ চোখ তুলে তাকিয়ে রইলেন হুসেনীর দিকে। সে বলে চলল, 'অথচ এখানে থেকে এই গ্যারিসন ধ্বংস করতে পারলে এ এলাকায় নানাসাহেবই হবেন সর্বেশ্বর! নানাসাহেবের পতাকা আবার উড়ছে শুনলে বহু মারাঠী ছুটে আসবে। ঝাঁসীর রাণীর সাহায্যও হয়তো এখনই পেতে পারব। এদের শেষ করে এখানে আরও বহু সিপাই এনে শক্তি প্রতিষ্ঠিত করলে, বাদশার সঙ্গে উনি মিলিত হতে পারবেন সমানে সমানে। বাদশা কেন সকলেই সমীহ করবে তখন—ভয়ও করবে। অবশ্য ওদের উপকারও হবে। কলকাতা থেকে যে দল আসবে আমরা তাদের আটকাতে পারব।...ওরা নিশ্চিন্ত হয়ে লক্ষ্ণৌ এবং পঞ্জাবের গোরাদের শেষ করতে পারবে। আর—,' বিচিত্র তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আজিমুল্লার চোখের দিকে চেয়ে বলে চলল আমিনা, 'আর নানাসাহেব স্বাধীন সার্বভৌম শক্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত হলেই আমাদের সুবিধে—মানে আপনার এবং আমার—তাই নয় কি আজিমুল্লা খাঁ সাহেব?'

আজিমুল্লা শেষের এই প্রশ্নটাতে শিউরে কেঁপে উঠলেন। হুসেনী কিন্তু তা লক্ষ্যও করল না। সে আরও তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাঁর চোখের দিকে চেয়ে বলল, 'আপনি উঠুন, এখনই নানাসাহেবের কাছে যান। তিনি অসংখ্য পুরুষ বেষ্টিত হয়ে আছেন এখন—আমার পক্ষে সেখানে যাওয়া সম্ভব নয়,

নইলে আমিই যেতুম।…তাঁকে বুঝিয়ে বলুন, মহারাষ্ট্রের পেশোয়া-বংশের সন্তানরা কখনও মুঘল বাদশার দাসত্ব করে নি—কুর্নিশ করে নি। তারা সম্রাটের রক্ষক হিসেবেই দিল্লীতে গিয়েছিল—কর্মচারী হিসেবে নয়। তিনি যেন আজ পিতৃ-পিতামহের মুখে কালি না দেন। গিয়ে বুঝিয়ে বলুন, এখানকার গ্যারিসনে এখনও দু শ সমর্থ পুরুষ-শত্রু পেছনে রেখে যাওয়ার পরিণাম কী হতে পারে এবং সেই শক্তি অক্ষত অটুট অবস্থায় নীলসাহেবের বাহিনীর সঙ্গে মিলিত হলে কি ভয়ংকর শত্রু আমাদের পেছনে থাকবে সেটা ভাল করে ভেবে দেখতে। তাঁকে এই পাঁচ রেজিমেণ্ট সিপাই নিয়ে ফিরে এসে কালই ওদের ঐ মাটির কেল্লায় চড়াও হতে বলুন—নইলে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করার কল্পনা ত্যাগ করতে হবে তাঁকে, এইটে বুঝিয়ে দিন।'

আজিমুল্লা দ্বিরুক্তি না করে উঠে দাঁড়ালেন। তার পর আভূমিনত হয়ে অভিবাদন করে ঈষৎ আবেগ-কম্পিত কণ্ঠে বললেন, 'সত্যিই খোদা আপনাকে একটা সাম্রাজ্য-শাসনের যোগ্যতা দিয়ে পাঠিয়েছেন। আমরা আপনার বান্দা হবারও উপযুক্ত নই বেগমসাহেবা!'

আমিনা মহিমময়ী সম্রাজ্ঞীর মতই গ্রীবা হেলিয়ে এই সরব ও নীরব অভিবাদন গ্রহণ করে বলল, 'আমার অনেক অপরাধ হয়ে গেল খাঁ সাহেব, মাফ করবেন।'

'অপরাধ আমারই।' আচকানের ওপর কোমরবন্ধ আঁটতে আঁটতে আজিমুল্লা খাঁ জবাব দিলেন।

॥ ৩৫ ॥

নানাসাহেব আজিমুল্লাকে দেখে শুধু যে উৎসাহিত হয়ে উঠলেন তাই নয়, বেশ একটু আশ্বস্তও বোধ করলেন। আসলে আজ সারাটা দিন তাঁর যে উত্তেজনা ও উদ্দীপনার মধ্যে দিয়ে কেটেছে, সেটা একটা নেশার ঘোর ছাড়া আর কিছু না। সমস্ত নেশারই প্রতিক্রিয়া আছে। সকাল থেকে যে মাদকতা তাঁকে ছুটিয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে, কল্যাণপুর পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে বুঝি তারও প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছে। আজিমুল্লা যখন তাঁর তাঁবুতে প্রবেশ করলেন, তখন তাঁর ললাট আবারও রীতিমত মেঘাচ্ছন্ন হয়ে উঠেছে।

আজিমুল্লার বক্তব্য কিন্তু সে মেঘ কাটতে কোন সহায়তা করল না। বরং তাঁকে দেখে নানাসাহেবের যেটুকু উৎসাহ বোধ হয়েছিল, সেটুকুও নিভে গেল। এখনই ইংরেজদের সঙ্গে পুরোপুরি সংগ্রাম শুরু করতে মন একেবারেই সায় দেয় না। তিনি খানিকটা চুপ করে থেকে কেমন একরকম শুষ্ক কণ্ঠে বললেন, 'কিন্তু এরা কি শুনবে? এরা এখনও আমাকে পুরো বিশ্বাস করতে পারে নি। তার ওপর এখনই যদি কথা পালটে ফেলি তো ভাববে আমার মতলব ভাল নয়!'

আজিমুল্লা ঘাড় নেড়ে দৃঢ়কণ্ঠে বললেন, 'ওদের শোনাতেই হবে পেশোয়া। শোনাতে জানলে সব কথাই শোনানো যায়। আর সব যুক্তি যদি হার মানে অকাট্য যুক্তি তো রইলই।'

'অর্থাৎ?'

'অর্থাৎ লোভের যুক্তি। মুরুব্বীদের ঘুষ খাওয়াতে হবে। সে ভার আমার। ওদের ডেকে তো পাঠান।'

নানাসাহেব তবুও কিছুক্ষণ উৎকণ্ঠিত মুখে চুপ করে বসে রইলেন। তার পর বললেন, 'কিন্তু কাজটা কতদূর যুক্তিযুক্ত হবে, এখনও ভেবে দেখ।... এক জায়গায় শক্তি সংহত করাই কি উচিত হত না?'

'না মহারাজ। একতা শক্তি ঠিকই, কিন্তু অনেক সময় বাহ্য-একতাই সব নয়। আপনি কানপুরে থাকলে আসলে দিল্লী ফৌজেরই উপকার হবে সবচেয়ে বেশী!'

'দেখ, যা ভাল বোঝ কর।' নানা ছোট একটা দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে হাল ছেড়ে দেন।

'ওদের তা হলে এখনই ডেকে পাঠাই? এখনও রাত হয় নি—দরকার হলে আমরা শেষ রাত্রেই ফিরতে পারব।'

আজিমুল্লা অনুমতি-প্রার্থনার ভঙ্গিতে কথাটা বললেও উত্তরের জন্য অপেক্ষা করলেন না। তখনই সেই মত ব্যবস্থা করতে নিজেই বাইরে এলেন এবং তাঁবুর বাইরে প্রথম যে দু জনের সঙ্গে দেখা হল—গণপৎ ও তেওয়ারী—দু জনকেই নানাসাহেবের নামে হুকুমজারি করে দু দিকে পাঠিয়ে দিলেন—মুরুব্বীদের ডেকে পাঠাতে।

একটু পরেই উদ্বিগ্ন ও ক্লান্ত সেনানায়কের দল নানাসাহেবের তাঁবুতে এসে পৌঁছল। আমাদের পূর্ব-পরিচিত টীকা সিং, দুলগঞ্জন সিং, জলাদীন—এরা

এবং আরও জন-এগারো লোক তাঁবুতে ঢুকে পেশোয়া ধুন্ধুপন্থকে অভিবাদন করে দাঁড়াল। নানাসাহেবকে তাদের সত্যিই বিশ্বাস নেই, সেজন্য এমন হঠাৎ তিনি জরুরী আহ্বান পাঠাতে সকলেই একটু উৎকণ্ঠা বোধ করবে এই-ই স্বাভাবিক।

নানাসাহেব কিন্তু ততক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়েছেন। যা করতেই হবে—তা আত্মসম্মান বজায় রেখে করাই ভাল। তা ছাড়া আজিমুল্লা যা বলেছে তাতে যুক্তি আছে—এটা কোনক্রমেই অস্বীকার করা যায় না। এখন কানপুরে পৌঁছে ক্ষমতা হস্তগত করার অর্থ এখনই পেশোযারূপে সিংহাসনে বসা—অর্থাৎ অনেক দিনের স্বপ্ন অবিলম্বে সার্থক ও সফল হওয়া। সুদূর ভবিষ্যৎ আগামী কাল নয়, অনিশ্চিতেব জন্য অপেক্ষা করার প্রয়োজন নেই।

তিনি প্রশান্তমুখে বললেন, 'ব'স তোমবা। একটা যুক্তি করবার জন্যই তোমাদের ডেকেছি। আমি তোমাদের ওপর হুকুম চালাতে চাই না কোন-দিনই—মিলেমিশে পরামর্শ করে কাজ করব—এই আমাব ইচ্ছা।'

তিনি কথাগুলোর কী প্রভাব সৃষ্টি হয় তা দেখবার জন্যই বোধ করি একটু থামলেন।

বলা-বাহুল্য, শ্রোতাবা এ ভূমিকাতে কেউই বিশেষ আশ্বস্ত হল না। তবু গঙ্গাদীন সবিনয়েই বলল, 'বলুন পেশোয়া।'

'আমরা অনেক বিবেচনা কবে দেখলাম—আমাদের এখন দিল্লী যাওয়াটা বেশ একটু নির্বুদ্ধিতার কাজ হচ্ছে। আমার মনে হয়, আমাদের অবিলম্বে কানপুরে ফিরে যাওয়াই উচিত।'

'তার মানে?' টীকা সিং যেন একটু উদ্ধত সংশয়ের সঙ্গেই প্রশ্নটা করে।

নানাসাহেব আরও কী বলতে যাচ্ছিলেন, আজিমুল্লা সে সুযোগ দিলেন না, বললেন, 'মহামান্য পেশোয়া যা বলেছেন, তার মধ্যে যুক্তি আছে। কানপুর গ্যারিসনে দু শ সশস্ত্র ইংরেজকে রেখে আসার অর্থ—ইংরেজ-শক্তিকে কানপুরে শুধু অক্ষুণ্ণ বেখে আসা নয়—সুপ্রতিষ্ঠিত রেখে আসা। তাদের সঙ্গে ওধাবের ইংরেজ-বাহিনীর মিলন হলে কী সাংঘাতিক ব্যাপার হবে তা আপনারা ভেবে দেখেছেন? কী প্রচণ্ড শত্রু আমাদের পিছনে রেখে আমরা এগোচ্ছি। তা ছাড়া দিল্লীতে কেন যাচ্ছি আমরা? সেখানে মীরাটের যে সিপাইরা কিল্লা দখল করে বসে আছে—তাদের তাঁবেদারি করতে

কি ?…তারা এখন কি আপনাদের সমান মনে করবে ভেবেছেন ? মোটেই না। তারা রীতিমত আপনাদের ওপর মুরুব্বীয়ানা চালাবে। তা ছাড়া, মহামান্য পেশোয়া ভারতের সর্বাবাদী-সম্মত রাজচক্রবর্তী হিন্দুরাজা। তিনি সিংহাসনে বসলে, যাদের সহায়তায় বসেছেন, তাদের কখনই ভুলবেন না। অর্থাৎ আপনারাও আপনাদের সেবা ও বিশ্বস্ততার পুরস্কার হাতে হাতে পাবেন। পেশোয়া দিল্লীতে গিয়ে বাহাদুর শার হাকিমের* তাঁবেদারি করবেন—এটা সঙ্গত নয়। পেশোয়া মহানুভব, তাঁর পক্ষে হয়তো তাও সম্ভব, কিন্তু আমরা—যারা তাঁর বিশ্বস্ত সেবক—তা হতে দেব না কোনমতেই। তা ছাড়া আগেই বলেছি, কানপুর গ্যারিসন ধ্বংস করতে না পারলে আমরা পুর্বী-ইংরেজদের ঠেকাতে পারব না কিছুতেই। সেদিক দিয়েও আমাদের একটা কর্তব্য আছে।'

আজিমুল্লা শুধ দৃঢতাব সঙ্গেই নয়—বেশ একটু ঔদ্ধত্যের সঙ্গেই যেন বললেন কথাগুলো। অর্থাৎ তিনি যেন তাঁর বলবার ভঙ্গিটুকুব মধ্যেই জানিযে দিতে চান যে কেবলমাত্র দলে ভারী বলেই সিপাইদের কথা তাঁরা নির্বিচারে মেনে নেবেন—সে পাত্র তাঁরা নন। বক্তব্য শেষ করে তিনি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে উপস্থিত সেনানায়কদের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন।

শ্রোতারা অনেকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। কেউই কারও দিকে চায় না, সকলেই যেন সকলের দৃষ্টি এড়াতে চায়—এমন একটা অবস্থা। অবশেষে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করল গঙ্গাদীনই। বলল, 'খাঁ সাহেব যা বললেন তাব মধ্যে যুক্তি আছে হয়তো, কিন্তু ব্যাপার কি জানেন, এতখানি প্রবল উৎসাহ আর উদ্দীপনা নিযে সিপাইরা যাচ্ছিল দিল্লীর দিকে, তারা বডই আশাভঙ্গ বোধ করবে। তারা রাজী হবে কি ?… এখানে তাদের ব্যক্তিগত লাভের আশা বড়ই কম।'

আজিমুল্লা তাঁর স্থির দৃষ্টি গঙ্গাদীনের মুখের ওপর নিবদ্ধ করে বললেন, 'ব্যক্তিগত লাভের আশা বলতে কী বোঝাচ্ছেন ? লুট ?…সে কি মীরাটের সিপাইরা কিছু বাকি রেখেছে ? তা ছাড়া আমরা যাচ্ছি লড়াই করতে, লুটেরা ডাকাতের মত সামান্য কিছু টাকাই একমাত্র লক্ষ্য নয় আমাদের।

*বাহাদুর শার নিজস্ব চিকিৎসক হাকিম আহ্সানুল্লা খাঁ। বাহাদুর শা নাকি রাজনৈতিক ব্যাপারেও এঁর পরামর্শের উপরই নির্ভর করতেন।

এখন থেকে সিপাইদের লুটের লোভ দেখালে তাদের সামলাতে পারবেন গঙ্গাদীন সাহেব ?'

গঙ্গাদীন মাথা ঘামিয়ে বলল, 'বেশ, আপনাদের হুকুম আমরা এখনই সিপাইদের জানাচ্ছি। তাদের জবাবও আপনাদের জানিয়ে যাব।'

আজিমুল্লা তীক্ষ্ণকণ্ঠে বললেন, 'জবাব ! তাদের জবাব আবার কী ? আপনারা সিপাইদের সেনাপতি—আপনাদের হুকুম তারা শুনবে না ?'

গঙ্গাদীন অপ্রতিভ হয়ে কী একটা উত্তর দিতে গিয়েও যেন থেমে গেল। আরও অপ্রতিভভাবে মাথা চুলকোচ্ছে, এমন সময় আর এক কাণ্ড ঘটল। মংগরকর বোধ হয় বাইরেই কাছাকাছি কোথাও ছিল, সহসা সে নিঃশব্দ দ্রুতগতিতে তাঁবুর মধ্যে ঢুকে আজিমুল্লার হাতে কী একটা চিরকুট কাগজ দিয়েই আবার তেমনি নিঃশব্দে বার হয়ে গেল। ঘটনাটা ঘটল যেন এক লহমারও কম সময়ে।

তাঁবুর মাঝের বড় খুঁটিটাতে বাঁধা একটা বড় তেলের ডিব্বা ঝুলছিল। সেই আলোতে কাগজের টুকরাটা একবার মাত্র মেলে ধরেই আবার সেটা হাতের মুঠোর মধ্যে দলা পাকিয়ে নিলেন আজিমুল্লা। তার পর পুনশ্চ গঙ্গাদীনের মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, কৈ উত্তর দিলেন না কিছু ?'

তবুও গঙ্গাদীন যেন ঠিকমত জবাব দিতে পারে না।

আজিমুল্লা তাকে বেশীক্ষণ অবসরও দিলেন না। বললেন, 'থাক,জবাব দিতে হবে না, দেবারও কিছু নেই। আমি এই মুহূর্তে স্বাধীন পেশোয়া নানা ধুন্ধুপন্থের হয়ে একটা ঘোষণা করছি। আজ থেকেই তিনি স্বাধীনভাবে তাঁর রাজ্যভার নিজের হাতে গ্রহণ করলেন। সেই উপলক্ষ্যে এবং সেই সঙ্গেই আপনাদের কিছু কিছু পদোন্নতি হবে। জমাদার দুলগঞ্জন সিং, আজ থেকে আপনি ৫৩ নম্বর রেজিমেণ্টের কর্নেল হলেন। সুবাদার টীকা সিং, আপনি আজ থেকে জেনারেল—সমস্ত ঘোড়সওয়ারদের ভার আপনার হাতে। আর সুবাদার গঙ্গাদীন, আপনি হলেন ৫৬ নম্বরের কর্নেল। যান, এবার আপনাদের হুকুম সিপাইদের জানান। হুকুম শোনানো এখন আপনাদের দায়িত্ব।···তবে হ্যাঁ, আরও একটা কথা সিপাইদের বলতে পারেন। তাদের বলবেন, যেদিন পেশোয়া শাস্ত্রোক্ত অনুষ্ঠানের সঙ্গে যথারীতি সিংহাসনে আরোহণ করবেন, সেদিন তারাও কিছু কিছু উপহার পাবে। তাদের প্রত্যেককে দেওয়া হবে একটি করে সোনার বালা।'

উপস্থিত সকলেরই মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সন্ত উন্নীত জেনারেল ও কর্নেল তিন জন আভূমি-নত হয়ে পেশোয়াকে অভিবাদন জানাল। পেছনে যারা ছিল, তারা ঈষৎ ক্ষীণকণ্ঠে পেশোয়ার জয়ধ্বনি করল। তাদের আশা অবশ্য একেবারে যায় নি—তবে নগদ পাওনাটা মিলল না!

পেশোয়ার মুখও যেন বেশ একটু বিবর্ণ হয়ে উঠেছে। কিন্তু তবু তিনি সহজ প্রসন্ন ভাবেই অভিবাদন গ্রহণ করলেন—হাত তুলে আশীর্বাদ জানালেন।

অভিবাদনান্তে জেনারেল টীকা সিং প্রশ্ন করল, 'তা হলে এই হুকুমই সিপাইদের জানাই গে পেশোয়া?'

'হ্যাঁ, শুনলেই তো।' নানাসাহেব ঢোঁক গিলে বললেন।

'প্রত্যেক সিপাইকে একটা করে সোনার বালা দিতে হলে—অনেক টাকা লাগবে খাঁ সাহেব।' গঙ্গাদীনের কণ্ঠে সংশয়ের সুর।

'কোন ভয় নেই কর্নেল সাহেব। পেশোয়া যা বলেছেন—ভেবেই বলেছেন। তাঁর ইজ্জতের কথা তিনি ভাববেন। আপনি নিশ্চিন্তমনে তাঁর এই প্রসাদের কথা সিপাইদের জানাতে পারেন।'

আবারও এক দফা অভিবাদন জানিয়ে পেশোয়ার জয়ধ্বনি করতে করতে সকলে বার হয়ে গেল। শেষ লোকটির পদধ্বনি ভাল করে মিলিয়ে যাবার আগেই কপালের ঘাম মুছে নানাসাহেব উৎকণ্ঠিত কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, 'এ কি করলে আজিমুল্লা?'

'না করে উপায় ছিল না পেশোয়া। আর অপেক্ষা করার সময় নেই। তা ছাড়া, সিপাইদের মতামতের ওপর আমাদের নির্ভর করতে হচ্ছে, এই অসহায় অবস্থাটা একবার তাদের জানতে দিলে আর রক্ষা থাকবে না। তাই—এখনই এমন একটা কিছু ঘোষণা করা দরকার ছিল, যার পরে আর আদেশ অমান্য করা বা সে সম্বন্ধে কোন সংশয় জাগবারও অবকাশ না থাকে। সেই জন্যেই আপনার মতামতের অপেক্ষা না করেই আপনার নামে হুকুম চালাতে হয়েছে। সেজন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছি পেশোয়া।'

'কিন্তু এতগুলো সিপাই—প্রত্যেককে একটা করে সোনার বালা—কোথা থেকে দেবে তুমি?'

নানাসাহেবের তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বরে সংশয় ফুটে ওঠে।

আজিমুল্লা হাসলেন একটু। বললেন, 'ভয় নেই, আপনার বিঠুরের ভাণ্ডার অক্ষয় হয়ে থাক। আমি অন্য উপায়ে এ টাকা তুলব!'

'অর্থাৎ !'

'কাল কানপুরে পৌঁছেই নান্‌হে নবাবের বাড়ি লুট করাব। নিত্য নতুন রক্ষিতা যুগিয়ে স্বর্গত পেশোযার অনেক পয়সা খেয়েছে লোকটা, তা ছাড়া প্রজাদের ওপর বড় উৎপীড়ন করে। ওর পযসা আমাদের কাজে লাগালে বরং কিছু সদ্ব্যয়েই যাবে।'

'নান্‌হে নবাবের বাড়ি লুট করাবে ? না, না—ও কাজ করতে যেও না। সামান্য কেওকেটা নয় লোকটা—মুসলমানদের ক্ষেপিয়ে তুলবে শেষ পর্যন্ত।'

'আপনি নির্ভয়ে থাকুন পেশোযা। তার আগেই ব্যাপারটা মিটিযে ফেলতে পারব। একদল হিন্দু-সিপাই পাঠিয়ে ওর বাড়ি লুট করাব, ওকে বাঁধিয়ে আনাব—তার পর আপনি ব্যস্ত হয়ে মুক্ত করে দেবেন—মাফ চাইবেন। বরং সব দোষটা আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দেবেন ওর সামনেই। আমি আবার সিপাইদের ঘাড়ে চাপাব। আমিও মাফ চাইব। ওকে আবার সসম্মানে ওর বাড়িতে ফিরিয়ে দেব। চাই কি, একটা বড় চাকরিও আপনি দিতে পারবেন। মোট কথা মিটিয়ে নেওয়া খুব একটা কঠিন হবে না।'

আজিমুল্লার মুখে এক প্রকারের ধূর্ত হাসি ফুটে ওঠে।

'কি জানি, কী যে তোমরা করছ কিছুই বুঝছি না।'

নানাসাহেব অস্থির ভাবে উঠে তাঁবুর মধ্যেই খানিকটা পাযচারি করলেন। তার পর সহসা একেবারে আজিমুল্লার সামনে এসে দাঁড়িয়ে সোজা তাঁর চোখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এ পরামর্শটাও কি হুসেনীর ?'

আর যাই হোক, ঠিক এ প্রশ্নটার জন্য হয়তো আজিমুল্লা প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি বেশ একটু চমকে উঠলেন এবং তার সে বিব্রত ভাবটা ঢাকা রইল না।

কোনমতে আমতা আমতা করে প্রশ্ন করলেন, 'কোন্—কোন্‌টা পেশোয়া ?'

'এই নান্‌হে নবাবের বাড়ি লুট করাটা ?'

আজিমুল্লা ততক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়েছেন। একটু হেসে বললেন, 'হ্যাঁ পেশোয়া, সোনার বালার বুদ্ধিটাও তাঁরই।···হুসেনী বেগমের মত অসাধারণ বুদ্ধিমতী মহিলাকে পাশে পাওয়া বহু ভাগ্যের কথা। আপনি সত্যিই ভাগ্যবান।'

তার পর হাতের দলা-পাকানো কাগজটা যতটা সম্ভব খুলে নানাসাহেবের

সামনে মেলে ধরে বললেন, 'এই যে দেখুন না—ঠিক যখন কী করব ভেবে না পেয়ে প্রমাদ গনছি, তখনই এই চিরকুটটুকু এল।'

নানা হাতের একটা ভঙ্গিতে, যেন কাগজখানা পড়বার প্রস্তাবটাকেই সরিয়ে দিয়ে বললেন, 'আজিমুল্লা, আমাদের শাস্ত্রে বলেছে—স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী! তুমি কোথায় ওদের বুদ্ধি দেবে—না ওদের বুদ্ধিতেই চলছ।… কোথায় গিয়ে পড়ছ—একটু ভেবে দেখ।'

'কিন্তু আপনাদের দেবতা শিব তো শুনেছি তাঁর বিবির কাছে ভিখারী, এমন কি তাঁরই পায়ের তলায় পড়ে থাকেন। তাই নয় কি পেশোয়া?'

নানাসাহেব সে কথার জবাব দিলেন না। ইতিমধ্যে আর একটা কথা তাঁর মনে পড়ে গেছে। তিনি ঈষৎ উদ্বিগ্নভাবে বাইরের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তার মানে সে-ও প্রায় আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই এখানে এসেছে। গেল কোথায় তা হলে?'

এ প্রশ্নটা বহুক্ষণ থেকে আজিমুল্লাকেও পীড়া দিচ্ছিল বৈকি! আর একবার অভিনন্দন জানাতে—এবং চোখে দেখতেও বুঝি বা—সমস্ত অন্তরটা তাঁরও আকুল হয়ে উঠেছিল। শুধু সুযোগ বা অবসরের অভাবেই ছুটে বাইরে যেতে পারেন নি এতক্ষণ—ভেতরে ভেতরে ছটফট করছিলেন। এবার সাগ্রহে বলে উঠলেন, 'বাইরে গিয়ে খোঁজ করব নাকি পেশোয়া?'

'দেখ না একবার।…আবার এত রাত্রে, একাই না কানপুরে ফেরে।… অনর্থক বিপদ ডেকে আনা।…দরকারও তো নেই, কাল তো আমাদের সঙ্গেই ফিরতে পারে অনায়াসে।'

আজিমুল্লা আর কথা বললেন না। এক বার মাত্র হাতটা অভিবাদনের ভঙ্গিতে মাথার দিকে তুলেই দ্রুত বার হয়ে গেলেন।

আজিমুল্লা চলে গেলে নানাসাহেব আবার এসে তাঁর আসনে স্থির হয়ে বসলেন। বড়ই বিচলিত হয়ে পড়েছেন তিনি। জীবনে এত বিচলিত বোধ করি কখনই হন নি। আজ বিঠুর থেকে যাত্রা করে কল্যাণপুর আসবার পথে কেবলই নানা অমঙ্গল দেখেছেন—সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে, কানপুরে ফেরা হল, ভালই হল।

কিন্তু—

কানপুরে ফেরা মানে যুদ্ধটাকে একেবারে নিজের ঘাড়ে নিয়ে আসা।

দায়িত্ব অনেকখানি। এইভাবে এত তাড়াতাড়ি একা শুধু নিজের দায়িত্বে ইংরেজের সঙ্গে শত্রুতা করার কথাটা আদৌ খুব রুচিকর মনে হচ্ছে না—আজও।

হুইলার সেদিনকার চিঠিটার জবাব পর্যন্ত দিল না। যদি দিত—আজ এত কাণ্ডের প্রয়োজনই হত না। আজও তিনি ইংরেজদের বন্ধুই থাকতে পারতেন।

অথচ তিনি হুইলারকে আশ্বাস দিয়েছেন—এটাও ঠিক। তিনি ব্রাহ্মণ এবং রাজা। তাঁর আশ্বাসের এই মূল্য! যদিচ একথা সত্য যে তাঁর বিখ্যাত পূর্বপুরুষেরা আর যাই হোন—সত্যরক্ষার জন্য খুব বিখ্যাত ছিলেন না, তবু এতখানি বিশ্বাসঘাতকতা করতে আজও যেন নানাসাহেবের কোথায় একটু সংকোচে বাধে।

নানা উঠে দাঁড়ালেন। তাঁবুর ভেতরই তাঁর খাটিয়ার পাশে কাগজপত্রের বাক্সটি রাখা আছে। খাটিয়াতে বসে আঙরাখার জেব-এর মধ্যে থেকে বাক্সর চাবি বের করে একটু সন্তর্পণে এবং নিঃশব্দেই বাক্সটি খুললেন। তারপর ভেতর থেকে কাগজ-কলম বের করে হুইলারকে আর একটি চিঠি লিখতে বসলেন নানা ধুন্ধুপন্থ।

অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত চিঠি।

লিখলেন, "প্রিয় জেনারেল, হুইলার, ঘটনা আমার আয়ত্তের বাইরে চলে গেছে। আজই হয়তো আমরা আপনাদের আক্রমণ করতে বাধ্য হব। আপনারা যতটা পারেন প্রস্তুত থাকবেন। ইতি—আপনার বিশ্বস্ত, নানা ধুন্ধুপন্থ, পেশোয়া।"

চিঠিটা মুড়ে মোম দিয়ে সীলমোহর করলেন। তারপর আবার বাক্সটি বন্ধ করে তাঁবুর দরজার কাছে দাঁড়িয়ে খুব মৃদুকণ্ঠে ডাকলেন, 'গণপৎ।'

'জী হুজুর।' নিম্নকণ্ঠে সাড়া দিয়ে গণপৎ ভেতরে এল। বহু দিনের লোক সে—ডাকবার ভঙ্গি থেকেই সাড়া দেওয়া সম্বন্ধে সতর্ক হতে শিখেছে।

তার হাতে চিঠিটা দিয়ে প্রায় চুপিচুপি নানাসাহেব বললেন, 'কাল ভোরেই আমরা আবার কানপুর ফিরছি।...চিঠিটা তোমার কাছে রাখো। ওখানে পৌঁছেই কোন এক ফাঁকে তুমি ইংরেজদের ছাউনিতে যাবে—আর হুইলার সাহেবের আর্দালীর হাতে, নয় তো কোন ইংরেজের হাতে চিঠি

পৌঁছে দেবে। কোনমতেই যেন এর অন্যথা না হয়, কিংবা কেউ জানতে না পারে—বুঝেছ? তা হলে তোমার গর্দান থাকবে না।'

গণপৎ নীরবে মাথা হেলিয়ে সম্মতি জানাল এবং চিঠিখানা বুকে গুঁজে বার হয়ে গেল।

নানা এবার যেন কতকটা নিশ্চিন্ত হলেন। এতক্ষণে তাঁর হুঁশ হল যে এবার একটু বিশ্রাম করা প্রয়োজন। তরবারি-সুদ্ধ ভারী কোমরবন্ধটা খুলে তাঁর সেই হাতবাক্সটার ওপর রেখে তিনি খাটিয়ায় লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লেন। সেই মুহূর্তে এমনই ক্লান্তি বোধ করলেন যে পোশাকটা খুলতেও আর ইচ্ছা হল না।

বাইরে তখন সিপাহীদের মধ্যে দারুণ উত্তেজনা ও জটলা শুরু হয়ে গেছে। সেই দিকেই আলো ও কোলাহল। কারণ মশালগুলি বেশির ভাগই ঐ সব জটলার জায়গায় গিয়ে জড়ো হয়েছে। এক-এক জায়গায় আলো বেশ ঘনীভূত হয়ে উঠেছে। ফলে নানাসাহেবের তাঁবুর দিকটা তখনও পর্যন্ত শুধু যে নির্জন ও নিস্তব্ধ তাই নয়—বড় বড় আমগাছের আড়ালে অনেকখানি অদৃশ্যও বটে। হয়তো কতকটা সেই জন্যই, গণপৎ বা আজিমুল্লা কারও নজরে পড়ে নি যে, তাঁবুতে প্রবেশ-পথের ঠিক পাশেই—আবছা অন্ধকারে গা ঢেকে আমিনা সমস্তক্ষণ দাঁড়িয়েছিল। তাঁবুর একটা ফুটো দিয়ে সে নানার চিঠি লেখা ও চিঠির জিম্মাদারি দেওয়া—সবই দেখেছে, কিন্তু আজ আর তার সে সম্বন্ধে কোন উৎকণ্ঠা কি উদ্বেগ নেই—বরং কেমন একটা সস্নেহ প্রশ্রয়ের ভাবই আছে। শিশুদের বৃথা আকুলতা দেখে অভিভাবকদের মুখে যে ধরনের হাসি ফুটে ওঠে, কতকটা সেই ধরনের হাসিই সে সময় ফুটে উঠেছিল আমিনার মুখে।

গণপৎ বাইরে এসে আবার পায়চারি শুরু করল বটে, কিন্তু ওদিকের কোলাহল ক্রমশই তাকে কৌতূহলী ও উৎসুক করে তুলল। সে দু-এক বার ইতস্তত করল, বারকতক পাগড়ির মধ্যে দিয়ে মাথা চুলকোল—তার পর খবরটা কী জানবার জন্য পা-পা করে সেদিকেই এগিয়ে গেল।

আমিনা যেন এই অবসরটুকুরই অপেক্ষা করছিল। সে প্রায় তস্করগতিতেই তাঁবুর পর্দা সরিয়ে ভেতরে প্রবেশ করল।

কিন্তু যত নিঃশব্দেই সে আসুক, গরমের দিনে তৃণশূন্য কঠিন মাটিতে

পায়ের একটু শব্দ বাজবেই। সেই সামান্ত শব্দেই নানার তন্দ্রা ছুটে গেল—তিনি চমকে জেগে উঠে তরবারির দিকে হাত বাড়ালেন।

‘ভয় নেই পেশোয়া, আমি,—আপনার বাঁদী।’

এবার ভাল করে চোখ মেলে চাইলেন নানা ধুন্ধুপন্থ। হুসেনীকে দেখে প্রসন্ন হাস্যে তাঁর মুখ রঞ্জিত হয়ে উঠল। সাগ্রহে ও সস্নেহে হাত বাড়িয়ে তার দুটি হাত ধরে টেনে পাশে বসালেন। প্রায় গদ্‌গদ্ কণ্ঠে বললেন, ‘তুমি এসেছ।..পিয়ারী, তোমার ঋণ আমি জীবনে শোধ করতে পারব না।’

আমিনার মুখে কেমন এক প্রকারের অদ্ভুত হাসি ফুটে উঠল, সে নানা-সাহেবের বুকে এলিয়ে পড়ে বলল, ‘কে বললে পারবেন না মালিক, সময় এলে কড়ায়-গণ্ডায় বুঝে নেব আমার পাওনা। শুধু তখনও পর্যন্ত শোধ করবার ইচ্ছেটা আপনার থাকলে হয়।’

॥ ৩৬ ॥

কানপুরে পৌঁছে নতুন জেনারেল টীকা সিং তাঁর লোকজন নিয়ে সোজা ম্যাগাজিনের দিকে চলে গেলেন। টীকা সিং দীর্ঘকাল ইংরেজদের অধীনে সেনানায়কের কাজ করেছেন—কর্তব্য সম্বন্ধে তিনি আজও অনেকটা সচেতন। কামানগুলি ইংরেজদের ‘নাচারগড়’-এর দিকে পাঠানো, গোলা-গুলি বারুদ-বন্দুক প্রভৃতি নিজের পাহারার মধ্যে আনা—অনেক কাজ তাঁর। এর আগেই ইংরেজরা এই সব মাল ত্রিশটি নৌকোয় চাপিয়ে এলাহাবাদ পাঠানোর জন্য প্রস্তুত করেছিলেন, কিন্তু নৌকো ছাড়বার অবসর বা লোক পাওয়া যায় নি। তোপখানার ঘাটে সেগুলি সেই অবস্থাতেই পড়েছিল। বদমাইশ বা বাজে লোকের হাতে এই সব মারাত্মক-জিনিস পড়লে কি সাংঘাতিক অবস্থা হবে টীকা সিং তা অনায়াসেই অনুমান করতে পারেন। তাই তিনি প্রায় সারাদিন সেগুলিকে পুনরায় নিরাপদ স্থানে চাবি-তালা ও পাহারার মধ্যে রাখতে ব্যস্ত হয়ে রইলেন।

কিন্তু বাকি অপর সিপাহ্‌সলার বা সিপাহী—কেউই এতটা কর্তব্যপরায়ণ নয়। শহরে পা দেবার পরই যেন তাদের সমস্ত শৃঙ্খলা ও কর্মধারা ভেঙে

পড়ল। ইংরেজদের ধরবার নাম করে সারা শহর জুড়ে একটা প্রেতের তাণ্ডব শুরু হয়ে গেল।

কয়েক জন সাহেব—ব্যবসায়ী, চিকিৎসক, বিচারক—এই শ্রেণীর ইউরোপীয়ান, যাঁরা তখনও দেওয়ালের গায়ে কালের লেখা পড়তে পারেন নি—তাঁরা তখনও অপ্রস্তুত ও অসতর্ক ছিলেন। তাঁরা অনেকেই প্রাণ দিলেন। কেউ কেউ পালাবার চেষ্টা করে ধরা পড়লেন। বলা বাহুল্য, তাঁদেরও প্রাণ রক্ষা হল না। কে বা কারা রটিয়ে দিল, ইংরেজ, ফরাসী—যে কোন জাতেরই সাহেব হোক্, এমন কি ফিরিঙ্গী বা ক্রীশ্চানকেও যদি কেউ আশ্রয় দেয় তো সে এ-দেশী হিন্দু বা মুসলমান হলেও শাস্তি পাবে।

আসলে এটা হল নির্বিচার লুটতরাজের ভূমিকা। এই উপলক্ষ্য করে বহু নাগরিক-গৃহ ও পণ্য-বিপণি লুণ্ঠিত হল। বহু নিরীহ লোক প্রাণ দিল। চাঁদনি-চকের অধিকাংশ দোকানই গোলমালের ভয়ে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল—দরজা ভেঙে যথেচ্ছ লুট করা হল। রাজা, জমিদার ও নবাবের দলও রেহাই পেলেন না। একটি দোকান থেকেই চল্লিশ হাজার টাকা পাওয়া গেল। বলা বাহুল্য, এই সব কষ্টার্জিত বা পুরুষ-পরম্পরায় সঞ্চিত অর্থ যাদের গেল তারা এক মুহূর্তে একেবারেই নিঃস্ব হল বটে, কিন্তু তাব সবটাই সিপাহীদের ভোগে লাগল না। প্রত্যেক শহরেই চিরকাল এক শ্রেণীর গুণ্ডা-বদমায়েশ বেকার থাকে, সম্ভবত চিরদিনই থাকবে; যতই সমাজতন্ত্রবাদ প্রতিষ্ঠিত হোক, খেটে খেতে সকলে চায় না, পরিশ্রমে সকলের রুচি থাকবে তা আশা করাও অন্যায়—তারা এই সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করল। বদ্রীনাথ নামে এক ঠিকাদার—লেডি হুইলার ও তাঁর কন্যাদ্বয়কে আশ্রয়দানেব অপরাধে—কোনও প্রকার প্রমাণ বা বমাল না মিললেও, কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই সর্বস্বান্ত হলেন। বহুদিনের সঞ্চিত ধন, তাঁর যথাসর্বস্ব হারিয়ে পথে বসলেন। কোনমতে প্রাণটা বাঁচল এই রক্ষা।...

নানাসাহেব ঠিক এই ব্যাপারেই আশঙ্কা করেছিলেন! তিনি বিচলিত ও উদ্বিগ্ন হয়ে আজিমুল্লাকে ডেকে পাঠালেন। কিন্তু কোথায় আজিমুল্লা? চারদিকের এই অরাজকতার মধ্যে বুঝি সবই হারিয়ে গেল। নানা তাঁর খোঁজে দিকে দিকে লোক পাঠালেন, জুলগুঞ্জন সিংকেও বার বার তলব জানালেন, কিন্তু কারও টিকিটি পর্যন্ত দেখা গেল না। আমিনাও এখানে থেকেই কোথায় সরে পড়েছে। এক বালাসাহেব ছাড়া কেউ কাছে নেই

বালা অবশ্য বিভিন্ন পাড়ায় গিয়ে অবস্থাটাকে আয়ত্তে আনবার অনেক চেষ্টা করলে, কিন্তু কোন ফলই হল না। একটি সেনাকেও সে নাচারগড়ের দিকে নিয়ে যেতে পারলে না। অবশেষে এক সময় ক্রুদ্ধ ও হতাশ হয়ে ফিরে আসতে বাধ্য হল।

এক কথায় নানাসাহেব নিজেকে বড অসহায় বোধ করতে লাগলেন।

আসলে আজিমুল্লাও কম বিচলিত হন নি। তিনি ঠিক এতটা বিশৃঙ্খলার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। হয়তো তিনি কানে বহু বার শুনলেও কার্যত এ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন নি যে, বাঁধ কেটে বন্যার জলকে পথ দেওয়া খুব সোজা, কিন্তু আবার তাকে বাঁধের মধ্যে আটকানো মোটেই অত সহজ নয়।

নান্‌হে নবাবের বাড়ি লুট করবার আদেশ তিনি নিজেই দিয়েছিলেন এটা ঠিক, কিন্তু লুটতবাজের অবাধ বন্যা সেখানেই থামল না। নান্‌হে নবাবেব বাড়ির বিপুল ঐশ্বর্যও সবটা তাঁদেব করায়ত্ত হল না।—কোথা থেকে কারা এসে যে সেই সব বহুমূল্য আসবাব, চীনামাটির দামী বাসন, কাট্‌গ্লাসের সেট প্রভৃতি লুট করে নিয়ে গেল, তা তিনি বুঝতেও পারলেন না।

বরং এধারে আর-এক বিপত্তি দেখা দিল।

নান্‌হে নবাব প্রতিপত্তিশালী মুসলমান জায়গীরদার।—তাঁর এই অপমান ও লাঞ্ছনায় মুসলমানরা বিরূপ হয়ে উঠল। এমন কি সিপাহীদের মধ্যেও একটা দলে প্রবল অসন্তোষ দেখা দিল। তারা স্পষ্টই বলে বেড়াতে লাগল, 'তা হলে ইংরেজ তাড়িয়ে আমাদের লাভ কী? আমরা কি হিন্দুদের কাছে রোজ সাত হাত মেপে নাকখৎ দেবার জন্যেই এত কাণ্ড করছি?'

সংবাদটা আমিনার কানে গিয়ে পৌঁছতে সে তাড়াতাড়ি এক খৎ লিখে পাঠাল আজিমুল্লাকে, 'করছেন কি খাঁ সাহেব, এখনও সামলান, নয় তো সিপাহীদের মধ্যেই দু জাতে দাঙ্গা বেধে যাবে! এমনও শুনছি যে, নান্‌হে নবাবকে কানপুরের নবাব বলে ঘোষণা করবে মুসলমানরা!'

অবশ্য ধূর্ত আজিমুল্লার সে তাল সামলাতে বেশী দেরি হল না। অপরাহ্নের দিকে নান্‌হে নবাবকে কায়দা করে সিপাহীরা যখন ডুলি-সুদ্ধ সাভাদা প্রাসাদে এনে নানাসাহেবের সামনে নামাল, তখন তিনিই ছুটে গিয়ে হাত ধরে তাঁকে নামিয়ে আনলেন এবং স-সম্মানে নিয়ে গিয়ে নানাসাহেবের পাশে বসিয়ে দিলেন। নানাসাহেবও অভিনয়ে কিছু কম গেলেন না—

নবাবের দুটি হাত ধরে সিপাহীদের এই দুষ্কৃতির জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। নবাবের সাহায্য-ব্যতিরেকে যে ইংরেজ-নিধনরূপ দুষ্কর কাজ সাধন করা সম্ভব হবে না—তাও জানালেন এবং ঐ বিধর্মী কুকুরগুলো দূরীভূত হলে নানাসাহেব যে নান্‌হে নবাবের প্রাপ্য বুঝিয়ে দেবেন এমন প্রতিশ্রুতিও দিলেন। নবাবের ক্রুদ্ধ ও আরক্ত মুখ এই সব তোষামোদ-বাক্য শুনতে শুনতে অপেক্ষাকৃত কোমল এবং প্রসন্ন হয়ে উঠল। কিন্তু তাঁর নগদ টাকাকড়ি আসবাব রত্নালঙ্কার সবই গিয়েছে—সে ক্ষোভ অত সহজে যে মেটবার নয়,—তা আজিমুল্লা জানেন। তিনি সুকৌশলে এমন একটা ইঙ্গিত দিলেন যাতে নবাবের মনে হয় যে, ইংরেজ বিতাড়িত হলে কে এ অঞ্চলের মালিক হবে সে প্রশ্নের চরম মীমাংসার এখনও সময় হয় নি এবং তখন মুসলমান মুসলমানের দিকই টানবে —তা বলা বাহুল্য।

আজিমুল্লা জানতেন—ভবিষ্যতের অনেকখানি লোভ ছাড়া বর্তমানের ক্ষতির ব্যথা মানুষ ভোলে না।

তিনি চমৎকার কথার প্যাঁচে আরও ইঙ্গিত দিলেন যে, লুটের বন্যায় যা বার হয়ে গেছে, তা আবার সেই পথেই ফিরে আসতে পারে।

নানহে নবাব বুঝলেন। তাঁর মুখ প্রসন্নতর হল। তিনি বললেন, 'যা হবার তা তো হয়েই গেছে পেশোয়াজী, ওসব কথা এখন থাক্। আমি সর্বদাই আপনার খিদমতে হাজির আছি জানবেন।'

পেশোয়া ইঙ্গিতে নবাবের জন্যে বিলেতী সুরা আনতে আদেশ দিয়ে পুনশ্চ তাঁর হাত দুটো ধরলেন, 'উঁহু, অত সহজে এড়িয়ে যেতে পারবেন না নবাব সাহেব, আপনাকে কিছু একটা বড় কাজের ভার নিতে হবে। নইলে এ কি একার কাজ—আমি পারব কেন?'

'কী কাজ করতে হবে বলুন?' ঈষৎ উৎকণ্ঠিত ভাবেই প্রশ্ন করেন নবাব।

নানাসাহেবকে মুহূর্তকয়েক চুপ করে থাকতে হয়। আসলে কথাটা বলবার সময় অত কিছু ভেবে বলেন নি—অনেকটা ঝোঁকের মাথায়ই বলেছেন প্রীতি বা উদারতা দেখাতে গিয়ে মানুষের একটা ঝোঁক চাপে—কেবল মাত্রা বাড়াতে শুরু করে। নানাসাহেবেরও কতকটা সেই অবস্থা।

এবারে আজিমুল্লাও আশঙ্কায় কণ্টকিত হয়ে উঠেছেন। কিন্তু ঠিক সামনে বসে নবাব সোজা তাঁর মুখের দিকেই চেয়ে আছেন—কোন প্রকার ইঙ্গিত করবারও উপায় নেই।

নানাসাহেবকেও কিছু একটা তখনই বলতে হবে। তিনি বলে বসলেন, 'আপনি আমার তোপখানার ভার নিন—তোপ আর গোলন্দাজ বাহিনী সবই আপনার হাতে থাকবে।'

সত্যই যথেষ্ট সম্মানের পদ। নানুহে নবাব এবার আন্তরিক খুশী হলেন। তিনিই এবার নানাসাহেবের ডান হাতখানা চেপে ধরে বললেন, 'আমার যথাসাধ্য করব পেশোয়াজী—আপনার সেবার দরকার হলে জান দেব।'

নানুহে নবাব মহা সমাদর ও আপ্যায়নের মধ্যে বিদায় নিলে আজিমুল্লা আর নিজেকে সামলাতে পারলেন না, তীব্র ভর্ৎসনার সুরে বললেন, 'করলেন কি পেশোয়া, ও কি জানে তোপের আর তোপাখানার? জীবনে কখনও লড়াই করেছে? ওর বাপ সুদ খেয়ে আর মেয়েমানুষের কারবার করে কিছু জমিদারি আর খানকতক বাড়ি করে গিছল—ও এখন ভোগ করছে। ওকে দিলেন এত বড় একটা ভার।'

'আরে, টীকা সিং-ই তো রইল আসল সেনাপতি—এটা একটু বাহ্যিক খাতির, বুঝলে না?'

অপ্রতিভ পেশোয়া মাথা চুলকোতে চুলকোতে আজিমুল্লাকে আশ্বাস দেবার চেষ্টা করেন।

কিন্তু এ দিকটা খানিক ঠাণ্ডা হলেও আসল কাজের কাজ কিছু হল না।

নানাসাহেব সন্ধ্যার পর আজিমুল্লাকে ডাকিয়ে এনে বললেন, 'এ কী হচ্ছে আজিমুল্লা? আমি তখনই বলেছিলুম তোমাকে যে এ পথ ভাল নয়, এখন সামলাও যেমন করে হোক। লড়াই তো মাথায় উঠল—ঐ কটা ইংরেজ যদি এসে আমাদের কয়েদ করে নিয়ে যায়, কি কেটে ফেলে তো বাঁচবার মত একটা সিপাইও নেই ধারে কাছে! ওরা যে সেটা করছে না, নেহাত সেটা আমার গুরুবল আর ওদের আহাম্মকি!'

আজিমুল্লা তিরস্কৃত হয়ে নীরবে মাথা নত করে বেরিয়ে গেলেন সেখান থেকে। অবস্থা শুধু তাঁর আয়ত্তের বাইরে নয়—যেন তাঁর বুদ্ধিরও বাইরে চলে গেছে। আর যেন কিছু ভাবতে পারছেন না।

বাইরে গিয়ে ঘোড়ায় চেপে গোটা শহরটা আরও একবার ঘুরে এলেন—ফল কিছুই হল না।

কিন্তু ঘুরতে ঘুরতে আর একটা মতলব তাঁর মাথায় গেল। মনে পড়ল

তাঁর পুরাতন হেডমাস্টার গঙ্গাদীনের একটা ছাপাখানা আছে। তিনি সোজা সেইখানে চলে গেলেন। তখনই বুড়োকে নিয়ে বসে গেলেন খানকতক ইস্তাহার রচনায়। নাগরী ও উর্দু হুবহু হরফেই সে ইস্তাহার ছাপা হল। হিন্দু-মুসলমান ভাই-ভাই—নাগরিকদের ধনসম্পত্তি ও প্রাণের দায়িত্ব সিপাহীদেরই—তাদের আসল শত্রু ইংরেজরা, আসল লক্ষ্য দেশের স্বাধীনতা—এমনি নানা ভাল ভাল কথা লিখে কতক নানাসাহেবের নামে, কতক মৌলবী আমেদউল্লার নামে—ইস্তাহার প্রচারিত হল।

সারারাত অক্লান্ত পরিশ্রম করে ইস্তাহারগুলি ছাপিয়ে ভোরের দিকে আজিমুল্লা সেগুলি লোক মারফৎ শহরের চারদিকে পাঠিয়ে দিলেন তখনই বিলি করতে। বিলি করাও হল, কিন্তু অবস্থা যথাপূর্ব—বিশেষ কোন ফলই হল না। হুইলারের নাচারগড়ের দিকে একটি সিপাহীকেও ফেরানো গেল না।

আমিনাও সারারাত ঘুমোয় নি। উৎকণ্ঠিত উদ্বেগে ঘটনার ধারা একটির পর একটি সবই লক্ষ্য করেছে—সংবাদও মুহুর্মুহু তার কাছে পৌঁচেছে। কিন্তু সেও কোন উপায় খুঁজে পায় নি। অবশেষে বেলা দুপুরের দিকে সে সোজা আজিজনের বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হল।

'এত কাণ্ড সবই বুঝি বৃথা হয় বোন—তীরে এসেও বুঝি তরী ডোবে। এতক্ষণ যদি হুইলারের দল আত্মরক্ষার জন্য হাত-পা গুটিয়ে বসে না থেকে আমাদের ওপর চড়াও হত তো আমরাই ওদের হাতে মরে জাহান্নমে যেতাম! ...কী উপায় করা যায় বল্ তো! সবই কি বৃথা হবে?'

আজিজনের চোখে যেন নিমেষে আগ্নেয়গিরিরই ইঙ্গিত জাগে। কঠিন কণ্ঠে সে বলে: 'না—তা হতে দিলে চলবে না। আজ এই কটা লুটেরার জন্যে আমাদের এতদিনের এত কৃচ্ছ্রসাধনা বরবাদ হতে দিলে চলবে না!'

'কিন্তু কী-ই বা করবি? আমি তো কোন উপায় দেখি না!'

আমিনা সত্যিই যেন হতাশায় ভেঙে পড়ে।

'নিদানকালের চরম ব্যবস্থা—হেকিমরা কী একটা বলে না? তাই কিছু করতে হবে আর কি! আচ্ছা, আমিই দেখছি।'

সে একেবারে উঠে দাঁড়িয়ে বলে, 'তুই যা। দেখি আমি কী করতে পারি। ...ঘোড়া আছে? একটা ঘোড়া পাঠিয়ে দিতে পারিস্ এখনই?'

'পারি বৈকি। একটা কেন, দশটা ঘোড়া আছে।'

আমিনা চলে গেল। খুব যে একটা কিছু আশা-ভরসা নিয়ে গেল তা নয়, তবু মজ্জমান ব্যক্তি খড়কুটোকেও আশ্রয় মনে করে, সেই ভাবেই কতকটা সে প্রাসাদে ফিরে একটা ভাল শান্ত গোছের ঘোড়া পাঠিয়ে দিল।...

দুপুরের একটু পরে আজিজন ঘোড়ায় চেপে পথে বেরিয়ে পড়ল। আজ তার বিশ্ববিজয়িনী মনোমোহিনীর বেশ। মুখে বিলিতী প্রসাধন—চোখে দিশী সুর্মা। সমস্ত বেশভূষায় একটিই মাত্র ইঙ্গিত—বহ্নিশিখার মত সে রূপে পতঙ্গের মত ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান।

সে চকবাজার ও অপর স্থানে—যেখানে যেখানে সিপাহীদের জটলা বেশী, সেই সব স্থানে একেবারে তাদের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। তার সেই ভুবন-ভুলানো হাসিতে, চোখের মাদকতায়, দেহের ভঙ্গিতে সকলকে চঞ্চল লুব্ধ করে তুলল এক নিমেষে! কিন্তু সেই রূপোন্মত্ত সিপাহী বা সিপাহ্‌সলারের দল অগ্রসর হতে এলেই আজিজনের হাতের চাবুক শূন্যে শব্দ করে ওঠে—সপাং।

'অতি সস্তা আমি নই ভাই সাহেব! পাঁচ শ মোহর আমার দাম। পারবে দিতে? তবে হ্যাঁ, এক কথা—পাঁচ শ মোহরের বদলিও আছে—আংরেজের রক্ত! আমি যাচ্ছি এখন ঐ কুত্তাদের ছাউনির দিকে—যে আসতে চাও এস। যে আগে একটা আংরেজ মারবে—আমি নিজে তার কাছে গিয়ে গিয়ে ধরা দেব। সাফ কথা আমার কাছে—এই কসম খেয়ে বলছি।'

এই অভূতপূর্ব ঘোষণার পর আজিজন আর কোথাও মুহূর্তকাল দাঁড়াল না—চোখের পলকে ঘোড়া ঘুরিয়ে রওনা দিল আবার নতুন ঘাঁটির উদ্দেশে।

কিন্তু এতেই ফল ফলল—আশ্চর্যরকম ভাবে!

এতক্ষণ অবধি সেনাপতিদের আদেশে যা হয় নি, নেতাদের পৌনঃপুনিক আবেদনে যা হয় নি, হাজার ইস্তাহারে যা হয় নি—রূপোপজীবিনীর চোখের ইঙ্গিতে ও মুখের প্রতিজ্ঞায় তাই হল। মধ্যাহ্ন অপরাহ্নে ঢলবার আগেই উচ্ছৃঙ্খল লুটেরারা, আবার সিপাহীতে পরিণত হল। হুইলার সাহেবের মাটির কিল্লার চারিদিকে স্থায়ীভাবেই তারা অবরোধ রচনা করল।

কানপুরের বিখ্যাত অবরোধ শুরু হল—রাজা বা বাদশার আদেশে নয়—এক বারবিলাসিনীর অনুপ্রেরণায়।

॥ ৩৭ ॥

মীরাটে যেদিন গোলমাল বাধে, সেদিন হীরালালরা সেখানেই ছিল। আরও অনেকেই ছিল অবশ্য, তাঁরা রয়েও গেলেন। এইসব হাঙ্গামার ভেতর বাঙালীরা একটা অদ্ভুত অবস্থার মধ্যে টিকে ছিল। সিপাহীরা তাদের সাহেবের পা-চাটা ঘৃণা বলে এবং অবজ্ঞা করলেও, কতকটা অকর্মণ্য বলেই জানত—তাই তাদের কাছ থেকে কোন অনিষ্ট আশঙ্কা করে নি। আর বাঙালীরাও, সিপাহীদের কাছে সিপাহীদের এবং সাহেবদের কাছে সাহেবদের হিতাকাঙ্ক্ষী সেজে কোন মতে আত্মরক্ষা করছিল। তবে যে মধ্যে মধ্যে একেবারে কাছে এসে পড়ে নি তা নয়—গর্দানটা যেতে যেতেও রয়ে গেছে অনেক বার মাইনের টাকা তো পাওয়াই যায় নি ক'মাস, তবু অপঘাতে মরে নি—অন্তত এই উপদ্রবের কারণে নয়।

কিন্তু মৃত্যুঞ্জয় বুদ্ধিমান ও দূরদর্শী লোক। কতকগুলো গোঁয়ার ও মূর্খ সিপাহীর খেয়াল ও মর্জির ওপর ভরসা করে বসে থাকবার মানুষ তিনি নন। তা ছাড়া তাঁর জীবনের মূল্যও কিছু আছে। তিনি প্রায়ই বলেন, 'এতটা কাল তো দুঃখে-দুঃখেই কাটল। দেশভুঁই ছেড়ে তেপান্তর ডিঙিয়ে এখানে এই বেম্মডাঙায় পড়ে থেকে পয়সা রোজগার করেছি,—সে কি পাঁচ ভূতকে খাওয়ানোর জন্যে? নিজেই যদি ভোগ না করলুম তো এ পোড়ার দেশে এমন করে পড়ে থাকার দরকারটা কী বাপু? রামোঃ। একি একটা জায়গা! গরমকাল এল তো ভাজনাখোলায় পড়ে ছটফট্ কর, ঝল্‌সে মর, আবার শীতকাল এল তো সেও একেবারে উৎপরীক্ষে শীত—ত্রাহি মাং পুণ্ডরীকাক্ষং!···সায়েবদের যেমন খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই—এইখেনে এল আপিস করতে!'

অর্থাৎ দু পয়সা তিনি করেছেন। সে জবাবও তাঁর মুখে মুখে, 'দেশভুঁই ছেড়ে এই পয়সা মেড়ো-খোট্টার দেশে না খেয়ে দেয়ে পড়ে আছি কী করতে বাপু—দু পয়সা রোজগার করতেই তো? বামুনের ছেলে, হবিষ্যির এক মুঠো চাল আর একটা কাঁচকলা কি দেশে জুটত না? নাকি ইংরেজ আমার বাপের ঠাকুর যে তার উপকার করতে এখানে পড়ে আছি! পয়সা দুটো করেছি,

তা মানছি। আরও করতে পারতুম, তবে সেই সে-মাগীর জ্বালায় কি কিছু উপায় আছে? যা পাবে ছিষ্টি পাচার করবে নিজের বাপের বাড়ি! দেখ-তোর—না দেখ মোর! এই তো অবস্থা। বিয়ে করা কি জান দাদা, ভাত-কাপড় দিয়ে ঘরেতে চোর পোষা!'

সুতরাং মৃত্যুঞ্জয় গাঙ্গুলী মীবাট ত্যাগ করার জন্য প্রস্তুত হলেন। চৌধুরী-প্রমুখ দু-এক জন তাঁকে বুঝিয়ে বলতে গেলেন যে, 'যা হয় সবারই হবে ইংবেজদের সঙ্গে এরা আর কদিন যুঝতে পারবে ভাবছ? এস, এক সঙ্গেই থাকি সকলে, দুর্গা নাম স্মরণ করে। যার মনে যা আছে তাই করবেন—কাটতে হয় কাটবেন, মারতে হয় মারবেন!'

মৃত্যুঞ্জয় ঘাড় নেড়ে উত্তর দিলেন, 'উঁহু, আপনারা বুঝছেন না, আমার সংসারে আর কেউ নেই। আমি না থাকলে ছেলেপুলেগুলো পথে বসবে একেবারে। মাগীটি থান পরতে না পরতে শালারা এসে জেঁকে বসবে কর্তা হয়ে—যথাসর্বস্ব শুষে নিয়ে তবে ছাড়বে। বিধবার টাকা খাবার জন্যে বাপসুদ্দ মুকিয়ে বসে থাকে তো ভাই। তার ওপর মাগীটার তো একরত্তি বুদ্ধি নেই—মনে করে ওর ভাইএরা সব এক-একটি ধম্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির! শেষে ছেলেমেয়ে-গুলোকে হয়তো ভিক্ষেই করতে হবে।···না চৌধুরীদা, মাপ করুন আমাকে। এখনও হযতো পথ আছে—মানে মানে দেশে গিয়ে পৌঁছতে পারব।'

হীরালালকেও তিনি ছেড়ে যেতে রাজী হন নি। যে দিনকাল, তেমন একটা জোয়ান ছোকরা সঙ্গে থাকলে অনেক সুবিধা। অন্তত দু-চার জন লোকের মহড়া যে নিতে পারবে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। তা ছাড়া আজকাল ভাগ্নের হাতে একটা লাল পাথরের আংটি দেখা যাচ্ছে—কোথা থেকে কেমন করে এসেছে সে সম্বন্ধে ভাল রকম কোন জবাব না পেলেও লোকের মুখে তিনি শুনেছেন যে ওটা নানাসাহেবের আংটি—কে জানে, সেই মুসলমানীটারই বা হবে! কিন্তু যদি নানাসাহেবেরই হয়, তা হলে বুঝতে হবে যে ও-মহলে শ্রীমানের রীতিমত দহরম-মহরম আছে। সেদিক দিয়েও অনেকটা ভরসা!

মুখে বলেছিলেন, 'না বাপু, বিধবার ছেলে তুমি, তোমার মা আমার হাতে সঁপে দিয়ে নিশ্চিন্ত ভরসায় আছে। তাকে গিয়ে কী জবাব দেব? আমাকে একলা ফিরতে দেখলে সে হয়তো কেঁদে-কেটে অনর্থ করবে। আমার কথা হয়তো বিশ্বাসই করতে চাইবে না, ভাববে আমি মিছে করে বলেছি—ছেলে তার কৌত হয়ে গেছে!'

হীরালাল এতদিনে তার মামাকে হাড়ে হাড়ে চিনেছে। তবু অনেক ভেবেচিন্তে শেষ অবধি মামার প্রস্তাবেই রাজী হল। সিপাহীদের আকস্মিক অভ্যুত্থানের মধ্যেই তাকে বড় সাহেব চুপি চুপি বলে দিয়েছিলেন, 'তোমরা যে পার এখান থেকে পালাও, যেখানে যার সুবিধা চলে যাও, যে কোন ইংরেজ গ্যারিসনে গিয়ে রিপোর্ট করলেই কাজ পাবে। বিশ্বস্ত লোকের এখন খুবই দরকার। আর এ বিপদে যে আমাদের সঙ্গে বিশ্বস্ত ব্যবহার করবে, তাকে আমরা সুদিনে কখনই ভুলব না—এটুকু আশা করি তোমরা আমাদের চিনেছ।'

এখনকার বাঙালীদের সে প্রস্তাব তত ভাল লাগে নি। এই ডামাডোলের বাজারে দিনকতক ঘাপটি মেরে থাকাই ভাল। দেখা যাক না, কতদূরের জল কতদূর গড়ায়! যদি শেষ পর্যন্ত অঘটনই ঘটে, সিপাহীদের জয়লাভ হয়—তখন? কী দরকার অত ভালমানুষি দেখানোর?

অথচ হীরালালের অল্পবয়সের রক্ত—যে-কোন কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে চায়। কর্মহীন, উদ্যমহীন ভাবে প্রতিদিন বসে বসে গুজব শোনা এবং কোনমতে প্রাণটা বাঁচিয়ে চলা—এ তো মৃত্যুরও অধিক।

জীবনে বিপদেরও এক প্রকার মধুর আস্বাদ আছে।

বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়ার মধ্যেই আছে পৌরুষের সার্থকতা।

তা ছাড়া বিপদের সামনাসামনি আগু বেড়ে গেলে ভয়টাও অনেক কমে যায়। 'পড়ল পড়ল বড় ভয়—পড়লেই সরে যায়'—এ প্রবাদ সে আবাল্য শুনে আসছে।

হীরালাল চায় কাজ করতে। সে চায় সাহেবদের এই বিপদে যথাসাধ্য সহায়তা করতে। যাদের নিমক সে খেয়েছে—বিপদের দিনে প্রাণ দিয়েও তাদের সাহায্য করা দরকার। বিধবা মায়ের কাছ থেকে ছেলেবেলায় অনেক ভাল ভাল কথা সে শুনেছে—সেগুলো যে এমনভাবে তার রক্তে মিশে গেছে, তা সে-ও এতদিন ধারণা করতে পারে নি। তার মা—সে সামান্য একটু লেখাপড়া শিখতে—তাকে দিয়েই মহাভারত রামায়ণ পড়িয়ে শুনেছেন, আজ সে সব কথাও বার বার মনে পড়ে।

এক কথায় সে এইসব বহুদর্শী বিচক্ষণ হুঁশিয়ার অভিভাবকদের সংসর্গ এড়িয়ে স্বাধীনভাবে কোন কাজে লেগে পড়তে চায়—ভারতব্যাপী এই মহা-আহবে কোন-না-কোন দলে, কোন-না-কোন কাজে অংশগ্রহণ করতে চায়।

কিন্তু সে ইচ্ছাপূরণে বাধা অনেক। সকলেই তার চেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ, গুরুজন-স্থানীয়। তারই কল্যাণ ভেবে তাঁরা নিষেধ করেন তাকে ঘরের বাইরে যেতে—মুখের ওপর সে আদেশ ও নির্দেশ লঙ্ঘন করতে বাধে।

সুতরাং 'কণ্টকেনৈব কণ্টকং'—আর-এক গুরুজনকে দিয়েই সে বাধা লঙ্ঘন করা যেতে পারে।

মামা ছাড়বেন না—এর ওপর কথা কী?

তার পর? মামাকে এড়াতে সে পারবে।

না-হয় এক সময় সুযোগ ও সু-স্থান বুঝে সরে পড়তে কতক্ষণ।

'মামা ছাড়ছেন না—উনিই তো আমার অভিভাবক, ওঁর কথা অমান্যি করি কেমন করে? এই কথাই বলে সকলের কাছে বিনীতভাবে সে বিদায় প্রার্থনা করল এবং নিজের যৎসামান্য তল্পি-তল্পা গুছিয়ে মামার সঙ্গে রওনা দেবার জন্যে প্রস্তুত হল।

মৃত্যুঞ্জয় দিন-ক্ষণ তিথি-নক্ষত্র দেখে, সুযোগ-সুবিধা বুঝে যাত্রা করবেন।

কিন্তু এই সংকল্পে পৌঁছবার আগে শুধুই কি ইংরেজের নিমকের কথা তাঁর মনে এসেছিল—আরও একজনের নিমকের কথা তার মনে পড়ে নি? তার জীবনদাত্রীর কথাই কি সে ভুলতে পেরেছে?

না, তা সে পারে নি। তাঁকে ভোলা হীরালালের পক্ষে সম্ভব নয়।

আর তা নয় বলেই সে চায় যতটা সম্ভব তাঁর কাছাকাছি থাকতে। বিপক্ষ পক্ষে থেকেও যদি সে কাছাকাছি থাকতে পারে তো অনেক লাভ। যদি কোনদিন কোন অবসরে—কোন এক বিপদের মুহূর্তে সে তাঁর পা থেকে একটি কাঁটাও অপসারিত করতে পারে—তা হলেও নিজের জীবন সার্থক ধন্য মনে হবে!

তাই যেমন করেই হোক, কাছাকাছি থাকা দরকার।

আর সেজন্যে মীরাট থেকে বার হয়ে যেতে হবে—যত তাড়াতাড়ি হয়। এতকাল চাকরি ছিল—পরের আদেশে নির্দেশে ঘুরতে হত, গতিবিধির কোন স্বাধীনতাই ছিল না। সে বাধা যখন ঘুচেছে, কোথায় যেতে হবে সে রকম যখন কোন স্পষ্ট নির্দেশ উপরওয়ালার কাছ থেকে পায় নি, তখন সে যতটা সম্ভব সেই জীবনদায়িনী দেবীর কাছাকাছিই থাকবে।

কানপুর—নিতান্ত না হয় তো আশে-পাশে কোথাও।...

প্রথম থেকেই তার লক্ষ্য ঠিক করা ছিল। তাই সে মামাকে কিছুতেই উত্তরের নিরাপদ অঞ্চল দিয়ে যেতে দিল না।' নানারকমে ভয় দেখিয়ে তাঁকে নিবৃত্ত করল। তার মধ্যে ডাকাতের ভয়টাই বেশি। এখনও ওদিকে রীতিমত ঠ্যাঙাড়ের ভয় আছে। ফাঁসুড়েও দু-চার জন থাকা অসম্ভব নয়। তা ছাড়া দল বেঁধে রাহাজানি—এ তো নিত্যকার ব্যাপার! এই তো সেদিনও—খবরটা নতুন টেলিগ্রাফ মারফত আগ্রা থেকে তার কাছেই আগে এসে পৌঁছেছিল—গোরুর গাড়ি থামিয়ে মাত্র ষোলটি টাকার জন্য পাঁচজন রাহীকে খুন করেছে ডাকাতরা। তাদের কাছে শুধু বর্শা-বল্লম লাঠি-সড়কিই নয়, রীতিমত গাদাবন্দুকও ছিল। তা ছাড়া তরাই এলাকার সর্বনাশা জ্বরাতিসার, সাপ-বাঘ এসব তো আছেই। এ পথে বরং একটিই ভয়—সিপাহীদের। তা তাদের বললেই হবে আমরা কারবারী লোক, দেশে ফিরে যাচ্ছি; এসব ব্যাপারের কিছুই জানি না।

মৃত্যুঞ্জয় কথাটা বুঝলেন। তাঁর সঙ্গে মোটামুটি বেশ কিছু টাকা আছে। টাকাকে সোনায় গেঁথে নিয়েছেন। কোমরের গেঁজেটি মোহরে পূর্ণ। এ মোহর যদি বাড়ি অবধি না পৌঁছয় তো শুধু দেহটা পৌঁছেই বা লাভ কি?

তিনিও অনেক ভেবে শেষে অযোধ্যার পথেই ধরলেন।

নানা বিপদ-আপদ (আসল বিপদের চেয়ে গুজবের চোটগুলোই বেশী মারাত্মক) কাটিয়ে, নানা আশঙ্কায় নিয়ত কণ্টকিত থেকে মামা ও ভাগ্নে একসময় লক্ষ্ণৌ-এর উপকণ্ঠে এসে পৌঁছলেন। এবারের এ যাত্রা আগের বারের চেয়ে অনেকটাই ভিন্ন। মৃত্যুঞ্জয় এবার অনেকটা নরম হয়ে আছেন—এই লড়াই-বিগ্রহের মধ্যে বলিষ্ঠ ভাগ্নেকে অনেকটা যেন আঁকড়েই ধরেছেন। সেজন্যে তাকে এই পথে একা ছেড়ে দিতে বেশ একটু মন-কেমনই করতে লাগল। তবু হীরালাল তার কর্তব্য স্থির করে ফেলল। মামাকে আলমনগরের চটিতে রেখে খবরাখবর মুলুক-সন্ধান নেবার নাম করে বার হয়ে আসলে সে বেশী করে শহরেরই হালচাল সংগ্রহ করল এবং ফিরে এসে মামাকে জানাল যে, এখানে এখনও ইংরেজের শক্তি খানিকটা খাড়া আছে। এমন কি, কিছু সিপাহীও তাদের দিকে আছে। ইংরেজরা যদিচ বেশির ভাগই রেসিডেন্সির বাগানে আশ্রয় নিয়েছে, তবু বাইরেও কিছু কিছু দপ্তর [illegible]ও তাদের অধিকারে আছে। মচ্ছিভবনের সামনে খোলা মাঠে তারা এক

ফাঁসি-গাছ খাড়া করেছে। বিদ্রোহী বলে সন্দেহ হওয়ামাত্র তারা প্রকাশ্যে সেখানে তাদের ধরে ফাঁসি দিচ্ছে। এমন কি, তাতেও তাঁবেদার সিপাহীরা প্রকাশ্যে কোন গোলমাল করে নি।

এই যখন অবস্থা, তখন কি তাঁদের উচিত নয় সাহেবদের সঙ্গে দেখা করে এখানেই যা হোক কাজ শুরু করা?

মৃত্যুঞ্জয় ভাগ্নের প্রস্তাব শুনে কিছুক্ষণ হাঁ করে তার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। যা হোক, দুটো ভাত-ডাল ফুটিয়ে তিনি এতক্ষণ ধরে হা-পিত্যেশে এই অপদার্থটার জন্য অপেক্ষা করছেন—সে কি এই উদ্ভট প্রস্তাব শোনবার জন্যে? বেলা তৃতীয় প্রহর অবধি ঘুরে এই অঙ্গ-জল-করা খবর সে আনল।

অনেকক্ষণ পরে তাঁর বাক্যস্ফূর্তি হল, 'তুমি কি পাগল হয়েছ বাপু? না তোমার মতিচ্ছন্ন হয়েছে? জেনে শুনে আবার এই ফাঁদে পা দেব আমি? এখনও হয় নি—দু দিন পরেই শুরু হবে। সব জায়গাতেই যা হচ্ছে, এখানেও তাই হবে—এ দেশই কি বাদ যাবে ভেবেছ? বলি আসতে আসতে সীতাপুরের কাণ্ডটা শুনলে না নিজের কানে?.. এখন ভাল চাও তো মানে মানে সরে পড়।...আমার ঝকমারি হয়েছিল তোমার কথা শুনে এই পথে আসা। এখন ভালয়-ভালয় বাবা বিশ্বনাথের কৃপায় কাশীটা পেরোতে পারলে বাঁচি।... চাকরি। বলে—আপনি বাঁচলে বাপের নাম! ..ভাল চাও তো চল—দেশে গিয়ে এখন দিনকতক ঘাপটি মেরে পড়ে থাকবে। এসব দোলমালাই চুকুক, দেখ আগে কে রাজা হয় আর কে না হয়—তখন চাকরি করলেই চলবে! চাকরি তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না বাবা, বলি যদ্দিন এই মেতন্ গাঙ্গুলী আছে তদ্দিন চাকরির ভবনা নেই। ..নাও, এখন চাট্টি খেয়ে আমাকে উদ্ধার কর। কাল ভোরেই দুর্গা বলে রওনা দিতে হবে—ওসব কোন কথাই নয়।'

তখনকার মত হীরালাল কোন প্রতিবাদ করল না। ভালমানুষের মতই মুখহাত ধুয়ে আহারে বসল এবং প্রতিদিনকার মতই আহারান্তে বাসনগুলি মেজে-ঘষে দোকানীকে বুঝিয়ে দিল। মামা নিশ্বাস ছেড়ে বাঁচলেন, ভাবলেন ছোঁড়াটার সুবুদ্ধি হয়েছে। পাগলামিটা অল্পে অল্পেই কেটেছে।

কিন্তু শেষ অবধি দেখা গেল, যে তিনি তাঁর ভাগ্নেকে পুরো চিনতে পারেন নি এখনও। অথবা, সেই চকিতে-একবার-মাত্র-দেখা এক মুসলমানীর কী পর্যন্ত প্রভাব তাঁর এই তরুণ ভাগ্নেটির ওপর পড়েছে—তার কোন খবরই রাখেন না।

আহারাদির পর মৃত্যুঞ্জয়ের সামান্ত দিবানিদ্রার ফাঁকে হীরালাল আবারও কোথায় বার হয়ে পড়েছিল। সন্ধ্যের সময় ফিরল একেবারে দুটো লালমুখ আহেলা গোরা সিপাহী সঙ্গে করে।

তাদের দেখেই তো মৃত্যুঞ্জয়ের নাড়ী ছাড়বার উপক্রম। কোনমতে পৈতেটা আঙুলে জড়িয়ে দুর্গা-নাম জপ করবেন—তাও যেন হাত ওঠে না।

'এ—এসব কী বাপু?' অতি কষ্টে কণ্ঠ ভেদ করে স্বর বার হয়।

মুখখানাকে যতদূর সম্ভব বিপন্ন করে হীরালাল উত্তর দিল, 'এই যে দেখুন না, এদের সঙ্গে হঠাৎ পথে দেখা হয়ে গেল। আর এরা ছাড়তে চাইছে না। আপনাকেও ধরে নিয়ে যেতে চায়। বলে কাজ বেশি—এখন তোমাদের পালিয়ে গেল চলবে কেন?...তা আমি অনেক কষ্টে বলে-কয়ে আপনার ছাড় মঞ্জুর করেছি, কিন্তু আমাকে কিছুতেই ছাড়বে না। পাছে আমি সরে পড়ি বলে একেবারে সঙ্গে সঙ্গে এসেছে।...এক্ষেত্রে আপনি একাই যান—আমি থেকে যাই। কী আর করবেন।'

'তা-তা-তাই না-হয় কর। একি বিপদ রে বাবা, এ আবার কী বিপদে ফেললেন মা সিদ্ধেশ্বরী! তা বাপু, আমাকে এই কাশীটা অবধি পৌঁছে দিয়ে ফিরে এলে হত না?'

'সে তো ভালই হত, কিন্তু এরা যে ছাড়ছে না—দেখতেই তো পাচ্ছেন! ...আমি বরং আমার মোট-মাটারি নিয়ে তাড়াতাড়ি সরে পড়ি, এদের যা কাণ্ড, হয়তো আপনাকেও পাকড়াও করে ধরবে।...গোরার মেজাজ তো—মত বদলাতে কতক্ষণ!'

'না—না, তা হলে আর দেরি করে দরকার নেই। তুমি সরেই পড দুর্গা শ্রীহরি বলে। বিপদে মধুসূদন গমনে বামনশ্চৈব—সর্বকার্যেষু মাধব। মাধব, মাধব।···যাও বাবা, আর দেরি ক'র না।'

হীরালাল চিরদিনই গুরুজনের বাধ্য—সে-ও আর কাল-বিলম্ব করল না। যত শীগগির সম্ভব নিজের বোঁচকাটা নিয়ে বার হয়ে এল।

হীরালাল চিরকালই মার কাছে শুনে এসেছে যে মিথ্যা কথা বলা পাপ। কথাটা তার চর্ম—এমন কি অস্থি ভেদ করে বোধ করি বা মজ্জাতেই মিশে গেছে—এত বারই শুনেছে সে। তাই মিথ্যাকে সে ঘৃণাই করে। তা.ক যে কোনদিন, বিশেষত গুরুজনের সামনে মিথ্যা কথা বলতে হবে—এটা সে

কল্পনাও করে নি। বলবার আগে মনের সঙ্গেও যথেষ্ট তোলাপাড়া করছে, কিন্তু আর কোন উপায় দেখতে পায় নি। এক পথ ছিল—না বলে সরে পড়া, কিন্তু সে-ও একরকমের মিথ্যাচরণ। সে হয়তো আরও হিতে বিপরীত হত। মামা চেঁচামেচি কান্নাকাটি করতেন—হয়তো তাকে বৃথা খোঁজাখুঁজি করতে গিয়ে তাঁর জীবন বিপন্ন হত। তার চেয়ে এ অনেক ভাল। মান-রক্ষার্থে মিথ্যা কথা বলার নির্দেশ তো আছেই শাস্ত্রে—আর এ মান-রক্ষা ছাড়া কী? যিনি বার বার তার জীবন দান করেছেন, কথঞ্চিৎ তাঁরই ঋণ শোধ করা—বা ঋণ শোধের চেষ্টা করা—একে যদি মান-রক্ষা না বলে তো সে বস্তুটি কা তা হীরালাল জানে না।

সৎ উদ্দেশ্যে মিথ্যাচরণেও বাধা নেই। শঙ্করাচার্যের গল্প সে মার কাছেই শুনেছে। শঙ্কর তাঁর জননীর কাছ থেকে সন্ন্যাসের অনুমতি নিতে মায়া-কুম্ভীর সৃষ্টি করেছিলেন। চিৎকার করে মাকে বলেছিলেন, 'মা, কুমীরে আমাকে নিয়ে চলল, যদি সন্ন্যাসের অনুমতি দাও তো ছাড়তে পারে।' মা পুত্রের জীবননাশের ভয়ে সে অনুমতি দিয়েছিলেন। হয়তো কুমীর আদৌ ধরে নি তাঁকে—সবটাই মিথ্যা। শঙ্করের বেলায় যদি দোষ না হয়ে থাক তো তার বেলাই বা হবে কেন?

আসলে হীরালাল নানা পথ ঘুরে সোজা রেসিডেন্সিতে গিয়েছিল। সেখানে তার পূর্ব-পরিচিত মনিবস্থানীয় বহু 'সাহেব'ই আছেন। সুতরাং তার সততায় সন্দেহ করবার কোন প্রশ্নই ওঠে নি। সে যে এই বিপদের মধ্যে পালাবার সর্বপ্রকার সুযোগ-সুবিধে সত্ত্বেও সে-সুযোগ গ্রহণ না করে কর্তব্যবোধে স্বেচ্ছায় বিপদকেই বরণ করে নিতে প্রস্তুত হয়েছে—এতে তাঁরা সকলেই খুব খুশী হয়েছেন, যথেষ্ট বাহাবা এবং সাধুবাদও দিয়েছেন।

হীরালাল তাঁদের মামার কথাটা খুলেই বলেছিল। সব শুনে সাহেবদের একজন মামাকে ঈষৎ ভয় দেখিয়ে তাঁর কবল থেকে মুক্তিলাভের এই সহজ উপায় বাতলেছিলেন এবং তিনিই হীরালালের সম্মতির অপেক্ষা না করে গোরা সিপাহী দু জনকে শিখিয়ে পড়িয়ে সঙ্গে দিয়েছিলেন।

অবশ্য তখনও হীরালাল ঠিক মন স্থির করতে পারে নি। যুক্তিগুলো ক্রমশ আসছে। প্রথমটা সে চমকেই উঠেছিল। মামার কাছে শুধু মিছে কথা বলা নয়—একটা মিথ্যা অভিনয়ও করতে হবে।...অথচ অন্য উপায়ই বা আছে কী? শেষ পর্যন্ত সে কতকটা অনিচ্ছাসত্ত্বেই—যেন অভিভূতের মত—গোরা

দুটোকে পথ দেখিয়ে চটিতে নিয়ে এসেছে এবং সমস্তক্ষণ মনকে প্রবোধ দিতে দিতে এসেছে যে—এতে দোষ নেই, এ এমন কিছু অপরাধ নয়। তৎসত্ত্বেও সেই চিন্তার ফাঁকে ফাঁকে, এই সমস্ত সময়টা অন্য কিছু উপায়ের জন্যও মনের কাছে যথেষ্ট মাথা খোঁড়াখুঁড়ি করেছে, কিন্তু এ সময় আর কোনও সহজ পন্থাও তার মনে আসে নি। আপৎকালে মানুষের সহজবুদ্ধি ও সহজাত চিন্তাশক্তি কোন কাজেই লাগে না—হীরালাল নিজেকে দিয়েই যেন এই কথাটার প্রমাণ পেল।

যা হোক, মামার কবল থেকে মুক্তি পেয়ে বাইরে এসে মামার জন্য যথেষ্ট মন-কেমন এবং এই বোধহয়-বা অকারণ মিথ্যাচরণের জন্য যথেষ্ট গ্লানিবোধ করলেও—একটা মুক্তির আস্বাদও পেল। সবচেয়ে বড় কথা, নিষ্ক্রিয়তা থেকে মুক্তি পেয়ে সে যেন বাঁচল।

হীরালাল সোজা আবার রেসিডেন্সিতেই ফিরে এল। শেষের দিকে রাজা ও নবাবরা যখন অনেকটা কোম্পানির আশ্রিত হয়ে এসেছিলেন, সেই সময়ই নিয়ম হয়—দেশীয় নৃপতিদের রাজধানীতে এক জন করে 'রেসিডেন্ট' বা ঐখানে খুঁটি-গেড়ে-বসে থাকা এক জন বড় কর্মচারী থাকবেন। তিনি কড়া নজর রাখবেন ঐসব রাজা-মহারাজারা বেচাল ধরছেন কিনা, অর্থাৎ কোম্পানির বিরুদ্ধে কোন ষড়যন্ত্র করছেন কিনা। লক্ষ্ণৌ রেসিডেন্সি ও সেই রেসিডেন্ট সাহেবের প্রাসাদ, সেখানেই আজ এখানকার জঙ্গী ও বে-সামরিক সমস্ত ইংরেজ মায় স্ত্রী-শিশু, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা সকলে এসে আশ্রয় নিয়েছে। ছড়িয়ে থাকলে একেবারেই অসহায়, সৈন্যদের সঙ্গে একত্র বাস করায় তবু বাঁচবার একটা আশা আছে।

ফলে কমিশনার সাহেবের অফিস বলুন, সামরিক দপ্তর বলুন, আর কমিসারিয়েট হেড-কোয়ার্টার বলুন—সবই এখন এই রেসিডেন্সি।

কিন্তু হীরালালের মনিবরা রেসিডেন্সিতে তাকে আশ্রয় দিতে রাজী হলেন না। প্রথম কারণ স্থানাভাব। তাঁরা এখনও মাচ্ছিভবন দখল করে আছেন বটে, কিন্তু অচির-ভবিষ্যতে হয়তো ছেড়ে দিতে হবে। তখন একেবারেই জায়গা হবে না। তা ছাড়া হীরালাল ইংরেজ নয়, সিপাহীও নয়—সাধারণ নাগরিকে সঙ্গে বেশভূষায় তার কোন তফাত নেই। তার পক্ষে শহরে কোথাও বাস করে থাকবার অসুবিধে নেই। এখনও তাঁরা ঠিক অবরোধে পড়েন নি, কিন্তু সে সম্ভাবনা খুব সুদূরও নয়। তেমন দিনে সেই অবরোধের বাইরে এক জন বন্ধু বা বিশ্বস্ত কর্মচারী থাকা খুব প্রয়োজন। এই সব ভেবেই তাঁরা হীরালালকে

বললেন, শহরে কাছাকাছি কোথাও একটা বাসা দেখে নিতে। খরচার জন্য কয়েকটি টাকাও দিয়ে দিলেন। এখনও পর্যন্ত রেসিডেন্সিতে আসা-যাওয়ার বিশেষ কোন বাধা নেই—হীরালাল স্বচ্ছন্দে প্রত্যহ আসতে পারবে। এই ভাবেই সে উপকারে লাগবে বেশি।

হীরালাল প্রথমটা একটু ক্ষুণ্ণ হলেও কথাটা বুঝল। একেবারে কর্মকেন্দ্রে বাস করবার একটা প্রবল উত্তেজনা আছে। বিশেষত এইরকম সময়ে। সেটা থেকে বঞ্চিত হয়ে একা একা নির্বান্ধব অবস্থায় কোন একটা বাসায় পড়ে থাকা—কথাটা ভাবতে তেমন ভাল লাগে না। কিন্তু এদের কথাতেও যথেষ্ট যুক্তি আছে। সেটা মনে মনে অন্তত স্বীকার না করে পারে না।

সে আবার রেসিডেন্সি থেকে বার হয়ে শহরে এল এবং খানিকটা ঘোরাঘুরির পর এক দোকানীর সঙ্গে বন্দোবস্ত করে মাসিক চার আনা ভাড়ায় তার দোকানের পেছনে একটা অন্ধকার ঘরে বাসা বাঁধল। পাক করে খাবার বাসনপত্র এবং আঙোটিও সে দেবে—এইরকম বন্দোবস্ত হল।

॥ ৩৮ ॥

মনে মনে সেই গোরা দুটি, তথা সমগ্র ইংরজ জাতি, কাণ্ডজ্ঞানহীন সিপাহী গুলি (এই ঝঞ্ঝাটের জন্য তারাই তো মূলত দায়ী !) এবং সেই সঙ্গে নিজের অকালপক্ক ভাগ্নেটিরও মুণ্ডপাত করতে করতে (কী দরকার ছিল বাপু তোমার অত সাউখুড়ি করে শহরে খবর আনতে যাবার ?), বাবা বিশ্বনাথ, বাবা বৈদ্যনাথ, বাবা গদাধর এবং দেশের মা সিদ্ধেশ্বরীকে স্মরণ করে মনে মনে তেত্রিশ কোটি দেশবাসীকে প্রণাম জানাতে জানাতে দুর্গা-শ্রীহরি বলে মৃত্যুঞ্জয় পরদিন প্রত্যূষেই আলমনগরের চটি থেকে যাত্রা করলেন।

কিন্তু হায়, কোন কারণে হয়তো ঐ সমগ্র তেত্রিশ কোটিই—অথবা কোন শক্তিশালী দেবদেবী কেউ তাঁর ওপর অপ্রসন্ন হয়েছিলেন। কিছু দূর যেতে না যেতেই পথের মাঝে আর এক অঘটন ঘটল।

মৃত্যুঞ্জয় ওখান থেকে বার হয়ে প্রাণপণে হেঁটে মাত্র দু দিনেই অযোধ্যা পৌঁছলেন। অযোধ্যা তীর্থস্থান, তা ছাড়া ওখানে কোন ছাউনি বা সেনানিবাস নেই বলে অনেকটা নিরাপদ। সুতরাং ওখানে পৌঁছে তিনি অনেকটা হাঁফ

ছাড়লেন। পুরাতন বংশগত পাণ্ডাও জুটে-গেল এক জন—শহরে পা দিতে-না-দিতেই। তিনি স্থির করলেন, পাণ্ডার বাড়িতে পুরো একটা দিন বিশ্রাম করবেন। এই দু দিন অতিরিক্ত হাঁটায় হাঁটু দুটোতে অসম্ভব ব্যথা হয়েছে, তা ছাড়া এখান থেকে পথঘাটের খবরাখবর সংগ্রহ করাও দরকার। বেশ হিসেব করে নিরাপদ পথ ধরতে হবে। কাশীতে পৌঁছলে গাড়ি পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু তার আগে অবধি বড়ই গোলমাল।

পাণ্ডাকে তিনি দক্ষিণাদি ভালই দিয়েছিলেন। সে-ই উৎসাহী হয়ে পথের খবর সংগ্রহ করে আনল। কিন্তু খবর যা পাওয়া গেল তা মোটেই সুবিধের নয়। কাশী ও এলাহাবাদের পথ ধরা এখন নাকি অত্যন্ত বিপজ্জনক। ইংরেজ ফৌজ ওদিকে যথেচ্ছাচার করে বেড়াচ্ছে—এদেশী লোক দেখলেই নাকি ধরে ফাঁসি দিচ্ছে, কাউকে কাউকে আরও যন্ত্রণা দিয়ে মারছে। যুবকদের তো কথাই নেই—বৃদ্ধরাও খুব নিরাপদ নয়।

মৃত্যুঞ্জয়ের মুখ শুকিয়ে উঠল।

দুর্গা-দুর্গা, জয়-মা-সিদ্ধেশ্বরী, মা, কোনমতে কটা দিন চালিয়ে নাও মা।

অনুতাপ হতে লাগল, মেজর সাহেবকে ধরে একটা পরিচয়-পত্র লিখিয়ে নিলে হত, তা হলে গোরারা কোন জুলুম করত না। বড়জোর ধরে চাকরি করিয়ে নিত। কিন্তু এ যে পৈতৃক প্রাণ নিয়েই টানাটানি।

পরক্ষণেই মনে হল যে, সে আরও বিপদ। যে কারণে তিনি কমিসারিয়েটের সঙ্গে যোগাযোগের সমস্ত কাগজপত্র নিশ্চিহ্ন করে পথে বের হয়েছেন, সে কারণ তো এখনও বিদ্যমান—অর্থাৎ সিপাহীদের হাতে পড়লে?

তিনি ঠিক করলেন—ও-পথে যাবেন না। পাকা সড়কের মায়াও ত্যাগ করলেন। গুণ্ডা-বদমায়েশ—ফাঁসুড়ে-ঠ্যাঙাড়ের দলও সাধারণত বড় সড়কের ধারেই ওৎ পেতে বসে থাকে। গ্রামাঞ্চল ধরে ক্ষেতের আলে আলে যদি চলা যায় তো অত বিপদের সম্ভাবনা নেই। তা ছাড়া গোরা আর সিপাহী এদের সঙ্গে মোলাকাৎ হবার সম্ভাবনাও কম।

আরও একটা সুবিধে হয়ে গেল। পাণ্ডার বাড়িতে আর একটি বৃদ্ধ বাঙালী যাত্রীর সঙ্গে আলাপ হল। তিনি এসেছিলেন তীর্থ-দর্শন করতে। সঙ্গে বড় একটি দল ছিল। মথুরা থেকে বেরিয়ে আগ্রার কাছাকাছি পৌঁছতেই তাঁরা হাঙ্গামা পান। বড় রকম একদল সিপাহীর হাতে তাঁদের সর্বস্ব যায়। সেই সঙ্গে দলছাড়া হয়েও পড়েন। বাকি সকলে যে

কোন্‌দিকে গিয়েছে তা তিনি আজও জানেন না। কোনমতে পথে ভিক্ষে করতে করতে এখানে এসে পৌঁচেছেন। নেহাত পুরনো পাণ্ডা, তাই সে আশ্রয় দিয়েছে, দু-একটি টাকাও দিয়েছে। সেই ভরসাতেই তিনি এখন দেশে রওনা হচ্ছেন। খানাকুল কৃষ্ণনগরে তাঁর বাড়ি—দেশে ঘর-বাড়ি জমিজিরাত সবই আছে। দেশে পৌঁছলে তাঁর টাকার অভাব থাকবে না।

লোকটিকে ভাল লাগল মৃত্যুঞ্জয়ের। তবে এভাবে ফাঁসুড়ে-ঠ্যাঙাড়েরাও অনেক সময় আলাপ জমাত—তা তিনি শুনেছেন। তাদের কেউ কেউ এখনও বেশ বহাল-তবিয়তে কারবার চালিয়ে যাচ্ছে—এও শোনা যাচ্ছে। এই ব্যক্তি সেই উদ্দেশ্যেই "জমাচ্ছে" কিনা কে জানে। অনেক করে তাই বাজিয়ে দেখলেন মৃত্যুঞ্জয়। শেষ অবধি সন্দেহ অনেকটা দূর হল—মনে হল লোকটা সত্যি কথাই বলছে। এতটা বয়স হল তাঁর—দেখলেন শুনলেনও ঢের, মানুষ কতকটা চিনতে পারেন বৈকি! তা ছাড়া পাণ্ডা আশ্বাস দিল—পরিচিত যজমান, যাওয়ার পথেও তীর্থকৃত্য করে গেছে।

মৃত্যুঞ্জয় কতকটা নিশ্চিন্ত হয়ে যজ্ঞেশ্বরের সঙ্গে (লোকটির নাম যজ্ঞেশ্বর মজুমদার) পরামর্শ করতে বসলেন। ঠিক হল যে বেশভূষা যতদূর সম্ভব নগণ্য করে, প্রায় ভিখারীর বেশে তাঁরা গ্রামপথে রওনা হবেন—যজ্ঞেশ্বরের গল্পটাই দু জনে চালাবেন, অর্থাৎ তাঁরা দু জনেই যেন দলছাড়া হয়ে পড়েছেন এবং দাম দিয়ে খাদ্য বা আশ্রয় না খুঁজে সোজাসুজি গ্রামবাসীদেরই সাহায্য প্রার্থনা করবেন। তা হলে আর যাই হোক, ফাঁসুড়ে-ঠ্যাঙাড়েরা পিছু নেবে না, পথে ডাকাতেও ধরবে না।

সেই ভাবেই রওনা দিলেন দু জনে। বিছানাপত্র মৃত্যুঞ্জয়ের সঙ্গে যা ছিল তা পাণ্ডার বাড়িতেই রয়ে গেল। স্থির রইল ভালয়-ভালয় যদি তিনি কোন দিন মীরাটে ফিরতে পারেন তো যাওযার পথে নিয়ে যাবেন। তাঁদের এখন তরুতল-বাসই বিধেয়—বিছানাপত্রে আর কাজ নেই। বলতে গেলে এক বস্ত্রেই তাঁরা রওনা দিলেন। পরনের ধুতি ও পিরান—এই কদিনেই যথেষ্ট ময়লা হয়ে উঠেছিল, তা আর পরিষ্কার করবার চেষ্টা করলেন না। ফলে এমনিতেই যথেষ্ট দীন দেখাতে লাগল।

তিন-চার দিন বেশ চললেন তাঁরা।

যেখানেই যান, গ্রামবাসীরা সাদরে আশ্রয় দেয়। বিশেষত মৃত্যুঞ্জয়

ব্রাহ্মণ—এই পরিচয় পেয়ে আরও খাতির করে। আহা, গোলমালে এমন কত লোকই না পথে বসেছে! সাহায্য করা প্রয়োজন বৈকি। এ তো গৃহস্থেরই ধর্ম। হোক 'মছলীখোর বাংগালী'—তবু 'বাহ্মন' তো। এমন কি খাটিয়া বা শয্যাদিরও অভাব হল না। দু-চারটে 'খট্‌মল' অদৃষ্টে জুটল—তা আর কি করা যাবে। সব সুখ কি আর হয়।

মৃত্যুঞ্জয় নিজেই বার বার নিজের বুদ্ধির তারিফ করতে লাগলেন। শুধু যে নিরাপদে যাচ্ছেন তা নয়—এক পয়সা খরচও হচ্ছে না। এটা কী কম লাভ!

কিন্তু হঠাৎ গাজীপুর ছাড়িয়ে এসে এক বিপত্তি বাধল।

সন্ধ্যা হয়-হয়। গ্রীষ্মের অপরাহ্ণও ম্লান হয়ে এসেছে। পাখীরা ইতিমধ্যেই গাছপালায় রাত্রির আশ্রয় খুঁজতে ব্যস্ত। হাওয়া একেবারে ঠাণ্ডা না হলেও তার সেই প্রচণ্ড দাহ খানিকটা কমে গেছে—এখন হাঁটা অনেক সহজ। মৃত্যুঞ্জয় ও সর্বেশ্বর দুপুরের পরেই এক গাঁ থেকে রওনা দিয়েছেন আকাশের সেই অগ্নিবৃষ্টির মধ্যেই—গ্রামবাসীদের হিসেব সত্য হলে এক প্রহরের মধ্যেই একটা বড় গণ্ড-গ্রামে পৌঁছবার কথা। কিন্তু গ্রামের কোন চিহ্ন পর্যন্ত নেই কোথাও। তাঁরা দু জনেই যথাসাধ্য দ্রুত হাঁটছেন—অনেকক্ষণ ধরেই এই ভাবে চলছেন, যে-কোন পথেই যে-কোন একটা গ্রাম পাওয়ার কথা। কে জানে, হয়তো বা পথ ভুলে তাঁরা একই পথে ঘুরছেন—নইলে এমন হবে কেন?

আসলে একটা বড় জঙ্গলের মধ্যে এসে পড়েছেন তাঁরা—এখানে পথ নির্ণয় করা শক্ত। মাঝে মাঝে এক-আধটু ফাঁকা যে না পাচ্ছেন তা নয়, কিন্তু সে সবই অনাবাদী জমি—মানব-বসতির স্বাক্ষর তার বুকে নেই। তবে ভরসার মধ্যে পায়ে-হাঁটা পথ একটা বরাবরই পাচ্ছেন—অর্থাৎ এ পথে লোক যাতায়াত করে। কিন্তু তা হোক, রাত্রের অন্ধকারে এ জঙ্গলের পথে যাওয়া ঠিক নয়। বাঘ-ভালুক তো আছেই—বেশি যেটা ভয় সেটা সাপকে। এই গরমের দিনে এদেশের জঙ্গলে সব রকম বিষাক্ত সাপেরই সাক্ষাৎ মিলতে পারে। সিপাহীর হাত থেকে বাঁচতে এত কাণ্ড করে শেষে কি সাপের কামড়ে প্রাণ দেবেন নাকি?

গ্রাম কোথায়? কত দূর? কোন্ পথে?

দু জনেই দু জনকে অবিরত প্রশ্ন করছেন। দু জনেই যৎপরোনাস্তি শঙ্কিত হয়ে উঠেছেন এবং পরস্পরের প্রতি বিরক্তও। দু জনেই দু জনকে দোষারোপ

করছেন—'তোমার জন্তই এই কাণ্ডটি হল! তুমিই তো এই পথে নিয়ে এলে।··
আমি তখনই বলেছিলুম।'· ইত্যাদি।

এই যখন অবস্থা, ছ জনেই যখন প্রাণ বাঁচাতে প্রাণপণে ছুটে চলেছেন, হঠাৎ মনে হল পাশের সেই নিবিড় জঙ্গলেব ছায়ার মধ্যে থেকে অশরীবী কোন কণ্ঠস্বর ক্ষীণ, অতি ক্ষীণ কণ্ঠে যেন ফিস্ ফিস্ কবে ডাকল, 'বাবু।'

বলা বাহুল্য, ছ জনেই প্রচণ্ড বিস্ময়ে ও শঙ্কায় পাথব হয়ে গেলেন। না বাব হল কণ্ঠ থেকে কোন শব্দ—আব না চলল পা।

ভূত?

ভূত তো বটেই। তবে—কা ভূত?

আবারও সেই শব্দ হল' 'বাবু। বাবু। এই যে-এদিকে। দয়া করে দাঁড়াও —প্লীজ।'

বিস্ময়ের প্রথম মূঢ়তা ও জড়তা কাটতে, ছ জনেই প্রচণ্ড একটা দৌড়েব জন্ত উদ্যত হয়েছিলেন—এখন এতগুলি কথাব পব সামান্ত একটু ভবসা হল। ছ জনেই ভয়ে ভয়ে নিজেদেব বাঁ পাশেব ছায়াঘন গাছগুলিব দিকে চাইলেন।

জঙ্গলের মধ্যে থেকে এবাব বিচিত্র এক মূর্তি প্রায হামাগুড়ি দিয়ে বেব হয়ে এল।

এ যদি প্রেত না হয তো প্রেত কে?

গায়ত্রী তো দূরের কথা—রাম-নামটাও বুঝি মনে পড়ে না।

'বাবু, ভয় পেও না। আমি ইংরেজ।'

আগের মত ভাঙা হিন্দীতে সেই প্রেতটা বলে ওঠে কথাগুলো।

এবার ভাল করে তাকান ছ জনে।

সত্যিই তো—গায়ের বংটা এককালে সাদাই ছিল—তার কিছু চিহ্ন আজও আছে। পোশাকটা শতচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে, কিন্তু তবু তা যে সাহেবী পোশাক তাতেও সন্দেহ নেই। তবে কঙ্কালসার মূর্তি, চক্ষু কোটবগত—সবটা জড়িয়ে প্রেতেরই মত দেখাচ্ছে। এ মূর্তি স্পষ্ট দিনের আলোতে দেখলেও ভয় পাবার কথা।

লোকটা হামাগুড়ি দিয়েই আর কতকটা এসে কোনমতে সোজা হয়ে দাঁড়াল।

'বাবু, তোমরা তো বাঙালী—না? তোমাদের নাঙ্গা শির আর হাঁটবার ধরন দেখেই ধরেছিলুম। আমি ইংরেজ। ফত্তেপুরে ছিলুম। মিলিটারির

সঙ্গে সম্পর্ক নেই—নিতান্তই কারবারী লোক। আগে অতটা গোলমাল বুঝি নি, যখন বুঝলুম, তখন আর উপায় ছিল না। কোনমতে জানটা নিয়েই পালাতে পেরেছি। সঙ্গে মেম আছেন—ঐ দেখ, বনের মধ্যেই এলিয়ে পড়েছেন। আর এক পা চলবার সামর্থ্য নেই। কদিন ধরেই হাঁটছি—অবিরত হাঁটছি বনের মধ্যে দিয়ে। বুনো ফল খাচ্ছি, দু-একটা আমও পেয়েছি মাঝে মাঝে, কিন্তু বিশ্রাম পাই নি কোথাও। লোকালয়ে যাবার সাহস নেই—পাছে ধরা পড়ি।...এ দিকটা দেখেছি অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা—হয়তো গ্রামে গিয়ে পড়লে একটা সুবিধে হতে পারে। কিন্তু বিপদ হয়েছে কি আরও—সঙ্গে টাকা-পয়সা কিছুই নিয়ে আসতে পারি নি। খেতে বসেছিলুম, কোনমতে পেছনের দোর দিয়ে বেরিয়ে বাগানের পাঁচিল টপকে পালিয়েছি। এক-কাপড়ে এসেছি—পয়সা পাব কোথায়। অথচ এখন আর একটুও চলতে পারছি না। টাকা থাকলে গ্রামে গিয়ে একটা বয়েল গাড়ির খোঁজ করতুম। কিন্তু সে উপায়ও নেই।'

সাহেব এক নিশ্বাসে হাঁপাতে হাপাতে কথাগুলি বলে শেষ করলেন।

যজ্ঞেশ্বর মজুমদার ভালমানুষ লোক, তিনি তাড়াতাড়ি ছুটে মেমসাহেবের অবস্থা দেখতে গেলেন। কিন্তু মৃত্যুঞ্জয়ের চোখদুটো প্রথম থেকেই ছিল সাহেবের আঙুলের দিকে। এখন তাঁর হাতের হীরার আংটিটার দিকে দেখিয়ে বললেন, 'সাহেব, টাকা নেই বলছ, ওটা কি আসল পাথর নয়?'

সাহেব এত দুঃখের মধ্যেও ম্লান একটু হাসলেন। বললেন, 'হ্যা, আসলই। শুধু পাথরটার দামই আড়াই শ টাকা। কিন্তু পাথর তো ভাঙানো যায় না—ও দিয়ে কী হবে? এক মুঠো চানা কিনতে পারব—না বয়েল গাড়ির ভাড়া দিতে পারব?'

মৃত্যুঞ্জয় কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বললেন, 'ওটা বেচবে সাহেব?'

'কিনবে তুমি?' সাহেবের চোখে আশার আলো ঝলকে ওঠে। পরক্ষণেই ম্লান হাসেন আবার, 'এটা আমার বিয়ের আংটি, বেচার ইচ্ছে নেই একটুও—হাউএভার, এখন আর এসব ভাবতে গেলে চলবে না। নগদ টাকা কিছু পেলে বেঁচে যাই।'

লোভে মৃত্যুঞ্জয়ের চোখ দুটো জ্বলে উঠল। তিনি বললেন, 'একটা মোহর আর তিনটে রুপোর টাকা দিতে পারি সাহেব—দেখ।'

'এত কম দাম!' সাহেব হতাশভাবে বললেন, 'এত কমে দেব এই দামী

জিনিসটা ?' তার পর একটু সন্দিগ্ধভাবে তাকান মৃত্যুঞ্জয়ের দিকে, 'তোমার কাছেই আছে টাকা ?'

'আছে বৈকি সাহেব। টাকা না পেলে তুমি মাল ছাড়বে কেন ?'

'সব রুপোর টাকা দিতে পার না ?'

'নেই। রুপোর টাকার ভার বেশি, সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়া বিপদ—বোঝই তো সাহেব।'

সাহেব কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'আচ্ছা, তাই হবে, দাও তুমি টাকা।'

মৃত্যুঞ্জয়ের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিনি পিরানের জেবে হাত পুরে একটা ছেঁড়া ন্যাকড়া বের করলেন। তার এক প্রান্তে বাঁধা আছে তিনটে টাকা—আর এক প্রান্তে বোধ হয় কিছু খুচরো রেজগি। সম্ভবত এখান থেকে সুদূর বাংলা দেশ পর্যন্ত যাবার মোট রাহাখরচ হিসাবে ঐগুলিই বাইরে রেখেছিলেন। এখন ন্যাকড়ার প্রান্ত থেকে অতি সন্তর্পণে টাকা তিনটি বের করে বার বার গুনে সাহেবের হাতে দিলেন। তার পর আবার ন্যাকড়াটি সেই জেবেই পুরে রাখলেন। তার পর ধীরে-সুস্থে কোমর থেকে গেঁজেটি খুলে সবে হাতে করছেন—এমন সময় এই কাণ্ড।

একেবারে সম্পূর্ণ আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত ঘটনাটা! কল্পনারও অতীত।

যেন মাটি ফুঁড়ে সেই জঙ্গলের মধ্যে থেকে একেবারে সাত-আট জন লোক বেরিয়ে তাঁদের ঘিরে দাঁড়াল।

সম্পূর্ণ নিঃশব্দে অথচ বিদ্যুৎগতিতে তারা এসে পড়েছে—এত নিঃশব্দে এবং এত দ্রুত যে, উপস্থিত চার জনের এক জনও তাদের আগমন টের পায় নি।

যারা এসেছে তারা সকলেই এ দেশী পশ্চিমা—মৃত্যুঞ্জয়ের ভাষায় 'খোট্টা'। ঠিক সিপাহী নয় তবে বরকন্দাজ জাতীয়—সকলেরই হাতে মোটা বাঁশের পাকানো লাঠি। কেবল এক জনের হাতে একটা বন্দুক।

ওঁদের ঘিরে দাঁড়িয়ে তারা যেন পৈশাচিক উল্লাসে একটা চীৎকার করে উঠল এই প্রথম শব্দ তাদের।

সন্ধ্যার অন্ধকারে সেই ভয়াবহ উল্লাস-ধ্বনি জঙ্গলের ছায়াঘন বিভীষিকাকে আরও বাড়িয়ে চারদিকে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। সে শব্দে সন্ত্রস্ত নীড়ে

-আসা পাখীগুলো ভয়ে গাছের আশ্রয় ছেড়ে ঝটাপট করে আবার আকাশে উড়ে গেল। কোথায় একটা কী জানোয়ারও যেন সভয়ে ডেকে উঠল।

বিস্ময়ের প্রথম বিহ্বলতা কাটতেই মৃত্যুঞ্জয় তাড়াতাড়ি গেঁজেটা লুকোবার চেষ্টা করতে গেলেন, কিন্তু তার আগেই একটা লাঠিয়াল এসে বজ্রমুষ্টিতে তাঁর হাত চেপে ধরল।

'চোট্টা কাঁহাকা। সাম্হাবকে!'

তার পর মহা সোরগোল করে ওরা চার জনকেই বেঁধে ফেলল এবং টানতে টানতে নিয়ে চলল। বেচারী মেমসাহেব সত্যিই অর্ধমৃতের মত পড়ে ছিলেন, অবিরত চলবার ফলে তাঁর রক্তাক্ত ও ক্ষতবিক্ষত দুটি পা ফুলে উঠেছে—এক পা-ও আর হাঁটবার সামর্থ্য নেই। তাঁকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছিল, সাহেব দু হাত জোড় করে বললেন, 'ওঁকে আমি বয়ে নিয়ে যাচ্ছি—ছেড়ে দাও আমার হাতে।'

কী ভেবে লোকগুলো আপত্তি করল না। সাহেব কোনমতে তাঁকে জড়িয়ে ধরে বহন করতে লাগলেন। সাহেবেরও অবস্থা ভাল নয়। সেদিকে তাকিয়ে যজ্ঞেশ্বর ভয়ে ভয়ে বললেন, 'আমি ধরব আর এক দিকে?'

সাহেব কোন উত্তর দেবার আগেই বন্দুকধারী লোকটা ধমক দিয়ে উঠল, 'নহি—নেহি, তুম আপ্না চলো ঠিক্সে। চুপচাপ!'

যজ্ঞেশ্বর ভয়ে চুপ করে গেলেন।

কিন্তু মৃত্যুঞ্জয়ের এসব কোনদিকে লক্ষ্য নেই। তাঁর মোহরপূর্ণ গেঁজেটি ওদের হস্তগত হয়েছে। বাধা দিতে যে চেষ্টা করেন নি তা নয়, কিন্তু তাতে শুধু হাতের ওপর লাঠির আঘাত খাওয়াই সার হয়েছে। এখনও হাতের গাঁটটা ঝন্ঝন্ করছে। তবে সেদিকেও তাঁর তত লক্ষ্য নেই, তিনি শুধু হায় হায় করে চলেছেন। আর কি ঐ গেঁজে তিনি ফিরে পাবেন? এতগুলি মোহর! এতদিনের সঞ্চয়! এত কষ্ট করে এত পথ বাঁচিয়ে এসে এ কী হল।—'হায়, হায়! হে ভগবান, এ কি করলে! হে মা সিদ্ধেশ্বরী, তোমার মনে কি এই ছিল মা?'

সেই অবিরাম চীৎকারে বিরক্ত হয়ে সর্দার গোছের লোকটা ধমক দিল, 'আরে এ বুড্ঢা! চুপচাপ চলো। চিল্লাও মৎ নেহি তো—'

'নেহি তো' কা হবে তা অনুমান করা কঠিন নয়। কিন্তু মৃত্যুঞ্জয় চুপ করতে পারেন কৈ?

'আরে বাবা, আমার গলাটা আগে কেটে ফেল তোরা। আর আমার বেঁচে দরকার কী? আমার জরু-ছাওয়ালই যদি না খেতে পায় তো আমি বেঁচে কী করব?'

সাহেব এবার ইংরেজিতে বললেন, 'চেঁচিয়ে তো লাভ নেই বাবু, মাথা ঠাণ্ডা করে ভাব কী করা যায়। এখনও তো প্রাণটা আছে, সেটাও যেতে পারে—সেই কথাটা ভাব। বাঁচলে অনেক টাকা কামাতে পারবে!'

ইংরেজি বলতে না পারলেও কতক কতক বুঝতে পারেন মৃত্যুঞ্জয়! কথাটা বুঝলেন, হৃদয়ঙ্গমও হল। অপেক্ষাকৃত একটু শান্ত হয়ে, যে ব্যক্তি তাঁকে ধরে নিয়ে যাচ্ছিল তাকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করলেন।

সে লোকটা কতক উত্তর দিল—কতক উত্তর দিল না। তবু তারই মধ্যে থেকে যতটা বোঝা গেল—এরা স্থানীয় জায়গীরদার রামচরিত সিং-এর লোক। এই সাহেবটার খবর পেয়ে আজ দু দিন ওরা জঙ্গলে ঘুরছে কিন্তু ধরতে পারে নি—সাহেব ও মেমসাহেব বার বার সুকৌশলে তাদের এড়িয়ে গিয়েছেন। এত পরিশ্রম এতক্ষণে সার্থক হয়েছে—আসলটা তো পেয়েছেন, ফাউটাও মিলেছে। অর্থাৎ এই বজ্জাত 'সাহাব-লোগ'দের সাহায্যকারী বেইমান 'পুরবীয়া'ছুটোকেও পেয়েছে! আজ ভারী ইনাম মিলবে মনিবের কাছ থেকে।

মৃত্যুঞ্জয় সব শুনে কাতর কণ্ঠে আর একবার মা সিদ্ধেশ্বরীকে স্মরণ করলেন।

রাত্রি এক প্রহর পর্যন্ত হেঁটে অবশেষে এক সময় তাঁরা রামচরিত সিং-এর প্রাসাদে পৌঁছলেন। ঘিঞ্জি গণ্ডগ্রামের মধ্যে মাটির উঁচু পাঁচিল-ঘেরা সে প্রাসাদ। তার বেশির ভাগই খাপরার চালা, মাটির ঘর—মধ্যে খানিকটা পাকা বাড়িও আছে; একদম জানালাহীন কতকগুলি ঘর—সম্ভবত মধ্যের একটা চতুষ্কোণ উঠান ঘিরে তৈরী হয়েছে। তার দরজা সব ভেতরের দিকে শুধু নীরন্ধ্র নিরেট উঁচু দেওয়াল। জেলখানার পাঁচিলের মত দেখাচ্ছে। পাকাবাড়ির চালটাও খাপরার, তবে ঘরগুলো খুব উঁচু।

পাকাবাড়িটার সাম্‌নাসাম্‌নি বাইরের তৃণলতাশূন্য প্রাঙ্গণে কয়েকটা চারপাই পেতে কতকগুলো লোক বসে আড্ডা দিচ্ছিল। প্রায় সবটাই অন্ধকার, উঠোনের মধ্যে দু দিকে দুটো খুঁটিতে বাঁধা গোটা চারকে মশাল জ্বলছে বটে, কিন্তু তাতে আলো হয়েছে অতি সামান্য স্থানেই।

লাঠিয়ালগুলো ঢুকতে ঢুকতে একটা বিচিত্র উল্লাসধ্বনি করে উঠল—তাতে কোন কথা নেই, শুধুই শব্দ খানিকটা—ভেতর থেকেও জাগল তার প্রতিধ্বনি। মাঝের চারপাইতে যে একহারা লম্বা চেহারার লোকটা বসে হুঁকো টানছিল, তারই সামনে গিয়ে কয়েদীদের দাঁড় করিয়ে দেওয়া হল!

কড়া দা-কাটা তামাকের ধোঁয়ায় চারদিকের বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে। সেই ধোঁয়া নাকে যেতে যজ্ঞেশ্বর ও সাহেব দু জনেই খক্ খক্ করে কাসতে শুরু করলেন। সর্দারটা আবারও প্রচণ্ড ধমক দিয়ে উঠল, 'চুপচাপ খাড়া রহো—বেকুফ কাঁহাকা।'

চারপাইতে উপবিষ্ট সেই লোকটিই সম্ভবত জায়গীরদার রামচরিত সিং। হুঁকো থেকে মুখ না সরিয়েই জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে বাঙালী দু জনের দিকে তাকাল। তখন বন্দুকধারী সর্দারটা দু হাত জোর করে যা নিবেদন করল তার মর্মার্থ এই যে—এই বাঙালী দুটোও নিশ্চয়ই ইংরেজ কুত্তাদের গুপ্তচর, কারণ ভিখিরীর মত বেশভূষা হলেও এদের কাছে প্রচুর টাকা-মোহর আছে। এরা এই সাহেবটাকে টাকা দিতেই জঙ্গলে এসেছিল, নইলে ওখানে ওদের কী দরকার? আর এই বদমাশ চেহারার লোকটা গেঁজে খুলে সাহেবকে টাকা দিচ্ছিল—সেই সময়েই ওরা ধরে ফেলেছে। নিশ্চই আগে থেকে ষড় ছিল, নচেৎ জঙ্গলে সাহেবটা আছে—ওরা কেমন করে জানল?

এবার হুঁকোটা মুখ থেকে সরল। ষড়যন্ত্রের চেয়ে স্বর্ণের মূল্য বেশি। রামচরিত প্রশ্ন করল, 'সে মোহর কোথা?'

'এই যে।' সর্দার গেঁজেটা খুলে মোহরগুলি রামচরিতের কোলের মধ্যে ফেলে দিল! মৃত্যুঞ্জয় সব ভুলে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'আরও ঢের ছিল হুজুর, আরও ঢের ছিল!'

পিঠে একটা প্রচণ্ড গোঁত্তা খেয়ে তিনি চুপ করতে বাধ্য হলেন। কিন্তু ব্যাপারটা বুঝতে রামচরিতের এতটুকুও দেরি হল না। সে বলল, 'কত ছিল ঠিক বল তো বাবু? তোমার কোন ভয় নেই—বল!'

মৃত্যুঞ্জয় ভয়ে ভয়ে পেছনের লোকটার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তা প্রায় দেড় শ মোহর ছিল হুজুর!'

ছিল আরও বেশি। কিন্তু সামনে রাম, পেছনে রাবণ—রাবণকেও ভয় করবার কারণ যথেষ্ট।

রামচরিত একবার চোখ বুলিয়েই মোহরগুলি গুনে ফেলল। তার পর কঠিন

স্থির দৃষ্টিতে সর্দারের দিকে তাকিয়ে বলল, 'বার কর বাকি মোহর এখনই নইলে এই সব কট্টাকে কুকুর দিয়ে খাওয়াব।'

সর্দার নতমস্তকে কোমরে জড়ানো কাপড়ের খাঁজ থেকে কয়েকটা মোহর বার করে দিল।

'আর?'

'আর নেই, গঙ্গাকসম।'

রামচরিতের দৃষ্টি স্নিগ্ধ হয়ে এল। সে মোহরগুলি আবাব গেঁজেতে পুরে সংক্ষেপে হুকুম করল, 'এদের দু দলকে দুটো ঘরে পুরে রাখ। কাল সকালে এদের বিচার হবে।'

অন্ধকার জানালাবিহীন ঘর। দিনের প্রচণ্ড অগ্নিদাহের পর সে ঘর সরা-ঢাকা তপ্ত হাঁড়ির মতই হয়ে উঠেছে। সেই রকম একটা ঘরে পুরে রেখে ওরা চলে যাচ্ছিল—দূর থেকে এক জন কে বলে উঠল, 'আরে ভাই, একটু একটু জল দিয়ে রাখ ঘরে, নইলে লোকগুলো মরে যাবে যে!'

বোধ করি সেই কথা মতই খানিক পরে সর্দার আবার দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল। তার এক হাতে এক ঝাঁঝোরা জল, আর এক হাতে একটা চিরাগ। জলের কলসী নামিয়ে সে বাইরে যাবে, হঠাৎ মৃত্যুঞ্জয় পৈতেটা হাতে জড়িয়ে দু হাতে সর্দারের পা জড়িয়ে ধরলেন, 'হুজুর, আমি ব্রাহ্মণ, আপনার পায়ে পড়ছি, আমার একটি উপকার করুন। দেখুন আমি এক কথায় আপনাকে অতগুলো মোহর পাইয়ে দিলুম।'

'এই, পা ছাড়! মোহর তো সব ফিরিয়ে দিলুম।'

মৃত্যুঞ্জয়ের দু চোখে অপরিসীম ধূর্ততা ফুটে উঠল। তিনি বললেন, 'গোনাগাঁথা মোহর আমার। আমি জেনেশুনেই কমিয়ে বলেছি, হুজুর!'

'হুঁ। তা থেকে ভাগ দিতে হবে না?' বিরস কণ্ঠে বলে সর্দার।

'তা হোক। মোটামুটি তো আপনিই নেবেন হুজুর। এতগুলো টাকা! তার বদলে আমার একটা সামান্য উপকার করুন, আমি কাউকে কিছু বলব না। দেখুন ব্রাহ্মণ হয়ে আপনার পায়ে ধরছি!'

'ছেড়ে-টেড়ে দিতে পারব না আমি। তা হলে আমার গর্দান থাকবে না।'

'না, না, ছাড়তে হবে না। একটা খৎ পাঠাব আমি লক্ষ্ণৌতে। সেখানে আমার ভাগ্নে থাকে। কোনমতে সেটা তাকে শুধু পাঠিয়ে দিতে হবে।

দোহাই হুজুর, এই উপকারটি করুন। একটু কাগজ-কলমের ব্যবস্থা করুন—আর কিছু নয়। দোহাই আপনার!'

সর্দারটি জাতে কুর্মী। ব্রাহ্মণ পায়ে ধরেছে—মনে মনে সে খুবই কুণ্ঠিত হয়ে পড়েছিল। সে বলল, 'আচ্ছা, আমি কাল খুব ভোরে কাগজ-কলম এনভেলাপ সব এনে দেব। লিখে দিও।'

'ঠিক পাঠাবেন হুজুর ?'

'ঠিক পাঠাব। গঙ্গাকসম।'

'গঙ্গাকসমের এইমাত্র যা নমুনা পেলাম হুজুর, আপনি বরং আমার জেনেউ ছুঁয়ে বলে যান।'

একটু ইতস্তত করে সর্দার মৃত্যুঞ্জয়ের উপবীত স্পর্শ করেই শপথ করল, তাঁর খৎ সে ঠিক পাঠিয়ে দেবে।...

সর্দার তার প্রতিশ্রুতি মত খুব প্রত্যূষে, সূর্য অভ্যুদয়েই যথাসম্ভব তস্করগতিতে কাগজ-কলম প্রভৃতি নিয়ে উপস্থিত হল। মৃত্যুঞ্জয় সংক্ষেপে তাঁর বন্দীদশার সংবাদ দিয়ে হীরালালকে লিখলেন, 'সাহেবদের বলে যদি গোরা আনতে পার একদল, তবেই আমাদের প্রাণ রক্ষা হয়। সাহেব-মেমদের কথা ব'ল—তাঁরা রাজী হবেন। সময়ে এলে হয়তো টাকা কটাও উদ্ধার হতে পারে! কী আর বলব—তুমি আমার সন্তানের মত, তোমার হাতেই আমার জীবন-মরণ নির্ভর করছে।'

সর্দার যেমন এসেছিল, চিঠি নিয়ে তেমনি নিঃশব্দে ও গোপনে বেরিয়ে গেল।

একটু পরেই স্বয়ং রামচরিত এসে আবার দোর খুলল। তখনও ভাল করে সকাল হয় নি। ভেতরে এসে কিছুক্ষণ চুপ করে ওদের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, 'তোমরা ব্রাহ্মণ, তোমাদের আমি অনিষ্ট করতে চাই না। তোমাদের এখনই ছেড়ে দিচ্ছি। কিন্তু সকাল হবার আগেই গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যাও!'

মৃত্যুঞ্জয় প্রথমটা যেন কানকে বিশ্বাস করতে পারলেন না।

এতক্ষণ তিনি দেওয়ালে ঠেস দিয়ে মড়ার মত পড়ে ছিলেন। এখন একেবারে এক লাফে উঠে দাঁড়ালেন, 'ভগবান আপনার কল্যাণ করবেন হুজুর, সত্যনারায়ণ আপনাকে দীর্ঘজীবী করবেন। কিন্তু হুজুর—'

'কী ?' কঠিন কণ্ঠে রামচরিত প্রশ্ন করে।

'আমার মোহরগুলো ? দু-চারটে ফেরত পাই না হুজুর ?'

'দুপুরবেলা পঞ্চায়েৎ বসবে। তোমাদের বিচার হবে। সেইখানেই তা হলে আর্জি জানিও।' ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে তার মুখ-চোখের চেহারা।

নিমেষে নিজের কান নিজে মলে মৃত্যুঞ্জয় বললেন, 'ঘাট হয়ে গেছে হুজুর। মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম।...ভীমরতি হয়েছে আমার, কী বলতে কী বলে ফেলেছি। চল হে, যজ্ঞেশ্বর। দুর্গা-দুর্গা, মা-কালী আপনাকে বাঁচিয়ে রাখুন, ধনেপুত্রে লক্ষ্মীলাভ হোক আপনার !'

যজ্ঞেশ্বরের একটা হাত ধরে টানতে টানতে মৃত্যুঞ্জয় প্রায় ছুট দিলেন। ঘর থেকে বেরিয়ে প্রাঙ্গণ—সেখান থেকে গ্রামপথ—সেখান থেকে বাইবের মাঠ।

একেবারে অনেকটা দূরে এসে সাহস করে দম নিতে দাঁড়ালেন দু জনে।

কথঞ্চিৎ সুস্থ হয়ে যজ্ঞেশ্বর বললেন, 'কিন্তু তোমার ভাগ্নের কাছে চিঠিটা চলে গেল—তাকে তো একটা খবর পাঠাতে হয়। মিছিমিছি তাকে এই হাঙ্গামের মধ্যে টেনে আনা—'

'তুমি ক্ষেপেছ মজুমদার।' মৃত্যুঞ্জয় কথাটা উড়িয়ে দেন, 'তাকে আবাব খবর দেব কী করে ? তা ছাড়া, দরকারই বা কী, যদি আসতে পারে তো আসুক না একদল গোরা সিপাই নিয়ে। যেমন কুকুর তেমনি মুগুর হয় !··· হারামজাদা ব্যাটারা আমাকে সর্বস্বান্ত করে দিলে গা! সবনাশ হবে— সর্বনাশ হবে ব্যাটাদের, মুখে রক্ত উঠে মরবে সব কটা।···ভাতে হাত দিতে গুয়ে হাত দেবে, অন্ধ হয়ে ঘুরে বেড়াবে—এই আমি বলে দিলুম। হে মা কালী, যদি সত্যি হও তো স্থানে থেকে কানে শুনো মা !'

যজ্ঞেশ্বর একটা নিশ্বাস ফেলে বললেন, 'নাও এখন চল, ব্যাটারা আবার এসে পড়তে কতক্ষণ।'

'তা বটে। চল—চল। আবার দাঁড়ালে কেন ?'

মৃত্যুঞ্জয়ই তাড়া দিয়ে ওঠেন।

॥ ৩৯ ॥

অতলান্ত সাগরের বুকের ওপর দিয়ে একখানি জাহাজ চলেছে। এখনকার আরামপ্রদ 'লাইনার' নয়—এক শ বছর আগেকার পালতোলা কাঠের জাহাজ। তখন সমুদ্রযাত্রার নাম হলে অতি বড় দুঃসাহসিকেরও মুখ শুকোত। ঝড়-ঝাপটা বিপদ-আপদের জন্য তত নয়—যত ভ্রমণকালীন অস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য।

দীর্ঘ মন্থর যাত্রা। সাগরের বুকেই একটির পর একটি জ্যোতির্ময় প্রভাত দেখা দেয—সে প্রভাত মন্থরতম গতিতে মধ্যাহ্নে অগ্রসর হয়, সে মধ্যাহ্ন আবার এক সময় অপরাহ্নে ঢলে পড়ে, অপরাহ্ন মিলিয়ে যায় নক্ষত্র-খচিত বা মেঘ তিমিরান্ধ সন্ধ্যায়। শুরু হয় তখন একটানা রাত্রি। এইভাবেই দীর্ঘদিন চলেছে যাত্রীদল। বৈচিত্র্যহীন নিরানন্দময় যাত্রা।

পথ সুদূর। তবু পথের শেষ সম্বন্ধেও এদের না আছে আগ্রহ, না আছে ঔৎসুক্য। কারণ এরা জানে সে পথের প্রান্তে অনেকের জন্যই অপেক্ষা করে আছে ভয়ঙ্কর বীভৎস মৃত্যু। অজানা দেশ, অপরিচিত মানুষ—যেটুকু জনশ্রুত পরিচয় আছে তা আগ্রহ বাড়াবার মত নয়। হলদে বেণীওয়ালা প্রাচ্য মানুষগুলোর নিষ্ঠুরতার অসংখ্য কাহিনীই তারা শুনেছে। তাদের আভিজাত্য বা আতিথেয়তার কোন বিবরণ ওদের কানে পৌঁছয় না। তা ছাড়া সেই মায়ামমতাহীন নিষ্ঠুর মানুষগুলোর অতিথিরূপেও তারা যাচ্ছে না—যাচ্ছে তাদের শাসন করতে, শত্রুরূপে। সুতরাং সেখানে যে অভ্যর্থনা তাদের ভাগ্যে আছে সে সম্বন্ধে অন্তত একটা অস্পষ্ট ধারণা করতে পারে বৈকি!

তাই যাত্রাতেও যেমন আনন্দ নেই, যাত্রা শেষ করতেও তেমনি ব্যগ্র নয় এরা। যে দিনটি আসছে সেই দিনটিই তাদের লাভ। তার বাইরে আর কিছু জানতে চায় না। তারা পেশাদার সৈনিক—যুদ্ধ-ব্যবসায়ী, বর্ত্তমানের অতীত কোন ভবিষ্যতে তাদের আশা থাকতে নেই, তারা তা জানে। তাই যতটা সম্ভব হৈ-হল্লা এবং নানারকম পাশবিক আনন্দের মধ্যেই তারা এই দিনগুলি কাটাচ্ছে। এই দিনগুলি যে তাদের মাপ-করা পরমায়ুরই মূল্যবান অংশ বিশেষ—এ দার্শনিক তথ্য নিয়ে তাদের কোন মাথা ব্যথা নেই।

আমরা বলছি ৯৩নং হাইল্যাণ্ডার রেজিমেন্টের কথা। চীনে বিদ্রোহ দমনে চলেছে এরা। ক্রিমিয়ার অভিজ্ঞ, পোড়-খাওয়া বীর যোদ্ধা সব—ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের স্তম্ভ। কিন্তু বর্তমানের এই অর্ধ-পশুবৎ পানাসক্ত লোকগুলিকে দেখলে সে কথা কল্পনা করাও শক্ত। এই জাহাজেই তাদের সেনাপতি ও সেনানায়করাওআছেন, কিন্তু তাঁরা এ হুল্লোড়ে বাধা দেন না—তাঁরা জানেন, এইটুকুই এ হতভাগ্যদের সান্ত্বনা। অকারণ বিধি-নিষেধের গণ্ডি টানতে গেলে সে গণ্ডি থাকে না। কাজের সময়টুকুতে রাশ টেনে ধরতে পারলেই যথেষ্ট। আর সে রাশ যথাসময়ে টানতেও তাঁরা জানেন—কাজেই বর্তমানের এ উচ্ছৃঙ্খলতায় কোন উদ্বেগ নেই তাঁদের।

এই বীভৎস হৈ-হল্লার মধ্যে একটি মানুষ কিন্তু প্রথম থেকেই নির্লিপ্ত—এবং এদের মধ্যে থেকেও একটা ব্যবধান রেখে চলেছে—সে হল আমাদের পূর্বপরিচিত 'কোয়েকার' ওয়ালেস। এই দীর্ঘ দিনগুলির অধিকাংশ সময়ই সে দূর দিক্‌চক্ররেখার দিকে চেয়ে কাটায়—যেখানে সাগরের নীল গিয়ে মিশেছে আকাশের নীলে, একটি সূক্ষ্মরেখা সৃষ্টি করে—অথবা কোন একটা ছায়াচ্ছন্ন কোণ বেছে নিয়ে একমনে বসে বাইবেল পড়ে। মদ সে কোনদিনই স্পর্শ করে না। এমনি অশ্লীল গল্প বা নাচ-গান-হুল্লোড়েও কোনদিন যোগ দেয় না। অবশ্য তার সঙ্গীরাও ওকে দলে টানবার চেষ্টা করে না, কারণ এর আগে বহুবার সে চেষ্টা করে তারা হাল ছেড়ে দিয়েছে। বরং এখন ওকে এড়াতেই চায়—কারণ ওয়ালেসের এমনই ব্যক্তিত্ব আছে যে, সে কাছে এসে বসলে কেমন যেন সুর কেটে যায় তাদের আমোদের। যে লোকটা অশ্লীল গল্প শুরু করেছে তার গলা শুকিয়ে আসে, যে গান ধরেছে তার তাল কেটে যায়। অথচ কোয়েকার নিজে সাত্ত্বিক ধরনের মানুষ হলেও কোনদিন সে এদের প্রকাশ্যে তিরস্কার করে নি—এমন কি কোন অনুযোগও করে নি। ঠিক যে চেষ্টা করে সে এড়াতে চায় এদের তাও নয়, কিন্তু সকলে আমোদ-আহ্লাদ করছে, তার মধ্যে একটা লোক যদি কাঠ হয়ে বসে থাকে—তাহলে বাকি সকলের আনন্দে কোথায় যেন বেসুর বাজে।

কিন্তু এই একান্ত নির্লিপ্ত উদাসীন মানুষটিকেও সহসা একদিন দারুণ বিচলিত ও উত্তেজিত হতে দেখা গেল। তার সে উত্তেজনা যারা লক্ষ্য করল—তাদের বিস্ময়ের সীমা রইল না।

জাহাজটি তখন সমস্ত আফ্রিকার পশ্চিম সীমা অতিক্রম করে একেবারে

দক্ষিণে এসে পৌঁচেছে—সাইমন্‌স্‌ উপসাগরে দু দিনের জন্য নোঙর ফেলেছে খাদ্য-জল প্রভৃতি নেবার জন্য, কিন্তু জাহাজ থামার কিছুক্ষণ পরেই আর একটি জাহাজ এসে ভিড়ল এর সঙ্গে। তাতেই ছিলেন সেনাপতি—ঐ জাহাজটিই তখন হেড কোয়ার্টার্স। শোনা গেল, ওতে কী একটা জরুরী খবর পৌঁচেছে; এবং তার আধ ঘণ্টার মধ্যেই সে জরুরী খবর রেজিমেণ্টের সব সৈনিকেরই কর্ণগোচর হল। ভারতে 'মিউটিনি' দেখা দিয়েছে—দেশী সিপাহীরা গোরা সেনাপতি, সৈনিক, এমন কি 'সিভিলিযান' সাহেবদের উপরও চড়াও হয়েছে। শুধু প্রাণ নয়—স্ত্রীলোকদের ইজ্জতও বিপন্ন। স্ত্রী-শিশু-বৃদ্ধ কেউই নাকি তাদের হাতে অব্যাহতি পায় নি। অবশিষ্ট যে ইংরেজ এখনও আছেন তাঁদের অবস্থাও সঙ্কটাপন্ন। অতএব এখনই সেখানে লোক পাঠানো প্রয়োজন। ৯৩ নং হাইল্যাণ্ডারদের চীন-যাত্রা এখন স্থগিত রইল—এখনই তাদের কলকাতা রওনা হতে হবে।

খবরটা শুনে চারদিকেই একটা গুঞ্জন উঠল।

অত্যাচারের সংবাদে সকলেরই রক্ত গরম হয়ে উঠেছে।

নেটিভ সিপাহীগুলোর এত স্পর্ধা! এই স্পর্ধার এমন উত্তর দিতে হবে যে, শতাব্দী পরেও মানুষ যেন তা না ভোলে। রক্তের বদলে রক্ত শুধু নয়—একটি ইংরেজের রক্তের বদলে দশটি নেটিভের রক্ত চাই—যাতে কোন প্রাচ্য দেশে কোন কালে আর কেউ না ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে মাথা তুলতে সাহস করে। ইত্যাদি—

গুঞ্জন ক্রমে কোলাহলের আকার ধারণ করল। সে কোলাহলে নির্লিপ্ততা রাখা সম্ভব নয়—এক সময় কোয়েকার ওয়ালেসের কানেও তা পৌঁছল। কিন্তু যে ব্যক্তিকে কামানের গোলার সামনেও প্রশান্তমুখে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেছে—তার এতকালের প্রশান্তি সহসা এই সামান্য সংবাদে কে জানে কেন একেবারে নষ্ট হয়ে গেল। সে আরক্ত মুখে ভিড়ের মধ্যে এসে যাকে যাকে সামনে পেল প্রত্যেককেই প্রশ্ন করতে লাগল, 'এসব কী শুনছি—এ কি সত্যিই? আমরা নাকি ইণ্ডিয়ায় যাচ্ছি?'

এক এক জন এক-এক রকম উত্তর দিল। কেউ বলল, 'সত্যি বইকি!' কেউ বলল, 'তাই তো শুনছি।' কেউ বা বলল, 'হুকুম নাকি সেই রকমই এসেছে।'

অবশেষে এক জায়গায় ক্যাপ্টেন ডসনের দেখা পাওয়া গেল। তাঁকেও

প্রশ্ন করল ওয়ালেস। ডসনের দু চোখেতে আগুন—বোঝা গেল তিনিও অত্যন্ত বিচলিত হয়েছেন; বললেন, 'আলবৎ যাচ্ছি, এই পথটা যদি উড়ে যেতে পারতাম তো ভাল হত!'

'কিন্তু ক্যাপ্টেন, আমরা চীনে যাব বলে এই দলে নাম লিখিয়েছিলাম।'

ডসন এবার যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হয়ে তাকালেন, বললেন, 'তুমি বড় আশ্চর্য লোক তো দেখছি! তুমি কি ভারতে যেতে চাও না নাকি? তুমি কি শোন নি সেই dirty swineগুলো কী করছে সেখানে? আমাদের মেয়েদের বে-ইজ্জত করেছে—স্ত্রী-শিশু-বৃদ্ধ নির্বিচারে হত্যা করেছে, সাধু-সন্ত-পাদরী কেউই বাদ যায় নি। এর পরেও তুমি স্থির থাকতে পারছ?'

বিচিত্র ভ্রূকুটি করে ওয়ালেস উত্তর দিল, 'মাপ করবেন ক্যাপ্টেন, আমরা যা এতকাল করেছি সেখানে—তারই ফল ভোগ করছি মাত্র। এতে এত বিচলিত হবার মত কিছুই দেখছি না।'

ডসন কাঁধটায় এক প্রকার ঝাঁকানি দিয়ে শুধু বললেন, 'স্ট্রেঞ্জ! যাই হোক—কর্তার ইচ্ছায় কর্ম। আমাদের হুকুম তামিল করা ছাড়া উপায় নেই।'

ওয়ালেস আর দ্বিরুক্তি না করে কোনমতে ভিড় ঠেলে পাশের জাহাজ 'মরিসাস'এ গিয়ে উঠল। সেখানে কর্নেলের কামরার সামনে বিরাট জটলা। কর্নেলও ব্যস্ত রয়েছেন নিশ্চয়ই, শোনা গেল, অপর সেনানায়কদের সঙ্গে 'কন্ফারেন্স'এ বসেছেন। আর্দালী অফিসার যে ভাবে ভ্রূকুঞ্চিত করে দাঁড়িয়ে আছেন, তাতে সেদিকে কিছু সুবিধে হবে বলে ভরসা হয় না। অগত্যা ওয়ালেস অধীর ভাবে সেইখানেই পায়চারি করতে লাগল। সে যে নিরতিশয় বিচলিত হয়েছে—তার মুখ দেখে সে বিষয়ে সংশয় মাত্র থাকে না। যে ক'জন পরিচিত সহকর্মী আশেপাশে ছিল, তারা বিস্মিত হলেও এই অস্থিরতার ভিন্ন অর্থ করল। তারা ভাবল, প্রতিশোধের জন্যই সে অধীর হয়ে উঠেছে।

সৌভাগ্যক্রমে কর্নেল আড্রিয়ান হোপ কিছু পরেই সহসা বার হয়ে এলেন চারদিকের জনতার দিকে চেয়ে এক প্রকার কঠিন হাস্যের সঙ্গে বললেন, 'বৎসগণ, তোমরা এতক্ষণে খবর নিশ্চয়ই শুনেছ। আমরা যত শীঘ্র সম্ভব জ্বালানি এবং খাবার সংগ্রহ করেই রওনা দিচ্ছি। শুয়োরের বাচ্ছারা মনে করেছে ঐ কটা অসহায় এবং অপ্রস্তুত ইংরেজকে নিয়েই আমাদের দেশটা, আর ঐটুকুই আমাদের শক্তি! তারা এখনও আমাদের চেনে নি একটুও

কিন্তু ভয় নাই—আমরা গিয়ে পড়ছি শীগগিরই। এ ঋণ যদি কড়ায়, ক্রান্তিতে সুদ সুদ্ধ উসুল করতে না পারি তো বৃথাই আমাদের শৌর্যের খ্যাতি, বৃথাই হাইল্যাণ্ডার রেজিমেণ্টের এতদিনের গৌরব! তোমরা একটু ধৈর্য ধর—প্রতিটি বিন্দু ইংরেজ-রক্তের দাম আমরা আদায় করে নেব—অন্তত দশগুণ!'

চারদিক থেকে জয়ধ্বনি উঠল—উঠল কর্নেল এবং রেজিমেণ্টের জয়গান। তবে সে জয়ধ্বনিতে উল্লাসের নামগন্ধও ছিল না—একটা চাপা রোষ এবং প্রতিহিংসার দৃঢ় সংকল্পেরই আভাস ছিল।

আড্রিয়ান হোপ ভিড় ঠেলে সিঁড়ির মুখের দিকে আসতেই ওয়ালেস সামনে এসে অভিবাদন করে দাঁড়াল।

'মাপ করবেন কর্নেল, একটা কথা!'

প্রথমটা ভ্রূকুঞ্চিত করে ওর দিকে তাকিয়েছিলেন কর্নেল। কিন্তু ওয়ালেসের মুখের চেহারাটা দেখার পর সে কুঞ্চন মিলিয়ে গেল। মৃদু হেসে বললেন, 'তুমি ওয়ালেস, না? কোযেকার ওয়ালেস। তোমার অধীরতা বুঝতে পারছি ওয়ালেস—আমিও কম অধীর হয়ে উঠি নি, কিন্তু কী করব, উড়ে যাওয়া তো সম্ভব নয়! তবে নিশ্চিন্ত থাক, মানুষের যতটা সাধ্য ততটাই তাড়াতাড়ি আমরা গিয়ে পৌঁছব। আর কটা দিন ধৈর্য ধরে থাক।'

ওয়ালেস একটু অসহিষ্ণুভাবেই হাতটা আবার কপালে ঠেকাল। বলল, 'মাপ করবেন, কিন্তু আমার অন্য একটা কথা আছে!···আমরা কি সত্যিই ইণ্ডিয়ায় যাচ্ছি?'

'নিশ্চয়ই!' হোপ নিরতিশয় বিস্মিত হয়ে তার মুখের দিকে চাইলেন, 'কেন, তুমি কি শোন নি, সেখানে নেটিভ সিপাহীরা বিদ্রোহী হয়ে ইংরেজদের সঙ্গে চরম বিশ্বাসঘাতকতা করেছে এবং অকথ্য অত্যাচার করেছে—এখনও করছে?'

'কিন্তু কর্নেল' শান্ত অথচ দৃঢ় কণ্ঠে ওয়ালেস বলল, 'আমরা চীনে যাব বলেই এই রেজিমেণ্টে নাম লিখিয়েছিলাম। অন্যত্র যাওয়ার কথা হলে হয়তো নাম লেখাতাম না। আর সত্যি কথা বলতে কি, ভারতে যেতে আমার প্রবল আপত্তি আছে।'

'আশ্চর্য! ওখানে কী রকম বর্বরতা হচ্ছে তা শোনবার পরও এই রকম মনোভাব তোমাদের কারও হতে পারে—এ নিজের কানে শুনেও বিশ্বাস হচ্ছে

না! জান্‌, ওখানে তোমাদের মেয়েরা শুদ্ধ অপমানিত এবং লাঞ্ছিত হচ্ছেন!'

'হয়তো অনেক পাপের সামান্য মূল্য শোধ হচ্ছে মাত্র—অবশ্য মাপ করবেন, এ সব কথা আমার মুখে ধৃষ্টতা, কিন্তু আমি এখনও আমার কথার জবাব পাই নি।'

আদ্রিয়ান হোপের ললাটে এবার একটা ভীষণ রোষ ঘনিয়ে এল। তাঁর তখনকার সে ভয়ঙ্কর ভ্রূকুটির দিকে চাইলে অনেকেরই বুক কেঁপে উঠত। কিন্তু ওয়ালেস শান্তভাবেই উত্তরের প্রতীক্ষা করতে লাগল, তাকে বিন্দুমাত্র ভীত বা সন্ত্রস্ত হতে দেখা গেল না।

হোপ কিছুক্ষণ নিঃশব্দ দহনে তাকে দগ্ধ করে কঠিন এবং রুক্ষ কণ্ঠে বললেন, 'তোমরা জাতির কলঙ্ক! তোমাদের মত লোক নিশ্চয়ই আরও দু-চারজন ওখানে আছে, তাই নেটিভগুলোর অত স্পর্ধা! ··হাউএভার, তোমরা সৈনিক, তোমাদের সঙ্গে এই চুক্তিই আছে—যখন যেখানে যেতে বলা হবে সেখানেই যাবে।···একথা যে এতকাল পরে তোমাকে মনে করিয়ে দিতে হল সেজন্য আমি দুঃখিত।'

তিনি আর কোন উত্তর-প্রত্যুত্তরের অবসর মাত্র না দিয়ে প্রত্যভিবাদনেব একটা ভঙ্গি করেই দ্রুত পাশের 'বেল আইল' অর্থাৎ ওয়ালেসদের জাহাজ পরিদর্শনের কাজে চলে গেলেন।

ওয়ালেস বহুক্ষণ সেখানেই নতমুখে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। দক্ষিণে অনন্ত ভারত-মহাসমুদ্রে সন্ধ্যার আবছা অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে—বাতাস স্তব্ধ, সমস্ত আবহাওয়াটা থমথমে হয়ে রয়েছে।

পাশের জাহাজের উত্তেজনা হৈ-হল্লাও কমে আসছে ক্রমশ, একটু পরেই সন্ধ্যার খাবার দেওয়া হবে—সেজন্য প্রস্তুত হচ্ছে হয়তো সবাই।

অনেকক্ষণ পরে মুখ তুলে দূর সমুদ্রের দিকে চাইল ওয়ালেস। কী দেখল কে জানে। হয়তো বহুদিনের স্মৃতির গরল তার কণ্ঠে ফেনিয়ে উঠেছে—তাই কেমন এক রকমের রুদ্ধ অস্পষ্ট কণ্ঠে বলল, 'ঈশ্বর, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক!'

এমন ভয়াবহ গোলযোগ ও রাষ্ট্রবিপ্লবের দিনে চিঠিখানা যে সত্যই হীরা-লালের কাছে পৌঁছবে, স্বয়ং মৃত্যুঞ্জয়ও পুরোপুরি এমন আশা করেন নি—কতকটা শেষ অবলম্বন হিসেবেই চিঠিটা পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু, সম্ভবত তাঁর উপবীত স্পর্শ করে শপথ করানোর জন্যই, এক সময় সত্যি-সত্যিই হীরালালের হস্তগত হল।

চিঠি পেয়ে সে বিষম বিচলিত হয়ে পড়ল। মামা যা-ই হোন, আর যা-ই করুন—হাজার হোক, মামাই। তা ছাড়া সে তাঁর কাছে অনেক উপকৃত তাতেও সন্দেহ নেই। তিনি তার কল্যাণার্থেই তাকে সঙ্গে এনেছিলেন—তিনি না আনলে এ চাকরি পাওয়াও সম্ভব হত না।

কিন্তু এখন করাই বা যায় কী?

সাহেবদের কাছে একথা মুখে আনা চলবে না। তাঁদের নিজেদেরই অবস্থা শোচনীয়—যাকে বলে, 'মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল' তাই। নেটিভ কেরানী মৃত্যুঞ্জয়ের কথা তোলাই তো বাতুলতা—এমন কি ঐ সাহেব-মেম দুটির কথা শুনিয়েও কোন লাভ হবে না। আপনি বাঁচলে বাপের নাম। নিজেদেরই যেখানে নিত্য জীবন-সংশয়, সেখানে পরের কথা কে ভাবতে বসবে?

অবশ্য হীরালালকে ভাবতে হল বৈকি।

সারাদিন ধরেই সে ভাবল এবং ছটফট করল। সব চেয়ে মুশকিল এই যে, এখানে এমন পরিচিত হিতাকাঙ্ক্ষী কেউ নেই, যার সঙ্গে সে পরামর্শ করতে পারে। অবশেষে সন্ধ্যার সময় একটা মতলব মাথায় এল। সে সাহেবের সঙ্গে দেখা করে শরীর খারাপের অছিলায় দিন-তিনেকের ছুটি নিল। এখন এমনই বিপর্যয়ের সময় যে, কে কী ছুটি নিচ্ছে না নিচ্ছে সে কথা নিয়ে মাথা ঘামাবারও অবসর নেই কারও। ছুটি সহজেই মিলে গেল। তার পর সে একটি সিপাহীর সঙ্গে ভাব জমিয়ে নগদ একটি টাকা ঘুষের সাহায্যে সরকারী ভাণ্ডার থেকে একটা সিপাহীর পোশাক সংগ্রহ করে বাসায় ফিরে এল।

সমস্ত দিন কিছুই খাওয়া হয় নি—খুব পিপাসার সময় এক ডেলা গুড় গালে

দিয়ে এক ঘটি জল খেয়েছিল মাত্র। ফলে এমন শরীর ঝিম ঝিম করছে। একে পশ্চিমে গরমের দিনে ক্ষুধা এমনিতেই প্রবল হয়, তার ওপর এত বড় বেলা গড়িয়ে গেল—পেটে কিছু পড়ে নি, শরীর ভেঙে আসবারই কথা। অথচ এখন আর আঙোটি ধরাতেও ইচ্ছে হল না। শেষ পর্যন্ত বাজার থেকে কিছু গরম পুরী সংগ্রহ করে এনে তাড়াতাড়ি আহারের পালা শেষ করল। তার পর সেই সিপাহীর পোশাকটা এঁটে দুর্গা প্রভৃতি তেত্রিশ কোটি দেবতার নাম স্মরণ করতে করতে ঘরের চাবিটা বাড়িওয়ালা দোকানদারের জিম্মা করে দিয়ে দিক্‌নির্দেশহীন অজানা সেই গ্রামের উদ্দেশে রওনা হল। ভাগ্যে মাত্র দিন কয়েক আগেই—কতকটা তার নিরাপত্তার কথা ভেবেই, তার যাতায়াতের জন্যে সাহেব একটা ক্ষীণজীবী গোছের খচ্চর দিয়ে রেখে-ছিলেন—তবু অনেকটা সুবিধা হল। কোথায় যেতে হবে স্পষ্ট জানা নেই। মামার চিঠিতে শুধু এইটুকুই ছিল যে 'গাজীপুর ছাড়িয়ে সোজা পূর্ব-দক্ষিণ মুখে হাঁটলে এক বন পাবে, সেই বনের সীমানায় একটা গ্রাম'—এই সামান্য নির্দেশ নিয়ে হাঁটাপথে সে-গ্রাম খুঁজে বের করতে করতে মামা টিকে থাকবেন কিনা সন্দেহ। এখন এই অশ্বতর-পুঙ্গব যদি শয্যাগ্রহণ না করে তো অনেক অল্প সময়ে ও স্বচ্ছন্দে সে সেখানে পৌঁছতে পারবে। পথ চলতে চলতে মামার ওপর রাগটা চাপতে পারল না। কী দরকার ছিল সকলের কথা অবহেলা করে এই গোঁয়ার্তুমি করতে যাওয়ার ?

॥ ৪১ ॥

কানপুরের সংবাদ আবছা অস্পষ্টভাবে লক্ষ্মৌতেও পৌঁছল। সার হিউ ইতিপূর্বে লরেন্সের প্রেরিত দু শ সৈনিক ফেরত দিতে তিনি অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন—কিন্তু সম্পূর্ণ হন নি। হুইলার যতই বলুন, সিপাহী ও স্থানীয় নেটিভদের ওপর এতটা নির্ভর করার মত আবহাওয়া চারদিকে কোথাও নেই—শুধু কানপুরে থাকবে, এটা বিশ্বাসযোগ্য নয়। বিশেষত নানাসাহেব, যাঁর ইংরেজদের আচরণে ক্ষুণ্ণ হবার যথেষ্ট কারণ আছে, তিনি যে সত্যি-সত্যিই 'জান' দিয়ে ইংরেজদের রক্ষা করবেন তাও বিশ্বাস করা কঠিন। তাই লরেন্স একটা কান বরাবরই কানপুরের দিকে খোলা রেখেছিলেন।

এখন এই সব গোলমেলে সংবাদে তাঁর পূর্ব সংশয়ই সত্য বলে প্রমাণিত হতে তিনি উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। কিন্তু এখন তাঁর অবস্থাও সংকটজনক, শেষ মুহূর্তে শেষরক্ষা হবে কিনা সন্দেহ। তিনি কেমন করে এখান থেকে লোক পাঠাবেন!

কিন্তু তাঁর উদ্বেগ তাঁর মধ্যেই সীমাবদ্ধ রইল না। কানাঘুষা এদিকে-ওদিকেও ছড়িয়ে পড়ল। অপর ইংরেজ অফিসাররাও উদ্বিগ্ন ও বিচলিত হয়ে উঠলেন। এইটুকু তো মাত্র পথ—তবু এতটুকু সাহায্য করতে অগ্রসর হওয়া যাচ্ছে না, এর জন্যে ক্ষোভ ও আত্মবিলাপেরও শেষ রইল না। অথচ উপায়ও কিছু নেই কোথাও।

অবশেষে আর কোনমতে স্থির থাকতে না পেরে বোল্টন নামে এক তরুণ লেফটেনান্ট এসে জানাল—সে একাই একবার কানপুরে যেতে চায়। সেনাপতি কি অনুমতি দেবেন ?

সার হেনরী বহুক্ষণ বিস্মিত হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তার পর বললেন, 'কিন্তু তুমি একা গিয়ে তাদের কী উপকারে লাগবে ?'

'তা জানি না। হয়তো সত্যিই কিছু উপকার করতে পারব না। কিন্তু এমন ভাবে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকাও যে অসহ্য।...তা ছাড়া, একটা কথা ভেবে দেখুন সার, কোন-একজন বন্ধুও অন্তত বাইরে থেকে তাদের সাহায্যের জন্যে গিয়ে পড়ছে—এটা জানতে পারলে তাদের মনের বল কতখানি বাড়বে !'

'কিন্তু পারবে কি শেষ পর্যন্ত পৌঁছতে ?'

নিঃশব্দ প্রশংসায় সার হেনরীর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলেও, সংশয়ের সুর বাজল তাঁর কণ্ঠে।

'চেষ্টা করতে পারব অন্তত! প্রাণপণেই চেষ্টা করব।'

'তাতে প্রাণটাই হয়তো যাবে, আর কোন কাজ হবে না!'

'মাপ করবেন, প্রাণ তো এখানেও যেতে পারে। হয়তো অচিরেই যেতে পারে।...এখানেই যে বেশী দিন আমরা নিরাপদে থাকতে পারব তারই বা ঠিক কি ?...নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে বসে মরার চেয়ে বাঁচবার চেষ্টা করতে গিয়ে মরা কি অনেক ভাল নয় ?'

লরেন্স প্রায় সমস্তক্ষণই তার মুখের দিকে চেয়ে ছিলেন। এখনও খানিকটা স্থির অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। আত্মবিশ্বাস ও আত্মত্যাগের অদম্য

বাসনায় দীপ্ত-উজ্জ্বল মুখ। রণবাদ্য শুনলে যুদ্ধাশ্বের যে চঞ্চলতা দেখা যায়, সেই চাঞ্চল্য তার সমস্ত স্নায়ুতে ও পেশীতে। একটা কোন কাজে লাগতে বিপদকে আগু বাড়িয়ে যুদ্ধ দিতে অধীর উন্মুখ হয়ে উঠেছে সে।

একটা ছোট দীর্ঘশ্বাস ফেলে লরেন্স বললেন, 'যাও, কিন্তু একেবারে একা যেও না!'

এবার বিস্মিত হবার পালা বোল্টনের, 'বেশী লোকজন নিয়ে গেলে লোকের চোখ এড়িয়ে যাওয়া শক্ত হবে স্যার। বরং একা কোনমতে পৌঁছতে পারব হয়তো।'

'না খুব বেশী লোক আমি দিতেও পারব না। তবে একেবারে একা যাওয়াও ঠিক নয়। এখনও কিছু বিশ্বাসী সিপাহী আছে আমাদের হাতে—তাদেরই মধ্যে থেকে জন-কয়েককে বেছে নাও।'

বোল্টনের এ প্রস্তাবটা ভাল লাগল না। তবে সে লরেন্সকেও চিনত। এটা অনুরোধ নয়—আদেশ। এ আদেশ অবহেলা করলে শেষ পর্যন্ত যাবারই অনুমতি পাবে না!

বোল্টন অনেক যাচাই-বাছাই করে ছ জনকে সঙ্গী করল। ছ জনেই সওয়ার, তারা ঘোড়ায় চেপেই রওনা হল, নচেৎ অযথা বহু বিলম্ব হয়। স্থির রইল যে, কানপুরের উপকণ্ঠে পৌঁছে তারা ঘোড়াগুলো কোথাও লুকিয়ে রাখবে, তার পর পদব্রজেই শহরে ঢুকবে।

সারাদিন এক রকম ভাল ভাবেই কাটল। বোল্টন বড় সড়কের জনবহুল অংশ এড়িয়ে চলল। যেখানে যেখানে পথের ধারেই গাঁ বা বস্তি—সেখানে পথ থেকে মাঠে নেমে বনের মধ্যে দিয়ে অথবা বহু দূর চক্র দিয়ে ঘুরে চলতে লাগল।

কিন্তু বিপদ বাধল সন্ধ্যার মুখে।

সকালে রওনা হবার আগে কিছু পেটে পড়েছিল ঠিকই, কিন্তু তার পর এই জ্যৈষ্ঠের সুদীর্ঘ বেলা কেটেছে। শুধু এক জায়গায় মাঠের মধ্যে একটা কুয়া পেয়ে মানুষ ও পশু উভয়েই একবার পিপাসা মিটিয়ে নিয়েছিল মাত্র, তবে সে-ও অনেকক্ষণের কথা হয়ে গেল। এবার আহারাদির চেষ্টা না দেখলে নয়। নিজেদের কিছু খাওয়া দরকার, ঘোড়াগুলোকেও কিছু খাওয়ানো দরকার। সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন জীবগুলির বিশ্রামের। আটা-ডাল

সিপাহীদের সঙ্গে কিছু কিছু আছে, কিন্তু সেগুলি কাঁচা খাওয়া যায় না। পাক করবার মত একটা স্থান, আগুন এবং একটু জল চাই। ঘোড়াগুলোর ঘাস এই দগ্ধ তৃণশূন্য প্রান্তরে মিলবে না—সে জন্যেও লোকালয় চাই।

এই সব অকাট্য যুক্তির কাছে বোল্‌টনের সব সতর্কতা-বোধকে হার মানতে হল। অবশেষে সন্ধ্যার মুখে তারা একটি গ্রাম দেখতে পেয়ে সোজা সেই দিকেই ঘোড়া চালাল।

ছোট্ট গ্রাম। পথের ধারেই একটা কূয়া, তার সামনেই একটি চটি। কূয়াতলায় কয়েকটা লোক কুণ্ডলী পাকিয়ে বসে তামাক খাচ্ছিল, সহসা এতগুলো ঘোড়সওয়ারকে দেখে তারা প্রথমটা ভয় পেয়ে এদিক-ওদিক সরে পড়ল। দোকানটিরও ঝাঁপ বন্ধ করতে পারলে খুশী হত, কিন্তু সে চেষ্টা করবার আগেই ওরা এসে গেল।

বোল্‌টন তাড়াতাড়ি ঘোড়া থেকে নেমে তার দোকানের চালার মধ্যে মাথা গলিয়ে দিয়ে বলল, 'ডরো মৎ, হাম লোক চীজ লেগা, কিম্মৎ দেগা। ডরো মৎ।'

ইতিমধ্যে যারা এদিক-ওদিক গা-ঢাকা দিয়েছিল, তারা ছ জন সিপাহীর মধ্যে এক জন গোরা দেখে আশ্বস্ত হল। এবার তারা এসে ঘিরে দাঁড়াল। কেউ কেউ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে কূয়া থেকে 'পানি' উঠিয়ে দিতে লাগল।

একটা গাছতলায় খাটিয়া পাতা ছিল—বোল্‌টন নিশ্চিন্ত হয়ে তাতে শুয়ে পড়ল। নিজের জন্য আহার্য তৈরির তাড়া নেই—সিপাহীদের ডাল রুটি তৈরি হলে সে-ও ভাগ পাবে। এতকাল এদেশে থেকে দেশী খাদ্য তার বেশ অভ্যাস হয়ে গেছে।

সিপাহীরা বিশ্রাম এবং স্নানাদির পর আর একটা গাছতলায় চুলা কেটে ডাল চাপাল। চটিওয়ালাই রান্নার 'সামান' ইত্যাদি দিয়েছিল। ঘিউ-নিমক-মশলা প্রভৃতি বেশ চড়া দামে বেচতে পেরে সে বরং এদের ওপর একটু বন্ধু-ভাবাপন্নই হয়ে উঠল—সে নিজে থেকেই ঘোড়াগুলোর তদ্বির করতে লাগল। বোল্‌টন মনে মনে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়ে আরও একটু পরে বেশ নিশ্চিন্তভাবে তন্দ্রাচ্ছন্ন হল।

কিন্তু গোল বাধল এবারই।

গ্রামবাসীরা ছ জন সিপাহীর সঙ্গে এক জন গোরাকে দেখে আগে একটু উল্টোই বুঝেছিল। তারা ভেবেছিল সিপাহীরা গোরাটাকে কয়েদ করে

নিয়ে যাচ্ছে। সে ভুলটা যখন ভাঙল, তখনও খানিকটা চুপ করে রইল, তার পর বোল্টনের নিদ্রার অবসরে সিপাহীদের কাছে এসে নানারকম প্রশ্ন শুরু করল।

'তোমাদের ওখানে কি এখনও তোমরা আংরেজদের তাঁবেদারি করছ? তবে যে শুনছি চারিদিকেই সিপাইদের রাজ হয়ে গেছে?' ইত্যাদি বাঁকা বাঁকা প্রশ্ন।

সিপাহীরা প্রথমটা বোঝাতে চেষ্টা করল যে,—যতটা শোনা যাচ্ছে ততটা ঠিক নয়। সকলে নিমকহারামি করে নি—করতে চায়ও না। তারা আংরেজের নিমক খেয়েছে—সে নিমকের মর্যাদা প্রাণপণে রাখবে।—কিন্তু চারিদিকে যে লোকগুলি ভিড় করে এসে দাঁড়িয়েছে, তারা সহজে ছাড়বার লোক নয়। তারা বিদ্রূপ করতে লাগল 'আসল কথা তোমরা ভীতু—বিষম ভীতু! আর সাহেবের পা-চাটা। তামাম হিন্দুস্তানের সিপাইরা যা বুঝছে, তোমরা তার চেয়ে বেশি বোঝ?···তোমার আপনার জাতের লোক, দেশের লোক আপন হল না—এরা বেশী আপন হল? তোমরা পয়লা নম্বরের বেইমান! তোমরা কি মানুষ···একটা গোরা তোমাদের মত ছ জন জঙ্গী জোয়ানকে হুকুম করছে, আর তোমরা তাই তামিল করছ! ঐ তো—সবাই মিলেই কষ্ট করছ, অথচ সাহেব ঘুমোচ্ছে—তোমরা তার জন্যে রুটি পাকাচ্ছ। লজ্জাও করে না। তোমাদের মত বেইমানদের জন্যেই আমরা ঐ ক্রেস্তানগুলোর লাথি খাচ্ছি।'

সিপাহীরা চারদিকের এই অসংখ্য বাক্যবাণে বিব্রত বোধ করতে লাগল। বোধ হয় একটু লজ্জাও পেল।

এক জন বলল, 'না, তা নয়। আসলে আমরা একটু বেয়ে-চেয়ে দেখছি ব্যাপারটা কতদূর গড়ায়। আরে ও তো আমাদের হাতের মধ্যেই রয়েছে! যাবে আর কোথায়—যখন মনে করব, তখনই কায়দা করব!'

এ পক্ষ থেকে আর এক জন বিদ্রূপের সুরে বলল, 'সে সাহস তোমাদের হবে না। বরং তোমরাই মরবে। আমরা ছেড়ে দিলুম, কিন্তু এর পর যেখানে যাবে, কেউ কি ছেড়ে দেবে ভেবেছ? এই সময়েও তোমরা সাহেবকে সাহায্য করছ দেখলে ওর সঙ্গে তোমাদেরও গর্দান নেবে—এটুকু জেনে রেখো।'

সঙ্গে সঙ্গে আর এক জন পোঁ ধরল, 'এই তো পরশুরই কথা, সীতাপুরে কী হয়েছে শোন নি? এক বেটা বয়েলগাড়িওলা ছুটো মেমকে জঙ্গলের মধ্যে

দিয়ে পার করে দিচ্ছিল, ওখানে গাঁয়ের লোকের হাতে পড়তে তারা মেম দুটোকে ধরে নিয়ে গেল জায়গীরদারের বাড়ি, কিন্তু গাড়িবানকে সেখানেই মেরে গাছে ঝুলিয়ে দিলে।···ঠিকই করেছে, বেইমানেব এই হালত্ হওয়াই উচিত !'

হাঁড়িতে ডালটা পুড়ে উঠছিল, এক জন সিপাহী তাড়াতাড়ি তাতে খানিকটা জল ঢেলে দিল, যে আটা মাখছিল, সে হাত-পা গুটিয়ে বসে আছে অনেকক্ষণ—তাকেও একটা তাড়া লাগাল। কিন্তু ক্রমশ এটা বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠল যে, কোন একটা কাবণে এদেব আহাবে রুচি একেবাবেই চলে গেছে।

চটিওয়ালা এতক্ষণ উদাসীনভাবে এক পাশে বসে ছিল, সে এবার গলা-খাঁকাবি দিয়ে বলল, 'আচ্ছা ভেইয়া বামলগন, আংবেজ কাউকে ধরে নিয়ে গিয়ে নানাসাহেবেব জিম্মা করে দিলে মোটা টাকা ইনাম মিলছে—এ কথাটা কি ঠিক ?'

'আলবৎ ঠিক। এক-আধ টাকা নয়। এক আংরেজ-পিছু শও শও রুপেয়া ইনাম মিলছে। এই তো আমাবই চাচেরা-ভাই একজন পেযেছে, ছ জন ছিল ওবা—ওই হিস্সাতেই ষোল রুপেয়াব বেশি পেযেছে।'

সিপাহীদেব ললাটে এবার ঘাম দেখা দিল।

ডালটা আবাবও পুড়ে উঠছে—তা উঠুক। ডাল আর একবার চড়ালেই চলবে। এক জন হাঁড়িটা নামিয়ে রাখল।

আর একটু পরে, আরও দু-চারটি বহুমূল্য উপদেশ-বর্ষণ এবং ভীতি-প্রদর্শনের পবে এক জন সিপাহী ঐ বামলগনকেই জিজ্ঞাসা করল, 'ভাই, দড়ি আছে তোমাদের এখানে ?'

'জরুর।' রামলগন উঠে দাঁড়াল, 'দড়ি খুব মজবুতই দিচ্ছি। কিন্তু যা কববে তোমবাই করবে। আমাদেব এব ভিতরে টেনো না। একথা না ওঠে যে আমরা তোমাদের সঙ্গে মিলে কাজ করেছি। তাতে তোমাদেরই ইনামের হিস্সা কমে যাবে !'

বোল্টনের স্বপ্নভঙ্গ হতে একটু বিলম্ব হল বৈকি।

অতি গভীর সুখনিদ্রা তার—হয়তো বা সুখ-স্বপ্নও।

অবশেষে ব্যাপারটা যখন সে বুঝল, তখন তার দুটি হাত এবং দুটি পায়ের কোনটাই আর স্ব-বশে নেই—পরকরতলগত হয়েছে। দেখতে দেখতে তাকে

উঠিয়ে হাত-পায়ের সঙ্গে দেহটাকেও জড়িয়ে বেঁধে ফেলা হল—যাকে আষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধা বলে। তরুণ ইংরেজের এক্ষেত্রে যা করা উচিত, তা-ই করল সে। চীৎকার করে গালিগালাজ করল—প্রাণপণে হাত-পা খোলবার চেষ্টা করল, তার পর অনুনয়-বিনয় করল। সমবেত গ্রামবাসীরা উদাসীন দর্শকের মত দূরে দূরে দাঁড়িয়ে ছিল। তাদেরও অনেক করে বুঝিয়ে বলল, নানারকম লোভ দেখাল, কিন্তু তারা তেমনিই নিস্পৃহবৎ অটল হয়ে দূরে দাঁড়িয়ে রইল—মনে হল তারা পাথরের মতই বধির।

অনেকক্ষণ পরে বোল্টনের মাথায় কথাটা গেল যে, রোদনটা তার নিতান্তই অরণ্যে করা হচ্ছে। এখানে কাউকেই ভেজাতে পারা যাবে না। তখন সে সহসাই একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেল এবং মাথা উন্নত করে এদের প্রতি চরম উপেক্ষার দৃষ্টি হেনে নীরবে দাঁড়িয়ে রইল।

এবার আবার ডাল চাপল। সেই সঙ্গে মন্ত্রণাসভাও বসল একটা।

কয়েদীকে নিয়ে এখন কী করা যাবে?

এক জন বলল, সোজাসুজি কেটে ফেলা হোক। দেশ ও জাতির শত্রুর নিপাত যাক একটা।

কিন্তু তার নিবুদ্ধিতাকে বাকী সকলেই ধিক্কার দিয়ে উঠল। যেখানে জীবিত লোকটাকে হাজির করলে শও রুপেয়া তো বটেই, আরও বেশী ইনাম মিলতে পারে—সেখানে শুধু শুধু তাকে কেটে নিজেদের হাত কলুষিত করে লাভ কী?

নিজেদের সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে।

কিন্তু তাতে অসুবিধা ঢের—ভয়ও একটু আছে। প্রথমত বাঁধা অবস্থায় ঘোড়ার পিঠে বসানো যায় না। বসালে এক জনকে ধরে নিয়ে যেতে হয়—তাতে দ্রুত হাঁটা যায় না। হাঙ্গামাও বিস্তর। আবার এধারে পথে যদি সিপাহীদের কোন একটা বড় দল সামনে এসে পড়ে তারা হয়তো ছিনিয়ে নেবে—বাহাদুরিটা নিজে নেবার জন্য।

চটিওয়ালা উপদেশ দিল, 'আমার কাছেই রেখে যাও—বাঁধা আছে তো, তোমরা গিয়ে নানাসাহেবকে খবর দাও। বরং আজিমুল্লা খাঁর শুনেছি ঢের লোক আছে, গাড়ি-ঘোড়াও আছে—তারাই নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করুক।'

উদাসীনভাবে কথাটা বলবার চেষ্টা করলেও ব্যগ্রতা বোধ হয় একটু বেশিই প্রকাশ পেয়েছিল। সিপাহীদের কাছে ব্যাপারটা স্পষ্ট হতে

একটুও বিলম্ব হল না। মতলবটা ভাল—'তোমরা রেখে যাও, আমি বাহাদুরিটা নেব।'

আলোচনা ও তর্কের শেষ নেই।

ক্রমে গ্রামবাসীদের মনোভবও বেশ প্রকট হয়ে উঠেছে। এত বড় শিকার হাতছাড়া করতে তারা নারাজ। আংরেজটাকে কেড়ে নিতে তাদের হাত নিশপিশ করছে—শুধু এই ছটি বন্দুকের ভয়েই পারছে না। কিন্তু এতগুলি লোক যদি সত্যিই বেঁকে বসে তো বন্দুক ছটা শেষ পর্যন্ত কাজে লাগবে কিনা সন্দেহ।

বিপন্ন সিপাহীরা পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। শেষ অবধি এক জন প্রস্তাব করল—তার চেয়ে ওকে কেটে মুণ্ডটা নিয়ে এখনই রওনা হওয়া যাক, তা হলে কাল এক প্রহর বেলার মধ্যেই নানাসাহেবের কাছে পৌঁছে দেওয়া যাবে।

প্রস্তাবটা শুনে বাকী সিপাহী ক'জন শিউরে উঠল। গ্রামবাসীরা আর একটু ঘন হয়ে ঘিরে দাঁড়াল।

এ প্রস্তাবে যদি এরা ইতস্তত করে—তারা কাজে লাগবে না কেন?

শেষে বেগতিক দেখে আরও এক জন সিপাহী এই প্রস্তাব সমর্থন করল।

বাকী চার জন কিন্তু প্রথমটা খুব বেঁকে বসল। এক জন স্পষ্টই বলল, 'আমরা ওর মধ্যে যাই কেন? যা করবার নানাসাহেবই করুক না। হাজার হোক আমরাই ভরসা দিয়ে এনেছি ওকে—'

কিন্তু ক্রমে সকলেই বুঝল যে বেশী ইতস্তত করলে শিকার হাতছাড়া হবে। গ্রামের নামটি আগে তারা শোনে নি—এখন সেটাও কানে গেল। এ অঞ্চলে গ্রামটা বিখ্যাত—এক পয়সার জন্যও এরা না করতে পারে এমন কোন কাজ নেই। তাদের হাতে বন্দুক আছে সত্যি কথা, কিন্তু এতগুলি লোক—বেকায়দায় ফেলতে কতক্ষণ? আর কিছু না হোক, ঘোড়াগুলোকে জখম করে ফেললেই তো যথেষ্ট।

শেষ অবধি সর্বসম্মতিক্রমে সাহেবকে কেটে ফেলাই ঠিক হল। তাতেও চটিওয়ালা বাগড়া দিতে এসেছিল—এসব হাঙ্গামা তার বাড়িতে কেন? যা করবে দূরে গিয়ে কর না বাপু।...গ্রামবাসীরাও সঙ্গে সঙ্গে উল্টো সুর ধরল। দু-এক জন এমন ভাবও দেখাল—প্রয়োজন হলে ওরা এই কাজে বাধা দেবে।

সিপাহীদের মেজাজ খারাপ হয়ে উঠল। এখন যেন একটা জেদ চেপে

গেছে। সাহেবটাকে তারা মারবেই—অন্তত এদের উদ্দেশ্য তো তাতে পণ্ড হবে। চটিওয়ালাকে এক জন সঙ্গীনের এক খোঁচা দিয়ে চুপ করিয়ে দিল। আর দু জন সাহেবকে টেনে একটা নিম গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে দাঁড় করাল। ওদের মধ্যে প্রধান যে, সে খাপ থেকে তলোয়ারটা খুলে এগিয়ে গেল। সঙ্গে টোটা বারুদ খুব বেশি নেই—অকারণে নষ্ট করা ঠিক হবে না। হয়তো অবিলম্বে আত্মরক্ষার কাজেই লাগতে পারে। তা ছাড়া মুণ্ডটা কেটে নিয়ে যাবার একটা চেষ্টা তো করতে হবে।

বোল্‌টন একবার অস্ফুট কণ্ঠে যীশুকে স্মরণ করল। দেশে মা আছেন—কিন্তু না, তাঁর কথা সে কিছুতেই ভাববে না। যদি চোখে জল এসে যায়।

সব ঠিক, যে তলোয়ার খুলেছিল সে বোধ করি পশীব খিল ছাড়িযে নেবার জন্যই হাতটা তুলে বার দুই শূন্যে আস্ফালন করে নিল—কিন্তু শেষ পর্যন্ত আসল স্থানে অর্থাৎ বোল্‌টনের কাঁধে সেটা নেমে আসবার ঠিক আগেই সহসা দূর প্রান্তরে যেন একটা অশ্বপদধ্বনি বেজে উঠল। প্রথমটা সকলেরই সন্দেহ হয়েছিল, বুঝি কানই ভুল শুনছে। কিন্তু একটু পরে আর কোন সংশয় রইল না।

নির্জন মাঠ, নিস্পন্দ গুমোট আবহাওয়া—বহু দূর থেকে শব্দটা স্পষ্ট হযে উঠেছে। ঘোড়সওয়ার আসছে—সে সম্বন্ধে সন্দেহ মাত্র নেই। সকলেই উৎসুক হয়ে তাকাল। গ্রামবাসীরা আশান্বিত—আর কিছু না হোক, একটা ঝগড়া বাধলেও তাবা বাঁচে। যদি আগন্তুক গোরা ফৌজের লোক হয় তো কথাই নেই, এখনই শপথ করে এই সিপাহীগুলোকে অভিযুক্ত করবে। প্রমাণ করে দেবে—তাদেবই জন্য সাহেব এখনও বেঁচে আছেন, নইলে এই সিপাহীবা এতক্ষণ কেটেই ফেলত। আব যদি সিপাহী হয় তো বেশ ভাল রকম বিবাদ বাধানো যাবে।

ঠিক এই একই কারণে সিপাহীগুলিরও প্রথমটা মুখ শুকিয়ে গিয়েছিল। যদি গোরার দলই কোথাও থেকে এসে পড়ে! সিপাহীদের দল এলে ইনামটা হাতছাড়া হবার ভয, কিন্তু গোরা হলে জানটাই যাবে যে। তারা ঘোড়ার রেকাবে পা টান করে প্রস্তুত হযে বসল, তেমন দেখলে সোজা দৌড় দিতে পারবে।

কিন্তু আর একটু পরে বোঝা গেল—দল-টল কিছু নয়, আগন্তুক একা। একটি ছোট গোছের ঘোড়া বা বড় গোছের খচ্চর চেপে কেউ এক জন আসছে,

মাত্র। সকলেই নিশ্বাস ফেলে সহজ হল। এখন আর ভয় নেই—সে জায়গায় ঔৎসুক্য জন্মেছে।

আরও কাছে আসতে, তখনও আকাশের সর্ব-পশ্চিমপ্রান্তে লেগে থাকা গোধূলির আবছা আলোতে দেখা গেল—আগন্তুকও সিপাহী এক জন।

সিপাহীদের ভরসা বাড়ল, ভ্রূ কুঞ্চিত হল। একজন হেঁকে প্রশ্ন করল, 'কৌন্ হ্যায়?'

যে আসছিল সে কোন উত্তর না দিয়ে সোজা তাদের কাছে এসে ঘোড়া থেকে নেমে পড়ল। তার পর এক লহমায় সমস্ত ব্যাপারটা অনুমান করে নিয়ে অত্যন্ত সহজকণ্ঠে অথচ কর্তৃত্বের ভঙ্গিতে প্রশ্ন করল, 'এ সব কী! কী হচ্ছে এখানে?'

কণ্ঠস্বর পরিচিত। বোল্‌টন চোখ তুলে তাকাল। চুলার কাঠগুলো তখনও জ্বলছে। তারই কম্পমান আলোটা আগন্তুকের মুখে পড়েছে—বোল্‌টনেরও।

একটা নিমেষ মাত্র। দু জনেরই চোখে পরিচয়ের ভাষা ফুটে উঠে আবার মিলিয়ে গেল।

॥ ৪২ ॥

কর্তৃত্বের ভঙ্গিটা ঠিকমত প্রকাশ পেলে, অথবা আদেশের সুরটা পুরোপুরি কণ্ঠে ফুটে উঠলে সকলেই তার সামনে নত ও সংকুচিত হয়ে পড়ে। কোন্ অধিকারে সে ব্যক্তি এই কর্তৃত্ব প্রকাশ করছে তা বিচারের অবকাশ পায় না—স্বাভাবিক ভাবেই আদেশ পালন করে, কর্তৃত্ব মেনে নেয়। হীরালাল এমনিতেই অবশ্য নির্বিরোধ ভালমানুষ, তার ওপর এখানে এসে পর্যন্ত মামার ভয়ঙ্কর দাপটে ও নিয়ত বয়োজ্যেষ্ঠদের সাহচর্যে শান্ত ও বিনত হয়ে থাকাই তার অভ্যাস হয়ে গেছে। তবু বোধ করি, তার রক্তে কর্তৃত্বের বীজ কোথাও লুকোনো ছিল—আজ এই সিপাহীর পোশাকটা গায়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সেই বীজই অঙ্কুরিত হয়ে উঠেছে। সে নিজেও অবাক হয়ে লক্ষ্য করল—কেমন করে অনায়াসে তার কণ্ঠস্বর ও অঙ্গভঙ্গিতে সহজ কর্তৃত্ব এবং নেতৃত্বের ভাবটা ফুটে উঠেছে। অবশ্য ওর সুগঠিত বলিষ্ঠ দেহে পোশাকটা মানিয়েওছিল

বড চমৎকার। সবটা জড়িয়ে উপস্থিত সিপাহী এবং গ্রামবাসীদের মধ্যে সত্যি-সত্যিই একটা সম্ভ্রমের সৃষ্টি হল।

সিপাহীদের ঠিক এতটা তটস্থ হবার আর কোনও কারণ ছিল না। সাধারণ হাবিলদারের পোশাক হীরালালের। এ-দলেও দু জন হাবিলদার ছিল। তবু একজন, যে সামনে দাঁড়িয়ে ছিল, সে যেন কতকটা অভিভূতের মতই দু হাত জোড করে বলল. 'সরকার, ইযে এক গোরা হ্যায়!'

'হ্যাঁ, তা তো দেখছি। বেঁধেছ ভাল করেছ, কিন্তু ঐ যে ওধারে কে দাঁড়িয়ে আছে—তোমার তলোয়ার খোলা কেন? তোমরা নানাসাহেবের হুকুম শোন নি?'

'না তো! কী হুকুম সরকার?'

সিপাহীরা আর-একটু কাছে ঘেঁসে এল, গ্রামবাসীরাও আতঙ্কমিশ্রিত সম্ভ্রমের দূরত্ব বজায় রেখে উৎসুকভাবে কান খাড়া করে রইল।

'নানা ধুন্ধুপন্থ পেশোয়া হুকুম দিয়েছেন যে, কোন গোরা আংরেজ, পুরুষ বা মেযেমানুষ কাউকে মারা চলবে না। যে যাকে পাবে, বেঁধে নিয়ে নানা-সাহেবের সরকারী কাটকে জিম্মা করে দেবে। লড়াই শুরু হযে গেছে—এ পক্ষেও বন্দী হবে, ও পক্ষেও হবে। সাহেব গোটাকতক আমাদের হাতে আটক থাকলে, আমাদের দলের কোন লোককে মারতে কি কাটতে ওরা সাহস করবে না'

কথাটা খুবই যুক্তিযুক্ত বোধ হল। ঠিক সময়ে ঠিক কথাটা মুখ দিয়ে বের করার জন্য হীরালাল মনে মনে মা-কালীকে ধন্যবাদ দিলে একবার।

গ্রামবাসীরা প্রায় সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠল, 'আমরা তো সেই থেকে এই কথাই ওদের বোঝাচ্ছি হুজুর, তা এই বেকুফ সিপাইগুলো কি কথা শোনে। দেখলে, বলছিলুম তোমাদের যে, একে সরাসরি নানাসাহেবের দরবারে নিয়ে যাও! দেখলে তো এখন?'

সিপাহীগুলো বড়ই দমে গিয়েছিল, তাই এই ধরনের অপমানও নীরবে হজম করল। মাতব্বর ধরনের যে লোকটি বোল্টনকে কাটতে গিয়েছিল সে এখন পুনশ্চ হাত জোড় করে বলল, 'তা কী করব সরকার বলে দিন।'

হীরালাল ভ্রূকুটি করে একবার ঘোডাগুলোর দিকে ও বোল্টনের দিকে চেয়ে নিয়ে ঈষৎ তাচ্ছিল্যের সুরে বলল, 'এর আর এত কি ভাববার আছে বুঝি না! ওর বন্দুকটা কেড়ে নাও, জেব-টেবগুলো দেখে নাও আর কোন

হাতিয়ার আছে কিনা। তার পর ওর পায়ের বাঁধন খুলে দিয়ে ওর ঘোড়াতেই ওকে চাপিয়ে দাও। এক জন শুধু ওর ঘোড়ার লাগামটা ধরে সঙ্গে সঙ্গে চল।—তোমাদের অসুবিধে হয় তো আমাকেই দাও, আমি নিয়ে যাচ্ছি। বাকি তোমরা দু জন দু পাশে চল—দু জন আগে আর দু জন পিছে। পালাবে কোথায়?'

এ মতলবটা সিপাহীদের সকলকারই ভাল লাগল। লোকটা যখন তাদের চারদিকে নিয়েই যেতে চাইছে, তখন হয় তো খুব বদ মতলব কিছু নেই, অন্তত একা বাহাদুরি বা বকশিশটা চায় না। সেক্ষেত্রে এমন একটা লোক সঙ্গে থাকাই ভাল।

তারা খুশী হয়ে কাজে লেগে গেল। এক জন বোলটনের ঘোড়াটাকে নিয়ে এল, আর এক জন তাড়াতাড়ি ওর পায়ের বাঁধনটা খুলে দিতে গেল।

হীরালাল যদিও এই মাত্র ওদেরই জের-টের পরীক্ষা করতে বলেছিল, তবু এখন অত্যন্ত সহজভাবে, যেন সিপাহীদের সাহায্য করতেই, নিজেই সে কাজে অগ্রসর হল। বোল্টনের শার্ট-এর পকেট, প্যান্টের পকেট, সব দেখে, কাগজ-পত্র যা দু-একখানা পেয়েছিল তা অত্যন্ত তাচ্ছিল্যভরে পকেটেই আবার রেখে দিল। কেবল কোমরবন্ধ থেকে পিস্তলটা খুলে নিয়ে একবার নেড়েচেড়ে দেখে সটা ওদেরই এক জনের হাতে দিয়ে বলল, 'এটা তোমাদের কাছেই থাক—কী বল? পথে কাজে লাগতে পারে।'

'জী সরকার।' সকলেই সায় দিল, 'আপনিই রাখুন বরং, ওর সঙ্গেই যাবেন তো—হাতে তৈরী রাখা ভাল, কোন গোলমাল করলে সাবাড় করে দেবেন।'

হীরালাল একান্ত নিরাসক্ত ভাবে উত্তর দিল, 'তা মন্দ বল নি। তাই রাখি বরং।'

হীরালাল পকেট থেকে কাগজগুলো নেবার সময় সকলের অগোচরে বোল্টনকে অত্যন্ত নিম্নস্বরে ইংরেজিতে বলে নিয়েছিল, 'ভয় পেয়ো না। আমি বন্ধু। যা বলি শোন।' এখন প্রকাশ্যে বেশ কঠোর কণ্ঠে প্রশ্ন করল, 'তোমার নাম কী? কী কর? কোন্ কোম্পানির? ঠিক ঠিক জবাব দাও।'

হীরালাল আশ্বাস না দিলেও বোল্টনের বন্ধু চিনতে ভুল হত না। গলায়াবটা যে এর জন্যই গলায় পড়তে পড়তে রয়ে গেল, তা বুঝে আগেই সে

যৎপরোনাস্তি কৃতজ্ঞ হয়েছিল। তবু সে-ও, অভিনয়ের অঙ্গ হিসেবেই, নিরুত্তরে অপরদিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

হীরালাল মুহূর্ত কয়েক চুপ করে থেকে কাঁধটা ধরে সজোরে ঝাঁকানি দিয়ে বলল, 'কী হল? উত্তর দাও।...তুমি আমাদের বন্দী। ভালয়-ভালয় আমাদের কথা মত যদি না চল তো—'

বোল্‌টন উদ্ধতভাবে জবাব দিল, 'তোমরা বেইমান বিশ্বাসঘাতক, তোমাদের সঙ্গে আমার কোন কথা নেই। নানাসাহেবের কাছেই নিয়ে চল, উত্তর দিতে হয় সেখানেই দেব।'

এক জন সিপাহী তার এই ঔদ্ধত্যে রুষ্ট হযে এক ধমক দিয়ে উঠল, 'এই, ঠিক ঠিক কথা বল। নইলে নানাসাহেবের কাছে পৌঁছতে হবে না—তার আগেই আমরা ঢিট করে দেব। যে জিভে আমাদের গাল দিচ্ছ, সে জিভ আর থাকবে না।'

হীরালালও ভ্রূকুটি করে বলল, 'হুঁ, তোমার বিষদাঁত ভাঙে নি এখনও। ভয় নেই, নানাসাহেব জানেন—তোমাদের মত কুকুরকে কোন্ মুগুরে বশ করতে হয়।...ভাই সব, তৈরী? চল এবার রওনা হওয়া যাক্।'

সিপাহীরা ঘোড়ায় চড়ে তৈরী হয়েই ছিল। ডাল আবারও পুড়ে উঠেছে। আটার তাল তেমনিই মাখা পড়ে আছে। কিন্তু এখন আর সেদিকে নজর দিলে চলবে না। আজ অদৃষ্টে আহার নেই। তারা সে চেষ্টাও করল না। যদি গোরা ধরবার বকশিশই ঠিক ঠিক মেলে তো এ অনাহারের দুঃখও ঘুচবে। তারা সাবধানে বন্দীকে ঘিরে চলতে শুরু করল। মাঠে ঠিক সুবিধে না হলেও প্রশস্ত বড় সড়কে পড়ে হীরালালের নির্দেশানুযায়ী ব্যূহ রচনা করে চলতে কোন অসুবিধা হল না। বোল্‌টনের ঘোড়ার লাগাম ও কোমরের দড়ি হীরালালের হাতেই রইল।

কিন্তু বেশীক্ষণ সেভাবে চলা সম্ভব হল না। পাশাপাশি ইংরেজ ও বাঙালীর চলতে যতটা না আপত্তি হোক—অশ্ব ও অশ্বতরে প্রবল আপত্তি দেখা দিল। খচ্চরের আরোহীর হাতে ঘোড়ার লাগাম থাকবে, ঘোড়ার পক্ষে এর চেয়ে অপমানকর বুঝি আর কিছুই নেই। সে বার বার প্রবল আপত্তি জানিয়ে সজোরে সবেগে আগে চলবার চেষ্টা করতে লাগল—বার বারই লাগামটার কথা স্মরণ করিয়ে তাকে পুনরায় সংযত করতে হল হীরালালকে। কিন্তু তবু দেখা গেল, এই টানা-হেঁচড়ার ফলে বোধ করি, এক সময়

হীরালাল ও বোল্টন দু জনেই কিছু এগিয়ে গেছে। সিপাহীদের চোখের আড়ালে যায় নি বলেই হোক অথবা এতক্ষণে হীরালালের আচরণে তার ওপর আস্থা এসেছে বলেই হোক, তারা আর খুব বেশী তাগিদ করে ব্যূহ রক্ষা করবার চেষ্টাও করল না! তা ছাড়া ঘোড়া খানিকটা বিশ্রাম পেয়েছে সত্য কথা, কিন্তু সারাদিন চলবার ক্লান্তি ঐটুকু বিশ্রামে অপনোদিত হয় নি। এই অবস্থায় বেশী জোর করতে গেলে হয় তো হিতে বিপরীত হবে। সে জন্যও কতকটা তারা নিরস্ত রইল।

আর হীরালাল সেই সময় ঘোড়া শাসনের অছিলায় এক ফাঁকে নিজের হাত থেকে চার-কোণা লাল পাথরের একটা আংটি খুলে বোল্টনের হাতে পরিয়ে দিল এবং আর একটা অমনি গোলমালের সুযোগে প্রায় অস্ফুটস্বরে বলে দিল, 'নানাসাহেবের কাছে পৌঁছবার পর যদি বিপদ বোঝ—কোন মতে তাঁর হুসেনা বেগমের কাছে এই আংটিটা পাঠিয়ে দিও। তিনি তোমাকে নিশ্চয়ই বাঁচাবেন!'

॥ ৪৩ ॥

বোল্টনের প্রাণটা আপাতত রক্ষা পেল—পরেও হয়তো পাবে, সেজন্য মামাকে ভুললে চলবে না। হীরালাল তা ভোলেও নি। শুধু অকারণ এমন একটা হত্যাকাণ্ড নির্বিকার ভাবে দাঁড়িয়ে দেখা যায় না বলেই সে এতখানি সময় নষ্ট করল। যে পথে এখন চলেছে সেটা তার পথ নয়—গাজীপুরের পথ এখান থেকে সোজা উত্তর-পূর্বে গিয়েছে। কাল সন্ধ্যায় দিক ঠিক করতে না পেরেই সে এই পথে এসে পড়েছিল—বোধ করি বোল্টনের অদৃষ্টক্রমেই। এখন শেষরাত্রে দিকটা ঠিক পেতেই সে বিদায়ের জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠল।

তখন ঘোড়াগুলোকে জল খাওয়াবার জন্য সকলে নেমে এক জায়গায় জড়ো হয়েছিল। সেই অবসরেই হীরালাল বলল, 'ভাই সব, এবার কিন্তু আমাকে ছাড়তে হবে। তোমরাই সাহেবটাকে নিয়ে সাবধানে চলে যাও। কানপুর আর বেশী দূর নয়। বেলা এক প্রহর হবার আগেই তোমরা পৌঁছে যাবে।'

'সে কি, আপনি যাবেন না? চলুন, চলুন!'

সকলেরই কণ্ঠে আগ্রহ ও মিনতি। তারা যেন একজন নেতা পেয়েছিল

—চলে গেলেই পুনরায় নেতাহীন হয়ে পড়বে। বোল্‌টনও নীরব মিনতির চোখে চেয়ে নিল একবার। কিন্তু হীরালালের দেরি করবার উপায় নেই।

সে ঘাড় নেড়ে বলল, 'না ভাই সব, আমি খুব জরুরী কাজে যাচ্ছি। পেশোয়া ধুন্ধুপন্থেরই হুকুম, দেরি করলে ক্ষতি হবে।'

বোল্‌টনের দিকে চেয়ে সকলের অলক্ষ্যে শুধু একটি অভয়ের ভঙ্গি করল। অর্থাৎ নির্ভয়ে যাও—কোন ভয় নেই। কিন্তু বোল্‌টন তাতে বিশেষ আশ্বাস পেল না। সে এই বাঙালী ছোকরার নাম জানে না, তবে কমিসারিয়েটের এক বাবু—এটুকু সে কাল কম্পমান উনানের আলোতেই চিনেছিল। কিন্তু যাই হোক, এই ছোকরা কাল যে উপস্থিত-বুদ্ধির বলে তার জীবন রক্ষা করেছে তার তুলনা নেই। ঐ ঘটনার পর থেকেই মনে মনে একান্তভাবে সে এই বাঙালী তরুণটিকেই আঁকড়ে ধরেছে—এখন যেন ভেতরে ভেতরে হতাশায় ভেঙে পড়ল।

সিপাহীরা পেশোয়ার নাম শুনে চুপ করে গিয়েছিল। তাদের ঠিক মালিক কে—দিল্লীর বাহাদুর শা, কানপুরের নানাসাহেব, না লক্ষ্ণৌএর বেগম—তা তারা জানে না। তবে এটা জানে যে, পেশোয়া নামের আজও অসীম প্রভাব আছে হিন্দুস্তানের সর্বত্র—পদবীটার সঙ্গে আজও একটা অপরিসীম মোহ জড়ানো আছে। বাজীরাও, বালাজীরাও, মাধাবরাওএর শৌর্যের কাহিনী আজও লোকের মুখে মুখে।...সুতরাং নানাসাহেবকে উপেক্ষা করা চলবে না। অগত্যা তারা চুপ করে গেল। সরকারী কাজ সকলের আগে—এত কাল সিপাহীগিরি করে এটুকু শিখেছে বৈকি।

হীরালাল চলে গেলে আবারও বোল্‌টনকে ঘোড়ায় চাপিয়ে তারা রওনা দিল। কানপুর সত্যিই আর খুব বেশী দূরে ছিল না—বেলা প্রথম প্রহর পার হবার আগেই তারা শহরের সীমান্তে পৌঁছে গেল।

কিন্তু কানপুরকে তখন জনারণ্য বললে কিছুই বলা হয় না। শহরের ঠিক তখন যা অবস্থা—উদ্বেল সাগরের সঙ্গেই মাত্র তুলনা হয়। চারিদিকেই কোলাহল, চারিদিকেই উত্তেজনা। আংরেজদের নাচাবগড় ঘেরাও করা হয়েছে—ভেতরে জল নেই, খাবার নেই, ওষুধ নেই, তবু ঐ কটা আংরেজ লড়ে যাচ্ছে। তাজ্জব ব্যাপার। এই প্রসঙ্গই সকলের মুখে মুখে। এদিকে দু সহস্রাধিক সৈন্য—আরও আসছে। একদল মুসলমান সৈন্য এসে প্রচণ্ড আক্রমণ করেছিল, তবু কিছুই করা যায় নি। ওদিকে বৃদ্ধ-স্ত্রী-পুরুষ নি-

মোট দুশ-র সামান্য কিছু বেশি হবে। তার মধ্যেও নিত্যই কয়েক জন করে মরছে—প্রতিদণ্ডেই মরছে বলতে গেলে, তথাপি ওদের এই প্রতিরোধশক্তি কোথা থেকে আসছে!

পথে-ঘাটে-মাঠে সর্বত্রই এই আলোচনা। মনে মনে ইংরেজদের তারিফ করছে অনেকেই। তেমনি কেউ কেউ যেন সিপাহীদের এই ব্যর্থতা ব্যক্তিগত অপমান বলে মনে করে রুষ্ট হয়ে উঠেছে। এত জেদ কিসের? এ জেদ ভাঙতে হবে।

সিপাহীদের সঙ্গে বোল্টনকে দেখে অনেকেই ওকে ছিনিয়ে নেবার জন্য উৎসুক হয়ে উঠেছিল। কেউ চায় তখনই ওকে মেরে ফেলে নিজেদের জিঘাংসা চরিতার্থ করতে—কেউ কেউ আবার লোকপরম্পরায় শুনেছে ইংরেজ ধরে নিয়ে যেতে পারলে বকশিশ মেলে। সেটাও যদি বিনা পরিশ্রমে করায়ত্ত হয় তো মন্দ কি?...তাদের এই ধরনের মনোভাব।

অতি কষ্টে সিপাহীরা এই সব লোলুপ-হস্ত বাঁচিয়ে চলল। তাদের আর শরীর বইছে না—কোথাও বসে একটুকু বিশ্রাম এবং অল্প কিছু খাদ্য না পেলে হয়তো এক সময় ঘোড়া থেকে পড়েই যাবে। ঘোড়াগুলোর অবস্থাও তথৈবচ। অথচ এ আপদ ঘাড় থেকে না নামিয়েও বিশ্রাম করার কল্পনা পর্যন্ত করা যায় না। এখন শুধু মানের কান্না হয়ে উঠেছে। তার ওপর প্রতি মুহূর্তে এই সব অপ্রত্যাশিত আক্রমণ সামলানো। তাদের হাতে বন্দুক আছে, কিন্তু জনতার কাছে বন্দুক কতক্ষণ? সুতরাং প্রত্যেককেই বলতে হল নানাসাহেবের হুকুমে এই 'আংরেজ'কে বন্দী করে আনা হয়েছে—তাঁর কাছে পৌঁছে দিতে হবে। এই কথাতেই কতকটা জাদুমন্ত্রের মত কাজ হল—রুষ্ট মারমুখী জনতার উদ্যত হাত নিরস্ত হল।

কিন্তু তাতে আর এক বিপদ বাধল। এই সিপাহীগুলো লক্ষ্ণৌএর ইংরেজ-শিবিরে ছিল, কানপুরের কোথায় কী হচ্ছে এবং কে কোথায় আছে, তার কোন খবর জানে না। কোথায় নানাসাহেব আছেন, কেমন করে তাঁর দেখা পাওয়া যাবে—সে কথাটা কাউকেও জিজ্ঞাসা করা দরকার। অথচ নানাসাহেবই যাদের পাঠিয়েছেন, তারা আবার কোন্ মুখে জিজ্ঞাসা করে যে নানাসাহেব কোথায় থাকেন বা তাঁর প্রাসাদটা কোন্ দিকে?

সুতরাং কতকটা লক্ষ্যহীনের মতই তারা 'যে দিকে দু চক্ষু যায়' সেদিকে চলতে লাগল। অপেক্ষাকৃত নির্জন কোন মহল্লা পেলে, যেখানে বন্দুকের

ভয় দেখিয়ে লোককে বশ করা যাবে—নানাসাহেবের পাণ্ডাটা তারা জেনে নেবে, এই মতলবেই এইভাবে চলছিল। এক সময় কি আর একটা জনবিরল পাড়া পাওয়া যাবে না?

কিন্তু পথ-ঘাট সম্বন্ধে কোন জ্ঞানই না থাকায় তারা কখন যে সে রকম ঈপ্সিত স্থান পেত কে জানে! ইতিমধ্যেই ঘুরে ফিরে কয়েকবার জেনারেলগঞ্জের চৌমাথার কাছে এসে পড়ল। একই লোক যদি এমনি ঘুরতে দেখে তো মিথ্যা-ভাষণটা ধরে ফেলতে কিছুমাত্র কষ্ট হবে না। যা হোক, দৈবক্রমে হঠাৎ একটা উপায় হয়ে গেল। একটা পথের মোড়ে হঠাৎ সর্দার খাঁর মাংসের দোকানটার সামনে তারা এসে পড়ল।

আজকাল সর্দার খাঁ নিজে বড়-একটা দোকান দেখতে ফুরসৎ পায় না। তার এক কর্মচারীই সেখানে বসে। কেবল আজই কী কারণে সে দোকানে এসে বসেছিল। তবে হাতে করে খাসি কাটার কাজটা আজও সেই লোকটা করছিল, সর্দার শুধু বসে পয়সাটা গুনে নিচ্ছিল—সুতরাং তার হাতে কাজ কম। সে এর মধ্যে এই দলটিকে আরও একবার এই পথে যেতে দেখেছে—এখন আবারও ঘুরে আসতে দেখে একেবারে দোকান থেকে নেমে পথ রোধ করে দাঁড়াল। একটা ইংরেজ অফিসারকে হাত-পা বেঁধে এমন করে সিপাহী কজন পথে পথে ঘুরছে—তার অর্থ কী? বিশেষত এদের সকলেরই ক্লান্ত ধূলিধূসর চেহারা ও উৎকণ্ঠিত মুখ—নিশ্চয় দূরের কোন পথ থেকে আসছে।

সে দু হাত প্রসারিত করে ঠিক পথের মাঝখানে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করল, 'তোমরা কে? কোথায় যাবে? এ আংরেজটাকে কোথায় পেলে? কোথা থেকে আসছ?'

প্রশ্নকর্তার এই সাক্ষাৎ দৈত্যের মত চেহারায় সিপাহীগুলোর বুকের রক্ত জল হয়ে গেল। এমন ভয়ঙ্কর চেহারার মানুষ এর আগে আর কখনও চোখে পড়ে নি। তাদের এতক্ষণকার রুখে ওঠবার ভঙ্গিটা যেন আর তেমন খুলল না। এমন কি, কথাই যেন গলায় আটকে গেল। তবু এক জন অনেক কষ্টে অভ্যস্ত মিথ্যাটাই বলল, 'নানাসাহেব পেশোয়ার হুকুমে আমরা একে ধরে নিয়ে আসছি।'

'ঝুট! ঝুটি বাত!' প্রচণ্ড হুঙ্কার দিয়ে উঠল সর্দার খাঁ, 'আমি পেশোয়ার নৌকর। আমার কাছে মিছে কথা বলে পার পাবে না।...তোমরা বিদেশ থেকে আসছ, তাই সর্বাঙ্গে এত ধুলো—আর পথঘাট চেন না বলে এক পথেই

এক শ বার ঘুরছ। সাফ সাফ কথা বল, নইলে আজ আর তোমাদের নিস্তার নেই। সত্যি-সত্যিই পেশোয়ার ফাটকে পুরব তোমাদের সুদ্ধ!'

এবার সিপাহীদের আর একেবারেই মুখে কথা যোগাল না। শেষ পর্যন্ত অতি কষ্টে এক জন মরীয়া হয়ে সত্যি কথাটাই বলে ফেলল, 'হুজুর, আমরা লক্ষ্ণৌএ থাকি। ওখানকার কমিশনার সাহেব এই সাহেবকে পাঠিয়েছিলেন এখানে গোয়েন্দাগিরি করার জন্যে। আমরা জানতে পেরে একে বেঁধে নিয়ে আসছি পেশোয়াব কাছে ধরিয়ে দেব বলে। আপনি ধরেছেন ঠিকই, আমরা এখানে একেবারে নতুন—পথঘাট চিনি না বলেই ঘুরছি।'

সর্দার খাঁ তার বর্তুলাকার চোখ দুটি মেলে কয়েক মুহূর্ত স্থির দৃষ্টিতে ওদের দিকে তাকিয়ে রইল। মনে হল লোকগুলো সত্যি কথাই বলছে। তাই অপেক্ষাকৃত মোলায়েম স্বরে বলল, 'বেশ চল, পেশোয়ার কাছেই নিয়ে যাচ্ছি। বকশিশ আদায় করতে পার ক'ব। লক্ষ্ণৌএর খবর পেলে হয়তো তাঁর উপকার হবে—বকশিশ দিতেও পাবেন। নইলে আংরেজ ধবাব কোন বকশিশ নেই—এ তো তোমাদেবই কর্তব্য।'

নানাসাহেব অবরোধেব একেবারে কাছে থাকবেন বলে বড একটা হোটেল-বাড়ি দখল ক'বে রয়েছেন কদিন। সর্দার খাঁ পথ দেখিয়ে সেই নতুন আস্তানার দিকেই নিয়ে চলল।

॥ ৪৪ ॥

এ পথে ভিড় আবও বেশী। প্রাসাদেব কাছাকাছি তো লোক ঠেলে চলাই দুষ্কর হয়ে উঠল—এত লোকের সমাগম। সিপাহী, প্রসাদপ্রার্থী, ব্যবসাদার, জমিদার, নবাব—কে না আছে সে জনতায়। এর মধ্যে শুধু সিপাহীরা এলে যে 'আংরেজ'-টাকে নিয়ে নিরাপদে নানাসাহেবের দরবারে পৌঁছনো যেত না—এটা তারা পরিষ্কার বুঝতে পারল। কিন্তু সর্দার খাঁর দেখা গেল অসীম প্রতিপত্তি। তাকে দেখে সকলেই যেন আতঙ্কিত হয়ে পথ ছেড়ে দিতে লাগল। ফলে সিপাহীদেরও ঐ লোকটি সম্বন্ধে সম্ভ্রম বেড়ে গেল।

প্রাসাদের মধ্যে ঢুকে প্রথমেই সর্দার খাঁ নীচে যেখানে রবাহুতদের জন্যে রুটি তৈরী হচ্ছিল, সেখানে ওদের নিয়ে গেল। ঘোড়ার ব্যবস্থা আগেই হয়েছিল,

এবার ওদের ব্যবস্থা। সর্দার খাঁ বলল, 'তোমরা এখানে বসে মুখে একটু জল দিয়ে নাও। এদের বলে দিলুম—খানা চাইলেই পাবে। এরও হাতটা খুলে দাও—মুখে একটু জল দিক্‌। চায় তো রুটিও দুখানা খেয়ে নিতে পারে।… এত লোক আছে—পালাতে পারবে না। কোমরের দড়ি তো আছেই। আমি ততক্ষণ পেশোয়াকে এত্তেলা দেবার ব্যবস্থা করছি।'

চলে যেতে গিয়েও কী ভেবে সর্দার খাঁ বোল্‌টনের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। বলল, 'জল খেতে চাও? দুখানা রুটি? তোমার অদৃষ্টে কী আছে জানি না—পেশোয়ার যা মর্জি, ইচ্ছে করলে কিছু খেয়ে নিতে পার।'

বোল্‌টন জীবনের আশা রাখে নি। হীরালাল চলে যাবার পর থেকেই সে আশা সে একেবারে ছেড়েছে। তার ওপর এখন এই ভয়ঙ্কর দৈত্যটার সঙ্গে দেখা হাওয়ার পর থেকে, প্রায় প্রতি মুহূর্তেই যেন মৃত্যুকে প্রতীক্ষা করছিল। কিন্তু অকস্মাৎ দৈত্যটার এই সামান্য মনুষ্যত্বের ইঙ্গিতেই কোথায় একটা আশা আবার তার মনের মধ্যে মাথা তুলল। অল্প বয়স তার—এ বয়সে আশা বুঝি কিছুতেই মরে না। অকস্মাৎ তাই এই লোকটাকেই অবলম্বন করে তার মৃত আশা আবার মঞ্জরিত হয়ে উঠল। মরীয়া হয়ে—জুয়া খেলা হিসেবেই, সে এক ফাঁকে চুপি চুপি প্রশ্ন করল, 'হুসেনী বেগমকে চেন তুমি? তাঁকে একটা খবর দেবে?'

ভূত দেখছে মনে হলে লোক যেমন চমকে ওঠে, সর্দার খাঁ তেমনিই চমকে উঠল। বেশ কয়েক মুহূর্ত সময় লাগল তার সে বিস্ময়টাকে সামলে নিতে। তারপর খুব সহজ ভাবেই ঐ সিপাহীদের বলল, 'তোমরা বরং মুখ-হাত ধুয়ে নাও, আমিই এর হাত খুলে দিচ্ছি।…এই চল ওধারে, জল খেতে চাও তো ওখানে গিয়ে ব'স।'

তার পর বোল্‌টনের কোমরের দড়ি ধরে একরকম টানতে টানতেই একটু দূরে নিয়ে গিয়ে চুপি চুপি অথচ কঠোর কণ্ঠে বলল, 'কেন, হুসেনী বেগমকে তোমার কী দরকার?'

বোল্‌টন কথা না বলে সদ্যোমুক্ত ডান হাতখানা উল্টো করে মেলে ধরল। অনামিকার পাশে—কনিষ্ঠায় একটি রুপো-বাঁধানো আংটি, তার চারকোণা লাল পাথরটা জ্বল জ্বল করছে!

আবারও চমকে উঠল সর্দার খাঁ, কিন্তু কোন কথা বলল না। আংটিটা এক টানে বোল্‌টনের হাত থেকে খুলে নিয়ে তার জন্যেও কয়েকখানা রুটির

ব্যবস্থা করে সে ভেতরে চলে গেল। তবে নানাসাহেব যেদিকে ছিলেন সেদিকে নয়—সে গেল সোজা অন্তঃপুরের দিকে।

হুসেনী বেগম এই কদিনের উপর্যুপরি উত্তেজনায় ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। অথচ একটু বিশ্রাম নেবারও যেন শক্তি নেই তার। ফলে তার চক্ষু হয়ে উঠেছে আরক্ত, চুল রুক্ষ ও অবিন্যস্ত - বেশভূষায় কোন শৃঙ্খলা বা পারিপাট্য নেই। চোখের কোলে গভীর কালি—এক কথায় উন্মাদের মত তার চেহারা হয়েছে। বিশ্রামের সময় আছে, এমন কিছু গুরুতর কাজ হাতে নেই, কিন্তু মনের যতটুকু স্থৈর্য ফিরে এলে একটুখানি ঘুমও সম্ভব হত—সেটুকু স্থৈর্যেরও একান্ত অভাব। ঘুম দূরের কথা, স্নানাহার করার মতও সহজ অবস্থা সে মনে আনতে পারছে না—অবিরাম যেন কক্ষচ্যুত উল্কার মত এ-ঘর, ও-ঘর, পথ-ছাদ করে বেড়াচ্ছে। দাসী জোর করে মধ্যে মধ্যে শরবৎ বা দুধ খাওয়ায় বলে জীবনটা আছে—চলাফেরার শক্তিটা লোপ পায় নি এখনও।

অনেকেই এই ব্যাপারে অনেক অনুযোগ করেছে, স্বয়ং নানাসাহেবও। কিন্তু তাঁকে সে এক কথায় ঠাণ্ডা করেছে, 'দাঁড়ান পেশোয়া, এ আমার জীবনমরণ পণ যে—আপনার শত্রুর নিপাত না হলে আমি স্থির হয়ে খেতে কি ঘুমোতে পারব না।'

নানাসাহেব বেশী পীড়াপীড়ি করতে পারেন নি। সামান্য আর একটু অনুযোগের পর মুসম্মৎকে ডেকে একটু-কিছু খাওয়াবে নির্দেশ দিয়েই কর্তব্য শেষ করেছেন।

মুসম্মৎ ও সর্দার খাঁ অবশ্য অনেক বকাবকি করেছে, তবে তাদের সঙ্গে ধমকের সম্পর্ক—ধমক দিয়েই তাদের থামিয়ে দিয়েছে হুসেনী। বলেছে, 'মিছে আমার মাথা আরও খারাপ করছিস সর্দার, এর একটা এস্‌পার-ওস্‌পার না হলে আমি কিছুতেই স্থির হতে পারব না।'

মুসম্মৎ অনুনয় করেছে, 'কিন্তু এমন করে আর কদিন থাকতে পারবে? মরে যাবে যে!'

'মরব! মরা অত সহজ নয়। তা ছাড়া খাচ্ছি তো—দুধ খাওয়া কি খাওয়া নয়?'

'অন্তত একবার স্নানটাও কর! এই গরম—'

'এই গরমে ঐ সাহেব-মেমগুলো স্নান না করে যুঝছে তো! না মুসম্মৎ,

স্নান না করলে মানুষ মরে না।…আগে ইংরেজদের রক্তে স্নান করব—তার পরে এমনি স্নান!'

এই অবস্থাই চলছে। তার সঙ্গে কথা কওয়াই প্রায় অসম্ভব, তবু সর্দার খাঁকে সেই চেষ্টাই করতে হল। পিঞ্জরাবদ্ধ ব্যাঘ্রীর মত আমিনা তখন একটা ঘরের মধ্যে একা পায়চারি করছিল, সহসা সর্দার খাঁকে দেখে যেন কতকটা আশার সঙ্গেই দু-এক পা এগিয়ে এল।

'কী খবর রে সর্দার—ওরা হার মানল?'

'না। আমি অন্য কথা বলতে এসেছি।'

'কী কথা?' ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে উঠল আমিনার।

সর্দার খাঁর অবশ্য কখনই ভূমিকা করা অভ্যাস নেই। সে বিনা ভূমিকায় বলল, 'ক'জন সিপাই একটা সাহেবকে ধরে এনেছে। নানাসাহেবের হাতে দিয়ে বকশিশ চায়। সাহেবটার হাতে এই আংটিটা ছিল। সে আপনার নামও করেছে আমার কাছে।'

আংটিটা মেলে ধরল আমিনার সামনে।

আমিনার মুখ ঠিক উজ্জ্বল হয়ে না উঠলেও যেন অনেকখানিই পূর্বের প্রশান্তি ফিরে পেল। চোখ দুটিও স্নেহে কোমল হয়ে এল।

'হীরালাল দিয়েছে নিশ্চয়ই। সে-ই আমার নাম করে দিয়েছে! সে ওকে বাঁচাতে চায়।…সাহেবটা এখন কোথায়।'

'সিপাইদের সঙ্গে নীচে অপেক্ষা করছে। তাকে কিছু খাবার দিতে বলেছি।'

কয়েক মুহূর্ত নীরবে কী চিন্তা করে নিল আমিনা। তার পর বলল, 'তুই লোক দিয়ে এখনই ওকে পেশোয়ার কাছে পাঠিয়ে দে।…এমনি ছেড়ে দিয়ে কোন লাভ নেই—আবার কার হাতে ধরা পড়বে। একেবারে নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে দিতে হবে।…আর সে কাজ নানাসাহেবের হুকুম ছাড়া হবে না।'

সর্দার খাঁ ঈষৎ বিস্মিত হয়ে তাকাল। প্রতিবাদ করা বা তর্ক করা তার অভ্যাস নয়। তবু একবার বলল, 'আংরেজকে হাতে পেয়ে ছেড়ে দেবেন মালেকান?'

পিশাচী যেন মন্ত্রবলে মানবীতে পরিণত হয়েছে। আমিনার স্নিগ্ধ দুটি চোখের দৃষ্টি যেন বহুদূরে আবদ্ধ হল। অনেক দিন পরে স্নেহ-কোমল কণ্ঠে

সে কথা কইল। বলল, 'এ তুই বুঝবি না সর্দার খাঁ, যার অনুরোধে ওকে এ অনুগ্রহ করছি, এ দুনিয়ায় তার মত সম্মান আমায় কেউ দেয় নি। সে আমাকে শ্রদ্ধা করে—সে আমাকে দেবীর মত দেখে!...সে আমাকে ভালবাসে, কিন্তু কখনও কামনার দৃষ্টিতে দেখে নি। সে—সে...না সর্দার, তার অনুরোধ না শুনে উপায় নেই!'

সর্দার আর দ্বিরুক্তি না করে নিঃশব্দে বার হয়ে গেল।

আমিনা কিছুক্ষণ সেখানেই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তার চোখ যদিও খোলা দ্বারপথেই নিবদ্ধ, তবু সেদিকে চাইলেই বোঝা যায় যে, সে চোখের দৃষ্টি ঐ দ্বারপথ পার হয়ে, তার বাইরের অলিন্দ পার হয়ে, এমন কি এই জনপদও পার হয়ে বহু বহু দূর চলে গেছে,—যেখানে একটি তরুণ ভক্ত তার অন্তরের সমস্ত শ্রদ্ধা ও প্রীতির আরতি সাজিয়ে বসে আছে, যেখানে মনুষ্যত্বের আসন পাতা, যেখানে নব-জীবনারম্ভের সুযোগ ও ইঙ্গিত দুটি পূর্ণপাত্রে সজ্জিত। হয়তো এখনও সময় আছে—হয়তো এখনও নতুন করে এই ঈশ্বরের পৃথিবীর রূপ-রস-বর্ণ-গন্ধ আস্বাদনের সুযোগ মিলতে পারে। এখনও জীবনের আনন্দ নিঃশেষ হয়ে যায় নি। এখনও এর বর্ণ-সুষমাময় বৈচিত্র্য সম্বন্ধে তার দু চক্ষু সজাগ ও সচেতন—জরা ও বয়স এখনও এই দেহ থেকে অনেক দূরে আছে, তাদের কর আদায়ের সময় এখনও আসে নি।

সে যাবে নাকি? এই ঘৃণ্য নারকীয় পবিবেশ ছেড়ে, প্রতিহিংসার 'তীব্রজ্বালা বহ্নি-ঢালা' সুরাপাত্র দূরে নিক্ষেপ করে ছুটে চলে যাবে—যেখানে এখনও কিছু শান্তি, কিছু আনন্দ আছে? হয়তো এখনও কোন অজ্ঞাত শান্ত গৃহকোণে কোন একটি মঙ্গলপ্রদীপ জ্বালাতে পারে সে—আজও! তাই যাবে নাকি?

কিন্তু পরক্ষণেই সমস্ত দেহ শিউরে একটা প্রচণ্ড ধিক্কার তাকে সচেতন করে দিয়ে গেল।

এই দেহটা নিয়ে? এই জন্মেই আবার? ছিঃ ছিঃ!

না, আর সময় নেই। আকণ্ঠ পঙ্কে নেমেছে, এখন যেখানেই যাক না কেন, এই পঙ্কের মালিন্য ও দুর্গন্ধ তার সঙ্গে যাবে।

না। সে সম্ভব নয়। এ জীবনটা এমনি করেই জ্বলে ও জ্বালিয়ে কেটে যাক।

তার পর যেদিন এই অবসন্ন আত্মা তার স্বেচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত অপরাধের বোঝা নিয়ে ঈশ্বরের দরবারে উপস্থিত হবে, কেবলমাত্র সেদিনই, যদি তাঁর করুণা হয় তো একটু শান্তি মিলতে পারে—তার আগে নয়।...

একটা বুকভাঙ্গা দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে আমিনা আত্মস্থ ও সক্রিয় হয়ে উঠল। কদিন পরে আবার আয়নার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। চুলগুলো পাখীর বাসা হয়ে আছে, মুখে চোখে কতদিন কোন প্রসাধনের প্রলেপ তো দূরের কথা, একটু জলও পড়ে নি। তাড়াতাড়ি মুখে একটু জল দিয়ে শুক্‌নো কাপড়ে ঘষে মুখটা মুছে ফেলল। চোখের কোলে বড় বেশী কালি পড়েছে—তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখতে একটু সুর্মাও লাগাল। তার পর কেশ ও বেশভূষাটাকে টেনে-টুনে যতটা সম্ভব ভদ্র করে নিয়ে নানাসাহেবের ঘরের উদ্দেশে যাত্রা করল।

আমিনা যখন পৌঁছল, তখন বোল্‌টনকে জিজ্ঞাসাবাদ জেরা প্রভৃতি হয়ে গেছে। এখন আমিনাকে আসতে দেখে নানাসাহেব তাড়াতাড়ি মামলা চুকিয়ে ফেললেন। আপাতত গারদ-ঘরে রাখবার হুকুম দিয়ে ইঙ্গিতে কয়েদীকে সরিয়ে নিতে বললেন। আমিনা এমন সময়ে তাঁর কাছে এসেছে—নিশ্চয়ই কোন জরুরী কাজ আছে। তা ছাড়া কদিনের এই অশান্তি, উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তার মধ্যে অকস্মাৎ আমিনাকে দেখে তিনি একটু খুশীও হয়ে উঠেছেন; নিভৃতে একটু আলাপের সুযোগ পাওয়া দরকার।

রক্ষীরা বন্দীকে টেনে নিয়ে গেল। আমিনার মুখে পাতলা ওড়নার অবগুণ্ঠন ছিল, তবুও তার মুসলমানী সজ্জাতে বোল্‌টন হুসেনী বেগম বলে অনুমান করতে পেরেছিল। যাওয়ার আগে শেষ আশা হিসেবে একবার করুণ নেত্রে তার দিকে চাইল, ঘোমটার মধ্যে অনুমান করে নিয়ে চোখে চোখ রাখবারও চেষ্টা করল, কিন্তু আমিনার তরফ থেকে এ অনুনয়ের এতটুকুও জবাব এল না। সে পাষাণ-পুত্তলীর মতই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। সম্ভবত ঐ ওড়নার আড়ালে তার মুখখানাও অমনি ভাবলেশহীন ছিল।

বোল্‌টন একটা নিশ্বাস ফেলে বার হয়ে গেল।

ঘর থেকে সকলে চলে যেতেই নানাসাহেব দু বাহু প্রসারিত করে হুসেনীকে অভ্যর্থনা করলেন।

'এ যে অযাচিত অনুগ্রহ বেগমসাহেবা! কী হুকুম বল!'

হুসেনী সযত্নে ও আপাত-সস্নেহে নানাকে তাঁর আসনে বসিয়ে নিজে একেবারে পায়ের কাছে বসল। তার পর বলল, 'যদি আমার অপরাধ না নন তো বলি—ঐ সাহেবটাকে ছেড়েই দিন।'

'ছেড়ে দেব? কেন বল তো? তুমি ওকে চেন নাকি? তুমি কি ওর কাছে কোন কারণে উপকৃত? তা যদি হয় তো—'

'না-না সেসব কিছু নয়। আমি ওকে এর আগে কখনও দেখি নি। নাম-ধাম পরিচয়ও জানি না।···কিন্তু তবু বলছি ছেড়ে দিন। শুধু তাই নয়—নিরাপদে ওকে ইংরেজদের ঐ গড়ে পৌঁছে দিন।'

'সে কি! কী বলছ? মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি?'

'না পেশোয়া, ঠিকই বলছি। আমি আপনার সব-জেরা আর ওর জবাব বাইরে থেকে শুনেছি। ও আসছে লক্ষ্ণৌ থেকে। ওর বিশ্বাসী সিপাইরাই ওকে বেঁধে এনেছে। পথে এক গাঁয়ের লোক ওকে কেটে ফেলতে গিয়েছিল। এখানে এসেও দেখেছে কি ভয়ানক ইংরেজ-বিদ্বেষ চারদিকে। ও যদি এসব কথা গিয়ে ইংরেজ-শিবিরে জানায়, তা হলে এখনও যেটুকু বাইরের সাহায্যের প্রত্যাশা করছে হুইলার—সেটুকুও যাবে। তা হলে আত্মসমর্পণের কথাটা বেশী করে ভাববে! আমার তো অন্তত তাই মনে হয়। আর তা যদি নাও হয়, একটা ইংরেজ মেরেই বা আপনার লাভ কী হবে বলুন। তার চেয়ে একটু পরখ করে দেখুনই না বাঁদীর কথাটা।'

নানাসাহেবের দৃষ্টিতে আজও মুগ্ধ প্রশংসা ফুটে উঠল। হুসেনী তার যে হাতটা নানার হাঁটুতে রেখে মুখ তুলে কথা বলছিল, সেই হাতটায় সস্নেহে হাত বুলোতে বুলোতে নানা বললেন, 'সত্যি তুমি একটা সাম্রাজ্য চালাবার মত বুদ্ধি রাখ হুসেনী।···তেমন সুযোগ পেলে নূরজাহাঁ বেগমের খ্যাতিও ম্লান করে দিতে পারতে। যদি কোন দিন সিংহাসনে বসতে পারি, তোমার কথা আমি ভুলব না পিয়ারী!'

'তা হলে হুকুম দিচ্ছেন তো'?

'এখনই। দেখ তো কে আছে বাইরে—'

সেইদিনই দ্বিপ্রহরে হুইলার সাহেবের 'মাটির কেল্লা'র অধিবাসীরা এক অদ্ভুত দৃশ্য প্রত্যক্ষ করল। চারিদিক থেকে শত্রুসৈন্যের অবিশ্রাম অগ্নিবর্ষণ চলছে, আট-নটি কামান থেকে গোলা-বৃষ্টি হচ্ছে—এ পক্ষেরও যথাসাধ্য

উত্তরদানে ত্রুটি নেই, তারই মধ্যে অকস্মাৎ দেখা গেল দূরে একটি আশ্বারোহী —সে অশ্বারোহী শ্বেতাঙ্গ।

একা একটি ইংরেজ এই অগণিত শত্রুর মধ্যে দিয়ে আসছে—কে এ? কোথা থেকে আসছে? কেমন করে এখনও বেঁচে আছে লোকটা? পাগল নাকি ও?

তারা বিস্ময়ে বুঝি বিমূঢ় এবং হতবাক্ বয়ে গিয়েছিল, নইলে দেখতে যে শত্রুপক্ষ এত গুলি-গোলা ছুঁড়ছে, কিন্তু ঠিক ঐ লোকটিকে কেউ বিশেষভাবে লক্ষ্য করছে না। নইলে কিছুতেই একা ঐ লোকটার পক্ষে এতক্ষণ বেঁচে থাকা সম্ভব হত না। আব চারদিকেই অবরোধ—নীরন্ধ্র শত্রুব্যূহ—তার মধ্যে দিয়ে নিরাপদে আসছেই বা কেমন করে।'

কিন্তু তবু, গুলি-গোলা চারদিক থেকেই আসছে এটা ঠিক। দৈবাৎ বিঁধতেও পারে। বেঁধার সম্ভাবনাই বেশি। তবে বুঝি দৈবই সহায—তাই এখনও সে অক্ষত আছে!

তীরবেগে ঘোড়া ছুটিযে আসছে ও।

দেখতে দেখতে কাছে এসে পড়ল।

'থামাও থামাও, অন্তত আমাদের কামান থামাও!' সকলে প্রায় একসঙ্গে চেঁচিযে উঠল।

দু হাত মাত্র মাটির দেওয়াল। ঘোড়া অনায়াসে সেটুকু পার হযে এল। পেছনে অবিরাম গোলা ঝরে পড়ছে। তবু অশ্ব এবং তার আরোহী দুই-ই অক্ষত আছে।

কিন্তু এতক্ষণের উদ্বেগ, পথশ্রম, অনাহার, আতঙ্ক—এতক্ষণের বিরতিহীন অগ্নিবাণবৃষ্টি—সবটা জড়িযে লোকটা একেবারে অবসন্ন হযে পড়েছে। ঘোড়া যখন শেষ অবধি থামল, তখন আর তার নিজের নামবার ক্ষমতা নেই। অবশ্য ততক্ষণে চারদিক থেকেই ইংরেজ বন্ধুর দল ছুটে এসেছে। তাদেরই কয়েক জন ওর অবস্থা বুঝে ওকে নামিয়ে নিল।

ক্ষীণ একটু অপ্রতিভ হাসির সঙ্গে ক্ষীণতর কণ্ঠে 'লেফটেনাণ্ট বোল্টন' এইটুকু মাত্র পরিচয় দিযেই সে বন্ধুদের হাতে মূর্ছিত হয়ে পড়ল।

বোল্‌টন এদের দুর্গতি অনেকখানিই আশঙ্কা করেছিল—কিছু লোকমুখে যে শোনে নি এমনও নয়, কিন্তু এখানে এসে যা প্রত্যক্ষ করল তা সে সব আশঙ্কা ও জনশ্রুতির অনেক উর্ধ্বে। বস্তুত কোন কল্পনারই বুঝি সাধ্য নেই যে, এই বাস্তবের কাছে পৌঁছয়।

আগেই বলেছি, সার হিউ 'নাচারগড়'টা তৈরী করেছিলেন কতকটা অনিচ্ছার সঙ্গেই। তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন যে, এখানকার সিপাহারা কোনদিনই বিদ্রোহ করবে না—আর যদিই বা করে তো তারা সোজাসুজি দিল্লীর দিকে রওনা হবে, এখানে কোন হামলা করবে না। বরং পাছে সিপাহীরা মনে করে যে, তিনি তাদের অবিশ্বাস করছেন—এই ভয়ে কোন রকম আত্মরক্ষার আযোজনেও তাঁর ঘোর অনিচ্ছা ছিল।

দুটি মাত্র পাকা ব্যারাক—তারও একটি খড়ের ছাউনি। গোড়ার দিকেই গোলার আগুনে সেটি ভস্মীভূত হযে গেছে। এই ব্যাবাকটিতেই হাসপাতালের ব্যবস্থা ছিল, সুতরাং যা-কিছু ওষুধপত্র তা ঐ সঙ্গেই পুড়ে নষ্ট হয়ে গেল। অতঃপর আহত বা অসুস্থ লোককে চিকিৎসা তো দূরের কথা—প্রাথমিক সাহায্যটুকুও দেবার উপায রইল না। যে আর্ত লোকগুলি সে ব্যারাকে ছিল, প্রাণপণ চেষ্টা করেও তাদের সকলকে উদ্ধার করা যায় নি। গোলন্দাজ বাহিনীর দু জন লোক তো সকলের চোখের সামনেই পুড়ে মারা গেল।

এই দুর্ঘটনার পর অবশিষ্ট রইল একটি মাত্র ব্যারাক—তাও এমন কিছু বড় নয়। বহু মহিলাকে স্থানাভাবে খাদের মধ্যে এসে আশ্রয নিতে হল। ভাগ্যে বর্ষার সময় এটা নয়—কারণ একেবারে মাটির ওপর শুয়ে থাকা ছাড়া সেখানে আর কোন আয়োজন ছিল না।

খাদ্য মাত্র পঁচিশ দিনের মতই দিতে বলা হয়েছিল ঠিকাদারকে। সে কি দিয়েছিল তাও কেউ দেখে নি। তার ওপর প্রথম প্রথম সে বিষয়ে বিশেষ সাবধানও হয় নি কেউ। খাদ্য ও পানীয় (সুরা) যদৃচ্ছ বিতরণ করা হয়েছে। পরে যখন হুঁশ হল, তখন সতর্ক হবার মত বিশেষ কিছু আর অবশিষ্ট ছিল না। দু বেলা সামান্য একটু আটা ও আরও সামান্য ডাল—এই মাত্র বরাদ্দ হল।*

এক বেলার মতও পর্যাপ্ত নয় তা—তবু সে ভাণ্ডারও দ্রুত খালি হয়ে আসছে। এর মধ্যে রোগী আছে—সদ্য-প্রসূতা স্ত্রীলোক আছে। মাংস তো স্বপ্ন-কথা, দৈবাৎ দু-এক দিন দু-চার জনের ভাগ্যে জুটেছে। তারও যে বিচিত্র ইতিহাস বোল্টনের কানে গেল—তাতে ওর মত তরুণ সৈনিকের চোখও শুকনো রাখা অসম্ভব!

একদিন বিপক্ষ দলের একটি অশ্বারোহী কাছাকাছি এসে পড়েছিল। সিপাহীর সঙ্গে ঘোড়াটাকেও মারা হল এবং শত্রুপক্ষের নিরবচ্ছিন্ন গোলাগুলি বর্ষণের মধ্যেই কয়েকজন গিয়ে ঘোড়াটাকে টেনে নিয়ে এল। সে-ই যেন মহোৎসব পড়ে গেল। কিন্তু সেটুকু পশুমাংসের জন্যও একজন মানুষকে প্রাণ দিতে হয়েছে। আর একদিন একটা দাগা ষাঁড় এদিকে এসে পড়েছিল! তাকে গুলি করে মারতে বেশী দেরি হয় নি। কিন্তু তার পর? জীবন বিপন্ন করে অবশেষে কয়েক জন গেলেন, আহতও হলেন কেউ কেউ—তার ফলে বহুদিন পরে পরিচিত মাংসের আস্বাদ মিলল। অবশ্য একটা ষাঁড়ের মাংস, তা সে যত বড় ষাঁড়ই হোক, আর তাকে যেমন ভাবেই ভাগ করা হোক—সকলের ভাগ্যে যে জোটা সম্ভব নয়, তা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু এখানেই শেষ নয়, ক্ষুধা যে মানুষকে যে কতখানি নীচে নামায়, তা একদিন আগে পর্যন্তও এদের কাছে অনুমান করা ছিল দুঃসাধ্য। একটা একেবারে 'নেড়ী কুত্তা', কেমন করে ঘুরতে ঘুরতে একদিন গড়ের ধারে এসে পড়েছিল। এতগুলি লোকের ক্ষুধার্ত রসনা থেকে সে বেচারীও অব্যাহতি পায় নি। অখাদ্য অন্ত্যজ জীব হওয়া সত্ত্বেও না!

সবচেয়ে যেটা কষ্টকর হয়ে উঠেছিল—সেটা পানীয় জলের অভাব। একটিই মাত্র কূয়া—তাও একেবারে বাইরে, পাঁচিলের ধারে। আর পাঁচিলও তো কত—কোমর-ভর মাটির দেয়াল, তার পেছনে অগভীর খাদ—আশ্রয় বলতে এইটুকু। তাও কুয়াটার পাশে যদি অতটুকু পাঁচিলও থাকত! দিনরাত অবিশ্রাম গুলি-বর্ষণ চলছে। কুয়ার কাছাকাছি কেউ গেলে সে বর্ষণের তীব্রতা আরও বেড়ে যায়। হাতের কাছে চোখের সামনে—কাজেই সেদিকে কেউ এগোবার চেষ্টা করলেই সব কটি বন্দুকের মুখ ঐদিক ঘুরে যায়। এক নিশীথে রাত্রির অন্ধকার ভরসা, কিন্তু অন্ধকারে নজর না চলুক, কপি-কলের সামান্য আওয়াজ, কিংবা জলের ওপর বালতি পড়বার একটু শব্দ তো হয়ই—আর তা হলেই ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি ছুটতে থাকে। অথচ কানপুর শহর

সীমতে সাহস পায় না। এই প্রচণ্ড সূর্যতাপে সে সব দেহ এক
বার পচে ওঠে—আর পচতেই থাকে। সেই দুর্গন্ধই মানুষকে পাগল
করার পক্ষে যথেষ্ট। তবু তারই মধ্যে এতটুকু আহার্যের জন্য—এক ফোঁটা
জলের জন্য অবশিষ্ট মানুষগুলোর কী ব্যাকুলতা! জীবনকে আঁকড়ে ধরে
থাকার কী প্রবল প্রয়াস!

কিন্তু তবু এরা টিকে আছে—এই ইংরেজরা। কী করে আছে সেই
কথাটাই সিপাহীরা বা তাদের নেতারা কেউ ঠিক বুঝতে পারে না। মুষ্টিমেয়
মাত্র লোক,—অন্তত সিপাহীদের সংখ্যানুপাতে,—চারিদিকে দিনরাত অতন্দ্র
শত্রুদের ঘিরে থাকতে দেখেও হতাশ হয় না—এ আবার কেমন কথা!
সিপাহীদের চেষ্টার বিরাম নেই, বরং তাদের রোখ চড়েই গেছে, তারা
সর্বদাই হুঁশিয়ার সতর্ক থাকে, হঠাৎ প্রচণ্ড আক্রমণ চালাতেও ছাড়ে না,
কিন্তু ফল সেই একই। মরে—তবু নত হয় না। ইতিমধ্যে মীর নবাব নামে
এক ব্যক্তি হঠাৎ একদিন তাঁর দলবল নিয়ে এসে হাজির হলেন—অন্তত
হাজারখানেক লোক তো বটেই। তিনি নাকি খুব দুর্ধর্ষ যোদ্ধা, আর
তাঁর সাঙ্গ-পাঙ্গরাও—সাদিবী ও আখ্‌তারী পল্টন—তেমনি ভয়ঙ্কর। ও
এসে দেখলেন তাদের। মীর নবাব তো হেসেই খুন! এই কটা ইংরেজ তাড়াতে
এত কাণ্ড! এত সিপাহী! এত কামান! একেই বুঝি বলে 'মশা মারতে
কামান দাগা'। তাঁর হাতে ব্যাপারটা ছেড়ে দেওয়া হোক, তিনি এক দিনে
টিট করে দেবেন।

নানাসাহেব ও আজিমুল্লা দু জনেই সাগ্রহে এ প্রস্তাবে রাজী হলেন।
মীর নবাব নিজের মনোমত ব্যূহ রচনা করে সত্যি-সত্যিই প্রচণ্ড আক্রমণ
করলেন—সে তীব্র আঘাতের সামনে অবিচল থাকা একরকম অসম্ভবই। কিন্তু
ইংরেজরা অসম্ভবকেও সম্ভব করল। আর এমনিভাবেই করল যে, ঐ দু হাত
উঁচু মাটির দেওয়াল এবং তার ওপরে ছেলেখেলার মত গড়খাইটুকু পার হওয়া
গেল না কিছুতেই।

মীর নবাব অপ্রস্তুত হলেন। সিপাহীরা হাসল।

তারা ইংরেজদের কাছে লড়াই শিখেছে—ও জাতটাকে কিছু কিছু চিনেছে
বৈকি!

—আব ... ছুটতে ...

দের এখানে দিকচক্রে ... ম্লান হয়ে ... বার কোন ... চিয়ে

॥ ৪৬ ॥

সেই স্মরণীয় চৌঠা তারিখ রাত থেকে শুধু যে আমিনা ঘুমোয় নি ... আজিজনও ঘুমোয় নি। আমিনা তবু প্রাসাদের স্বাচ্ছন্দ্য এবং দাস ... সেবার মধ্যে ছিল—আজিজন সেদিন থেকে এই অবরোধের মধ্যেই ক... সে যেন পাগল হয়ে গেছে।—সাক্ষাৎ চামুণ্ডার মতই রুধির-লোলুপা সে—ইংরেজদের রক্ত ছাড়া তার পিপাসা মিটবে না আর কিছুতেই। সেই রক্তের অবিরাম বর্ষণ ভিন্ন বুকের আগুন নিভবে না।

সেই যে পুরুষ-বেশে সে ঘোড়ায় চড়েছে, সে পুরুষ-বেশ আর ছাড়ে নি। একটা ময়লা হলে আর একটা সিপাহীর পোশাকই সে সংগ্রহ করে নে... আর তাকে না দেবে কে—সকলেই তাকে প্রসন্ন করতে চায়। সিপাহীর পোশাক, কোমর-বন্ধে তরবারি, কোমরের দু দিকে দুটি পিস্তল গোঁজা বুকের কাছে খাপে-মোড়া একখানা বাঁকানো ছোরা বা কিরিচ। আর হাতে রাইফেল। আক্রমণের সময় সে নিজেও অবিরাম গুলি ছুঁড়ে চলে। ফলে এক-এক সময় তার সুগৌর শুভ্র মুখ বারুদের গুঁড়োয় মসীবর্ণ ধারণ করে। বন্দুকের টোটা ফুরিয়ে গেলে আরও সামনে এগিয়ে যায়—তখন চলে পিস্তল। ছোরাখানা রেখেছে, যদি কখনও কোন ইংরেজকে সামনাসামনি পায় তো তখন সেটার ব্যবহার চলবে।

আজিজন একেবারেই সিপাহীদের সঙ্গে মিশে গেছে। আমিনা বিশ্রাম করে না—আজিজন করে। তবে সে ঐ সিপাহীদের সঙ্গেই। এক-এক দল সিপাহী পালা করে পেছনের তাঁবুতে বা প্রাসাদে গিয়ে পূর্ণ বিশ্রাম নেয়—আজিজন তাও নেয় না। সে পরিখাতেই থাকে—এবং একেবারে সামনের পরিখা ছাড়া কোথাও থাকতে পারে না। ওধারে ইংরেজ-পক্ষের কেউ ...জনও যদি কুয়ার ধারে আসে বা এমনিই নড়া-চড়া করে তো সে-ই সর্বাগ্রে ... পায় এবং এক লাফে বন্দুক বা পিস্তল নিয়ে উঠে দাঁড়ায়। সেইজন্যই ...সামনের পরিখা ছাড়ে না। সর্বদাই প্রস্তুত থাকে সে। গা... বিশ্রাম ...ও যেমন সে ভুলে গেছে, তেমনি তন্দ্রাও যেন আর তার চোখে নামে... আহার করে সে সেখানে বসেই। নিজের জন্য খাবার ...

ক—এই তো সেই ঈপ্সিত সুযোগ! কেউ জানতে পারবে না, কেউ দিতে পারবে না—কয়েক মুহূর্তের মধ্যে কাজ সেরে সে আবার নিরাপদে আসতে পারবে। মন্দ কি?

আজিজন বন্দুকটা নামাল।

আস্তে আস্তে সেটা পায়ের কাছে রেখে দিল। কোমরের তরবারিটাও লাফানো-ডিঙোনোর পক্ষে বড় অসুবিধা—সেটাও খুলে রাখল। বুকের কাছে ছোরাখানা আছে—এছাড়া পিস্তলও একটা আছে বাঁ দিকের কোমরে গোঁজা। ওই যথেষ্ট। ও লোকটা তো, যত দূর দেখা যায়, সম্পূর্ণ নিরস্ত্র।

আজিজন মার্জারীর মতই নিঃশব্দ লঘু পায়ে ওদিকের পরিখা থেকে উঠে এল। তার পর এদিক-ওদিক চেয়ে তেমনিভাবেই মাঝখানের পাঁচিল ডিঙিয়ে নেমে পড়ল এদিকের পরিখায়।

কিন্তু সেইখানেই একটা বিপদ বাধল।

কাছেই একটা নিমগাছ আছে। তার পাকা ফল ও শুকনো পাতা এসে পরিখার ভেতর জড়ো হয়েছিল। সে ফলও কবে শুকিয়ে গিয়েছে—শুধু আছে তার অতি-শুষ্ক বীজ।...আজিজনের পায়ে জুতো ছিল না, তবু সেই বীজ ও পাতার ওপর পা পড়ে অতি সামান্য একটু শব্দ হল।

সে শব্দ প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই বোল্‌টনের কানে পৌঁচেছে। কিন্তু এই বিষম বিপদের দিনে, মরণের সঙ্গে নিত্য মুখোমুখি জীবন নিয়ে টানাটানি করার ফলে—সকলেই অত্যন্ত সতর্ক হয়ে উঠেছে। বোল্‌টন তাই তার এত কাছে অপর কোন প্রাণীর অস্তিত্ব অনুভব করলেও বিচলিত হল না, এমন কি ঘাড় ঘুরিয়ে দেখবারও চেষ্টা করল না। আজিজনকে একবারও বুঝতে দিল না যে, শব্দটা তার কানে গিয়েছে। শুধু সব কটা ইন্দ্রিয়কে সজাগ ও প্রস্তুত রেখে সমস্ত স্নায়ু টান করে নিথরভাবে অপেক্ষা করতে লাগল।

তার এই নিশ্চলতার ভুল অর্থ বুঝল আজিজন। সে মুহূর্তকয়েক স্থির থেকে নিশ্চিন্তভাবে আবার পরিখা থেকে উঠে এল এবং একেবারে পেছনে এসে বুকের কাছ থেকে কিরিচখানা টেনে বার করল।

যত দূর সম্ভব নিঃশব্দে সমস্ত ঘটনাটা ঘটলেও বোল্‌টনের কানে সেই প্রায়-নিঃশব্দ গতিবিধির শব্দটুকুও এড়ায় নি। সে প্রস্তুত হয়েই ছিল—পলক ফেলবারও আগে, বলতে গেলে যথার্থ বিদ্যুৎবেগেই ঘুরে দাঁড়িয়ে আজিজনের হাতটা চেপে ধরল কড়া রকমের একটা

দিয়ে অপর হাতে অনায়াসে ওর মুঠের মধ্যে থেকে ছোরাখানা দের এখানে নিল।...

কিন্তু তার পরও সে চেঁচামেচি করল না। শত্রুকে এমন ... চেয়ে ফেলবার বাহাদুরি নিতে লোক ডাকাডাকিও শুরু করল না—শুধু হাতখানা পূর্ববৎ বজ্রমুষ্টিতে ধরে রেখেই ঈষৎ কাছে টেনে ভাল ... র তাকিয়ে রইল।

আজিজন প্রথম মুহূর্তকয়েক নিজেকে মুক্ত করে নেবার একটা প্রাণপণ প্রয়াস করছিল, কিন্তু তার পরই বুঝল সে চেষ্টা অনর্থক। তখন সে আশ্চর্যরকম শান্ত হয়ে গেল এবং কোনরকম কাতরতা প্রকাশ তো করলই না, বরং মাথা উঁচু করে সোজা বোল্টনের চোখে চোখে চেয়ে রইল।...মৃত্যু শিয়রে রেখেই তো একাজে নেমেছে এখন যদি সে এসে নিজের প্রাপ্য মিটিয়ে নিতে চায় তো বলবার কিছু নেই। বহু লোকের প্রাণ ও নিয়েছে, তখন ইতস্তত করেনি, আজ যদি দেবার মুহূর্ত এসে থাকে তো এখনও দ্বিধা রাখবে না— বীরাঙ্গনার ভূমিকায় নেমেছে—শেষ পর্যন্ত সেটাই বজায় রেখে যাবে। মিছামিছি অকারণ অনুনয়-বিনয়ে মরণের বাড়া অপমান সইতে পারবে না।...

অল্প কিছুকাল তার দিকে চেয়ে থেকেই বোল্টনের উগ্র ও হিংস্র দৃষ্টির জায়গায় অপরিসীম বিস্ময় ফুটে উঠল। সে শুধু অস্ফুট কণ্ঠে বলল, 'আওরত্!'

এবার আজিজন জবাব দিল। বিশুদ্ধ ইংরেজিতে বলল, 'হ্যাঁ, আমি স্ত্রীলোক। কিন্তু তাতে এত অবাক হচ্ছ কেন? মেয়েছেলে হলেও তোমার কাছে কোন বিশেষ অনুগ্রহ চাইব না—ভয় নেই। এ অবস্থায় পুরুষশত্রুকে হাতে পেয়েও যেমন আচরণ করতে, আমার সঙ্গেও সেইরকম করবে— এইটেই আশা করি!'

আরও বিস্মিত হল বোল্টন।

ভারতীয় নারীর মুখে সেযুগে এমন বিশুদ্ধ ইংরেজি প্রায় অবিশ্বাস্য ব্যাপার। বোল্টনেরও মনে হল যে, তার চোখ অথবা কান—একটা তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করছে। সে আবারও ভাল করে দেখল। না এইদেশীয় নারী— তাতে কোন সন্দেহ নেই।

সে আবারও তেমনি অর্ধ-বিহ্বল ভাবে বলল, 'কিন্তু কেন—কেন তুমি এই হিংস্রতার আবর্তে এমন করে এসে পড়েছ? তুমি স্ত্রীলোক, তোমার তো এ স্থান নয়।'

...একটা অসহিষ্ণু ? আমি তোমার বন্দী, আমাকে মেরে ফেল; ...দিতে কি ?...বা ক-দলের সান্ত্রীদের ডেকে।'

...বছ না কেন ? ...বলল, 'কিছুই করব না। তুমি চলে যাও।...

...দুবার একজন পুরুষ, আর একজন নারী—দু-দু বার আমার প্রাণ ...দিয়েছে। সে মহিলা বলতে গেলে অযাচিতভাবেই আমাকে প্রাণভিক্ষা দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, তাঁর ব্যবস্থাতেই আমি নিরাপদে এখানে এসে পৌঁছতে পেরেছি। তোমাকে মেরে বা ধরিয়ে দিয়ে সে ঋণ আমি শোধ দিতে চাই না। তুমি চলে যাও।'

বোলটন তার দিকে একেবারে পেছন ফিরে দাঁড়াল ...

আজিজনের এতক্ষণের উদ্ধত মাথা এবার বুঝি অবনত হয়ে আসে। সে আরও কিছুক্ষণ বিহ্বল দ্বিধাগ্রস্তভাবে দাঁড়িয়ে থেকে ধীরে ধীরে মাথা হেঁট করে ছোরাখানা কুড়িয়ে নিল। তার পর সেখানা আবার খাপে পুরে যেমন এসেছিল তেমনি নিঃশব্দে পাঁচিল ডিঙিয়ে ওধারের পরিখায় নেমে পড়ল।

॥ ৪৭ ॥

আজিজনের যেটুকু শক্তি তখনও অবশিষ্ট ছিল, নিরাপদে এপারে পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে সেটুকুও যেন একেবারে লোপ পেল। সে কোনমতে অবসন্নভাবে সেখানেই বসে পড়ল এবং বসেই রইল বহুকাল পর্যন্ত।

এমন অবস্থা আজিজনের আর কখনও হয় নি। সে যেন কিছু ভাবতেও পারছে না। মাথার মধ্যে সব কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। হাঁটু দুটোয় কোন জোর নেই। কিন্তু সে তো শুধু দৈহিক অবসন্নতা। পায়ের নীচে সম্বন্ধে মাটি যেন সরে গেছে, দাঁড়াবার স্থানও আর নেই। মানসিক এতখানি সত্যই তার ... এখনও অনুভব করে নি। এতদিন যে স্থির লক্ষ্যে, সে অন্ধকার ঘনিয়ে এলেও এত ...—আজ সেই লক্ষ্যটাই বুঝি গেছে হারিয়ে, দৃষ্টি হল না। ... পাওয়া যাচ্ছে না। তা ছাড়া, ঘৃণার একটা ...টন আরও কয়েক মুহূর্ত মানুষ করতে পারে না এমন কাজই ...ব্যক্তিগত কারণ না থাকলে ... নিজেকে এত দুর্বল এত অসহায়

বোধ হচ্ছে। মনের জোর যে নিঃসন্দিগ্ধতার ওপর। কিন্তু ওদের এখানে এক সংশয় এসে সেই জোরের ভিত্তিমূলকে দিয়েছে নাড়িয়ে। এতদিন যা ভেবে এসেছে সবই ভুল? তা হলে নিজের... নারকীয় আচরণের এবং ঘৃণিত জীবন-যাত্রার কো... না যে।

কিন্তু এতকাল যাদের একান্তভাবে ঘৃণা করে এসেছে, কিছুক্ষণ-... শোনা তাদেরই একজনের কথাটাও সে কিছুতে ভুলতে পারছে না। কোথায় একটা সত্যের দৃঢ়তা ছিল সে কণ্ঠস্বর, ছিল একটা অনস্বীকার্য যুক্তি স্বচ্ছতা—তাকে তো সে অবহেলা করে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিতে পারছে না।...তবে কি সত্যিই তার কোন অধিকার ছিল না একের অপরাধে সমগ্র জাতিকে বিচার করবার বা কলঙ্ক-চিহ্নিত করবার?

ক্ষীণ একটা চেষ্টা করে আজিজুল নিজেকে বোঝাবার। ওরা বিদেশী, বিধর্মী—আমাদের ওপর শাসন করবার কোন অধিকারই নেই ওদের। অন্যায় করে বিশ্বাসঘাতকতা করে এ রাজ্য ওরা নিয়েছে। ওদের সম্বন্ধে কোন সদ্যুক্তি বা সুবিবেচনা খাটে না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই বিবেক বলে 'তুমি বুকে হাত দিয়ে বল দেখি, দেশের জন্যই কি তুমি এই কাজে নেমেছ? শুরু করেছ এই মারণ-যজ্ঞ?'

আবার ভেঙে পড়ে মন, সমস্ত দেহও যেন সেই সঙ্গে অবসাদে এলিয়ে পড়ে।

বহুক্ষণ সে সেইভাবেই বসে রইল—অসহায়, অবসন্ন অব্যবস্থিত ভাবে। দু-একবার কাছাকাছি পদশব্দ শোনা গেলেও সৌভাগ্যক্রমে একেবারে কাছে কেউ এল না। ইতিমধ্যে মেঘও কেটে গেছে। জল তো দূরের কথা, একটা আঁধিও ওঠে নি। যে ক্ষণিক দুরাশার মোহ এদের হত্যা-পিপাসাকে প্রশমিত রেখেছিল, সে মোহ আর নেই। আবার শুরু হয়েছে উভয়পক্ষে গোলা ও গুলি-বর্ষণ! অর্থাৎ দু দিকেই জীবনযাত্রা দৈনন্দিন খাতে বইতে শুরু করেছে।

কিন্তু তবু আজিজুল কিছুতেই যেন আর পূর্বের স্বাভাবিক সহজ ভাবটা ফিরে পায় না। বার কয়েক উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করে দাঁড়াতেও পারে... পা দুটোতে কিছুতেই যেন আর জোর পাওয়া যাচ্ছে না। বসে রইল... মত ভারী হয়ে আছে—সেই সঙ্গে দেহটাও হয়ে উঠেছে যদি নিরা...দে ফিরে

কটা ভ এমনিভাবে বসে থেকে অনেক রাত্রে একসময় সে উঠে
...খানে বসেছিল তার দশ হাতের মধ্যেই একটা গোলা ফেটেছে।
...কোয় আজিজনের তাতে আঘাত লাগে নি, কিন্তু শব্দ ও
...গেছে। সেই শব্দই তাকে কতকটা প্রকৃতিস্থ ও সক্রিয় করে
...সে উঠে আবার খানিকটা পরিখার গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে
দি...ল।

তার পর দৈহিক শৈথিল্য দূর করতেই যেন, নিজের বেশবাস অকারণেই টানাটানি করে আর-একটু দৃঢ়বদ্ধ করে নিল। তার পর ধীর মন্থর গতিতে পরিখার ভেতর দিয়ে-দিয়েই অবরোধের পেছনদিকে যেতে লাগল।

পথে পরিচিত বহু লোকের সঙ্গে দেখা হল। এমন কি স্বয়ং ফুলগুঞ্জন সিং-এর সামনে পড়ে গেল। আর সকলকেই এড়িয়ে চলছিল, কিন্তু ফুলগুঞ্জন হেটু...দেখেই একেবারে অন্তরঙ্গভাবে বাহুবন্ধনে জড়িয়ে ধরে বলল, 'কি বিবিজান, আমার বক্‌শিশটা এবার দিতে হবে যে, সেই দুপুর থেকে পাওনা হয়ে আছে। কিন্তু কোথায় লুকিয়েছিলে এতক্ষণ? তামাম জায়গা তোমাকে ঢুঁড়ে বেড়াচ্ছি।'

খুব প্রবল একটা বাধা না দিয়ে আজিজন সুকৌশলে নিজেকে সেই বাহু-বন্ধন থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, 'একটু আসছি সিংজী, তবিয়ৎটা বড়ই খারাপ লাগছে। কোথাও গিয়ে অন্তত ঘণ্টা-দুই বিশ্রাম না নিলে আর দাঁড়াতে পারছি না।'

ফুলগুঞ্জন সঙ্গে সঙ্গেই সহানুভূতি ও সহৃদয়তায় পূর্ণ হয়ে উঠল। আন্তরিক ভাবেই বলল, 'আহা তা তো হবেই, এক দণ্ডও বোধ হয় বিশ্রাম নাও নি।... যাও, যাও, একটু আরাম করে নাও গে।'

সে পথ ছেড়ে দিল।

আজিজন অপেক্ষাকৃত নির্জন অংশ দিয়েই চলছিল, তবু লোকজন একেবারে থাকবে না তা তো হতে পারে না। সুতরাং এখন আর একটু জোরে পা চালিয়ে একেবারে অবরোধের বাইরে এসে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল সে।...

পা দুটো এখনও বিদ্রোহ করছে। একটা ঘোড়া ...ভাল হত। কিন্তু হল ...ড়া সংগ্রহ করতে হলেই আস্তাবলে যেতে হবে—আর সেখানে গেলেই সেই ...ও পুরাতন গা-ঘিন-ঘিন-করা রসিকতার ফাঁদে পড়তে হবে।
...ব্যক্তিগত কাঁধে...

শহরের পথে পড়তেই সামনে একটা এক্কা পড়েছিল। কিন্তু ...দেব এখানে করাতে গিয়ে মনে পড়ল—সঙ্গে একটাও পয়সা নেই। এই নতুন পো... পরবার সময় আগের কুর্তার জেব থেকে টাকা-পয়সা বের করে নেয় ...চেয়ে কদিন কোন প্রয়োজনও ছিল না, কারণ তাকে ঋণী করতে সকলেই ... ব্যস্ত, তাকে সর্বস্ব দিতে পারলেও তারা কৃতার্থ বোধ করে। যখনই যা ... —সামনে পরিচিত-অপরিচিত সিপাহী-সেনানায়ক যার জেব-এ খুশি ... ঢুকিয়ে বার করে নিলেই হল। কিন্তু অন্তত দুটি কথা না বলে পয়সা নেওয়া ... যায় না। এখন আর কোন পরিচিত লোকের সঙ্গে কথা কইতে ইচ্ছে হল না। তা ছাড়া, তা হলে আবার ব্যারাকে ফিরে যেতে হয়, তাতে সে নারাজ। সুতরাং যানবাহনের আশা ছেড়ে দিয়ে সে স্খলিত মন্থরগতিতে প্রাসাদের দিকে হেঁটেই চলল।

আমিনা সেদিনও উৎকণ্ঠিত প্রতীক্ষায় ছাদে দাঁড়িয়েছিল। অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না—মধ্যে মধ্যে গুলি-গোলার অগ্নিস্ফুরণ চোখে পড়ে মাত্র। তাতে অসহিষ্ণুতা বাড়েই শুধু।

কিছুই হচ্ছে না। তার আশা মিটছে না কিছুতেই। প্রতিদিনই প্রভাতে আশা জাগে—আজ শত্রুপক্ষ হার মানবে। অথবা এরাই বিজয়ী হয়ে ওখানে প্রবেশ করবে। কিন্তু সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে মনটা আবার হতাশায় ভেঙে পড়ে।

তবে কি শেষ পর্যন্ত আশা মিটবে না কোনদিনই?

না না, তা হতে পারে না।

তার জীবন থাকতে আশা ছাড়বে না। একার চেষ্টায় এত বড় আগুন জ্বালাতে পেরেছে সে যখন, তখন শেষ পর্যন্ত তার আশাও সফল হবে।

দ্বিধা ও উৎকণ্ঠায়, আশা ও হতাশায় ক্ষতবিক্ষত হতে থাকে সে অবিরাম, অনুক্ষণ।...

দাসী এসে সংবাদ দিল—আজিজন বিবি এসেছে, ছাদেই আসছে।

সাগ্রহে কৌতূহলে একরকম দৌড়েই ছাদের সিঁড়ির কাছে এগিয়ে আসে সে।

'কি রে আজিজন? ভাল খবর আছে কিছু?'

সে আজিজনকে একেবারে বুকে জড়িয়ে ধরে।

আজিজন নিঃশব্দে নিজেকে ... আলিঙ্গন থেকে মুক্ত ক... বসে বললেন... ...দের যদি নিরাপদে ফিরে

...এই বসে পড়ল—ধুলো ও বহুদিনের জড়ো-হওয়া শুকনো নিমপাতার ...।

'কী হল রে! শরীর খারাপ লাগছে?'

...ত হয়ে আমিনাও তার পাশে বসে।

'...একটু জল।' সংক্ষেপে শুধু বলে আজিজন।

...আমিনা ব্যস্ত হয়ে মুসম্মৎকে ডেকে শরবত আনায়। পূর্ণপাত্র শরবত পান ...রে আজিজন একটু সুস্থ হলে, আমিনা আবারও সাগ্রহে প্রশ্ন করে, 'কী ব্যাপার? খবর আছে কিছু? ওরা হার মেনেছে?'

আজিজন চোখ বুজেই বসেছিল। এবার চোখ খুলে একটু হাসল। শ্রান্ত অবসন্ন মুখের সে ম্লান হাসি মুখখানাকে যেন কথার চেয়েও বিকৃত করে তুলল।

...তার পর ধীরে ধীরে সে বলল, 'ওরা হার মানে নি রে। বরং আমিই হার ...মেনেছি।'

'তার মানে?' তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে আমিনার কণ্ঠস্বর।

'সত্যিই আমি হার মেনেছি!...আমিনা, এ আমাদের কাজ নয়। আগাগোড়াই ভুল হয়েছে বোধ হয় আমাদের।'

'এ কি বলছিস তুই। কী হয়েছে? কোন চোট-টোট লেগেছে বুঝি? সেই চোটে মাথা খারাপ হয়ে গেছে—না কি?'

আজিজনের দুটো কাঁধ ধরে সে সজোরে ঝাঁকানি দিতে লাগল।

'না রে। হ্যাঁ,—চোট লেগেছে, তবে সে মনে।...আজ এক ইংরেজের কাছেই চোট খেয়েছি আবার!...

'কী রকম? কী রকম? তবু ছেড়ে দিলি তাকে, না শেষ করেছিস?'

পাগলের মত অসংলগ্নভাবে প্রশ্ন করে আমিনা। এতদিনের সমস্ত ধৈর্য ও প্রশান্তি যেন তার ফুরিয়ে গিয়েছে।

'না, পারি নি। সে বুক খুলে দিয়েই দাঁড়িয়েছিল, তবু পারি নি।'

'তার মানে? তার মানে কি? কী হয়েছিল আমাকে বল্!'

'না থাক, বহিন। জীবনে এতবড় পরাজয় বোধ হয় আর কখনও হয় নি।... ...অপমানের কথা মুখে না-ই বললাম। তবে আমি মন স্থির করে ফেলেছি। ...টন আর থাকব না। তোমাকেও সেই কথাই বলতে এসেছি। এ ...ব্যক্তিগত কাজ—এখনও এ থেকে ...।'

'আমি একদিন খোয়াব দেখেছিল। ওয়ে সাহেবের মেম আমাদের এখানে করেছিলি। আজ তোর মুখে এ সব কী কথা। পরিশ্রমেই তোর মাথা গোলমাল হয়ে গেছে। বরং ... পরামর্শে বাঁচিয়ে তুই—'

'হ্যাঁ, বিশ্রামই করব, কিন্তু এখানে নয়।' আজিজন একেবারে উঠে ... 'কোথায় যাব তা জানি না। দূরে বহু দূরে কোথাও। যদি এখনও ... পাপের প্রায়শ্চিত্ত করা সম্ভব হয় তবে তাই-ই করব। নির্জনে গিয়ে খোদা ... কা... আরজ জানাব—তিনি যেন সেই পথই দেখিয়ে দেন। আর আজ তাঁর কাছেই প্রার্থনা জানাই, তুমিও যেন তোমার ভুল বুঝতে পার। আমাদের এ পথ নয় দিদি।'

আজিজন আমিনার মুঠো থেকে হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে ধীরে ধীরে ছাদ থেকে নেমে গেল। তার মুখে কী একটা ছিল—সুগভীর আত্মগ্লানি, অনুশোচনা অথবা দৃঢ়-সংকল্প—আমিনা আর তাকে বাধা দিতে পারল না।

আজিজন সেই যে অন্ধকার রাত্রে নানার নতুন প্রাসাদ থেকে নেমে বাইরের অন্ধকারে মি... গেল, আর তার কোন সংবাদই এবা পল না। যেন বাইরের অন্ধকার এবং বিপুল ... অরণ্য তাকে গ্রাস করল।

আমিনা ইহজীবনে আর তার দেখা পায় নি। তার এই অদ্ভুত পবিত্র ইতিহাসটাও জানতে পারে নি।

॥ ৪৮ ॥

আজিজন চলে যাওয়ার পর আমিনা বহুক্ষণ পর্যন্ত সেখানেই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। বাইরের এই অচঞ্চল অবস্থার ঠিক বিপরীত তার মনের ভেতর সেখানে প্রলয়ঙ্কর এক ঝড় উঠেছে। নতুন করে জ্বলেছে এক ভয়ঙ্কর রোষ তার দিক্‌দাহকারী জ্বালা আজ সারা জগৎ-সংসারটাকে পুড়িয়ে ভস্ম করে ফেলতে চায়! আজিজনের এই পরাজয় ও ব্যর্থতা ইংরেজের বিরুদ্ধে আমিনার বিদ্বেষকেও যেন নতুন ইন্ধনে নবতর তেজে জ্বালিয়ে তুলেছে।

প্রায় একদণ্ডকাল সেই ভাবে একেবারে পাথরের মূর্তির মত ... চেয়ে বসে রইল ... কে অস্ফুটকণ্ঠে আপন মনেই শুধু বলল, 'আচ্ছা, ... ন, ওদের যদি নিরা... দে ফিরে

...এই বসে পড়ল—ধুলো ও ...ই যেন নিমেষে তার সকল জড়তা ...-চঞ্চল ও অস্থির করে তুলল। সে প্রায় ছুটে ...

'কী হল রে! ...ভ্রান্তের মতই সামনে যাকে পেল ধরে প্রশ্ন করল, ...পেশোয়া কোথায় রে?'

...সৌভাগ্যক্রমে সে লোকটি গণপৎ। পেশোয়ারই কী একটা কাজে যাচ্ছিল। ...জই তাঁর খবরটা ঠিকঠিকই জানা ছিল তার। জবাব দিল, 'মহামান্য পেশোয়াজী তাঁর খাস কামরাতেই আছেন।'

'আর কেউ আছে সেখানে?'

'হ্যাঁ,—পণ্ডিতজী।'

পণ্ডিতজী, অর্থাৎ তাত্যা টোপী।

'ঠিক আছে। তুমি যাও।'

আজকাল নানা ধুন্ধুপন্থ স্বাধীন নৃপতির চালচলনই অভ্যাস করছেন, সুতরাং বিনা এত্তেলায় খাস কামরায় প্রবেশ করা উচিত নয়। কথাটা আমিনারও জানা ছিল, কিন্তু তার তখন এসব ছেলেখেলাতে সময় নষ্ট করার মত মনের অবস্থা নয়। সে অসহিষ্ণুভাবে কপাটে সামান্য একটা টোকা দিয়েই আগলটা খুলে ভেতরে ঢুকে গেল।

...নানা ও তাত্যা দু জনেই যৎপরোনাস্তি চিন্তাকুল ও উদ্বিগ্ন মুখে স্তব্ধ হয়ে বসেই ছিলেন। ঘরের মধ্যে পায়ের শব্দ পেয়ে প্রথমটা দু জনেই ভ্রূকুটি করে ...লেন। কিন্তু আমিনাকে দেখে দু জনেরই মুখভাব প্রসন্ন হয়ে উঠল। ...না যে সামান্য স্ত্রীলোক নয়, সে পরিচয় এতদিনে তাত্যাও পেয়েছেন। কা...নও এখন এই মহিলার বুদ্ধি নিতে অপমান বোধ করেন না।

নানা খুশী হয়ে বললেন, 'এসো এসো হুসেনী, ব'স। একটা পরামর্শ ...মর্শ দাও—আর তো পারা যাচ্ছে না। এইখানে এই কটা লোকের জন্যে প্রশান্তি শক্তি-ক্ষয় আর অর্থ-নাশ করব তা তো বুঝছি না!'

...না একটা চৌকি টেনে বসে পড়ল। কদিনের অনাহার ও অনিয়ম প্রকৃতির ও মানবশরীরের দুর্লঙ্ঘ্য আইনে তাকে অনেকখানিই দুর্বল করে ফেলেছে। তার ওপর গত এক ঘণ্টার মানসিক উত্তেজনাও কম নয়। ফলে এতখানি ছুটে এসে তার পা দুটো থর থর করে কাঁপছে। দাঁড়িয়ে থাকবার ... নয়। ... থাকব ...

...সুবিধার দিকে তাকাবার তার অবসর কৈ? ... ব্যক্তিগত কা...

বসে পড়ে বিনা ভূমিকাতেই বলল, 'গ্রীনওয়ে সাহেবের মেম আমাদের এখানে কয়েদ আছে না?'

'হ্যাঁ আছেন, কেন বল তো? তাঁকে তো তোমারই পরামর্শে বাঁচিয়ে রাখা হল!'

'ঠিকই হয়েছে। এখন তাকেই পাঠান আমাদের তরফ থেকে—হুইলারের কাছে। হুইলারকে বলে পাঠান যে, তারা যদি এখন এলাহাবাদে চলে যেতে চায় তো তাদের সমস্ত সুবিধা করে দেওয়া হবে—মায় মালপত্র যার যা আছে, তাও নিয়ে যেতে পারবে। কেবল অস্ত্রশস্ত্র আর টাকাকড়ি আমাদের দিয়ে যেতে হবে।'

দু জনেই কিছুক্ষণ অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। মনে হল, কথাটার বাচ্যার্থই তাঁদের হৃদয়ঙ্গম হয় নি। অবশেষে যেন কতকটা বিহ্বলভাবেই টোপী বললেন, 'মিসেস গ্রীনওয়ে?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি তার কথাই বলছি!' কতকটা অসহিষ্ণুভাবেই জবাব দেয় আজিনা।

'কিন্তু গ্রীনওয়ের মেম আমাদের হয়ে বলবেই বা কেন, আর হুইলারই বা ওর কথা শুনবে কেন?' নানা তখনও হতভম্বভাবে প্রশ্ন করেন।

আজিনা অধৈর্য দমন করতে নিজের ঠোঁট নিজেই কামড়ে ধরল। তার পর বয়স্ক অভিভাবক যেভাবে অবোধ বালকদের সঙ্গে কথা বলে, সেইভাবেই উত্তর দিল, 'গ্রীনওয়ের মেম যাবে এই জন্যে যে, এই কাজ ঠিকমত করতে পারলে তবেই সে মুক্তি পাবে—তা নইলে তার মৃত্যু অবধারিত। আর হুইলার যদি কারুর কথা শোনে তো তার পরিচিত স্বদেশীয় মানুষের কথাই শুনবে। ওরা এখন লড়ছে কতকটা মরীয়া হয়ে। না লড়লেও মরবে, কিন্তু সে মৃত্যুতে অপমান। এতে অপমান নেই। আর হয় তো শেষ পর্যন্ত দু-এক জন বাঁচতেও পারে—এ আশাও আছে, তাই লড়ছে। কিন্তু ওদের বুকের বল কমে এসেছে, কমতে বাধ্য। এখন যদি নিরাপদে চলে যেতে পায় তো এক মুহূর্তও ইতস্তত করবে না বলেই আমার বিশ্বাস।...মিসেস গ্রীনওয়েকে ডেকে পাঠান। তাকে বুঝিয়ে দিন যে, এ কাজ যদি সে করে তবেই তার বাঁচবার আশা থাকবে, নইলে ভয়ঙ্কর অপমানকর মৃত্যু আছে তার অদৃষ্টে।'

তবু কিন্তু নানা ও তাত্যা দু-জনেই সন্দিগ্ধভাবে চেয়ে বসে রইলেন। খানিকটা পরে তাত্যা ঈষৎ ব্যঙ্গের সুরে বললেন, 'ওদের যদি নিরাপদে ফিরে

যেতেই দেবেন বেগমসাহেবা, তা হলে এতদিন ধরে এত কাণ্ড করবার কী প্রয়োজন ছিল?'

আমিনার মুখে এতক্ষণ পরে একটু হাসি দেখা দিল। অদ্ভুত বিচিত্র হাসি। বলল, 'এত কাণ্ড করা হয়েছে বলেই হয়তো এবার ওরা খুব সহজে কাশী কি এলাহাবাদে চলে যেতে রাজী হবে। এখন হয়তো কোনমতে প্রাণ নিয়ে ফিরে যাওয়াকেই সৌভাগ্য বলে মনে করবে। তা নইলে ঐ কটা লোকের জন্যে শেষ পর্যন্ত আমাদের প্রাণ নিয়ে পালাতে হত। আর দুটো দিন সময় পেলেও ওরা ভারী কামান আর টাকাগুলো ছিনিয়ে নিতে পারত, আর তা হলে বুঝতেই পারছেন—ভাগ্যের চাকা কোন্‌দিকে ঘুরত।'

তার পর চৌকি ছেড়ে একেবারে উঠে দাঁড়িয়ে যেন রাজেন্দ্রাণীর মত ভঙ্গিতে বলল, 'তার পর, ওরা ফিরে যাবে কিনা সেটা বিবেচনা করারও ঢের সময় আছে টোপীজী। আগে যা বললুম, তাই করুন। খবর তো আপনিও পেয়েছেন, জেনারেল নীল এলাহাবাদ পর্যন্ত এসে পৌঁছে গেছে। আজ হোক, কাল হোক—মুখোমুখি লড়াইএ নামতেই হবে। সেজন্যে যদি প্রস্তুত হতে হয়—এই সামান্য শত্রুকে নিয়ে ব্যস্ত কি বিব্রত থাকলে চলবে?'

দরজায় টোকার শব্দ হল। সামান্য শব্দ নয়—বেশ জোরেই।

'কে?' টোপী প্রশ্ন করলেন, 'কী চাই?'

নিঃশব্দে কপাট ঠেলে ঘরে ঢুকল মুসম্মৎ। তার পর আমিনার দিকে ফিরে তার বক্তব্য জানাল, 'মৌলবীজী এইমাত্র এসে পৌঁচেছেন। তিনি আপনার সঙ্গে এখনই দেখা করতে চান।'

'চল্ আমি যাচ্ছি।' আমিনা নানার দিকে না ফিরে কোন প্রকার সম্ভাষণমাত্রও না জানিয়ে ব্যস্তভাবে বার হয়ে গেল।

'মৌলবীজী?' নানা ভ্রূকুটি করে প্রশ্ন করলেন।

'মৌলবী আমেদউল্লা—ফৈজাবাদের। কিন্তু—কিন্তু তাঁকে যে আমারও প্রয়োজন।'

তাত্যা টোপী উঠে দাঁড়ালেন।

'তা হলে হুসেনীর কথাটা তোমার কেমন মনে হচ্ছে?' নানা কতকটা ছেলেমানুষের মতই প্রশ্ন করেন।

'কথাটা শোনাই দরকার—আর এখনই শোনা দরকার। বেগমসাহেবা

তো বাজে কথা বলেন না—তাঁর যুক্তিও অকাট্য।...আমাদের এ বখেড়া এখনই মিটিয়ে ফেলা প্রয়োজন পেশোয়া।'

'তা হলে তুমিই মিসেস গ্রীনওয়ের সঙ্গে দেখা কর। কাল সকালেই যদি ওঁকে পাঠাতে পার সেই চেষ্টা দেখ।'

'দেখছি।' সংক্ষেপে এইটুকু বলেই টোপী বের হয়ে যাচ্ছিলেন। নানা পেছন থেকে ডেকে বসলেন, 'মেম বাজী হয় কিনা আমাকে এখনই জানিয়ে যেও, বুঝলে?'

টোপী নীরবে মাত্র একবার মাথা হেলিয়ে জানিয়ে দিলেন যে, মনিবের নির্দেশ তিনি বুঝতে পেরেছেন। তার পর একটা নমস্কারের ভঙ্গি করে তিনিও বার হয়ে গেলেন।

নানা একাই তেমনিভাবে বসে রইলেন। তাঁর মুখ দেখে তখন মনে হচ্ছিল যে পেশোয়াগিরির সাধ যেন ইতিমধ্যেই তাঁর অনেকটা কমে গিয়েছে। তিনি নিজেকে বড়ই অসহায় ও নিঃসঙ্গ বোধ করতে শুরু করেছেন।

বাইরে রাত্রি ঘনিয়ে এসেছে, কিন্তু প্রাসাদের বাইরে যতটা দৃষ্টি যায়, পথ-প্রান্তর আদৌ জনবিরল হয় নি। চারিদিকেই উত্তেজনা—চারিদিকেই কোলাহল।

কিন্তু এর ভেতর কর্মব্যস্ততা কৈ—যথার্থ কর্মব্যস্ততা?

নানাসাহেব উঠে এসে জানালার ধারে দাঁড়ালেন। দোকানগুলির আলোতে ও মশালে এত দূর থেকে কিছুই স্পষ্ট দেখা যায় না, তবু তাঁর মনে হল, বোধ করি এই প্রথম, এরা কেউই পেশোয়ার সিংহাসন রচনার জন্য ব্যস্ত নয়—দেশের জন্য এদের কিছুমাত্র মাথাব্যথা নেই, এমন কি ইংরেজদের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষও এদের এত রাত পর্যন্ত জাগিয়ে রেখেছে কিনা সন্দেহ। কৌতূহল, তামাশা দেখবার আগ্রহ, আর সর্বোপরি ব্যক্তিগত লোভই এদের মুখচোখে প্রকট। এই গোলমালের সুযোগে সকলেই নিজেদের কিছু সুবিধা করে নেবার জন্য ব্যগ্র।

এইখানে—এদের মধ্যে তিনি রাজশ্রীর স্বপ্ন দেখছেন।

দূরে মধ্যে মধ্যে কামানের শব্দ হচ্ছে—বন্দুক ছোঁড়ার শব্দের তো বিরাম নেই। কদিন আগে হলেও স্বচ্ছন্দে একেই যুদ্ধ বলে কল্পনা করতে পারতেন। কিন্তু আজ যেন সমস্তটাই অত্যন্ত অরুচিকর ও ছেলেখেলা বলে বোধ হল।

এ সময় আজিমুল্লাটাও যদি কাছে থাকত! কোথায় কোথায় যে সে ঘুরছে!

রুমালের অভাবে জামার হাতাতেই কপালের ঘাম মুছে নানা আবারও এসে বিছানায় বসে পড়লেন।

॥ ৪৯ ॥

অনেক দিন পরে পরিখার অপর পার থেকে এক জন শ্বেতাঙ্গ মহিলাকে আসতে দেখে নাচারগড়ের অধিবাসীরা প্রথমটা চোখকে বিশ্বাস করতে পারে নি। বিশেষত সে মহিলা আবার সন্ধির শ্বেত-পতাকা উড়িয়ে আসছেন—অর্থাৎ সিপাহীদের দলের লোক!

তবু শ্বেত-পতাকার কোন প্রয়োজন ছিল না। যে দিক দিয়ে, যে পক্ষের তরফ থেকেই আসুক—স্বদেশিনীর ওপর নির্বিচারে কেউ গুলি চালাত না এটা ঠিক। এখন সকলেই অস্ত্র নামিয়ে সাগ্রহে ভিড় করে এসে দাঁড়াল। স্বয়ং হুইলার সাহেবও বেরিয়ে এলেন তাঁর অফিসঘর থেকে।

বিস্ময় এমনি যতটাই হোক দূতী কাছে আসতেই তা আরও বাড়ল। মিসেস গ্রীনওয়ে! গ্রীনওয়ে সাহেব সিপাহীদের এতটা স্পর্ধা হবে তা শেষ দিন পর্যন্ত বিশ্বাস করেন নি, আর শেষ পর্যন্ত সে নির্বুদ্ধিতার মূল্য দিয়েছেন নিহত হয়ে—এই কথাই শোনা ছিল সকলের। মিসেস গ্রীনওয়ে তা হলে বেঁচে আছেন! শুধু বেঁচে নেই, অপর পক্ষের হয়ে কাজ করছেন। হুইলারের ললাটে ভ্রূকুটি ঘনিয়ে এল।

কিন্তু গ্রীনওয়ের মেম এপারে আসতে সকল সন্দেহ ঘুচে গেল। তাঁর সমস্ত পরিবারই সম্ভবত নিহত হয়েছে, কেবল জনাকয়েককে আগেই তিনি সরিয়ে দিয়েছিলেন, হয়তো তারা বেঁচে আছে, হয়তো বা নেই—তিনি অন্তত কোন খবরই রাখেন না। তিনিও নিহত হতেন, নানাসাহেবের অন্যতম রক্ষিতার পরামর্শে-ই নাকি তাঁর প্রাণরক্ষা হয়েছে—আর সেই প্রাণরক্ষার খাতিরেই আজ তাঁকে ঘৃণিত শত্রুপক্ষের তরফ থেকে দূতীরূপে আসতে হয়েছে। অবশ্য প্রাণের আর এতটা মায়া তিনি করেন না এটাও ঠিক,—তিনি স্বচ্ছন্দেই মরতে পারতেন, কিন্তু তাঁর দেশবাসী যদি দু-এক জনও তাঁর

দ্বারা রক্ষা পায় তো সে-ই জীবনের মত তাঁর শেষ সান্ত্বনা! সেই কারণেই তিনি ওদের প্রস্তাবে রাজী হয়েছেন।

সার হিউ হুইলার মিসেস গ্রীনওয়ের বক্তব্যটা নিঃশব্দে ধীর ভাবে বসে শুনছিলেন—নানার প্রস্তাব ও মিসেস গ্রীনওয়ের নিজের স-রোদন কাহিনী—সমস্তই। সব বলা শেষ হলে আরও কিছুক্ষণ তেমনি স্থিরভাবে বসে থেকে প্রশ্ন করলেন, 'আপনার কি মনে হয়—নানার এ প্রস্তাব আন্তরিক? শেষ পর্যন্ত বিশ্বাসঘাতকতা করবে না তো?'

মিসেস গ্রীনওয়ে দু কাঁধের একটা বিচিত্র ভঙ্গি করে বললেন, 'তা বলা শক্ত। ওদের আমি আর কোনদিনই বিশ্বাস করতে পারব না। তবে একটা জিনিস আমি জেনেছি যে, ওরাও এবার বিব্রত হয়ে পড়েছে আপনাদের নিয়ে। ওরা ভেবেছিল, খুব সহজেই আপনাদের শেষ করতে পারবে, তা নইলে বোধ হয় এ চেষ্টাও করত না। এখন ওদের হয়েছে কতকটা মানের কান্না! তা ছাড়া, শুনছি ব্রিটিশ ফৌজ এলাহাবাদ পর্যন্ত পৌঁছে গেছে, তা যদি হয় তো শীগগিরই আসল লড়াই শুরু হয়ে যাবে। তখন আপনাদের নিয়ে বসে থাকলে চলবে না। হয়তো সেজন্যেও কথার ঠিক রাখতে পারে।'

হুইলার চিন্তাক্লিষ্ট মুখে সহকর্মীদের দিকে তাকালেন।

'আপনারা কী বলেন?'

কর্নেল এওয়ার্ট ঘাড় নাড়লেন, 'না, এদের আমি একটুও আর বিশ্বাস করি না জেনারেল।...বেশির ভাগই তো গেছে—না হয় আমরা যাব। লড়াই করতে করতে মরার গৌরব আছে সার হিউ।...যদি শেষ পর্যন্ত নিজেদের নির্বুদ্ধিতার জন্য নিরস্ত্র মরতে হয়, তার চেয়ে লজ্জার কথা বোধ হয় আর কিছু নেই।'

'আর তা ছাড়া', মেজর ভাইবার্ট বললেন, 'যদি সত্যিই ব্রিটিশ ফৌজ এলাহাবাদ পৌঁছে থাকে তো আমাদের মুক্তিরও তো খুব বেশী দেরি নেই। এমন কি তারা এখানে পৌঁছবার আগেই হয়তো এরা আমাদের ছাড়তে বাধ্য হবে।'

'কিন্তু', সার হিউ কতকটা কিংকর্তব্যবিমূঢ়ভাবে বললেন, 'কিন্তু এখানে থেকেই হয়তো দু-এক দিন পরে নিরস্ত্র মরতে হবে কর্নেল এওয়ার্ট! আপনি তো জানেন, টোটা নিঃশেষ, কামানে দেবার মত বারুদ আর কয়েক পাউণ্ড বোধ হয় অবশিষ্ট আছে, খাবার সিকির সিকি মাত্র রেশন করেছি, তা-ও

অতিকষ্টে আর দুটি দিন যোটে চলবে। এক্ষেত্রে নানার প্রস্তাবে রাজী হলে একটা স্পোর্টিং-চান্স তবু থাকে সসম্মানে বাঁচবার। ওরা যেদিন দেখবে আমাদেব দিকে কামান বন্দুক নীরব, সেই দিনই কি এসে ঝাঁপিয়ে পড়বে না আমাদের ওপব? আব সেদিন কি কুকুর-বেড়ালের মতই মরতে হবে না?'

এওযার্ট অন্যদিকে মুখ ফিরিযে বললেন, 'যাদের অবিশ্বাস করা উচিত ছিল তাদেব আমবা বিশ্বাস করে ঠকেছি, যাদেব বিশ্বাস করা চলতে পারত তাদেব ঠিক বিশ্বাস করতে পারি নি—ফলে তাদের চোখেই আমরা চিরকালের মত বিশ্বাসঘাতক বলে চিহ্নিত হয়ে গেছি। আমবা আগাগোড়াই নির্বোধের মত কাজ করে যাচ্ছি জেনারেল।...আর বোধ হয় ওসব চেষ্টা না করাই ভালো।...আব লডাই চালিযে যেতে না পাাব, বন্দুকের শেষ গুলি শেষ হবার আগে সেটা নিজেদেব বুকেও তো চালাতে পাবি আমবা।'

জেনাবেল হুইলাবেব মুখ অগ্নিবর্ণ হযে উঠল। তিনি দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, 'আগাগোডাই যখন নির্বুদ্ধিতা কবে যাচ্ছি, তখন শেষ পর্যন্তও না হয তা-ই কবলাম। আপনি ফিবে যান মিসেস গ্রীনওয়ে, বলুন তাঁদেব প্রস্তাবে আমবা মোটামুটি বাজী আছি। তাঁদের শর্ত পাঠাতে বলুন, আব তাঁদের সততার কি জামিন থাকবে তাও জানাতে বলুন। আমাদের এলাহাবাদ রওনা হবার ব্যবস্থাও তাঁদেব কবে দিতে হবে।'

মিসেস গ্রীনওযে বললেন, 'হ্যা তা তাঁবা ঠিক করে দেবেন, খাবার-দাবার কোন কিছুরই নাকি অসুবিধা হবে না।'

'ঠিক আছে। আমাদেব আব কিছু বক্তব্য নেই।'

মিসেস গ্রীনওযে উঠে দাঁড়ালেন। যে কজন ইংরেজ অফিসার তাঁদেব ঘিরে দাড়িয়েছিলেন, তাঁদেব মুখের দিকে কেমন একরকম অসহায ভাবে তাকালেন, যেন জেনারেলের এই সিদ্ধান্ত তিনি আশা কবেন নি, তার মনের মতও হয নি—বরং অন্য উত্তর পেলেই তিনি সুখী হতেন। কিন্তু যাঁবা সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের মুখ পাথরের মতই ভাবলেশহীন। সে মুখের দিকে চেযে অন্তরের ভাব বোঝবার উপায় মাত্র নেই। মিসেস গ্রীনওযের মনে পডল যে, এই লোকগুলির অধিকাংশই সৈনিক—উপর-ওয়ালার আদেশ নির্বিচারে পালন করাতেই অভ্যস্ত। প্রতিবাদ করা, এমন কি নিজেদের মতামত জানাতে যাওয়াও এদের এলাকার বাইরে।...ধীরে ধীরে

বিহ্বল চোখ দুটি আবার হুইলারের মুখে ফিরিয়ে এনে মিসেস গ্রীনওয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'তা হলে চললাম আমি। সুপ্রভাত!'

পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলেন মুর। তিনি মিসেস গ্রীনওয়ের অনুগমন করতে করতে বললেন, 'আমাদের এমনই দুর্ভাগ্য যে, আতিথেয়তা করার মত কিছুই আর অবশিষ্ট নেই। এক কাপ চাও আপনাকে দিতে পারলাম না।'

মিসেস গ্রীনওয়ে মুরের মুখের দিকে চেয়ে কেমন একপ্রকার স্খলিত কণ্ঠে উত্তর দিলেন, 'আতিথেয়তা। আপনারা আমাকে গুলি করে মারলেই খুশী হতাম। আমি বড়ই কাপুরুষ, নিজের হাতে মরবার সাহস হল না কিছুতেই, নইলে তা-ই হয়তো উচিত ছিল।'

পরিখার অপর পারে মিসেস গ্রীনওয়ের ডুলি দাঁড়িয়ে ছিল। মুর সযত্নে হাত ধরে তাঁকে পাঁচিলটা পার করে দিলেন।

মিসেস গ্রীনওয়ে প্রাসাদে ফিরে আসতে তাঁকে সোজা পেশোয়ার দরবার-গৃহে নিয়ে যাওয়া হল। সেখানে সকলেই উপস্থিত ছিলেন—পেশোয়া স্বয়ং, তা ছাড়া আমিনা, আজিমুল্লা, তাত্যা, টীকা সিং—মায় নবাগত মৌলবী সাহেব পর্যন্ত। সকলে সাগ্রহে তাঁরই অপেক্ষা করছিলেন।

দূতী কী সংবাদ নিয়ে ফিরল তা শোনবার জন্য সকলেই যেন এতক্ষণ নিশ্বাস রোধ করে বসে ছিলেন। মিসেস গ্রীনওয়ের বক্তব্য শেষ হতে এবার তারা একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলেন। নানাসাহেব খুশি চাপতে না পেরে একেবারে বলে বসলেন, 'যান মিসেস গ্রীনওয়ে, চুক্তির আপনার দিকটা আপনি ঠিক ঠিক পালন করেছেন, কাজ সফলও করেছেন—এবার আপনি মুক্ত।'

প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই আমিনা তীব্র কণ্ঠে বলে উঠল, 'কিন্তু মুক্তি নিয়ে উনি যাবেন কোথায়? শহরের পথে বেরুলে কি উনি এক মিনিটও বাঁচবেন?'

নানা উদার ভাবে বললেন, 'বেশ, উনিই বলুন কী ভাবে কোথায় ওঁকে পৌঁছে দিলে উনি খুশী হবেন—আমরা তাই দিচ্ছি।'

মিসেস গ্রীনওয়ে উত্তর দেবার আগেই আমিনা বলল, 'উনি বরং গ্যারিসনের লোকদের সঙ্গে এলাহাবাদেই চলে যান না।'

যেন কী একটা অজ্ঞাত আতঙ্কে শিউরে উঠে মিসেস গ্রীনওয়ে বললেন, 'না, না!'

'তবে কোথায় আপনি যেতে চান?' নানা বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলেন।

'আমাকে বরং বিঠুরে পাঠিয়ে দিন—রানীমাদের কাছে। তার পর আমি সুযোগ বুঝে ওখান থেকে চলে যেতে পাবব। শুধু এই হুকুম দিয়ে দিন।'

নানার ললাটে ভ্রূকুটি দেখা দিল। কিছু দিন ধরেই স্বর্গত বাজীরাওএর বিধবাদের সঙ্গে তাঁব মনান্তর চলছে। এই স্ত্রীলোক দুটিব ষড়যন্ত্রে উত্ত্যক্ত হয়ে তিনি শেষ পর্যন্ত তাঁদের একরম নজরবন্দী করতেই বাধ্য হয়েছেন। তবু বললেন, 'আচ্ছা, তাই হবে। মংগবকব, তুমি তো শুনলে সব, তুমি নিজে সঙ্গে কবে ওঁকে বিঠুরে পৌঁছে দাও, আর আমাদের হুকুম জানিযে দাও যে,—যেদিন খুশি, যখন খুশি, উনি চলে যেতে পারবেন।'

তার পর—অর্থাৎ মিসেস গ্রীনওয়েকে নিযে মংগরকর বেরিযে গেলে নানাসাহেব উপস্থিত সকলেব দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তাব পব?'

তাত্যাই যেন সকলের হয়ে জবাব দিলেন, 'তার পর আর কি। আজিমুল্লা চলে যান, ওদের সঙ্গে কথাবার্তা পাকা করে ফেলুন গে—বলুন যে ওদেব কামান বন্দুক, অস্ত্রশস্ত্র আর টাকাকড়ি যা ওখানে আছে, সব আমাদেব হাতে ছেড়ে দিতে হবে এখনই। যদি বিশ্বাস করতে না পারে তো আমরা ববং আমাদের মধ্যে থেকে দু জন বিশিষ্ট লোককে ওদের ওখানে জামিন রাখতে রাজী আছি। কিন্তু ওদের একেবারে নিরস্ত্র করতে না পারলে আমরা নিশ্চিন্ত হতে পারব না। আজিমুল্লার সঙ্গে টীকা সিংও যান বরং, আমি ততক্ষণ নৌকো ভাড়া করার চেষ্টা করি। অনেকগুলোই লাগবে বোধ হয়!'

আমিনা এতক্ষণ চুপ কবে তাকিয়ে ছিল। সে যেন এই সব ছেলেমানুষি উল্লাসে এদের বুদ্ধি সম্বন্ধে একেবারে হতাশ হয়ে পড়েছে—তার মুখভাবটা অন্তত সেই রকমই। সে এবার কথা বলল, 'আজিমুল্লা খাঁ চেষ্টা করুন, যাতে ওরা কালই যেতে রাজী হয়।...আপনিও পণ্ডিতজী সেইভাবে নৌকোর ব্যবস্থা রাখুন। হ্যাঁ, ভাড়া করবেন না, একেবার কিনে নিন।'

'কিনে নেব? কেন বলুন তো?' সবিস্ময়ে প্রশ্ন করেন তাত্যা টোপী, 'মিছিমিছি কতকগুলো টাকা বেশী খরচ করবার দরকার কি? এমনিই তো বজরা দরকার-মত সব পাওয়া যাবে না, ডিঙি নৌকো ছাইয়ে নিতে হবে। তাতেই অনেক বাড়তি খরচ হয়ে যাবে।'

আমিনা তীব্র ব্যঙ্গের সুরে বলল, 'নৌকোগুলো কি তা হলে শেষ পর্যন্ত

নিরাপদেই এলাহাবাদে পৌঁছবে—আপনারা কি সেই বন্দোবস্তই করছেন নাকি?'

অকস্মাৎ যেন ঘরের মধ্যেই বজ্রপাত হল।

কিছুক্ষণ সকলেই স্তম্ভিত এবং হতবাক্ হয়ে আমিনার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

অনেকক্ষণ পরে নানাসাহেব বললেন, 'তা—তার মানে?'

আমিনারও এবার বিস্মিত হবার পালা। সে বলল, 'আপনারা কি ওদের সত্যি-সত্যিই ছেড়ে দিতে চান নাকি? আমি তো বরাবরই জানি যে, এটা একটা ছল মাত্র—ওদের নিরস্ত্র করার এবং গড় থেকে বার করার জন্যে।'

আবার কিছুক্ষণ সকলে হতবাক্! এমন কি স্বয়ং আজিমুল্লাও যেন এতটার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। শেষে নানাই আবার বললেন, 'কিন্তু আমরা কথা দিয়েছি,—রাজার তরফ থেকে কথা দেওয়া হয়ে গেছে—যুদ্ধেরও একটা আইন আছে তো। দূত পাঠিয়ে কথা দেওয়া হয়েছে—এখন এত বড় বিশ্বাস-ঘাতকতা করলে লোকে বলবে কী?'

'যুদ্ধের আইন!' আমিনা যেন গর্জে উঠল, 'ওদের সঙ্গে আবার যুদ্ধ কি? আর বিশ্বাসঘাতকতা? ওরাই বরং বিশ্বাসঘাতকতা করেছে আমাদের সঙ্গে চিরকাল—বিশ্বাসঘাতকতার ফলেই এদেশের সাম্রাজ্য পেয়েছে ওরা। আমরা ওদেরই পদ্ধতি ওদের ফিরিয়ে দিচ্ছি মাত্র। আর যুদ্ধের আইন বলছিলেন না পেশোয়া? আজিমুল্লা খাঁ নিশ্চয়ই জানেন, ওদের দেশে প্রবাদ আছে—প্রেম ও যুদ্ধে কিছুতেই অন্যায় হয় না।'

তবুও সকলে চুপ করে থাকেন। এতখানি অন্যায়, এতখানি বিশ্বাস-ঘাতকতায় কারও মন যেন সায় দেয় না ঠিক।

তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমতী আমিনা ঘরের হাওয়া টের পায়। সে একটুখানি নীরব থেকেই পুনশ্চ বলে, 'কার সঙ্গে কী আচরণ করতে যাচ্ছেন পেশোয়া সেটাও বুঝে দেখুন। এদের জন্যে আমাদের কতগুলি প্রাণক্ষয় হয়েছে তা একবার হিসেব করে দেখেছেন? ওদেরও কম লোক মরে নি। এখন ওরা নাচার—একবার নিরাপদ হতে পারলে ওদের এই কষ্ট, এই সব অকালমৃত্যুর কি ভয়ঙ্কর শোধ তুলবে তা কি ভেবে দেখেছেন? এই তো মৌলবীসাহেব পূর্ব দিক থেকে কালই এসে পৌঁছেছেন। জেনারেল নীল কাশী আর এলাহাবাদে কী কাণ্ড করেছেন—এঁর মুখ থেকেই শুনুন না।'

মৌলবী এতক্ষণ চুপ করে নতমুখে বসেছিলেন, তিনি এবার মুখ তুললেন বললেন, 'কাশী থেকে শুরু করে এলাহাবাদ পর্যন্ত পথের দু দিকে কোন জোয়ান লোক আর জীবিত নেই। তবে তাদের জন্য একটাও গুলি খরচ করে নি ওরা, দু দিকে যত গাছ আছে, আর সেসব গাছে যত ডাল আছে··· সবগুলিই আজ ফাঁসিকাঠ। ষোল থেকে ষাট বছর বয়সের কেউ সে পরিণাম থেকে অব্যাহতি পায় নি। স্ত্রীলোকের সম্ভ্রম ও ইজ্জত তো আজ কথার কথা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু শুধু যদি তাই হত। মরবার আগেও এক-এক জন যে অকথ্য অত্যাচার সহ্য করেছে. তা আপনারা কল্পনা করতে পারবেন না। ক্রোশের পর ক্রোশ রাস্তা বুকে হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, পথের কাঁকরে তাদের বুকের চামড়া ছিঁড়ে মাংস ক্ষয়ে হাড় বেরিয়ে পড়েছে, পিঠ চাবুকের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত—তার ওপর তাদের ধরে ফাঁসিকাঠে ঝোলানো হয়েছে! স্বামীর সামনে স্ত্রী, বাপের সামনে কন্যাদের বে-ইজ্জত করা হয়েছে! মায়ের কোল থেকে সন্তান ছিনিয়ে নিয়ে তার চোখের সামনে তাদের বধ করা হয়েছে! এদের সঙ্গে আপনি ভদ্র ব্যবহার করতে চান পেশোয়া!'

পেশোয়া নতমুখে বসে থাকেন। তাত্যা টোপী বিব্রত বোধ করেন। অবরুদ্ধ-রোষে আজিমুল্লার কপালের শিরাগুলো ফুলে ফুলে ওঠে।

অবশেষে তাত্যা বলে, 'কিন্তু ওরা যত নীচে নেমেছে, আমাদেরও কি ততটা নামতে বলেন মৌলবীজী? তা ছাড়া যুদ্ধের ফলাফল আজও অনিশ্চিত। এই বিশ্বাসঘাতকতা, এই হত্যার খবর আবার ওদের কানে পৌঁছলে ওরা আরও কত ক্ষিপ্ত হয়ে উঠবে তা ভেবে দেখেছেন? যদি ওদের হাতেই আবার দেশ ফিরে যায়?'

'কখনও না!' আমিনার দু চোখ থেকে আগুন বর্ষণ হতে থাকে, 'দেশ ফিরে গেলেও দেশবাসী যাবে না। তেমন দুর্দিন যদি সত্যিই আসে তো তার আগে আমরা রাজপুতদের মত জহরব্রত করব—কিন্তু ওদের ক্ষমা করব না পণ্ডিতজী। আপনারা যদি ভয় পান, আপনাদের যদি বুক কাঁপে তো আপনারা সরে দাঁড়ান। আমরাই এই ভার নিচ্ছি। শয়তানের ঝাড় ওরা—ছেলে-বুড়ো-স্ত্রীলোক কেউ কম নয়। এমন কাণ্ড করব, এমন শোধ তুলব এদের ওপর দিয়ে যে সমস্ত ইংরেজ জাত শিউরে উঠবে। ভয় পেয়ে ওরা এদেশে সাম্রাজ্য বিস্তারের আশা ত্যাগ করবে। শত্রু নাশ করব, ইংরেজ ধ্বংস করব—এই আমাদের ব্রত। যেমন করে হোক, যে পথে হোক। ক্ষমা নেই, সহিষ্ণুতা

নেই, ন্যায়-অন্যায় বিচার নেই।...আসুন আজিমুল্লা খাঁ, যা ব্যবস্থা করার আমরাই করি। মহামান্য পেশোয়া ও পণ্ডিতজীর মুখ বিবর্ণ হয়ে উঠেছে—ভীত স্ত্রীলোকের মত কাঁপছেন ওঁরা।...ওঁরা বরং কয়েকদিন বিশ্রাম করুন!'

॥ ৫০ ॥

অবরোধের ভেতরে-বাইরে কামান-বন্দুকের অবিশ্রাম শব্দ থেমেছে, নাচারগড়ের অধিবাসীদের মধ্যে নেমেছে একটা অদ্ভুত অবসাদ। পাহারা যায় নি, কিন্তু আগের মত নীরন্ধ্র নিরবসরও নেই। কুয়া থেকে যদৃচ্ছা জল তোলা যাচ্ছে, ধপ করে ডোলের শব্দ করতেও বাধা নেই—আগের মত সঙ্গে সঙ্গে যমদূতের পাখার হাওয়া লাগে না গায়ে। এক কথায় এতদিন পর এই প্রথম একটু অবসর মিলছে কিছুটা আত্মস্থ হওয়ার—বা আত্মচিন্তা করার।

তবে সে চিন্তাটা খুব সুখের নয়—আনন্দের তো নয়ই। অবসাদ দেহের চেয়ে মনে বেশি। এই যমপুরী থেকে যদি বা রক্ষা পাওয়া যায় সত্যি-সত্যিই, অনেকেরই আপনজনকে এখানে রেখে যেতে হবে। যাদের আপনজন কেউ ছিল না—তাদেরও বিরহ-বেদনা কম নয়। দুর্দিনের সঙ্গী কত থেকে গেল এখানে। বড় দুর্দিন—এমন দুর্দিন মানুষের জীবনে বুঝি আসে না। মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী কিন্তু সাধারণ মরণ হলে এতটা লাগত না—কী শোচনীয় অবস্থার মধ্যে কী মর্মান্তিক মৃত্যু! ওষুধ নেই, পথ্য নেই, এক বিন্দু জলও শেষ সময় হয়তো মৃত্যুপথযাত্রীর হিম শুষ্ক ওষ্ঠাধরে তুলে দিতে পারা যায় নি।...এমন কি শেষের দিকে ক্ষতস্থান বাঁধবার মত একটুকরো ন্যাকড়াও জোটে নি।...সে কথা মনে পড়লে এ মুক্তির কোন অর্থ খুঁজে পাওয়া যায় না। মনে হয় এমন মুক্তিতে প্রয়োজন নেই। এতগুলো লোকের যা হল আমাদেরও না হয় তাই হত, এ মুক্তির পাখায় চিরজীবনের মত যে স্মৃতির ভার চেপে রইল, তাতে বাকী জীবনটা কি চিরকালের মতই বিড়ম্বিত হয়ে গেল না? আনন্দের পূর্ণপাত্র এল বটে, কিন্তু পাত্রটা যেন নিমকাঠের, পান করতে গেলেই ওষ্ঠে ও রসনায় সেই তিক্ততা লাগবে প্রথম। জীবনের স্বাদ যেন চিরদিনের মতই বিষিয়ে গেল। এই একুশ দিনের স্মৃতি কি নিদ্রায় কি জাগরণে দুঃস্বপ্নের মত জগদ্দল বোঝা হয়ে বুকে চেপে থাকবে।

হুইলার সেদিন বাকী সময়টা বিন্দুমাত্র স্থির থাকতে পারলেন না। সারা রাত তাঁর চোখের পাতায় এতটুকু তন্দ্রা নামল না। কথাটা দিয়ে ফেলেছেন ঝোঁকের মাথায়। সেজন্য, মুখে প্রকাশ না করলেও, মনে মনে অনুতাপের শেষ নেই। একেবারে ছেলেমানুষের মতই এক-এক বার আশা করেছেন যে, নানাই হয়তো শেষ পর্যন্ত কথার খেলাপ করবে—আত্মসমর্পণের অগৌরব থেকে তাঁরা রক্ষা পাবেন। একটা অসম্ভব আশাও মনে জাগছে, হয়তো এমনি করে কথাবার্তা চালাচালি হতে হতেই দু তিনটে দিন কেটে যাবে—আর ইত্যবসরে কলকাতা থেকে সাহায্য এসে পৌঁছবে। ঈশ্বর কি এত কষ্টের পরও শেষ মুহূর্তে মুখ তুলে চাইবেন না?

কিন্তু কিছুই হল না। ২৬শে জুন ভোরবেলাই শ্বেত-পতাকা উড়িয়ে আজিমুল্লা ও জোয়ালাপ্রসাদ এসে উপস্থিত হলেন। মোটা কথাটা হয়ে গিয়েছে বটে, কিন্তু আত্মসমর্পণের পদ্ধতি ও শর্তাদি সম্বন্ধে আলোচনা করে সন্ধির একটা দলিল খাড়া করা দরকার। ক্লান্ত, রক্তচক্ষু হুইলার নিজে মুখভাবকে যত দূর সম্ভব সহজ করে এসে টেবিলে বসলেন। আজিমুল্লা প্রাথমিক সৌজন্য হিসেবে কুশল-প্রশ্নাদির পরই কাজের কথা পাড়লেন। অবরোধ আজই ছাড়তে হবে। ছোট বড় কামান, অপর হাতিয়ার এবং নগদ টাকাকড়ি যা আছে সবই নানাসাহেবের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীকে বুঝিয়ে দিতে হবে। সাহেবরা কেবল ব্যক্তিগত জামা কাপড, এক-একটি বন্দুক এবং ষাটটি করে টোটা সঙ্গে নিতে পারবেন। স্ত্রীলোক, আহত এবং রুগ্ণদের জন্য নানাসাহেব এখান থেকে ঘাট পর্যন্ত যাবার যানবাহনাদির বন্দোবস্ত করে দেবেন। ঘাটে প্রয়োজনমত নৌকো থাকবে। খাদ্য-খাবার এখনই তাঁরা কিছু পাঠাবেন। নৌকোতেও চার-পাঁচ দিনের ব্যবস্থা থাকবে।

হুইলার স্থিরভাবে সব শুনলেন। তার পর তাঁর পেছনে ও দু পাশে যে সব অফিসাররা দাঁড়িয়ে ছিলেন, তাঁদের দিকে তাকিয়ে ঈষৎ বিমূঢ়ভাবে প্রশ্ন করলেন, 'আপনারা কী বলেন?'

প্রথমটা সকলেই চুপ করে রইলেন। গতকালকের তিক্ত অভিজ্ঞতা কেউই ভোলেন নি। তাঁদের যদি নীরবে হুকুম তামিল করতে হয় তো করবেন—সেটা মিলিটারী আইন, তাতে দোষ নেই, কিন্তু মতামত জানাতে গিয়ে মিছামিছি গাল বাড়িয়ে চড় খাবেন কেন?

একটু চুপ করে থেকে, বোধ করি বা সহকর্মীদের মনোভাব বুঝেই, হুইলার আবার কঠিন হয়ে উঠলেন। প্রশ্নের ধরন এবং ভাষা দুই-ই বদলে বললেন, 'মিঃ মুর কী বলেন? পারবেন আজই রওনা হতে?'

মুর দৃঢ়ভাবে ঘাড় নেড়ে বললেন, 'আজ অসম্ভব। খুব তাড়াতাড়ি হলেও কাল সকালের আগে নয়।'

আজিমুল্লা যেন একটু জিদ করেই বললেন, 'কিন্তু আপনার তাতে অসুবিধা কি? আমরা যদি এ-ধারে সব যোগাড় করে দিই?'

'সব অসুবিধা সকলকে বোঝানো যায় না খাঁ সাহেব!' মুর নীরস কণ্ঠে উত্তর দিলেন।...

অগত্যা আজিমুল্লা ও জোয়ালাপ্রসাদকে তখনকার মত বিদায় নিতে হল। কিন্তু অর্ধপ্রহর অতীত হবার আগেই এল আর-এক জন দূত—নানা আজকের দিনটাও সময় দিতে রাজী হয়েছেন, তবে কামান, বন্দুক, বারুদ গোলাগুলি এবং টাকাকড়ি যা আছে, আজ সূর্যাস্তের আগেই বুঝিয়ে দিতে হবে।

আবারও হুইলার বিপন্ন বোধ করলেন।

একমাত্র পুত্রকে ডাইনের হাতে সমর্পণ করবার মতই শোনাল না কি কথাটা?

এবার একটু ইতস্তত করে সার হিউ খোলাখুলিভাবেই সহকর্মীদের মত চাইলেন।

মুর, ডিলাফোস, টমসন—এঁরা কী বলেন।

মুর বললেন, 'আমরা অনেক দূর এগিয়েছি সার—বলতে গেলে নিজেদের বাঁধা দিয়ে বসে আছি। এখন আর নতুন করে ভেবে লাভ নেই।'

'তা ছাড়া,' টমসন বললেন, 'আজ দিলেও দিতে হবে, কাল সকালে দিলেও তাই। তার পর তো সেই নিরস্ত্র অবস্থা। ওদের দয়ার ওপরই নির্ভর।...তার চেয়ে রাজী হওয়াই ভাল। বরং ওদের পক্ষ থেকে দু চার জন জামিনদার চান—যারা আমাদের মধ্যে এসে থাকবে আজকের রাতটা, কাল আমাদের সঙ্গে সঙ্গে ঘাট পর্যন্ত যাবে। নৌকোয় চাপলে তাদের ছুটি।'

হুইলার সেই কথাই জানালেন দূতকে।

দূত সম্ভবত এই উত্তরের জন্যেই প্রস্তুত হয়ে এসেছিল। সে বলল, 'বেশ তা হলে আপনাদের মধ্যে কেউ চলুন—মহামান্য পেশোয়া নানা ধুন্ধুপন্থজীর

সঙ্গে ফয়সালা করে-একটা চুক্তি করে ফেলবেন। একটা দলিল তৈরী করেই নিয়ে চলুন!'

নানা ধুন্ধুপন্থ। আবার নানাসাহেবের মুখ দেখতে হবে? ঐ লোকটার সঙ্গে সামনাসামনি দাঁড়িয়ে হয়তো বা পেশোয়া বলেই অভিবাদন করতে হবে!

ঘৃণায় অনেকেরই মুখ বিকৃত হয়ে উঠল। দু-এক জনের অন্তরে একটা আশঙ্কা ও সংশয়ও যে না জাগল তা নয়। অবশেষে টড নামে এক জন তরুণ অফিসার এগিয়ে এসে বলল, 'আমি রাজী আছি জেনারেল। এত দূরে এসে এই সামান্যটুকুর জন্যে পেছিয়ে যাওয়া চলবে না!...আমিই যাচ্ছি—যদি, যদি আর ফিবে না আসি, আমার মাকে দয়া করে খবরটা জানিয়ে দেবেন।'

সার হিউ উঠে টডেব সঙ্গে করমর্দন করলেন। তখনই একটা দলিলেব খসড়া তৈরী হল। টড সেই দূতের সঙ্গে রওনা হয়ে গেল। অবশিষ্ট ইংরেজরা রুদ্ধ নিশ্বাসে বসে তার প্রত্যাগমনের প্রহর গুনতে লাগলেন।

কিন্তু সকল আশঙ্কা ব্যর্থ করে টড ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ফিরে এল। দালল সই হয়ে গেছে। নানা বরং যেন একটু লজ্জার সঙ্গেই টডের সঙ্গে বেশ সদয় ও সসম্ভ্রম ব্যবহার করেছেন। কানে কানে এ কথাও একবাব শুনিয়ে দিয়েছেন, 'আমি তো জেনাবেল হুইলারকে আগেই সাবধান করে দিয়েছিলাম। আমার যতটা সাধ্য আমি কবেছি। তবে লক্ষ লক্ষ লোকেব ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি আর কতটুকু?'

সে যা হোক, নানা তাঁর দিক থেকে শর্তাদি ঠিক ঠিক পালন করেছেন। শুধু দলিলই আসে নি—টডের সঙ্গে প্রতিভূ-স্বরূপ জোয়ালাপ্রসাদ ও অপব দু জন সেনাপতি এসেছে। তাব এখানেই থাকবে কাল সকাল পর্যন্ত। এছাড়া তিন বয়েল-গাড়ি বোঝাই দিয়ে নানাসাহেব বহু খাদ্যও পাঠিয়েছেন—আটা, ডাল, মাংস, ঘি, এমন কি একঝুড়ি 'দশেরী' আমও। আর কিছু জ্বালানী কাঠ।

অনেকদিন পবে নাচারগড়ের উনুনে আগুন পড়ল। গলিত নর-মাংসের দুর্গন্ধ ঢেকে সুখাদ্যের সুঘ্রাণ উঠল। কতকটা নিশ্চিন্ত হয়ে অবশিষ্ট অফিসার তাঁদের পরিবাববর্গ জিনিসপত্র গোছগাছ করতে বসলেন।

সন্ধ্যের কিছু আগে টীকা সিং এসে কামান ও বাড়তি বন্দুকগুলির দখল নিলেন। এপক্ষেও টার্নার, ডিলাফোস এবং গোড-কে কয়েক জন সিপাহী সঙ্গে দিয়ে ঘাটটা ঘুরিয়ে আনা হল। নৌকো অনেকগুলোই ঘাটে জড়ো হয়েছে,

বটে, তবে তার অধিকাংশই ডিঙি-নৌকো—মাথায় আচ্ছাদন নেই। সে অভাব খড় ও বাঁশের সাহায্যে পূরণ করা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই কয়েকটি নৌকো ছাওয়া শেষ হয়েছে, বাকিগুলোতেও কাজ চলছে। আজিমুল্লা অভয় দিলেন, রাত্রের মধ্যে ছই-ঢাকা দেওয়ার কাজ শেষ হয়ে যাবে এবং রাত্রেই প্রতি নৌকোয় পানীয় জলের 'সুরাই', কিছু খাবার এবং ফল রাখবার ব্যবস্থাও করা হবে।

যেটুকু সংশয় এদের মনে এখনও ছিল, নৌকোগুলো দেখে সেটুকুও চলে গেল। অফিসার তিন জন হাসি হাসি মুখেই ফিরে এলেন।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসার পর নাচারগড়ে আজ অনেকদিন পরে আলো জ্বলল। আজ আর আলো লক্ষ্য করে কামান দাগবার ভয় নেই। মেমসাহেব যে কজন আছেন, তাঁরা সামান্য যা জিনিসপত্র অবশিষ্ট আছে গুছোতে বসলেন। সাহেবরা প্রয়োজনীয় কাগজপত্র গুছিয়ে তুলে বাকী বাজে কাগজ ও চিঠিপত্র ছিঁড়ে ফেলতে লাগলেন। কেউ কেউ স্বদেশে দীর্ঘ পত্রও লিখতে বসলেন।

এক কথায় যাত্রার তোড়জোড় শুরু হয়ে গেল।

॥ ৫১ ॥

আমিনাও আজ অনেকদিন পরে ভাল করে স্নান করল। তার পর মুসম্মৎকে ডেকে এটা-ওটা চেয়ে নিয়ে বেশ একটু ঘটা করেই প্রসাধন করতে বসল। চুলে জট পাকিয়ে গেছে—ফুলেল তেল ও কাঁকইএর সাহায্যে যত্ন করে সে জট ছাড়াতে লাগল। মুসম্মৎ তার ভাবগতিক দেখে বিস্ময় ও কৌতূহল চাপতে পারল না, প্রশ্ন করল, 'হঠাৎ যে এ মতিগতি?'

'এমনি। এত বড় একটা জয়লাভ হল পেশোয়ার—তাই।'

বলে একটু মুখ টিপে হাসল।

প্রসাধন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, মুসম্মৎ এসে সংবাদ দিল, আজিমুল্লা খাঁ সাহেব দর্শনপ্রার্থী।

বেনারসী রেশমের হালকা ওড়নাটা মাথায়-গায়ে টেনে দিয়ে আমিনা বলল, 'আসতে বল—এখানেই।'

বোধ করি বেগমসাহেবার প্রসাধনের জন্যই আয়নার দু পাশের গাছ-বাতিদানের সব কটি বাতি জ্বালা হয়েছিল। শুধু তাই নয়, মাথার ওপরে কাটগ্লাসের বহুমূল্য ঝাড়টাও পূর্ণ গৌরবে প্রজ্বলিত—ফলে ঘরে প্রায় দিবালোকের মতই আলো। বাইরের অন্ধকার থেকে সহসা এতটা আলোর মধ্যে এসে পড়ায় আজিমুল্লার চোখ দুটো যেন ধেঁধে গেল।

কিন্তু সে কি শুধু মাত্র এই মানুষের সৃষ্ট আলোতেই?

চোখের সামনে বিধাতার সৃষ্ট যে আলো আজ আবার পূর্বগৌরবে জ্বলে উঠেছে—চোখ ধাঁধানোর কি সে-ও একটা কারণ নয়? এমনিতেই তো যে-কোন বেশে, যে কোন প্রসাধনেই এই নারী তাঁর কাম্য, তাঁর উপাস্য। এমন কি, গত কদিন যে সে রুক্ষ কেশে বিস্রস্ত বেশে উদ্‌ভ্রান্তের মত ঘুরে বেড়িয়েছে তাতেও তো অন্তরের পিপাসা কিছুমাত্র প্রশমিত হয় নি, বরং ঐ ভস্মের অন্তরালে যে বহ্নি আছে, তার দিকেই তাঁর অন্তর-পতঙ্গ দু পাখা মেলে ছুটে যেতে চেয়েছে। সুতরাং আজ প্রজ্বলন্ত শিখার মত এইরূপ যে সে পতঙ্গকে আরও চঞ্চল, আরও বিহ্বল, আরও উন্মত্ত করে তুলবে—তাতে আর সন্দেহ কি?

আজিমুল্লা কী বলতে এসেছিলেন ভুলে গেলেন। যেন প্রচণ্ড আলো থেকে আড়াল করবার ভঙ্গিতে ডান হাতটা চোখের কাছাকাছি তুলে মুগ্ধ বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন।

আমিনার ভ্রূ দুটো ঈষৎ কুঞ্চিত হতে গিয়েও প্রাণপণ চেষ্টায় প্রসন্ন হাসির ভঙ্গিতে বিস্তারিত হল।

আমিনা বলল, 'কী হল সাহেব—এমন করে চেয়ে আছেন যে?'

'চেয়ে আর থাকতে পারছি কৈ বেগমসাহেবা—চোখ ঝলসে গেল যে।' হালকাভাবে বলতে চেষ্টা করলেও আজিমুল্লার কণ্ঠস্বর অস্বাভাবিক গাঢ় ও বিকৃত শোনায়।

'তাই নাকি?' বিদ্রূপ তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে আমিনার কণ্ঠে, 'দেখবেন, চোখ ঝলসানো তবু ভাল, তাতে প্রাণটা থাকে। নিজে সুদ্ধ পুড়ে মরবেন না!'

'পুড়ে মরতেই যে যে সাধ যাচ্ছে হুসেনী বেগম! পতঙ্গ না জেনে আগুনে ঝাঁপিয়ে পুড়ে মরে, আমার যে জেনেশুনেই মরতে ইচ্ছে করছে!'

অকস্মাৎ আমিনার দুচোখ জ্বলে ওঠে, সাপের মতই হিস্‌ হিস্‌ করে ওঠে কণ্ঠস্বর, 'কিন্তু এ বড় সাংঘাতিক আগুন খাঁ সাহেব। একটা সামান্য পতঙ্গকে পোড়াবার জন্যে খোদা এ আগুন জ্বালেন নি—বহু জীব, সমগ্র একটা জাতি,

একটা দেশ পোড়াবার জন্য জ্বেলেছেন। তোমারই মত কোন পতঙ্গ—না তোমার চেয়ে ঢের ছোট, ঢের ঘৃণ্য এক পতঙ্গ পাখার হাওয়ায় এ আগুন জ্বেলেছিল—খেলাচ্ছলে, সেই থেকে জ্বলছেই। জ্বলছে ও জ্বালাচ্ছে, প্রসারিত হচ্ছে দিকে দিকে, বহু পতঙ্গকে না পুড়িয়ে নিভবে না। সামান্য অপমানের অসামান্য শোধ!'

বলতে বলতেই হুসেনীর দেহ যেন কী এক নিরুদ্ধ আবেগে থরথর করে কেঁপে ওঠে—ললাট স্বেদবিন্দুতে ভরে যায়, চোখের জলন্ত দৃষ্টিটা ক্রমশ হয়ে ওঠে ভয়াবহ। সে দৃষ্টির সামনে বোধ কবি আজিমুল্লাও ভীত হয়ে ওঠেন। তিনি এক লাফে সামনে এসে ওকে ধরে ফেলে জোর করে একটা চৌকিতে বসিয়ে দেন।

'বেগমসাহেবা, বেগমসাহেবা, স্থির হও!'

আমিনা সেই স্পর্শে যেমন সংকুচিতও হয়, তেমনি তা তাকে প্রকৃতিস্থ হতেও সাহায্য করে। প্রাণপণ চেষ্টাতে সে একটু হাসিও টেনে আনে মুখে।

'বড্ড বেশী নাটকীয় হয়ে পড়ল দৃশ্যটা—না খাঁ সাহেব?'

'নাটকীয়? তা হযতো হবে। কিন্তু সব ভঙ্গিতে সব অবস্থাতেই তোমাকে ভাল দেখায় বেগমসাহেবা! কাজেই স্বাভাবিক বা অস্বাভাবিক, সহজ কি নাটকীয়, তা লক্ষ্য করবারও সময় পাই না।'

'এবার আপনিই নাটকীয় হয়ে উঠছেন আজিমুল্লা খাঁ।...কী যেন বলতে এসেছিলেন? নিশ্চয়ই শুধু আমার রূপের প্রশংসা করতে আসেন নি। ও-কাজটা বহুবার সারা হয়ে গেছে।'

'বলছি, কিন্তু বেগমসাহেবা তোমার পূর্ব ইতিহাসের একটা চমক মাত্র দিয়েই থেমে গেলে—কৌতূহল হচ্ছে যে। কে সেই পতঙ্গটি, যার পাখার হাওয়ায় এত বড় আগুন জ্বলল?...সে কি—ঐ—ঐ ধুন্ধুপন্থ?'

'সে একান্তই আমার ব্যক্তিগত ইতিহাস খাঁ সাহেব। নগণ্য এক নারীর সামান্য বৃত্তান্ত। সে সব আলোচনার সময় এ নয়।...কাজ শেষ হলে এত দিনের সাধনার পুরস্কার যখন ভাগাভাগি করে ভোগ করব তখনকার নিভৃত অবসরের জন্যই তোলা থাক না কথাগুলো।'

মুচকি হাসির সঙ্গে কটাক্ষ। আজিমুল্লার সারা দেহে যেন বিদ্যুৎ খেলে যায়। সঙ্গে সঙ্গে, আমিনার কথার তুলিতে ভবিষ্যতের যে ছবি ফুটে ওঠে সে ছবি মানসনেত্রে দেখতে দেখতে বাইরের দৃষ্টিটাও লোভাতুর হয়।

আমিনা কিন্তু বেশীক্ষণ সে দিবাস্বপ্নের অবসর দেয় না! সামনের আঁর একটা চৌকি দেখিয়ে দিয়ে বলে, 'বসুন। বলুন তো কী খবর?'

তার এই একেবারে বাস্তব প্রশ্নে ও ব্যবহারিক কণ্ঠস্বরে আজিমুল্লাও যেন স্বপ্নজগৎ থেকে রূঢ় বাস্তবে নেমে এলেন। তাঁর মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল বললেন, 'বেগমসাহেবা, এদিকে খুব বিপদ! আপনার হুকুম তামিল করা কঠিন হয়ে উঠছে।'

'কেন, কী বিপদ?' নিমেষে সোজা হয়ে বসে আমিনা।

'টীকা সিং আপনার নির্দেশমত সতীচৌরা ঘাটের ঝোপের মধ্যে কামান সাজাতে হুকুম দিয়েছিল—আর সেই সঙ্গে সিপাইরা কোথায় কোথায় প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে সে নির্দেশও ছিল। কিন্তু সিপাইরা একেবারে বেঁকে দাঁড়িয়েছে। তারা বলছে যে, তারা যুদ্ধ করতেই শিখেছে—খুন করতে নয়। নানাসাহেব ইংরেজদের জবান দিয়েছেন—নিরাপদে এলাহাবাদ পর্যন্ত যেতে দেবেন, এখন এভাবে আড়াল থেকে নিরস্ত্র ও নিশ্চিন্ত লোকের ওপর গুলি চালানো শুধু খুন করা নয়—চরম বিশ্বাসঘাতকতাও। তাতে তারা রাজী নয়।'

রোষে আমিনার মুখ রক্তবর্ণ হয়ে উঠে ক্রমশ একেবারে শ্বেতবর্ণ ধারণ করল। সে বলল, 'ইস্! এত নীতিবোধ তাদের এল কোথা থেকে? গত দেড় মাসে তারা কি নিরস্ত্র ইংরেজ একটাও মারে নি—না কি লুটতরাজই করে নি?'

'হ্যাঁ, সে কথাও বলতে গিয়েছিলাম। তারা বললে, হ্যাঁ, যখন যুদ্ধ চলেছে তখন নিরস্ত্র শত্রু সামনে পড়লেও মারব বৈকি, কিন্তু কথা দিয়ে, শত্রু যখন সরল বিশ্বাসে আমার হাত ধরে আমাকেই আশ্রয় করেছে, তখন তাকে মারা আলাদা কথা। আরও কী হয়েছে জানেন? তাত্যা টোপী আমাদের এ কাজ সমর্থন করছেন না। সম্ভবত তিনিই এই নীতিবোধটা ঢুকিয়ে দিয়েছেন ওদের মাথায়। টোপী ব্রাহ্মণ—সিপাইদের মধ্যে ওঁর খাতির বেশি।'

অসহায় রোষে নিজের ঠোঁট নিজেই কামড়ে ক্ষতবিক্ষত করে তুলল আমিনা। সেই মুহূর্তে তাত্যা টোপীকে সামনে পেলে হয়তো সে তাঁর মুণ্ডুটা নিজের হাতেই ধড় থেকে ছিঁড়ে নিত।

কিছুক্ষণ পরে আজিমুল্লার মুখের দিকে চেয়ে অসহায় ভাবেই সে প্রশ্ন করল, 'এখন উপায়?'

'উপায় তো কিছু দেখছি না।...মুসলমান সিপাইরা আছে বটে, কিন্তু তারা যে আলাদা করে কিছু করতে রাজী হবে, তা মনে হয় না।'

বড

শাসনের আয়ন

তাকিয়ে থাকতে থ

আগুন জ্বলল। সে উঠে দাঁ.সম

কাঁটা দিয়ে তা তুলতে হয়। ব্রাহ্ম

ধুন্ধুপন্থও ব্রাহ্মণ—ব্রাহ্মণ এবং রাজা

যান—পেশোয়ার নামেই লিখে নিয়ে যান—

পেশোয়া সেই ইস্তাহারে সিপাইদের কাছে জা.

রাজা। তিনি যা হুকুম দিচ্ছেন—তা বুঝেই দিচ্ছেন। কোন পাপ হবে না ওতে। ওদেরই শাস্ত্রে লেখা আছে যে, বিধর্মী শত্রুর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতায় কোন অন্যায় হয় না। স্বয়ং রামচন্দ্র নিজের কাজ উদ্ধার করতে একরকম বিশ্বাসঘাতকতারই আশ্রয় নিয়েছিলেন। আর যদিই কোন পাপ হয় তো তা স্বয়ং পেশোয়া তাদের হয়ে বহন করবেন। তিনি হুকুম করছেন—দায়িত্ব তাঁরই। যান, এখনই ভাল করে লিখে নিয়ে সিপাইদের পড়ে শোনান। রাত গভীর হয়ে আসছে—আর সময় নেই।'

'ঐ যে কী বললেন, রামচন্দ্র না কী—ওটা ইস্তাহারে লেখা কি ঠিক হবে? যদি কোন ভুলটুল হয় তো ওরা ক্ষেপে উঠবে আরও।'

'কিছু ভুল হয় নি। হিন্দু পুরাণ আমি ভাল করেই পড়েছি। ওটা যদি গুছিয়ে লিখে দিতে পারেন তো ভাল ফলই হবে বরং। শত্রু বধ করতে তিনি যা করেছিলেন তা অন্যায় নয় নিশ্চয়।'

আজিমুল্লা কিন্তু তবু ইতস্তত করতে থাকেন।

'কিন্তু, কিন্তু বেগমসাহেবা, স্বয়ং পেশোয়ার নামে ইস্তাহার চালাব—সে তো জাল। যদি এর পর পেশোয়া অস্বীকার করেন? তা হলে সিপাইরা আমাকে টুকরো টুকরো করে ফেলবে। পেশোয়া নিজেও শাস্তি দিতে পারেন—তাঁর নাম জাল করার অপরাধে।...তাঁর কানে উঠতেও তো দেরি হবে না। তাত্যা টোপী যখন শুনবেন, তখনই তিনি ছুটে যাবেন পেশোয়ার কাছে।'

। নির্দেশমত সতীচৌ।ঘাত আপনাকে পেতে হবে না।
—আর সেই সঙ্গে নিজের ক্ষমতাও জানি। অত সহজে
নির্দেশও আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে কাজে যান, আমি
তোরা বলছে যেন।'

সে হাসি, সে চাহনি, সে কটাক্ষের জন্যে মানুষ স্বচ্ছন্দে আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে—অন্তত আজিমুল্লার সেই মুহূর্তে তাই মনে হল। সামান্য বিপদের সম্ভাবনা তো তুচ্ছ।

তিনি উঠে দাঁড়ালেন। আর এক বার ঐ বহ্নিশিখাকে স্পর্শ করবার, ঐ দুখানি দেবদুর্লভ হাত অন্তত এক বার নিজের হাতের মধ্যে ধরবার অদম্য আকাঙ্ক্ষা প্রাণপণে দমন করতে হল। আমিনাকে এতদিনে তিনি চিনেছেন—সে চেষ্টা করতে গেলে আর একবার অপমানিতই হতে হবে শুধু। একটা নিশ্বাস ফেলে নিজেকে সংবরণ করে নিয়ে বললেন, 'আপনার হুকুম এখনই তামিল হবে বেগমসাহেবা!'

তার পর একটা অভিবাদন করে বার হয়ে গেলেন।

তাঁর সেই অপস্রিয়মাণ মূর্তির দিকে চেয়ে মুহূর্ত-কয়েক স্থির ভাবে দাঁড়িয়ে রইল আমিনা। ক্রমশ শুধু তাচ্ছিল্য নয়, যেন নিদারুণ একটা ঘৃণাই ফুটে উঠল মুখেচোখে। কিন্তু আর অবসর নেই, সেটা মনে পড়ে কতকটা জোর করেই নিজেকে প্রকৃতিস্থ করে নিল সে। আবার আয়নার সামনে এসে বসল। প্রসাধনের সামান্য দু-একটা কাজ তখনও বাকি ছিল, সযত্নে ও সন্তর্পণে সেটুকু সেরে, সুডৌল চারু ললাটের উপর কেশের রেখাটি ঠিক আছে কিনা হাত দিয়ে পরীক্ষা করে, অক্ষিপল্লবে সুর্মার কাঠিটি আর এক বার গভীরভাবে টেনে দিয়ে সে উঠে দাঁড়াল।...

এই সযত্ন চেষ্টার পরে আয়নায় যে চেহারাটা প্রতিফলিত হয়ে উঠেছিল,

তার দিকে চেয়ে একটা বিচিত্র হাসি ফুটে উঠল আমিনার মুখে। বিচিত্র ও দুর্জ্ঞেয়—কিন্তু বিজয়িনীর হাসি তা নয়, বরং তার মনে হল অসংখ্য বাতির উজ্জ্বল আলোতে সে হাসির আড়ালে কোথায় যেন একটা পরাজয়ের ছায়াই উঁকি মারছে। সে শিউরে উঠে মুখের ওপর ওড়নাটা টেনে দিয়ে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বের হয়ে পড়ল।

হার মানলে চলবে না তার। কিছুতেই হার মানবে না সে।

প্রয়োজন হয় তো বিশ্বের সমস্ত বিরুদ্ধ শক্তির সঙ্গে সে লড়াই করবে।

॥ ৫২ ॥

মুনশী কাল্কাপ্রসাদ বেশী দিন কানপুরের বাইরে থাকতে পারেন নি। কারণ প্রাণভয় যতই বড হোক, এ শহর তাঁর কাছে আরও বড়। পুরুষমানুষের পক্ষে উপার্জনের ক্ষেত্র থেকে দূরে থাকার অর্থ—জীবন্মৃত হয়ে থাকা। আর যদি মরেই থাকতে হয় তো এ দেহ থাকলেই বা কী—গেলেই বা কী। খাটতে খাটতে সকলেরই মনে হয়, দূরে কোথাও গিয়ে কদিন আরাম করবে। প্রথম দু-এক দিন সে আরাম ভালও লাগে, কিন্তু তার পরই নিষ্ক্রিয়তাটা বিছের মত কামড়াতে থাকে। সুখশয্যা কণ্টকশয্যা হয়ে ওঠে। বিশ্রামের অভাবে আগে মনে হয় অবসর পেলে ঘুমিয়ে বাঁচব, কিন্তু বিশ্রাম নিতে গেলে ঘুম আসে না চোখে একবিন্দুও।

কাল্কাপ্রসাদও এমনি একটা সংকল্প নিয়ে দেহাতে গিয়েছিলেন। প্রাণ-রক্ষাকে প্রাণরক্ষাও হবে, অথচ দায়ে পড়ে একটা পূর্ণ বিশ্রামলাভও ঘটবে। কিন্তু দুটো-তিনটে দিন যেতে-না-যেতেই হাঁপিয়ে উঠলেন। আরে ছোঃ, এমন সব দেশে মানুষ থাকে! উত্তেজনা নেই, চাঞ্চল্য নেই, ব্যবসা-বাণিজ্য কিছুই নেই, নগদ টাকার ঝনঝনানি শোনা যায় না—এমন কি বাইরের একটা খবরও এখানে এসে পৌঁছয় না। এ যেন কবরের মধ্যে বাস করা।

সবচেয়ে কানপুরের খবরের জন্যেই মনটা তাঁর ছটফট করত। এই শহর তাঁর কর্মজীবনের সঙ্গে পাকে পাকে জড়ানো—গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে বাঁধা। সেই কানপুরে কত কী কাণ্ড ঘটছে, কত ইতিহাস রচিত হচ্ছে মুহূর্তে মুহূর্তে, আর তিনি এই—বলতে গেলে রামচন্দ্রজীর অভিশপ্ত, ভুলে যাওয়া একটা জায়গায়,

বসে বসে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত তামাকু পোড়াচ্ছেন! তাও সঙ্গে যেটুকু শহরের ভাল তামাক এনেছেন তা তো ফুরোল বলে। এখন হয়তো এখানকার কড়া দা-কাটা খেয়ে জীবনধারণ করতে হবে। এমন জীবনে প্রয়োজন কী।

সুতরাং সাত-আটটা দিন যেতে না যেতেই তিনি আবার শহরে ফিরে এসেছিলেন। তবে নিজের বাড়ি—এমন কি নিজের মহল্লার দিকেও যেতে সাহস করেন নি। পরিচিত বহু লোকেই তাঁকে ঈর্ষা করে, সে তথ্য তাঁর অবিদিত নেই। দেখতে পেলে সঙ্গে সঙ্গেই ফিরিঙ্গীর 'নৌকর' ও গোয়েন্দা বলে ধরিয়ে দিতে এতটুকু দ্বিধা করবে না। সেজন্যে তিনি একেবারে বিপরীত দিকের একটা ঘিঞ্জি মহল্লাতে পরিচিত এক দোকানীর বাড়িতে এসে উঠেছিলেন। প্রচণ্ড গরম রোদের মধ্যে বার হওয়া আদৌ উচিত নয়—এই অজুহাতে সারা দিনটাই দোকানের পেছন দিকের আলো-বাতাসহীন ঘরে পড়ে ছটফট করতেন এবং সন্ধ্যের অন্ধকার হওয়া মাত্র টুপির বদলে একটা মোটা কাপড়ের পাগড়িতে মাথার অনেকখানি—মায় চোখের খানিকটা পর্যন্ত—ঢেকে বার হতেন শহরের সংবাদ সংগ্রহ করতে।

ক্রমে ক্রমে, অর্থাৎ কয়েকদিন বেশ নিরাপদে কাটাবার পর, অনেকখানি ভরসা বেড়ে গেলে, তিনি একেবারে সিপাহীদের লাইনেও আসতে শুরু করেছিলেন এবং 'দু পয়সা' কামাবার অভ্যাসটা দীর্ঘকালে স্বভাবে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল বলে, শেষের কদিন ঐ পরিচিত দোকানীটিকে সামনে শিখণ্ডী খাড়া করে ফৌজী ব্যারাকে সবৃজি, ফল, ঘি, তেল প্রভৃতি সরবরাহ শুরু করেছিলেন। নগদ কারবারে যা হয় ধার-বাকি ছাড়বেন না—এই ছিল তাঁর সংকল্প, তাই বেশী দামের জিনিসে ঘেঁষতেন না। পাঁচ টাকার সবৃজি অনায়াসে পনেরো টাকায় বিক্রি হবে, না হয় তো পচবে—তাতে ক্ষতির সম্ভাবনা সামান্যই। আর ঘি তেল? না বিক্রি হয়, পড়ে থাক। নিজেরা খেয়ে শেষ করতে পারবেন—চাই কি ধীরে সুস্থে দোকানেও বেচা চলবে।

ফলে নাচারগড়ের আশেপাশে ঘোরাঘুরি করে করে—এ কদিনে সব খবরই মোটামুটি সংগ্রহ করেছিলেন মুনশী কালৃকাপ্রসাদ। হঠাৎ গুলিগোলার শব্দটা কেন থেমে গেল, সে কারণটাও তাঁর অবিদিত ছিল না। আর—সন্ধি হয়েছে এবং সাহেবরা কাল সকালবেলাই নৌকোয় চেপে এলাহাবাদ রওনা হবেন—এ খবরটা জানা পর্যন্ত তিনি ছটফট করে বেড়াচ্ছেন। ২৬শে তারিখ সারারাত ঘুম হয় নি।

কারণ ?

তখনকার দিনের কি কারবারী, কি সাধারণ লোক—সকলকারই ধারণা ছিল সাহেবরা এক-একটি টাকার গাছ। রোজগার ওরা যত করে, বেশির ভাগ সাহেবই তার চেয়ে ঢের বেশী খরচ করে; অধিকাংশ সাহেবই ঋণগ্রস্ত। খুব বেশী উপরি রোজগার করার পথ যাদের আছে, অথবা ব্যবসায়ী সাহেব ছাড়া কেউই বড় একটা কিছু জমাতে পারে না। যে মাসিক আয় ভারতীয়দের হলে তারা জমিদারি কিনতে পারত, সেই আয়ই শেষ করে সাহেবদের ঋণ করতে হয়। তবে এই 'নবাবি'র অধিকাংশই ব্যয় হয় ভারতীয়দের মধ্যেই—বকশিশে ও চুরিতে। ওদের বেয়ারা-বয়-বাবুর্চি-খিদ-মৎগার-আবদার-চোপদার-ফরাশ প্রভৃতিরা এক-একটি টাকায় কুমীর হয়ে ওঠে অবিলম্বে। বাজারের টাকায়-চোদ্দ-ছটাক ঘি মাত্র কয়েক গজ এসে যে সের-করা চোদ্দসিকে দরে পরিণত হয়, এবং সেই চৌদ্দসিকের অধিকাংশ অঙ্ক যে এই কুমীরদের পেটেই পৌঁছয় তা কে না জানে? আর এই টাকাই বাবুর্চি বেয়ারাদের জেব-এ জমে এক সময় কল্পিত মহাজনের নামে আবার ঋণস্বরূপ সাহেবদের জেব-এ চলে আসে এবং এই যাতায়াতের ফলে শনৈঃ শনৈঃ অঙ্কটা বর্ধিত-কলেবর হয়, সে কথাও কালকাপ্রসাদের মত সাহেব-ঘেঁষা মানুষের কাছে অবিদিত নয়।

সুতরাং সাহেব-সান্নিধ্য মানেই টাকা!

টাকা ওদের চারপাশে ছড়িয়ে আছে, কুড়িয়ে নিতে পারলেই হল!

সেই তাগিদেই সমস্ত রাত ব্যারাকের ধারে বিনিদ্র কাটিয়ে ভোরবেলা সাহেবদের মালপত্র চালান শুরু হতেই কালকাপ্রসাদ এক ফাঁকে ঢুকে পড়লেন নাচারগড়ের মধ্যে। কী পাবেন, কী আশায় যাচ্ছেন, তা তিনিও স্পষ্ট জানেন না। শুধু একটা অকারণ অনিশ্চিত লোভই দুর্বার আকর্ষণে তাঁকে টেনে নিয়ে গেল।

কিন্তু সেখানে ঢুকে যে দৃশ্য চোখে পড়ল, তা মোটেই আশাপ্রদ নয়। কালকাপ্রসাদ রীতিমত দমে গেলেন।

খালি ঘরগুলোতে শুধুই ছেঁড়া কাগজপত্রের স্তূপ। কেউ কেউ চিঠিপত্র পুড়িয়ে দেবারও চেষ্টা করেছেন—ফলে এ-কোণে ও-কোণে আধপোড়া কাগজের গাদা। মালপত্র নেই বললেই হয়। ছেঁড়া জামা এক-আধটা, কাচ ও

কাঁচকড়ার দু-একটা বাক্স, খালি টিন—এমনিই দু-চারটে বাজে জিনিস এখানে-ওখানে পড়ে আছে। তা তার জন্যেও লুব্ধ ভিখারীর দল জুটে গেছে ইতিমধ্যেই। সিপাহীরাও কেউ কেউ উঁকি মারতে শুরু করেছে। পুরোনো চোপদার আবদার চাপরাসী বেয়ারা-বাবুর্চি—যারা প্রাণভয়ে কাজকর্ম ছেড়ে শহরে আত্মগোপন করে ছিল, অথবা ভিড়ে মিশে সাহেব ধরিয়ে দিয়ে দু পয়সা রোজগারের ফিকিরে ছিল এতদিন, তারা রাত্রের মধ্যেই এসে পড়েছে। কেউ কেউ পুরোনো মনিবের সঙ্গে গল্প জমিয়ে তুলেছে, কেউ বা তাঁদের মালপত্র গুছিয়ে বাঁধতে লেগে গেছে। দু-এক জন সিপাহীও তাদের পুরাতন মেজর বা ক্যাপ্টেনের সাহায্যে যে এগিয়ে আসে নি তা নয়। তারা কেউ মালপত্রের জন্য প্রেরিত বয়েল-গাড়িতে 'গরিব পরোবর' ও 'হুজুর'দের মালপত্র গুছিয়ে তুলে দিচ্ছে, কেউ বা নিজেরাই কাঁধে করে ঘাট পর্যন্ত পৌঁছে দেবে বলে তৈরী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

কালকাপ্রসাদ্ ঈর্ষার সঙ্গে লক্ষ্য করলেন, ছিটেফোঁটা প্রসাদ এবং বকশিশ-আদি যা মেলবার, এদেরই—অর্থাৎ পুরাতন সেবক ও সিপাহীদেরই মিলছে। টাকাটা-সিকিটা তো বটেই—দু-এক জন দামী ঘড়ি এমন কি মূল্যবান শালও এক-আধখানা পেয়ে গেল।

মজা মন্দ নয়। স-ক্ষোভে এবং কতকটা স-বিদ্বেষেও কাল্‌কাপ্রসাদও মনে মনে উক্তি করলেন, যারা অনিষ্ট করল, ভাই-বেরাদারদের খুন-জখম করল, তাদের বেলাই ওঁদের বদান্যতার সমুদ্র উথলে উঠল, আর তাঁদের মত যে বিশ্বস্ত সেবকরা শেষ পর্যন্ত বিশ্বস্ত রইল এবং সাহেবদের শৌর্য ও ভাগ্যে বিশ্বাস হারাল না, তাদের বেলায় অবশিষ্ট রইল কিছু ছেঁড়া কাগজ ও ছাইয়ের গাদা।

একেই বুঝি বলে ভগবানের সুবিচার! দূর ছাই, এই শ্মশানপুরীতে আসাটাই মিথ্যে হল!

যৎপরোনাস্তি বিরক্ত ও ক্ষুব্ধ মুখে কাল্‌কাপ্রসাদ একটা কোণে দাঁড়িয়ে একবার শেষবারের মত চারিদিকে তাকিয়ে দেখে নিচ্ছেন, আর কোথাও কোন লাভের আশা এখনও আছে কিনা, হঠাৎ কার একখানা ভারী হাত কাঁধের ওপর পড়ল।

হাতখানা একেবারে অপরিচিত নয়।

নানকচাঁদ।

সঙ্গে সঙ্গে খুশিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল কাল্‌কাপ্রসাদের মুখ। তিনি তাহলে একা ঠকেন নি, নানকচাঁদের মত বুদ্ধিমান লোকও তাঁরই মত বৃথা লোভে ছুটে এসেছে। আঃ বাঁচা গেল, অন্তত একা বেকুব বনবার দুঃখটা আর রইল না।

'কেয়া উকিলবাবুজী, রাম রাম!' কাল্‌কাপ্রসাদ প্রায় জড়িয়ে ধরতে গেলেন নানকচাঁদকে, 'কি, খুব আশায় এসেছিলে, না? ভেবেছিলে যে সাহেবরা চলে যাচ্ছে—দু-চার পাঁচ টাকা কি আর এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়ে থাকবে না? হুঁ হুঁ, অতি বড় বুদ্ধিমানেরও এমনি দুর্দশা হয়। সে গুড়ে বালি। কী ছিল যে থাকবে? অষ্টরম্ভা। পড়ে আছে ঐ কতকগুলো ছাই ভাই চাট্টি কুড়িয়ে নিয়ে যাও আর কি।'

ডান হাত মুঠো করে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠটি একটি বিশেষ ভঙ্গিতে তুলে ধরে খুব হাসতে লাগলেন কাল্‌কাপ্রসাদ। নিরতিশয় তৃপ্তির হাসি।

তাঁর এই বাক্যস্রোত যতক্ষণ রইল' নানকচাঁদ নীরবে, ধীরভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন। বাধা দেবার চেষ্টা করলেন না, কোন রকম অসহিষ্ণুতাও প্রকাশ করলেন না। শুধু তাঁর সারা মুখে ও চোখে একটা অপরিসীম করুণার ভাব ফুটে উঠল—কালকাপ্রসাদের কথায় ও কথা বলার ভঙ্গিতে।

তার পর কাল্‌কাপ্রসাদ থামলে তার দিকে স্থির-দৃষ্টিতে তাকিয়ে নানকচাঁদ অদ্ভুত একরকমের শান্তকণ্ঠে বললেন, 'তুমি টাকা চাও, না? টাকার ওপর খুব লোভ তোমার?'

এতক্ষণে কাল্‌কাপ্রসাদের মনে হল যে, কোথায় আরও একটা কি বড় রকমের বেকুবি হয়ে গেছে। কেমন করে এই ধীর শান্ত লোকটার কাছে বড় ছোট হয়ে গেছেন তিনি।

বড় বেশী লোভ তিনি প্রকাশ করে ফেলেছেন খুশির আতিশয্যে। তাই লোকটা তাঁর ওপর এক হাত নেবার সুযোগ পেয়েছে। ওকে আগে কথা বলতে দিলেই ভাল হত।

'কেন, কেন,—একথা বলছ কেন?'

ঈষৎ উদ্বিগ্ন ভাবেই প্রশ্ন করেন কাল্‌কাপ্রসাদ।

সে কথার উত্তর না দিয়ে নানকচাঁদ নিজের মুখখানা একেবারে কাল্‌কাপ্রসাদের মুখের কাছে নিয়ে এলেন। তাঁর চোখের দিকে এক রকম বিচিত্র স্থির-দৃষ্টিতে চেয়ে, কেমন একরকমের অদ্ভুত গলায় বললেন, 'মূর্খ, টাকা চাও

তো ভিখিরীর মত খালি বাড়ি-ঝাঁট দিতে এসেছ কেন? এখানে কী পাবে? এত সামান্য আশা তোমার? তোমার তো অভাব নেই, তবে এত নীচে নাম কেন? যাও, সাহেবদের পিছু পিছু যাও; এদের বিপদ কেটেছে বলে আমি মনে করি না। এদের সঙ্গে থাক গে, তেমন সময় ও সুযোগ এলে যে কটা সাহেবকে পার বাঁচাও গে।'

বেকুবের মতই বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে কালকাপ্রসাদ বললেন, 'তার মানে?'

'মানে, নানাসাহেব যতই কথা দিন, এই সাহেবরা নিরাপদে প্রাণ নিয়ে শেষ পর্যন্ত এলাহাবাদে পৌঁছতে পারবে বলে আমি মনে করি না। আর এও মনে করি না যে, আংরেজ-রাজ শেষ হয়ে গেল হিন্দুস্তানে। এ বড় অদ্ভুত জাত—এই আংরেজরা। ঐ স্থবির বাহাদুর শা, নির্বোধ নানাসাহেব, আর এই কটা লুটেরা সিপাইএর সাধ্য নেই যে, আংরেজদের কাছ থেকে রাজ্য ছিনিয়ে নেয়। এরাই জিতবে শেষ পর্যন্ত। কাজেই যতটা পার, যেভাবে পার এদের বাঁচাবার চেষ্টা কর গে, আখেরে কাজ দেবে। তখন পাবে টাকা—যত খুশি। যাও।'

একরকম তাঁকে বাইরের পথের দিকে ঠেলে দিলেন নানকচাঁদ, তার পর নিজেও নিমেষে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

॥ ৫৩ ॥

২৭শে জুন, ১৮৫৭।

এই তারিখটি ইংরেজের জাতীয় ইতিহাসে চিরকাল একটি ভয়াবহ দিন হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। ভয়, তার সঙ্গে বিদ্বেষ, ঘৃণা, প্রতিহিংসা—এক কথায় মানবমনের অনেকগুলি কু-বৃত্তির সঙ্গে চিরদিন বিজড়িত থাকবে এই দিনটি। এর পর এক শতাব্দীরও ওপর কেটে গিয়েছে, তবু ঐ দিনের ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা ইংরেজ জাতির স্মৃতি থেকে একেবারে মুছে যায় নি।

সিপাহী-বিদ্রোহে মোট নরহত্যা বড় কম হয় নি। ইংরেজ গোড়ায় মরেছে—পরে মেরেছে। নিষ্ঠুর হত্যা, পৈশাচিক হত্যা, অকারণ হত্যা।—ইংরেজ মেরেছে প্রতিশোধ নিতে, বৈর-নির্যাতন হিসেবে। হিন্দুস্থানী

মেরেছে প্রচণ্ড রোষে—হয়তো তাকেও বৈর-নির্যাতন বলা চলে। বহুদিন বহু অসন্তোষ পুঞ্জীভূত ছিল তাদের মনে।

কিন্তু সে যতই হোক, কানপুরের হত্যাকাণ্ড সব স্মৃতিকেই ম্লান করে দিয়েছে—অন্তত ইংরেজদের ইতিহাসে। সতীচৌরা ঘাট ও বিবিঘর—এই দুটি ঘটনার বুঝি জুড়ি নেই! সিপাহী-বিদ্রোহের ইতিহাসে Massacre of Cawnpore অন্যতম প্রধান ঘটনা হিসেবেই চিরদিন পরিচিত আছে। কেউ কেউ বা সেদিনের সেই বীভৎস হত্যাকাণ্ডকে শুধু The Massacre এই আখ্যায় একেবারে সর্বপ্রধান স্থানটিই দিয়ে গিয়েছেন।

২৭শে জুন, ১৮৫৭।

ইতিহাসে এই দিনটি বিশেষ দিন হিসেবে চিহ্নিত আছে বটে, কিন্তু সেদিনের বিশেষ ইতিহাস কি কোথাও পাওয়া যায়?

সেদিন ঠিক যে কী ঘটেছিল তা পুরোপুরি কেউই জানে না। কোন্ পক্ষের কতটা দায়িত্ব তাও কেউ জানে না—জানবার উপায়ও নেই!

নানাসাহেবও জানতেন না।

আমিনা আজিমুল্লাকে মিথ্যে কথা বলেছিল। রাত্রে সে নানাসাহেবের কাছে গিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু সে শুধু নৈশ-রহস্যের রমণীয় জালে তাঁকে বিভ্রান্ত ও অভিভূত করতে, নর্ম-লীলার উন্মত্ত উৎসবে তাঁকে মাতিয়ে অচেতন করে একান্ত অন্যমনস্ক রাখতে, এক কথায় বাইরের তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ ঘটনা-সমুদ্রের গর্জন যাতে তাঁর কানে না পৌঁছয়, সেজন্য নানাসাহেব ও বাইরের জগতের মধ্যে নিজের বহুজন-ইপ্সিত লোভনীয় ভঙ্গুর নারী-দেহটি দিয়ে এক দুর্ভেদ্য প্রাচীর রচনা করতে।

সেদিন যেন নিজেকে নতুন করে সৃষ্টি করেছিল আমিনা। তার রূপ-যৌবনের অলৌকিক কুহকে নতুন করে যেন মোহিনী মায়ার প্রলেপ লেপন করেছিল। তার সমস্ত শিক্ষা-দীক্ষা, সমস্ত ছলা-কলা-নৈপুণ্য প্রয়োগ করে সে সেই বিশেষ রাত্রে নিজেকে এমনিই এক দুর্নিবার বহ্নিশিখারূপে জ্বালিয়ে তুলেছিল যে, সে শিখায় পতঙ্গের মত ঝাঁপিয়ে পড়া ছাড়া নানাসাহেবের উপায় ছিল না।...বহুদিন তার সঙ্গে কাটিয়েছেন নানাসাহেব—বহু প্রমোদ-লীলার, বহু বিলাস-বিহারের স্মৃতিই জাগ্রত আছে তাঁর মনে—এই রমণীকে কেন্দ্র করে, তবু যেন সেই পুরাতন লীলাসঙ্গিনীটিকেই একেবারে নতুন করে আবিষ্কার করলেন তিনি সেদিন। এ যেন সেই পূর্বপরিচিত হুসেনী নয়,

যাকে এতকাল অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে রূপ-যৌবন-লাস্য প্রভৃতিতে আদালার অনেক নীচে স্থান দিয়ে এসেছেন। এ যেন আর কেউ, এ যেন সম্পূর্ণ নতুন। এর মোহিনী মায়ায় নিজেকে বিকিয়ে দিয়ে, এর ঐ রক্তোৎপল-তুল্য পায়ে নিজেকে সঁপে দিয়েই জীবন ধন্য মনে হয়।

সেদিনের রাত্রি যেন চোখের পলক না ফেলতে কেটে গেল। নানাসাহেবের মনে হল জীবনে সুখের রাত বড় ছোট, আনন্দের অবসর বড় কম। আরও মনে হল হুসেনী যে এতই অপরূপ এতই কাম্য তা এর আগে অনুভব করেন নি কেন।...

রাত ছোট মনে হলে মানুষ দু হাত দিয়ে তাকে ধরে রাখতে চায়—দিনের প্রান্তে এসেও। নানাসাহেবও আজ তাই করলেন। হুসেনীর তরফ থেকেও কোন আপত্তি নেই। তার আচরণ দেখলে সন্দেহ হতে পারত—চিরজীবনের দয়িতকে সে এই বুঝি প্রথম কাছে পেয়েছে।...সুতরাং সেদিন নানাসাহেবের প্রভাত হল যখন, তখন প্রভাতের চার দণ্ড উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। তার পর ক্লান্ত সম্ভোগ-বিবশ দেহটাকে টেনে তুলে স্নান-প্রাতঃকৃত্যাদি শেষ করে পুজোয় বসতে বসতে বেলা প্রথম প্রহরও উত্তীর্ণ হয়ে গেল।

ইংরেজরা চলে যাবে আজ, পরাজিত আত্মসমর্পিত শত্রু তাঁরই অনুগ্রহে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যাবে—আজ তাঁর গৌরবের দিন, উৎসবের দিন। সে কথাটা পুজো করতে করতে মনে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গেই সংবাদের জন্য কৌতূহলী ও উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠলেন নানাসাহেব। টোপী ও আজিমুল্লা এত বেলা পর্যন্ত একটা সংবাদ বিবরণ না পাঠানোর জন্যে প্রথমটা একটু বিরক্তিও বোধ করলেন। তার পরই মনে পড়ল, তিনি আজ এখনও পর্যন্ত অন্তঃপুরের গণ্ডির মধ্যেই আবদ্ধ আছেন। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে মনটা পূর্ব রাত্রির স্মৃতি-রোমন্থনে প্রসন্ন হয়ে উঠল। সেই প্রসন্নতা তাঁর কল্পনাতেও সঞ্চারিত হল। সব ঠিক সুশৃঙ্খলভাবে সম্পন্ন হয়ে যাচ্ছে কল্পনা করে নিশ্চিন্ত হলেন।

কিন্তু ভগবান গণপতির চরণে শেষ অর্ঘ্য দিয়ে ওঠবার আগেই অনেকগুলি গুলিগোলা-কামানের শব্দ কানে এল তাঁর। কোনমতে প্রণামটা সেরে বাইরে আসতেই দেখলেন মুখ অন্ধকার করে দাঁড়িয়ে আছেন তাত্যা টোপী।

'কী ব্যাপার তাত্যা—এ সব কী?' উদ্বিগ্ন নানা প্রায় রুদ্ধশ্বাসেই প্রশ্ন করেন।

'আপনিই হুকুম দিয়েছেন পেশোয়া, আপনিই জানেন এসব কী!'

বিরক্তি শুধু নয়, টোপীর কণ্ঠে বিরোধিতাও স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

'আমি! আমি কী হুকুম দিয়েছি?' বিহ্বলকণ্ঠে প্রশ্ন করেন নানা।

'বিশ্বাসঘাতকতা করে নিরস্ত্র ইংরেজদের ওপর গুলি চালাতে।'

'সে কি! আমি তো কিছু জানি না।'

বলেন বটে, কিন্তু যুগপৎ নানা ও টোপীর কণ্ঠে একই সন্দেহ আবছায়ারূপ পরিগ্রহ করে।

'সিপাইরা এ বিশ্বাসঘাতকতা করতে অস্বীকার করেছিল, কিন্তু আজিমুল্লা তাদের আপনার নাম করে হুকুম জানিয়েছে। বলেছে যে, আপনি রাজা এবং ব্রাহ্মণ, এ কাজে যদি কোন পাপ হয় তো সে পাপ আপনিই গ্রহণ করবেন।'

'সে কি! আমাকে না জানিয়ে আমার নাম করে হুকুম চালিয়েছে... আজিমুল্লার এত দুঃসাহস! তাকে ডেকে পাঠাও তো।'··একই সঙ্গে উত্তেজিত ও বিচলিত হয়ে ওঠেন নানা।

কিন্তু টোপীকে কোথাও যেতে হল না। হুসেনী বোধ করি কাছেই কোথাও ছিল, সে এইবার নিঃশব্দে সামনে এসে দাঁড়াল।

'আজিমুল্লার কোন দোষ নেই পেশোয়াজী। আমিই তাকে আপনার নাম করে ঐ আদেশ জানাতে বলেছিলাম, আমার দায়িত্বে।'

'সে কি—তুমি! তুমি কেন এ কাজ করতে গেলে হুসেনী?'

কেমন একরকম অসহায়ভাবে প্রশ্ন করেন নানা!

'আপনি যত সহজে আপনার শত্রুদের ক্ষমা করতে পারেন পেশোয়াজী, আমি পারি না। ওরা আপনার যে অনিষ্ট করেছে, আপনার কেন—সারা হিন্দুস্তানেরই দুশমন ওরা, আমাদের সকলেরই সর্বনাশ করতে চেষ্টা করেছে—ওদের এভাবে নিরাপদে ছেড়ে দেওয়ার চেয়ে নির্বুদ্ধিতা আর কিছুই হতে পারে না।...এই কটা ইংরেজ, ভেবে দেখুন, আপনার কত সৈন্যের মৃত্যুর কারণ হয়েছে। যাদের একান্ত নগণ্য ও অসহায় ভেবেছেন, তাদের জন্যেই কী পরিমাণ বিব্রত হতে হয়েছে আপনাকে! তার ওপর ওরা যদি ওদের বড় দলের সঙ্গে মিলতে পারে, তা হলে কি আর রক্ষা থাকবে? না আপনি সহজে ওদের হারাতে পারবেন?...আপনার মুখ চেয়েই এ ধৃষ্টতা করেছি পেশোয়া—দণ্ড দিতে হয় দিন! হাসিমুখেই সে দণ্ড নেব।'

হুসেনীকে দণ্ড দেওয়া!

কাল রাত্রের আগেও হয়তো সে-কথা ভাবা চলত, কিন্তু এখন আর ভাবা যায় না।

বিমূঢ়ভাবে একবার তার মুখের দিকে চেয়ে মাথা নামিয়ে নিলেন পেশোয়া।

তার পর তাত্যার দিকে না চেয়েই কতকটা স্খলিত কণ্ঠে বললেন, 'যা হবার তা তো হয়েই গেছে, অন্তত মেয়েছেলে আর বাচ্চাগুলোকে বাঁচাও তাত্যা—ছুটে যাও। দোহাই তোমার, আমার ওপর অভিমান করে থেকে সর্বনাশ আর বাড়িয়ো না।'

তাত্যা প্রায় ছুটেই চলে গেলেন।

তার গতিপথের দিকে চেয়ে আরও কিছুক্ষণ এইভাবে দাঁড়িয়ে থেকে নানা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বিহ্বল কণ্ঠে বললেন, 'কেন একাজ করলে হুসেনী, আমি যে ওদের কথা দিয়েছিলাম!'

'কথা দিয়ে তার খেলাপ করাটা মারাঠীদের পক্ষে খুব নতুন নয় পেশোয়া। পেশোয়া-বংশ কি একাজ এই প্রথম করলেন?'

কণ্ঠে তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ আমিনার।

পূজোর পরে দুগ্ধ পান করা পেশোয়ার নিত্য অভ্যাস। চাকর যথারীতি গরম দুধের 'কটোরা' নিয়ে এল। পেশোয়া ইঙ্গিতে তাকে চলে যেতে বলে সেই পট্টবস্ত্র-পরিহিত অবস্থাতেই এসে একটা চৌকিতে বসে পড়লেন।... বাইরে গিয়ে অবস্থাটা ভাল করে দেখা বা কোন নতুন আদেশ দেওয়া— কিছুতেই আর যেন কোন উৎসাহ রইল না তাঁর।

আমিনা এসে পাশে দাঁড়াল, কিন্তু স্পর্শ করতে সাহস করল না। পূজোর কাপড় এখনও ছাড়া হয় নি, তা ছাড়া মুখে এখনও একটু জল পড়ে নি। আমিনাকে ছুঁলে আবার স্নান না করা পর্যন্ত মুখে কিছু দিতে পারবেন না— একথাও সে জানে। সুতরাং স্পর্শের অভাবটা কণ্ঠের মাধুর্যেই সারতে হল। যত দূর সম্ভব মধুরকণ্ঠে অপরাধিনীর দ্বিধা এনে সে প্রশ্ন করল, 'আমার ওপর রাগ করলেন পেশোয়া? কিন্তু এবার একটা কথা বলি, কথার খেলাপ আপনার ঠিক হয় নি, গুলি ইংরেজই আগে চালিয়েছে নিরস্ত্র মাঝি-মাল্লাদের ওপর—সিপাইরা শুধু জবাব দিয়েছে মাত্র। আমার সেই নির্দেশই ছিল— আর তার অন্যথাও হয় নি। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমি খাঁটি খবরই বলছি। বলুন এবার আমাকে ক্ষমা করবেন।'

নানা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে তার দিকে চাইলেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দৃষ্টি কোমল হয়ে এল তাঁর। ম্লান হেসে বললেন, 'ক্ষমা? রাগ? না আমিনা, রাগ নয়। ভয় হচ্ছে—কোথায় চলেছি কে জানে। হয়তো এ কাজের এ-ই দস্তুর। মনে দ্বিধা রেখে এসব কাজ হয় না।...হয়তো তুমিই ঠিক করেছ—কে জানে!'

আর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন নানা ধুন্ধুপন্থ।

॥ ৫৪ ॥

আমিনা নানাসাহেবকে বলেছিল, ইংরেজরাই প্রথম মাঝি-মাল্লাদের ওপর গুলি চালিয়েছে। কথাটা হয়তো একেবারে মিথ্যেও নয়। পূর্বেই বলেছি যে, সেদিনের সঠিক ঘটনা সম্পূর্ণ জানবার কোন উপায় নেই। হাজার হাজার লোক নিয়ে যেখানে কাজ, যেখানে অসংখ্য কর্তা, ঘটনার স্থানে যেখানে এত বিস্তৃত—সেখানে কেউই সমগ্রভাবে খবর রাখতে পারে না।

সেদিনের ইতিহাস রচনা হয়েছে কয়েকটি লোকের জবানবন্দির ওপর। তারা কেউ ছিল ঘাটের ধারে অসংখ্য লোকের জনতার মধ্যে দাঁড়িয়ে, কেউ বা ছিল নিরাপদ দূরত্বে সরে—জনশ্রুতিতে সব শুনেছে। কালুকাপ্রসাদ শষোক্ত শ্রেণীরই একজন। যদিচ কালুকাপ্রসাদের সাক্ষ্যের ওপরও অনেক ঐতিহাসিক জোর দিয়েছেন।

সেদিন যে ইংরেজ কজন এলাহাবাদের উদ্দেশে নৌকোয় চেপেছিল, তাদের মধ্যে মাত্র চার জন লোক শেষ অবধি প্রাণে বাঁচতে পেরেছিল। টমসন ও ডিলাফোস্ তাদের মধ্যে দু জন। এঁরাও লিখিত ইতিহাস রেখে গেছেন। বিশ্বাস করতে হলে এঁদের কথাই বিশ্বাস করা উচিত। বর্তমান কালের ঐতিহাসিকরাও এঁদের কথার ওপরই বেশী জোর দিয়েছেন।

২৭শে জুন সকালবেলাই পূর্ব-প্রতিশ্রুতিমত আজিমুল্লা কতকগুলি ডুলি, 'বয়েলগাড়ি',—এমন কি ষোলটি হাতীও পাঠিয়েছিলেন—মানুষ ও মাল নদীর ঘাটে পৌঁছে দেবার জন্যে। বলা বাহুল্য যে, সব লোক সে ডুলি ও হাতীতে ধরে নি। মালগুলি গো-গাড়িতে চাপিয়ে স্ত্রীলোক, রুগ্ণ ও শিশুদের ডুলি এবং হাতীতে ভাগাভাগি করে তুলে দিয়ে সমর্থ পুরুষরা সকলেই হেঁটে

সতীচৌরা ঘাট পর্যন্ত গিয়েছিলেন। অনেকে বলেন সব শেষে পড়েছিলেন কর্নেল এওয়ার্ট। তাঁকে ও তাঁর বিবিকে গাড়ি থেকে নামিয়ে কেটে ফেলা হয়। হুইলার সাহেবও নাকি ডুলি থেকে নামবার সময় সিপাহীদের তরবারিতে প্রাণ হারান।

কিন্তু হুইলার সাহেব আদৌ ডুলিতে চড়েন নি, তাঁর স্ত্রী ও কন্যার সঙ্গে গোটা পথটাই হেঁটে এসেছিলেন—এর একাধিক বিবরণ পাওয়া গিয়েছে। তাঁর বেয়ারা নাকি তাঁকে একটা নৌকোয় চড়তেও দেখেছিল। এবং 'নাচারগড' সব শেষে ছেড়েছিলেন মেজর ভাইবার্ট—এওয়ার্ট নয়। ভাইবার্ট নিরাপদে ঘাট অবধি এসে নৌকোতে চড়েছিলেন—তারও বহু প্রমাণ আছে।

যে চার জন* শেষ পর্যন্ত প্রাণ বাঁচাতে পেরেছিলেন, তাঁদের অভিজ্ঞতাও অবশ্য ঐসব ঐতিহাসিকদের সঙ্গে মেলে না। নিজেদের সঙ্গেও মেলে না। কেবল তাঁদের বিবরণ থেকে এইটুকুই বোঝা যায় যে, সাহেব-মেমরা নৌকোয় ওঠবার আগে পর্যন্ত সিপাহীরা সম্পূর্ণ বিশ্বস্ত আচরণই করেছে। অনেকেই পুরাতন অধিনায়কদের সঙ্গে সঙ্গে গিয়েছে, তাঁদের মালপত্র বেঁধে-ছেঁদে গো-গাড়িতে বোঝাই দিয়েছে—কুশলপ্রশ্ন-বিনিময় প্রভৃতি হৃদ্যতারও অভাব হয় নি। এমন কি টমসন ঘাটে যেতে যেতে তাঁর পূর্বপরিচিত এক সিপাহীকে প্রশ্ন করেছিলেন, এলাহাবাদ পর্যন্ত সত্যিই তাঁরা নিরাপদে যেতে পারবেন কি না, তার উত্তরে সে নাকি আন্তরিকভাবেই তাঁকে আশ্বস্ত করেছিল।

প্রথম বিশ্বাসঘাতকতার চিহ্ন পান টমসন—সর্বশেষ ইংরেজ মেজর ভাইবার্ট নৌকোয় ওঠবার পর। তখন সকাল ঠিক নটা। সকলের ওঠা হয়ে গেলেই নাকি মাঝি ও মাল্লারা সব ঝুপঝাপ করে জলে লাফিয়ে পড়ে তীরবেগে পাড়ের দিকে ছুটতে শুরু করে। ভীত-সন্দিগ্ধ সাহেবদের তখন ঘরপোড়া গোরুর অবস্থা—তাঁরা সঙ্গে সঙ্গেই ঐ মাঝিদের লক্ষ্য করে এক ঝাঁক গুলি ছোঁড়েন। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর আসে পাড়ে প্রতীক্ষমাণ সিপাহীদের কাছ থেকে—বন্দুক ও কামান একসঙ্গেই গর্জে ওঠে। সাহেবদের গুলি-ছোঁড়াকে তারা ভুল বুঝতেও পারে—বলা যায় না। নদীতে পৌঁছে নিরাপদে নৌকোয় চেপে প্রতিহিংসার ইচ্ছা তাঁদের প্রবল হয়ে উঠেছে—এমন মনে করাও আশ্চর্য নয়।

* মব্রে টমসন, ডিলাফোস, সলিভান ও মারফি।

কিন্তু টমসন বলেন যে, মাঝিরা নৌকো ত্যাগ করবার আগে গোপনে খড়ের ছাউনিগুলোতে আগুন ধরাবার ব্যবস্থা করে গিয়েছিল। হয়তো বা জ্বলন্ত টিকা কি কাঠকয়লা বহু আগে থেকেই খড়ের মধ্যে লুকোনো ছিল। কিন্তু খররৌদ্রে শুকনো খড় বারুদের গাদার মতই দাহ্য—সামান্য স্ফুলিঙ্গেই জ্বলে ওঠে। সুতরাং তীরভূমির বন্দুকের গুলিতে আগুন ধরাও বিচিত্র নয়। আবার অনেকের মতে মাঝিরা নৌকো থেকে নেমে পড়তেই সিপাহীরাও নাকি পাড় থেকে লাফিয়ে পড়ে ইংরেজ বধ করতে থাকে।

এর পর কী হল তা টমসন বা ডিলাফোসেরও ভাল করে মনে পড়বার কথা নয়। সম্ভবত সবটা বুঝতেও পারেন নি। নৌকোগুলো জ্বলছে—তার সঙ্গে চলেছে তীর থেকে অবিরাম গুলিবর্ষণ। তাড়াতাড়ি পালাবারও উপায় নেই। চড়বার সুবিধা হবে বলে নৌকোগুলোকে যতটা সম্ভব পাড়ের কাছে এনে রাখা হয়েছিল। ফলে গ্রীষ্মের স্তিমিত গঙ্গার পাঁকে ও কাদায় বেশির ভাগ নৌকোই গিয়েছিল আটকে। মাঝি-মাল্লার ঠেলায় হয়তো তা সহজেই জলে ভাসত, কিন্তু অনভ্যস্ত ইংরেজ সৈনিকদের কাছে সেটুকু কাজও সময়-সাধ্য। অনেকেই জলে নেমে টানাটানি করে নৌকো ভাসাতে গিয়ে গুলিতে প্রাণ দিলেন।

কেবল মেজর ভাইবার্ট যে নৌকোয় ছিলেন, সেই নৌকোটি সৌভাগ্যক্রমে জলেই ভাসছিল, তাকে দূরে নিয়ে যাওয়া খুব কঠিন হল না। তাতে আগুনও লাগে নি। আরও একটি নৌকো তাঁদের পিছু পিছু আসছিল, কিন্তু কামানের গোলা লেগে সেটি ডুবে গেল। ওর আরোহীদের কাউকে কাউকে অগ্রবর্তী নৌকোয় টেনে তোলা হল। টমসন কোন নৌকো পান নি—তিনি সাঁতার কেটে এসে শেষ পর্যন্ত ঐ নৌকোতেই ওঠেন।

তখন ফিরে তাকাবার অবকাশ ছিল না। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে অতি বড় নির্ভীকও আত্মীয়-স্বজন স্ত্রীপুত্রের কথা ভাবে না। টমসনরাও ভাবেন নি। বাকি সকলের কী হল তাঁরা জানেন না। যেসব মহিলা ও শিশু তীরের অচল এবং প্রজ্বলন্ত নৌকোয় পড়ে রইল, তাদের অনিশ্চিত পরিণাম এবং ভাগ্যের ওপর ছেড়ে দিয়ে তাঁরা নিজেদের প্রাণ নিয়ে প্রায় প্রতি মুহূর্তে যমের সঙ্গে লড়াই করতে করতে ভেসে চললেন। নিশ্চিন্ত হওয়ার উপায় ছিল না। কারণ শত্রুর গোলা ও গুলি সঙ্গে সঙ্গেই চলল। মাঝ-গঙ্গায় পড়ার পর কামানের গোলা থেকে রক্ষা পেলেন বটে, কিন্তু

বন্দুকের গুলি ঠেকাবে কে? এ ছাড়া জলন্ত তীর এসে পড়তে লাগল আশেপাশে অজস্রধারায়। কতকগুলি নৌকোতে আগুন লাগিয়ে নৌকোগুলি স্রোতে ছেড়ে দেওয়া হল—ভাসতে ভাসতে পলাতক নৌকোর কাছে এসে পড়লে ও নৌকোর আগুনের ফুলকি থেকে এ নৌকোর খড়ের চালে আগুন লাগতে আর কতক্ষণ।

তবু জীবনের মায়ায় ঐ হতভাগ্যের দল প্রাণপণে মরণের সঙ্গে লড়েই চলল। যারা মরল তারা মরল—তাদের পানে ফিরে তাকাবার অবসর রইল না। দল ক্রমশই ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে আসতে লাগল। দাঁড় বেশি নেই—নদী থেকে টুকরো কাঠ ও বাঁশ কুড়িয়ে নিয়ে জল কাটাবার চেষ্টা চলতে লাগল।

দুপুর রাতের পর থেকে সকালের দিকটা পর্যন্ত একটু বিশ্রাম পাওয়া গেল। কিন্তু নজফগড়ের কাছাকাছি আসতে একটি স্নানার্থীর মুখে শোনা গেল যে সেখানকার জমিদার বিপুল এক দল নিয়ে পাড়ে অপেক্ষা করছেন। সেই স্নানার্থী লোকটিকে মোটা টাকার লোভ দেখিয়ে হাতে কিছু টাকা দিয়ে গ্রামে পাঠানো হল কিছু আটা কিনতে—বলা বাহুল্য, সে আর ফিরল না। বেলা দুটো নাগাদ নৌকো নজফগড়ের কাছে এসে পড়ল। সত্যিই তীরে বিপুল এক দল লোক দাঁড়িয়ে। তাদের সঙ্গে বন্দুক তো আছেই, একটা কামানও কোথা থেকে সংগ্রহ করেছে। ঠিক সেই সময়েই এদের নৌকোটা গেল চড়ায় বেধে। তবে এরা মরীয়া হয়ে লড়ছে বলেই বোধ হয় হিন্দুস্থানীরা সুবিধা করতে পারল না। কামান যে ছুঁড়বে সে-ই মরে গেল। কোনমতে ওদিকটা সামলে টানাটানি করে নৌকো ভাসানো হল তো দেখা গেল কানপুর থেকে এক নৌকো সিপাহী এসে পড়েছে। তবে পলাতকদের ভাগ্যক্রমে সে নৌকোও চড়ায় বেধে গেল।

সন্ধ্যার মুখে ভাইবার্টদের নৌকো আর এক চড়ায় লেগেছিল, কিন্তু সে যাত্রায় বাঁচিয়ে দিল ঝড়। ঝড়ের দমকা বাতাসে নৌকো আবার আপনা থেকেই জলে ভাসল।

আরও একটি রাত কাটল।

কিন্তু প্রভাতের আলোয় আশা জাগল না হতভাগ্যদের প্রাণে—সে জায়গায় দেখা দিল আরও হতাশা।

অন্ধকারে পথ ভুল করে মূল নদী ছেড়ে পাশের একটা খাঁড়িতে ঢুকে পড়েছে তারা—এখানে নৌকো চালানোর চেষ্টা করাও বুঝি বাতুলতা।...

পিছু হটবার বা অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করার আগেই শত্রুরা এসে পড়ল। তখন নৌকো ছেড়ে সকলে নীচে নামল। মরতে হয় তো লড়াই করেই মরবে। আত্মরক্ষার উন্মত্ত প্রচেষ্টায় সেই জন-বারো ইংরেজের বাহুতে সহস্র সৈনিকের শক্তি জাগল। সে প্রচণ্ড বিক্রমের কাছে দাঁড়াতে পারল না সিপাহী ও পল্লীবাসীর মিলিত দল। অবশেষে এক সময় প্রাণ নিয়ে পালাল তারা।

দুশমন তো গেল, সেই সঙ্গে নৌকোটিও যে অন্তর্হিত!

নৌকোয় লোকও ছিল কেউ কেউ। সম্ভবত তাদেরও নিয়ে গেছে কানপুরের দল—নৌকোর সঙ্গে সঙ্গে।

শ্রান্ত ও ক্লান্ত ইংরেজদের ক্ষুদ্র দলটি গত্যন্তর না পেয়ে নদীতীরের এক মন্দিরে আশ্রয় নিল। দু দিনের অনাহার, অনিদ্রা ও পরিশ্রম খিদেয় পেটে মোচড় দিচ্ছে, তৃষ্ণায় বুক পর্যন্ত গেছে শুকিয়ে। মন্দিরে না আছে খাদ্য—না আছে জল। তার ওপর গোটা মন্দিরটাই এক সময় বেড়া-আগুনে পুড়িয়ে দেবার সংকল্প টের পাওয়া গেল। অবশেষে হতভাগ্যের দল আবার নদীতেই ঝাঁপিয়ে পড়ল। ক্ষুধার অন্ন না থাক, জাহ্নবীর জলে তৃষ্ণা তো মিটবে। আর, এখনও হয়তো সামান্য শক্তি অবশিষ্ট আছে—সাঁতার কেটে কোথাও একটা যাওয়া চলতে পারে, পরে হয়তো সে উপায়ও থাকবে না।

তখন সংখ্যা দাঁড়িয়েছে মাত্র সাতে।

সাঁতার কাটতে কাটতে গুলি খেয়ে তার মধ্যে দু জন মারা গেল। এক জন আর সাঁতার দিতে না পেরে অবসন্নভাবে একটা চড়ায় এসে ওঠবার চেষ্টা করল, কিন্তু ভাল করে জল থেকে ওঠবার আগেই এক লাঠি এসে মাথায় পড়ল। অব্যর্থ আঘাত—ফলে সব ঝঞ্ঝাট চুকে গেল। বেচারীর আর প্রাণ রাখতে এই প্রাণান্তকর চেষ্টায় প্রয়োজন রইল না।

বাকি চার জন তখনও সাঁতার কাটছে। তবে আর যে বেশিক্ষণ পারবে না—তা তারাও জানে।

কিন্তু এবার বোধ হয় ভগবান মুখ তুলে চাইলেন—সম্ভবত ক্লান্ত হয়েই পেছনের দল পিছিয়ে গেল। অথবা মাত্র চার জনের জন্য মজুরি পোষায় না বলেই ছেড়ে দিল।

অনেকক্ষণ পর্যন্ত পাশে বা পেছনে শস্ত্রধারীর দল না দেখে এই চার জন এবার বিশ্রামের চেষ্টা দেখল। একেবারে তীরে আসতে তখনও ভরসা নেই।

যতটা সম্ভব নিঃশব্দে পাড়ের দিকে এসে প্রায় কোমরজলে গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে বসল। অর্থাৎ তেমন সম্ভাবনা দেখলে আবারও নদীতে ভাসা চলবে।

তখন অনাহার-অনিদ্রায় তৃতীয় দিনও প্রায় শেষ হতে চলেছে। ২৭শে জুনের সূর্য পূর্বাকাশে থাকতেই তারা নৌকোয় চড়েছিল, এখন ২৯শে জুনের সূর্য অপরাহ্ণে ঢলে পড়ছেন।

॥ ৫৫ ॥

এই পর্যন্ত গেল ইতিহাসের কথা। এবার কাহিনীতে ফিরে আসা যাক।…

মোহ যত বড়ই হোক, এক সময় তা কেটে যায়।

অকস্মাৎ দূরে—এই প্রাসাদের মধ্যেই কোথায় কোন্ শিশুর কান্না কানে যেতে, নানাসাহেবের মোহভঙ্গ ঘটল। তিনি যেন চমকে জেগে উঠলেন।

'কিন্তু মেয়েরা—?'

বিমূঢ় মুখে হুসেনীর দিকে চেয়ে আবারও প্রশ্ন করেন নানাসাহেব, 'মেয়েছেলে আর শিশুগুলোকে অন্তত বাঁচাও হুসেনী। আমাকে একেবারে চরম নরকে ডুবিও না। আমি বরং এখনই এক বার ঘাটে যাই… এই পোশাকেই যাব?…না-না, আমার পোশাকটা কাউকে আনতে বল—'

ছেলেমানুষের মত অসংলগ্ন কথা বলতে থাকেন নানা ধুন্দুপন্থ পেশোয়া।

আমিনাও যেন ব্যস্ত হয়ে ওঠে। কণ্ঠে যথেষ্ট ব্যাকুলতা এনে বলে, 'দোহাই আপনার পেশোয়া, আপনি উঠবেন না। আমিই দেখছি। আপনি অসুস্থ… একটুখানি অন্তত বিশ্রাম নিন। পারেন তো একটু দুধ খান।…আপনি কিসের জন্যে ছুটোছুটি করবেন—আপনি রাজা, মালিক, আপনার ইচ্ছের ওপর কার কথা? পণ্ডিতজী তো গেছেনই। তা ছাড়া না হয়, আজিমুল্লাকে ডেকে এখনই আপনার আদেশ জানিয়ে দিচ্ছি আমি, তার জন্য আপনি ছুটে যাবেন কেন?'

'তুমি কথা দিচ্ছ হুসেনী?'

'কথা দিচ্ছি পেশোয়া।'

হুসেনী সত্যিই ছুটে বার হয়ে গেল।

কিন্তু অন্দরের শেষপ্রান্তে এসে পৌঁছতেই প্রথম যার সঙ্গে তার দেখা হ'ল সে আজিমুল্লা।

তাঁর ললাটে দুশ্চিন্তার রেখা—চোখের দৃষ্টিতে ক্লান্তি।

'কী খবর আজিমুল্লা?'

উদ্বেগে ও ব্যাকুলতায় আজিমুল্লাকে সম্ভ্রমসূচক সম্বোধন করার কথাটা তার মনে পড়ে না।

'খবর কি বলব ভেবে পাচ্ছি না। তোমার আদেশ পুরো তামিল করা সম্ভব হবে বলে মনে হচ্ছে না বেগমসাহেবা। সিপাহীরা মেয়েদের উপর গুলি চালাতে রাজী হচ্ছে না। বলছে যে কসাইরাও পাঁঠা কাটতে চায় না—আমরা তো সিপাই। মেয়েছেলে আর বাচ্চাদের ওপর গুলি চালাতে আমরা হাতিয়ার ধরি নি।'

'হুঁ'...যাক্, আপাতত ওরা বাঁচুক। এদিকে নানাসাহেবও একেবারে ক্ষেপে উঠেছে—মেয়েছেলে আর ছেলেমেয়েগুলোকে অন্তত বাঁচাতে হবে। বুড়ী মেয়েদের মতই কাঁপছে সে। এতক্ষণে হয়তো কেঁদেও ফেলেছে। এ যাত্রা থাক্, তার পর আমি আছি। দরকার হয় এ হাতেও বন্দুক কিংবা তলোয়ার ধরতে পারব।'

'কোথায় রাখা যায় ওদের? আপাতত প্রাসাদেই আনতে বলেছি। এখানে থাকবে, না বিঠুরে পাঠিয়ে দেব?'

'উঁহু, উঁহু, বেকুবি ক'র না আজিমুল্লা। রাক্ষসীর জাত ওরা—ওদের কাছে রাখতে দেওয়া চলবে না। ..প্রাসাদে তাত্যা আছে, স্বয়ং নানা আছেন, ওঁদের নরম শরীর, দয়া উথলে উঠবে একেবারে। আর বিঠুরে আছেন বাজীরাও-এর বিধবারা—তাঁরা আমাদের কুকুর-বেড়ালের মত ঘৃণা করেন।'

'কিন্তু তাঁরা তো প্রায় বন্দী।'

'হ্যাঁ বন্দী, কিন্তু প্রাসাদেই বন্দী। প্রাসাদের রক্ষীদের কাছে এখনও তাঁরাই বাঈসাহেবা।...না, না—অন্য কোথাও রাখতে হবে।'

'কোথায় রাখব বলে দাও বেগমসাহেবা, আর সময় নেই।' ঈষৎ অসহিষ্ণু কণ্ঠেই প্রশ্ন করেন আজিমুল্লা। সম্ভবত এই দানবীয় রক্তপিপাসা তাঁর কাছেও অসহনীয় হয়ে উঠেছে।

'আরও তো কিছু মেমকে আটক করে রাখা হয়েছে খাঁ সাহেব, তারা কোথায় আছে?'

'তারা? ওখানে একটা ছোট্ট ব্যারাক মত আছে, উঁচু দেওয়াল ঘেরা, কার বাড়ি তা জানি না, সেইটাই খালি করে নেওয়া হয়েছে। বিবিরা আছে বলে সিপাইরা নাম দিয়েছে বিবিঘর।'

'ঠিক আছে, সেইখানেই ওদের নিয়ে গিয়ে তোল।'

আজিমুল্লা সঙ্গে সঙ্গেই চলে যেতে উদ্যত হলেন।

পেছন থেকে আমিনা তাঁর একটা হাত ধরল।

'দাঁড়াও। হুইলারের কী হয়েছে জান?'

'ঠিক বলতে পারব না। একজন বললে যে, সিপাইরা তাকে কেটে ফেলেছে, নৌকোয় ওঠবার আগেই।...আরও তিন চার জনকে জিজ্ঞাসা করেছি, তারা কিন্তু সকলেই বলেছে যে হুইলারকে তারা নৌকোয় উঠতে দেখেছে। তার পরের খবর অবশ্য কেউই বলতে পারে না।'

'সে যাক্ গে, তার খবরের জন্যে আমি খুব উদ্বিগ্নও নই। বরং সে বেঁচে থেকে তার নির্বুদ্ধিতার ফলাফল দেখে গেলেই আমি খুশী হই।...আমার প্রয়োজন তাঁর মেয়েকে। তার মেয়েকে ওদের সঙ্গে রাখা চলবে না তাকে আমার চাই। সাবধানে কড়া পাহারায় তাকে এখানে নিয়ে আসবে। পেছনে বাগানের দোর দিয়ে সোজা নিয়ে যাবে আমার ঘরে।' আমি তার জন্য অপেক্ষা করব।...মুসম্মৎ থাকবে অন্দরমহলের পথে, কোন অসুবিধা হবে না। নিজে না আসতে পার, কোন বিশ্বাসী লোক দিয়ে পাঠাবে। যাও!'

অত ব্যস্ততার মধ্যেও কৌতূহল অসংবরণীয় হয়ে ওঠে। ভ্রূ কুঞ্চিত করে আজিমুল্লা প্রশ্ন করেন, 'তাকে তোমার এত কি দরকার পড়ল বেগমসাহেবা? যদি—যদি তার কোন পাত্তা পাওয়া না যায়? কিংবা এর মধ্যেই ছুটকো গুলিতে যদি মরে গিয়ে থাকে?'

'না, না, তাকে আমার চাই-ই।...যদি মরে গিয়ে থাকে, মৃতদেহটাও নিয়ে আসবে। মৃত বলে শোধ তুলতে আমি ছাড়ব না। খুঁজে বার করতেই হবে। যদি পালিয়ে গিয়ে থাকে তো বুঝব, তুমি—তোমরা একেবারে অপদার্থ। সিপাই লাগিয়ে গোয়েন্দা লাগিয়ে যেমন করে হোক খুঁজে ধরে নিয়ে আসবে। উল্লাস সিংকে বলবে তার যেখানে যত পুলিশ আছে সব লাগাতে, নইলে তাকেই নিজের হাতে টুকরো টুকরো করে ফেলব আমি।...যাও, হুইলারের বেটীকে আমার চাই-ই। তাকে আনতে না পারলে তুমিও মুখ দেখিও না!'

কৌতূহল কিছুমাত্র মিটল না, বরং বেড়েই গেল। তবু আর প্রশ্ন করতে

সাহস হল না আজিমুল্লার। সেই মুহূর্তে ক্রোধে, ক্ষোভে, জিঘাংসায় আমিনার মুখখানা বোধ করি সত্যকার দানবীর মতই পৈশাচিক হয়ে উঠেছিল। ভয় হল বুঝি এখনই তার ওপরই ঝাঁপিয়ে পড়ে নখে-দন্তে ক্ষত-বিক্ষত করে তুলবে। তিনি সভয়ে বেশ একটু দ্রুতপদেই বেরিয়ে গেলেন।

হোক দানবী, তবু লোভনীয় বৈকি!

বাসনার নিবৃত্তি হয় নি যে এখনও।

বহুক্ষণ অপেক্ষা করতে হল আমিনাকে।

দ্বিপ্রহর অপরাহ্নে এসে পৌঁছল—তবু আজিমুল্লার পাত্তা নেই। শারীরিক ক্লান্তি আমিনারও বড় কম নয়, কিন্তু বিশ্রামের কথা তার মনে পড়ল না। আহারের তো কথাই ওঠে না—মুসম্মৎ জোর করে বার-দুই শরবত খাইয়েছে, নিতান্ত অসহ্য গরমে মুহুর্মুহু পিপাসা পায় বলেই সেটুকু প্রত্যাখ্যান করতে পারে নি। তবে শুধুই সেইটুকুই—অর্থাৎ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যেটুকু হয়। আজিমুল্লাকে বিদায় দিয়ে এক বার মাত্র সে নানাসাহেবের ঘরে গিয়েছিল সংবাদটা দিতে যে, সে কথার ঠিক রেখেছে, পেশোয়ার আদেশ সে আজিমুল্লাকে জানিয়ে দিয়েছে। তার পরই নিজের ঘরে ফিরে এসেছে সে। এসেই স্নান করে নিয়েছে—বোধ করি দৈহিক অশুচিতার সঙ্গে মানসিক গ্লানিও ধৌত করবার অক্লান্ত আগ্রহে ও আকুলতায়। তার পরই শুরু হয়েছে এই অধীর প্রতীক্ষা—পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহীর মতই অবিরাম পদচারণা। খবরও এখন আর কিছু নেই—পাবার উপায়ও নেই।

তবে বাইরের উত্তেজনা কিছুটা স্তিমিত হয়ে এসেছে। সেটা এখান থেকেই বোঝা যায়। প্রভাতের সে উন্মত্ত কোলাহল অনেক কমে এসেছে—হয়তো বা দৈহিক ক্লান্তিতেই, কিংবা ঘটনাটার নতুনত্ব ফুরিয়ে গেছে বলেই। মনে হয় শহরের জীবনযাত্রা আবার প্রাত্যহিক খাতে বইতে শুরু করেছে। এধারে দ্বিপ্রহরের শেষ দিকেই তাত্যা টোপী, উল্লাস সিং, নান্হে নবাব, বালা সাহেব সকলে মিলে দরবার গৃহের দরজা বন্ধ করে নানার সঙ্গে মন্ত্রণায় বসেছেন। এখনও সে দরজা খোলেন নি বা কেউ বাইরেও আসেন নি। বরং আরও দুজন পরে এসে সে মন্ত্রণায় যোগ দিয়েছে—টীকা সিং ও দুলগুঞ্জন সিং। সম্ভবত নানাই ডেকে পাঠিয়েছিলেন।

এর ভেতর আমিনার খবর কেউ নেয় নি। মন্ত্রণাগৃহে আজ তার ডাক

পড়বে না তা জানা কথাই। সেখানকার আলোচনাটা কোন্ খাতে বইছে তা সে অনায়াসেই অনুমান করতে পারে। তার বিরুদ্ধেই অধিকাংশ রসনা বিষোদ্গারে ব্যস্ত। কথাটা মনে পড়তেই অবজ্ঞায় আমিনার সুরবাঞ্ছিত ওষ্ঠ দুটি বারেক কুঞ্চিত ও বিকৃত হয়ে উঠল। ভেড়ার দল সব। ওদের বিষই বা কতটুকু যে তাকে ভয় করতে হবে। বেচারা নানা। অন্তরের অপরিসীম ঘৃণা পাত্র উপচে উঠলেও সহজাত মমতায় কথাটা মনে না পড়ে পারল না—সকাল থেকে বেচারীর কিছু খাওয়া হয় নি। এমন কি বোধ হয় দুধটুকুও না। রাজা হবার শখ হয়েছিল, কিন্তু তার কোন স্বাভাবিক যোগ্যতা তো নে-ই, কোন শিক্ষাও পায় নি। সামান্য মাত্র আঘাতেই অস্থির হয়ে পড়েছে।

কিন্তু আজিমুল্লা কৈ?

সত্যিই কি সে শয়তানের বাচ্চা মেয়েটা হাতের মধ্যে থেকে পালিয়ে গেল নাকি?

কথাটা মনে পড়া মাত্রই অসহ ক্রোধে ও রুদ্ধ বিদ্বেষে মুখ আরক্ত হয়ে উঠতে লাগল আমিনার। ললাটের দু পাশের শিরাগুলো ফুলে ফুলে উঠতে লাগল। হাত দুটো নিরুপায় আক্রোশে শুধু মুষ্টিবদ্ধ করতে করতে নখগুলো করতলের নরম মাংসে কেটে বসল।

বারকয়েক পর পর—অকারণ জেনেও, মুসম্মৎকে বাইরে পাঠাল। তাতেও নিশ্চিন্ত হতে না পেরে দু-তিনটি সিপাহীকে প্রচুর বকশিশের লোভ দেখিয়ে পাঠাল মেয়েটার খোঁজে। কিন্তু শুধু অকারণ ছুটোছুটি করলেই তো খবর মেলে না। মুসম্মৎ আর ফিরলই না। অবশেষে ধৈর্য শেষ সীমায় উপস্থিত হতে যখন আর বেশী দেরি নেই, তখন সহসা আজিমুল্লাই এসে হাজির হলেন সঙ্গে রক্ষী-বেষ্টিতা এক তরুণী ইংরেজ-দুহিতা। আলি খাঁ নামে এক তরুণ সিপাহী নাকি ওকে নিয়ে পালিয়েছিল, অতি কষ্টে খুঁজে বার করে এনেছেন

আতঙ্কে, অনশনে, কদিনের অনিয়মে—সর্বোপরি ধুলোয়-রৌদ্রে-পরিশ্রমে পূর্বের চেহারার সাদৃশ্য মিলিয়ে পাওয়া শক্ত. তবু আমিনা ভাল করে চেয়েই চিনতে পারল—হুইলারের দুহিতাই বটে, কোন ভুল নেই।

যে অবস্থা দেখলে স্বাভাবিক যে-কোন মানুষের চোখে জল আসবার কথা, সেই দৃশ্যই আমিনার দৃষ্টিকে উজ্জ্বল করে তুলল। এতক্ষণে যেন সে কিছুটা তৃপ্ত হয়েছে, তার এতদিনের আয়োজন সার্থক হতে চলেছে!

রক্ষীদের বাইরে অপেক্ষা করতে বলে আমিনা একেবারে তার সামনে এসে দাঁড়াল। দেখল মেয়েটি টলছে। ইঙ্গিতে একটা চৌকি দেখিয়ে দিয়ে ইংরেজিতে বলল, 'ব'স!'

তার পর কিছু পূর্বে তারই জন্য মুসম্মত যে শরবৎ রেখে গেছে, শরবতের পাত্রটা এনে তার সামনে ধরে বলল, 'খাও!'

মেয়েটি এক মুহূর্ত ইতস্তত করল—হয়তো বা শত্রুর দেওয়া পানীয়ে মৃত্যু লুক্কায়িত আছে কিনা সেই কথাটাই ভেবে নিল, কিন্তু এখন আর প্রত্যাখ্যান করার মত অবস্থাও নয় তার। হোক বিষ—পানীয় তো। শারীরিক শক্তি তার এমনিতেই নিঃশেষ হতে বসেছে। সে সাগ্রহে হাত বাড়িয়ে শরবতটা নিয়ে এক নিঃশ্বাসে শেষ করল। পাত্রটি ধরে থাকার সামর্থ্যও আর বুঝি নেই। হাতটা থরথর করে কাঁপছে দেখে আমিনা তাড়াতাড়ি শূন্য পাত্রটা নিজেই নিয়ে নামিয়ে রাখল।

আবার গলাটা একটু নামিয়ে বলল, 'শোন, তোমাকে এখানে কেন এনেছি জান? তোমার প্রাণ রক্ষা করতে!'

মেয়েটি কী বলতে গেল, বলতে পারল না। ঠোঁট দুটি বৃথা কাঁপল মাত্র। আমিনা অসহিষ্ণুভাবে তাকে নিবৃত্ত করে বলল, 'জানি বলবে যে সবাই যখন গেল, আমারই বা বাঁচবার দরকার কি?...কিন্তু সবাই গেলেও মানুষ বাঁচতে চায়। জীবন বড় প্রিয়। ঐ যাদের বিবিঘরে পাঠানো হল, তাদের কেউ বাঁচবে না। মহামান্য পেশোয়া তাঁর বহু অপমান, বহু প্রবঞ্চনার কথা ভোলেন নি—শোধ তিনি তুলবেনই। কিন্তু তোমার বাবাকে আমি জানি, তার মত প্রবীণ বীরের যদি সামান্য উপকারও করতে পারি—সে-ই আমার চেষ্টা। তা ছাড়া তিনি আমাদের বিশ্বাস করেছিলেন—বিশ্বাস করে ঠকেছিলেন। তাঁর কাছে আমাদেব লজ্জার ঋণ আছে। সেই কারণেই তোমাকে বাঁচাতে চাই। কিন্তু এখন বর্তমান অবস্থায় কোন ইংরেজ-রমণীর এদেশে প্রাণ বাঁচানো শক্ত এটা তুমি বুঝতে পার অবশ্যই। সব সময় তোমাকে পাহারা দিয়ে রাখাও সম্ভব নয়। আর তা রাখলেও, উন্মত্ত জনতার জিঘাংসার সামনে কটা রক্ষীর কী সাধ্য! তাই স্থির করেছি, তোমাকে আমার বোনের বাড়িতে পাঠিয়ে দেব।'

এক মুহূর্ত থামল আমিনা, বোধ করি প্রস্তাবটা করতে তখনও সংকোচে বাধছিল। তার পর বিস্মিত আজিমুল্লার বিস্ফারিত চোখের দিকে সম্পূর্ণ

পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে বলল, 'কিন্তু একটা কথা—সেটা, মানে সে পাড়াটাই কসবীদের মহল্লা। আমার বোনও তাই ছিল তা তুমি জান নিশ্চয়।...সেখানে সেইভাবেই থাকতে হবে।'

মেয়েটির প্রথমটা বুঝতে দেরি হল, তার পরই শিউরে উঠে বলল, 'না-না—না—সে আমি পারব না!'

'পারতেই হবে বোন। নইলে বাঁচবার উপায় নেই। সে মহল্লা—আব শুধু সে মহল্লা কেন, অন্য কোথাও তুমি বাঁচতে পারবে এমনি? তা ছাড়া মৃত্যুতেই কি তুমি ইজ্জতটা বাঁচাতে পারবে শেষ পর্যন্ত? হযতো দুটোই যাবে। তাব চেয়ে একটাই থাক। আর চাই কি, কোন মুসলমান রইসের নজবে পড়ে গেলে তার ঘবণী হয়ে সম্ভ্রান্তভাবেই জীবনটা শেষ করতে পাববে। আমাদের ধর্মে সে উদারতা আছে। যাও ভাই—আব ইতস্তত কবে সব নষ্ট ক'র না।'

আদেশ মত রক্ষীরা এসে আবার তাকে বেষ্টন করল। নীচে ঘেবাটোপ দেওয়া পালকি আছে, তাইতে করে নিয়ে যেতে হবে, নইলে বাঁচানো কঠিন। মেয়েটিকে শুনিয়েই আমিনা নির্দেশ দিল।

কী শুনল আব কী শুনল না মেয়েটি, কে জানে—যেমন এসেছিল, আচ্ছন্ন অভিভূতের মত রক্ষীদেব সঙ্গে তেমনিই বের হয়ে গেল—অজ্ঞাত, অন্ধকাব ভবিষ্যতের দিকে।...

ওদের পদধ্বনি মিলিয়ে যেতেই আজিমুল্লা ক্ষুব্ধভাবে বললেন, 'কিন্তু এতটা বাড়াবাড়ির কি সত্যই দবকার ছিল বেগমসাহেবা?'

'সব প্রয়োজন সবাইকে বোঝানো যায় না খাঁ সাহেব। যে জ্বালা এ বুকে জ্বলছে তা সহজে নিভবে না, এ তৃষ্ণা মিটবে না সহজে। তবে এক জনকেই বেছে নিয়েছি মাত্র—এদের মধ্যে যে সব চেয়ে সম্ভ্রান্ত তাকেই। বাকিদের সম্বন্ধে নিশ্চিত থাক আজিমুল্লা খাঁ—তারা মরবে, কিন্তু ইজ্জত নিয়েই মরবে। যাও, কাজে যাও। আমার বড্ড ঘুম পেয়েছে আজ, অনেক দিনেব অনেক ঘুম বাকি আছে।'

কাল্‌কাপ্রসাদজী ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটেছেন। তাঁর বিপদ অনেক। ভিড় এড়াতে হবে, নইলে কে কোথায় চিনে ফেলবে তার ঠিক নেই। অথচ ভিড়ের মধ্যে না গেলে ঠিক জলের মধ্যে কী ঘটছে তাই বা দেখা যায় কেমন করে? কোনমতে অস্ত্রধারীদের পাশ কাটিয়ে ঝোপঝাড়ের আড়াল থেকে যতটুকু দেখা যায়, আর দৈবাৎ কোন সম্পূর্ণ অপরিচিত মুখের ভিড় পেলে সন্তর্পণে পুরো তামাশাটার বিবরণ জিজ্ঞাসা করা—এতেই যতটা হয়। কখন্ কোন পরিচিত লোকের সামনে পড়ে যাবেন, সে তখনই হয়তো চেঁচিয়ে উঠবে—'এই লোকটা সাহেবদের নৌকর, দাও ওকেও সাবাড় করে'—আর সঙ্গে সঙ্গে কাছেই যে শস্ত্রধারী আছে সে অমনি দফা নিকেশ করে দেবে এক গুলিতে।

না, বেঁচে থাকলে ঢের পয়সা রোজগার হবে। পৈতৃক প্রাণটা বেঘোরে খুইয়ে লাভ নেই।

কিন্তু মনে মনে যতই এবংবিধ শুভ সংকল্প করুন, শেষ পর্যন্ত ঘাট ছেড়ে যেতেও পারলেন না। কে যেন চৌম্বক আকর্ষণে তাঁকে ধরে রাখল।

অবশ্য থেকেও যে বিশেষ অসুবিধা হল তা নয়, নানকচাঁদের উপদেশ কোন কাজেই লাগল না। চোখের সামনেই গণ্ডায় গণ্ডায় সাহেব মরল নৌকোয় আগুন লাগল, মেমসাহেব ও বাচ্ছা যারা মরতে পারল মরে বাঁচল, যারা পারল না তারা খোঁয়াড়ে আবদ্ধ পশুর মত জড়ো হয়ে কাঁপতে লাগল।

এক্ষেত্রে নিরুপায় নিস্পৃহ দর্শক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া উপায় নেই। সিপাহীদের মনোভাব তো দেখাই যাচ্ছে—দর্শকদের মনোভাবও অনিশ্চিত। কেউ কেউ স্পষ্টই উল্লাস প্রকাশ করছে, তবে সে সংখ্যায় খুব বেশী নয়। অধিকাংশই শুধু দেখে যাচ্ছে। তাদের ঠিক মনের ভাব কী তা কে বলবে? সহানুভূতি আছে কি না বুঝতে যাওয়া তো বিপদ। শেষে যদি হিতে বিপরীত হয়? দু-এক জায়গায় উল্টো কথা পেড়ে দেখতে গেলেন, তাতে ফল হল না: কারণ ওঁর মতলব বুঝতে না পেরে তারা সন্দিগ্ধভাবে মৌনী হয়ে রইল। রাষ্ট্র-বিপ্লবের দিনে সকলেই সাবধানে থাকতে চায়।

অবশেষে অনেক সুলুক সন্ধানের পর মন্দিরের পেছনের পাঁচিল থেকে

নজরে পড়ল, দুটি নৌকো কতকগুলো সাহেব নিয়ে মাঝগঙ্গায় ভেসে চলেছে, আর তাদের পেছনে সিপাহীদের নৌকো থেকে এবং পাড় থেকেও অসংখ্য অগ্নিবৃষ্টি হচ্ছে। খানিকক্ষণ—রুদ্ধনিশ্বাসে ব্যাপারটা দাঁড়িয়ে দেখলেন কালকাপ্রসাদ। গুলি ও গোলায় সাহেবরা দু-এক জন করে মরতে লাগল বটে, কিন্তু নৌকো দুটি থামল না—অপটু হাতের দাঁড় ও স্রোতের ওপর নির্ভর করে ভেসেই চলল।

কালকাপ্রসাদ আর দাঁড়ালেন না, ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে শুরু করলেন। অনেকেই ছুটছে, তাদের সঙ্গে ছোটা এমন কোন সন্দেহজনক ব্যাপার নয়। ক্রমে যখন সেই 'অনেকে' ক্লান্ত হয়ে ছোটা বন্ধ করল, তখন আর সন্দেহের ভয়ও রইল না। কালকাপ্রসাদ নিশ্চিন্ত হয়ে ছুটতে লাগলেন। কিন্তু কতক্ষণই বা ছুটবেন, ঈশ্বরেচ্ছায় (সাহেবদের অনুগ্রহেও বটে) প্রচুর 'দুধ-দধি-মালাই' খেয়ে দেহটা কিঞ্চিত ভারীই হয়েছে। মনের অদম্য আগ্রহ কতক্ষণ আর সে দেহ ছুটিয়ে নিতে পারে ? পা দুটি ক্রমশ পাথরের মত হয়ে উঠল, হাপরের মত শব্দ করে নিশ্বাস পড়তে লাগল। তাও যেন পড়তে চায় না। বুকটা ফেটে যাবার মত হল। অবশেষে এক সময় বসেই পড়লেন।

তা ছাড়াও বিপদ আছে। সব জায়গায় নদীর পাড় অধিগম্য নয়। কাঁটাঝোপ জঙ্গল-বস্তি এসব ঘুরে যেতে যেতে নৌকো দৃষ্টির বাইরে চলে যায়। তা ছাড়া স্থানে স্থানে স্থানীয় উৎসাহী লোকদের হল্লা তো আছেই। এক জায়গায় তো দেখা গেল রীতিমত কামান-বন্দুকের আয়োজন। সেখানে দর্শক হিসেবেও কাছে যেতে ভরসা হয় না।

হাল ছেড়ে দেওয়াই উচিত, কিন্তু কালকাপ্রসাদ তবু হাল ছাড়তে পারলেন না। নানকচাঁদের সেই বিদ্রূপকুটিল দৃষ্টি এবং হিস-হিস কণ্ঠস্বর যেন দৈববাণীর মতই প্রাণে লেগেছে।

অবশেষে অনেক ভেবে চিন্তে এক উপায় ঠাওর করলেন। পাশের একটা গ্রামে ঢুকে অনেক খোঁজাখুঁজির পর এক এক্কাওয়ালাকে বার করলেন এবং তাকে অনেক বুঝিয়ে দৈনিক এক টাকা হিসেবে ভাড়া কবুল করে নগদ দশটি টাকা জমা রেখে তারই সেই ক্ষীণকায় অশ্বতরটিতে সওয়ার হয়ে বসলেন। দড়ির রাশ—তা হোক, খচ্চর-পুঙ্গবের আর এমন শক্তি অবশিষ্ট নেই যে বেশী গোলমাল করবে। সেই গ্রাম থেকেই খানিকটা দুধ খেয়ে নিয়ে গামছার প্রান্তে খানিকটা 'মাওয়া' বা খোয়াক্ষীর সংগ্রহ করে আবার রওনা দিলেন।

কিন্তু আর একটু পরেই অন্ধকার হয়ে এল। এদিকে কোথায় বা নৌকো আর কোথায় বা সাহেব! এখন রাতটা কোথাও কাটানো দরকার—সকালে তখন না হয় খোঁজা যাবে। আশ্রয় মেলা কঠিন কথা নয়। তবে হঠাৎ কোন অপরিচিত জায়গায় আশ্রয় নিতেও ভরসা হয় না। সঙ্গে কিঞ্চিৎ টাকাও আছে, খুব বেশি নয় অবশ্য, তবু এই সব হাঙ্গামার দিনে টাকার লোভ বেড়েই যায় মানুষের। তা ছাড়া প্রাণটা থাকতে টাকার অঙ্ক জানার উপায় নেই। আশায় ও লোভেই জানটা কেড়ে নেবে হয়তো। সুতরাং কোথাও যাওয়ার কথা ভেবে পেলেন না। নদীর ধারে জঙ্গলে থাকতেও ভরসা হল না—সেখানে ছোট-খাটো এক-আধটা বাঘ থাকা বিচিত্র নয়। অবশেষে ঘোড়াটাকে একটা ঝোপের পাশে বেঁধে নিজে অতি কষ্টে একটা গাছে চড়ে বসলেন। দুর্দান্ত মশা, স্থির হয়ে বসা যায় না, অথচ বেশী সাড়া-শব্দ করতেও ভরসা হয় না, কেউ কোথা থেকে এসে দেখলে চোর-ডাকাত ভেবে মেরে ফেলতে পারে। শেষে পাগড়ি খুলে আপাদমস্তক মুড়ি দিলেন।

যা হোক কোনমতে রাতটা কাটল। ঢুলতে ঢুলতে দু-এক বার পড়ে যাবার উপক্রম হয়েছিল, নইলে আর কোন বিপদ ঘটে নি।

জনবিরল নদীতীরে 'ওঁযাদের' ভয় যে কিছু ছিল না এমন নয়, তবে গাছের ডালে সাদা কাপড় মুড়ি দিয়ে তিনিও সেই 'ওয়াদের' দলেই মিশে গেছেন—মনে মনে এই একটা ক্ষীণ সান্ত্বনা ছিল।

রাত্রি প্রভাত হলে আবার সেই কষ্টকর যাত্রা।

নৌকো ততক্ষণ বহুদূর চলে গেছে। একেবারে দ্বিপ্রহর পার হয়ে আবার হদিস মিলল, কিন্তু তখনও পেছনের লোক হাল ছাড়ে নি, কাল্‌কাপ্রসাদ দূর থেকে সেই নীরব দর্শক হয়েই রইলেন।

সেদিনও যথাসময়ে সন্ধ্যা হল। কিন্তু সেদিন আর কাল্‌কাপ্রসাদ আশ্রয়ের জন্য ব্যস্ত হলেন না। ঘোড়াটা একেই ক্ষীণজীবী, তাতে সারা দিনের পরিশ্রমে ক্লান্ত। সেটাকে এক এক্কাওয়ালার কাছে গছিয়ে খরচ বাবদ দুটি টাকা দিয়ে তার ঘোড়াটিকে সংগ্রহ করলেন। (করে কি লাভ হবে তার ঠিক নেই, মাঝখান থেকে এতগুলি কষ্টার্জিত অর্থ খতম!) এটাও তেমন জোরালো নয়, তবে সারাদিনে পরিশ্রম বিশেষ হয় নি, অনেকটা তাজা আছে—তেমনি তেজী হলে অবশ্য তাঁরও সামলানো ভার হত—কাল্‌কাপ্রসাদ সীতারাম ও মহাবীর স্মরণ করে ওতেই সওয়ার হলেন এবং এদিকের একটা সহজ পথ ধরে রাত্রি

দ্বিতীয় প্রহরের মধ্যেই মুরার-মাউ গ্রামে তাঁর বন্ধু জমিদার দিগ্বিজয় সিং-এর বাড়ি উপস্থিত হলেন।

রাস্তাটা সোজা এসেছে, নদী গেছে মস্ত বড় বাঁক বেড়ে অনেকটা দূর ঘুরে। ওরা যত তাড়াতাড়িই আসুক, কাল সকালের আগে পৌঁছতে পারবে না।

দিগ্বিজয় সিং কাল্‌কাপ্রসাদকে দেখে যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হলেন। তবে আদর-যত্নের ত্রুটি হল না। তাঁব ইংরেজ-বিদ্বেষ এত ভয়ঙ্কর নয় যে, শুদ্ধমাত্র ইংরেজের নৌকর এই অপরাধে বন্ধুকে যত্ন করবেন না। সত্যি কথা বলতে কি, দিগ্বিজয় সিং ঠিক ইংরেজবাজের অবসানটাও চাইছিলেন না, কারণ ওদের অনুগ্রহেই তাঁব পিতামহ তালুকদার হয়ে বসেছিলেন। কে অযোধ্যার নবাব গেল, আর কোথাকার পেশোয়া মরল, তার জন্য তাঁর মাথাব্যথা নেই। বরং বাহাদুর শা বাদশা হলে আবার তাঁকে পুরোপুরি অরাজকতার জন্য প্রস্তুত হতে হবে, পুরো এক দল লেঠেল পুষতে হবে—সেই ভাবনাটাই ছিল।

সুতরাং তিনি আন্তরিকভাবেই বন্ধুকে আলিঙ্গন করলেন। গুড়ের শরবত এল, 'মহারাজিন' বা পাচিকাকে ডেকে পুরীর ফরমাশ হল, একটি ভৃত্য গ্রামে ছুটল কোন গোয়ালার বাড়ি কিছু মালাই আছে কিনা খোঁজ করতে।

আতিথেয়তার পালা চুকলে দিগ্বিজয় প্রথম প্রশ্ন করলেন, 'তাব পব কাল্‌কাপ্রসাদ, হঠাৎ এত রাত্রে কী মনে করে বল দিকি? শুধুই বন্ধুপ্রীতি তা তো মনে হয় না।'

এই সরল প্রশ্নে মুনশীজী একটু বিব্রত বোধ করলেন। কিছুক্ষণ মৌন থেকে বললেন, 'বরাত ফেরাতে চাও দিগ্বিজয় সিং?'

'কার বরাত—তোমার না আমার?'

'ধর দু জনেরই!'

'আমার বরাত ফেরাতে কোন আপত্তি তো নেই-ই, এমন কি নিজের ক্ষতি না করে যদি তোমার বরাত ফেরাতে পরি, তাতেও আপত্তি নেই। কিন্তু ব্যাপারটা কী?'

তখন সংক্ষেপে সতীচৌরা ঘাটের বিবরণ দিয়ে কাল্‌কাপ্রসাদ বললেন, 'একটা নৌকোয় ঠেকেছে, তবু সাত-আট জন তো হবেই কম্‌সে কম। এদের বাঁচাও, বহুত ইনাম মিলবে—বরাত ফিরে যাবে।'

দিগ্বিজয় সিং ভ্রূ কুঞ্চিত করে বললেন, 'ওদের বাঁচিয়ে বরাত ফিরবে—না ওদের খরিয়ে দিয়ে ?'

'ছোঃ! তুমি কি ভাবছ সত্যি-সত্যিই আংরেজশাহি চলে গেল! কিচ্ছু না কিচ্ছু না, প্রথমটা ওরা প্রস্তুত ছিল না, তাই। ওধারে শোন নি নীল সাহেব কাশী-এলাহাবাদে কী কাণ্ডটা করেছে? তাকে ঠেকাবে কে? তোমার ঐ নানা ধুন্ধুপন্থ, না ভীমরতি-ধরা বুড়ো বাহাদুর শা? না বন্ধু, যত পার আংরেজ বাঁচাও, আখেরে কাজে আসবে!'

'হুঁ!' দিগ্বিজয় সিং অনেকক্ষণ নীরবে বসে রইলেন। তার পর বললেন, 'কিন্তু তুমিই শেষ পর্যন্ত আমাকে ফাঁসাবে না তো? আমি আংরেজ বাঁচাই আর তুমি সেই খবরটি সেখানে পৌঁছে দিয়ে হাতে হাতে ইনামটা বুঝে নাও—এমনটা হবে না তো?'

কাল্কাপ্রসাদ রীতিমত মর্মাহত হয়ে উত্তর দিলেন, 'আমার দেখছি এ কথা তোলাটাই ভুল হয়েছে! এত দিনের বন্ধুত্বের যদি এই পরিণাম হয়, যদি এই বিশ্বাসই জন্মে থাকে আমার ওপর, তা হলে বিদায় নেওয়াই ভাল মানে-মানে আমি উঠি—'

'আহা-হা, চটছ কেন? বাজিয়ে দেখছি একটু তোমাকে। দিনকাল কী পড়েছে তা তো দেখছই। দোস্তি-ইমান এসব কথার কোন মূল্য আছে কি? সাহেবদের নিমক খায় নি কারা বল তো! যারা যত বেশি খেয়েছে, তারাই আজ তত উৎসাহী—সাহেব মারতে!'

কাল্কাপ্রসাদ অপেক্ষাকৃত শান্ত হলেন। বললেন, 'তা বটে, তবে এক্ষেত্রে আমিও তো সঙ্গে জড়িয়ে রইলুম!'

'হ্যাঁ, আমিও তাই বলতে যাচ্ছিলুম, সাহেবদের ঠাঁই দিতে পার, মোদ্দা তারা যত দিন থাকবে, তোমাকে এখানে থাকতে হবে—এই সাফ কথা আমার! দেখ, রাজী আছ?'

কাল্কাপ্রসাদের মুখটা ঈষৎ গম্ভীর হল। মনের অবচেতনে ওদিকের পথটা খোলা রাখবার কথাটও যে মাথাতে ছিল না তা নয়। যদি তেমন অঘটনই ঘটে, যদি শেষ পর্যন্ত ইংরেজদের বিদায় নিতেই হয় তো তখন নিজের ইংরেজ-সেবার কলঙ্ক ক্ষালনের এই একটা সহজ পথ ছিল বৈকি। কিন্তু এখন আর ফেরাও সম্ভব নয়। তিনি বললেন, 'বেশ, আমাকেও না হয় ঐ সঙ্গে নজরবন্দী করে রেখো!'

এবার দিগ্বিজয় একটু অপ্রতিভ হলেন। বললেন, 'না-না, নজরবন্দী রাখার

কথা বলছ কেন'! দুই বন্ধু আমরা—বাঁচি একসঙ্গে বাঁচব, মরি একসঙ্গে মরব। ইনামটাতেও না ফাঁকে পড় সেটাও তো তোমার নজর রাখা দরকার!'...

পরের দিন ভোরবেলাই দিগ্বিজয় গঙ্গার ধারে লোক পাঠালেন। নৌকোর কোন চিহ্ন নেই। একটু বেলায় নিজেরা গেলেন, কিন্তু ফল সেই একই। দিগ্বিজয়ের কাছে ফিরিঙ্গীদের কাছ থেকে নতুন সংগৃহীত একচোঙা একটা দূরবীন ছিল, সেটা চোখে লাগালেন, কিন্তু তাতেও কোন ইংরেজ কি নৌকো দৃষ্টিগোচর হল না। শেষ পর্যন্ত নদীর পাড়ে একটা লোক মোতায়েন করে তাঁরা ফিরে এলেন।

দ্বিপ্রহরে আহারাদির পর আবারও দুই বন্ধু মাথায় আর মুখে ভিজে গামছা জড়িয়ে ঘাটে গেলেন।

তখনও কোন পাত্তা নেই। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে দু জনে ফিরে আসবার উপক্রম করছেন, দূরে দু-তিনটে গুলির শব্দ হল। কাল্কাপ্রসাদ উৎসাহিত হয়ে বললেন, 'ঐ!'

কিন্তু 'ঐ' ঐ পর্যন্তই রইল। আরও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে ফিরে এলেন ওঁরা। নৌকো দু-একটা আসা-যাওয়া যে না করছে তা নয়, তবে তার অধিকাংশই খোলা ডিঙি-নৌকো—তাতে সাহেবের কোন চিহ্ন নেই।

দিগ্বিজয় হেসে বললেন, 'ও সবই একে একে শেষ হয়েছে, বুঝলে? তোমার বাঁচাবার ভরসায় আর কতক্ষণ যোঝে বল।'

কাল্কাপ্রসাদও কাষ্ঠহাসি হাসলেন।

মিছিমিছি অনেকগুলি পয়সা খরচ হয়ে গেল।...

অবশেষে সন্ধ্যার কিছু আগে একটা লোক ছুটতে ছুটতে এসে খবর দিল—জন চার-পাঁচ লোক ঘাটের ধারে চুপ করে সন্দেহজনকভাবে গলা পর্যন্ত জলে ডুবিয়ে বসে আছে। তাদের মাথাটা মাত্র জেগে আছে, তাতে বোঝা যায় চুলগুলো কটা, গায়ের রংটাও অনেকটা পরিষ্কার—ঠিক ওদের মত নয়।

তখনই দু বন্ধু ঘাটে ছুটলেন। যারা জলে ডুবে বসে আছে তারা সাহেবই বটে। কাল্কাপ্রসাদের মুখে হাসি ফুটল। তিনি জামা কাপড় সুদ্ধ জলে নেমে গেলেন।...প্রথমটা টমসনের দল ওঁদেরও শত্রু ভেবেছিলেন, সহজে জল ছেড়ে উঠতে চান নি, তার পর ওঁদের কারও হাতে কোন হাতিয়ার নেই দেখে এবং পৌনঃপুনিক আশ্বাসবাক্যে কতকটা আধা-বিশ্বাস করলেন। কাল্কাপ্রসাদকে সলিভান চিনতেন,—'আমি হুজুর, কাকাপ্রসাদ, গ্রীনওয়েল্ সাহেবের মুনশী,

চিনতে পারছেন না ?' বলাতে মুখখানা ঝাপসা ঝাপসা মনেও পড়ল। তা ছাড়া এমনিতেই বা বাঁচবার পথ কৈ, জলে থাকলেও দু-এক ঘণ্টার মধ্যেই মরতে হবে। অগত্যা ওঁরা উঠে এলেন। ওঠার ক্ষমতাও নেই—টেনে ওঠাতে হল।

কারও গায়ে বিশেষ বস্ত্র ছিল না। জামাটা থাকলেও হয়তো পাজামা নেই। দিগ্বিজয়ের ইঙ্গিতে ধুতি এল, কম্বল এল। সেই সব জড়িয়ে কোনমতে ধরে ধরেনিয়েযাওয়া হল ওঁদের। সেখানে গরম দুধের ব্যবস্থা ছিল—খানিকটা করে দুধ খাবার পর মনে হল এ যাত্রা হযতো বা তাঁরা বেঁচে গেলেন।

কালকাপ্রসাদ দিগ্বিজযের ক্ষণিক অনুপস্থিতিতে সলিভানের কানের কাছে মুখ নিযে গিযে বললেন, 'আমি, সাহেব, আমিই পযসা খরচ করে ছুটে এসে খবর দিযেছিলুম। তাই এ যাত্রা বেঁচে গেলেন। আমিই বাঁচালুম।'

সলিভান চোখ মেলে তাকালেন মাত্র। কিন্তু কথাগুলোব অর্থ হৃদয়ঙ্গম কববাব মত তখন তাঁব অবস্থা নয়।

॥ ৫৭ ॥

কানপুরে ইংরেজ নির্মূল হযেছে, তাদের শক্তি, তাদের প্রতাপ এখন বিগত দিনেব জনশ্রুতিতে পর্যবসিত, পেশোযা এখানে একেশ্বর, তবু নানাসাহেবেব মনে-সুখ নেই। সত্য বটে, এদিকে নীল ও হ্যাভলকের অমোঘ অগ্রগতির সংবাদ প্রত্যহই শুনছেন, তাঁদের নিষ্ঠুব বৈর-নির্যাতনেব, নির্মম প্রতিহিংসার বীভৎস বিবরণ লোকের মুখে মুখে পল্লবিত হযেই তাঁব কানে আসছে—তেমনি ওদিকে লক্ষ্ণৌএর ইংরেজ-শক্তিও পতনোন্মুখ, এ খবরও তো তিনি পাচ্ছেন নিয়মিত ভাবেই সেখানে এখনও তারা নামেমাত্র টিকে আছে, কিন্তু শীঘ্রই তাদের অবস্থাও যে কানপুরের ইংরেজদের মতই হবে—এ তো একরকম সুনিশ্চিত।

আর লক্ষ্ণৌএর পতন হলেই, এদিক্‌কার ইংরেজ-প্রতিরোধ একেবারে শেষ হয়ে যাবে, তখন কি সম্মিলিত হিন্দুস্থানী শক্তির সামনে নীলসাহেবই দাঁড়াতে পারবে ?

মোটের ওপর, সবটা জড়িয়ে নানাসাহেবের উল্লসিত হবারই কথা—অন্তত ভয় পাবার কথা নয়।

তবে ? তবে তাঁর ললাটে সদাসর্বদা এমন চিন্তার ভ্রূকুটি ঘনিয়ে থাকে কেন ? সর্বদাই তাঁর আচরণে এমন একটা অস্থিরতা, অনিশ্চয়তা ও অন্যমনস্কতা প্রকাশ পায় কেন ?

ভয় ? ভয় তো বটেই, কিন্তু ভয় কাকে ? সে কি ইংরেজ-শক্তিকেই ?

প্রশ্নটার যথার্থ উত্তর দেওয়া হয়তো নানাসাহেবের পক্ষেও সহজ নয়। তবে একটা ভয়—নামহীন, আকারহীন, অকারণ আতঙ্ক যে তিনি অনুভব করছেন এটা অস্বীকার করারও উপায় নেই। তিনি অন্তরে অন্তরে চারিদিকের এই বিজয়োল্লাসের মধ্যেও কেমন করে অনুভব করছেন যে তিনি এবার ভীমবেগে তাঁর জীবনের অবশ্যম্ভাবী পরিণতির দিকেই এগিয়ে যাচ্ছেন। পরিণতি বটে—নিয়তিও বটে। শীঘ্রই তাঁকে ভাগ্যের সঙ্গে চরম বোঝাপড়া একটা করতে হবে, আর সেজন্য তিনি প্রস্তুত নন।

আসলে একটু একটু করে তাঁর মানসচক্ষুর সামনে থেকে মোহের পর্দাটা সরে গেছে—কেমন করে তিনি এ সিপাহী-অভ্যুত্থানের সত্য চিত্রটা যেন দেখতে পেয়েছেন। একটু একটু করে তিনি যেন তাঁর অনুগামী ও সহকর্মী-দেরও চিনতে আরম্ভ করেছেন। আর তাতেই এতখানি হতাশা তাঁর।

এধারে একটা যুদ্ধ আসন্ন তাতে সন্দেহ নেই। বালাসাহেব ও সেনাপতির দল জয় সম্বন্ধে সুনিশ্চিত। কিন্তু মুষ্টিমেয় ইংরেজকে অবরোধ করতে গিয়েই যে কৃতিত্ব ওরা দেখিয়েছে, তাতে নানা আর অতটা ভরসা পান না। তাত্যা পরামর্শ দিচ্ছেন দাক্ষিণাত্যে যেতে—সেখানে এখনও পেশোয়া-নামের জাদু সম্পূর্ণ অবলুপ্ত হয় নি, এখন নানাসাহেব গিয়ে উপস্থিত হলে হাজার হাজার মারাঠী তাঁর পতাকাতলে সমবেত হবে—অর্থেরও অভাব হবে না। কিন্তু নানা জানেন যে, হাজার হাজার অনুচর বা ভক্ত যেমন ছুটে আসবে, পেশোয়া-বংশের পুরাতন শত্রু ও প্রতিদ্বন্দ্বীরাও তেমনি বসে থাকবে না। তাদের পূর্ববৈরিতা ভুলে যাবার মত কোন কারণ ঘটে নি।

কেউ কেউ পরামর্শ দিচ্ছেন, এখানকার সিপাহীদের নিয়ে সোজা দিল্লী রওনা হতে—কারণ একতাই শক্তি। তাতেও পেশোয়া খুব রাজী নন। এই ক'দিনে স্বাধীনতার স্বাদ কিছুটা পেয়েছেন—এখন সেখানে গিয়ে সেই স্থবির ও হতবুদ্ধি বাহাদুর শার উদ্ধত পুত্র এবং নির্বোধ চিকিৎসক—ওদের

আদেশ মত চলতে তিনি পাববেন না। তা ছাড়া একটা কথা আজিমুল্লা ঠিকই বলেছেন, দিল্লী পর্যন্ত ইংবেজ সৈন্যদের গতি অব্যাহত ও অবাবিত বাখবাব সুযোগ দেওযা ঠিক নয়। জনসাধাবণের মনোবল তাতে একেবাবে নষ্ট হযে যাবে। যে অত্যাচাব এখন ইংবেজবা করছে, সে অত্যাচাবেব সুযোগ আব বশি দিলে সাবা উত্তব ভাবত আতঙ্কগ্রস্ত ও ইংবেজদেব পদানত হয়ে পড়বে। তা ছাড়া এখানকাব স্থানীয় সহাযতা থেকেও বঞ্চিত হবেন তাঁবা।

অর্থাৎ নানাসাহেব শুধু পবিণাম-চিন্তাতেই অবসন্ন নন—আশু কর্তব্য সম্বন্ধেও তাঁব দ্বিধা ও অন্তর্দ্বন্দ্বেব শেষ নেই।

আমিনা এ সব খববই পাচ্ছিল, খবব যেটাব পাওয়া যায় না—মনেব কথাটাব—সেটা সে অনুমান কবে নিচ্ছিল। নানাসাহেবকে সে ভাল কবেই চনে। তিনি খুব নির্বোধ নন। আব তা নন বলেই তাঁব মনে যে বিপুল নালপাড চলেছে, তা দূবে থেকেও আমিনা বুঝতে পাবে।

সেদিনের পব থেকে আমিনা আব তাঁব কাছে যায় নি। নানাসাহেবও তাকে ডাকেন নি। কেমন কবে তিনি বুঝেছিলেন যে, নিজেব এই আকাব মনের আতঙ্কেব কথাটা আমিনাব সামনে কিছুতেই চাপা থাকবে না, আব না হলে বড়ই লজ্জায় পড়তে হবে। আমিনাই যে তাঁকে বেশি কবে এই সবনাশা কাণ্ডে জড়িয়ে ফেলেছে— বোধ কবি সে কথাটাও তাঁব মনে ছিল। আমিনা তা বুঝত, তাই সে-ও গাযে পড়ে তাঁব কাছে যাবাব চেষ্টা কবে নি। দূব থেকে সব কিছু লক্ষ্য কবেছে। নানাসাহেবের কাছে এখন যাবা ঘন ঘন আসা-যাওয়া কবে, তাদেব কথাবার্তাব টুকবো থেকেও অনেক খবব পেযেছে সে।

এবই মধ্যে একদিন শুনল এখানকাব পাটিবাটি গুটিয়ে নানাসাহেব বিঠুরে যাচ্ছেন। কাগজপত্র সব গোছগাছ কবা হচ্ছে,—ইতিমধ্যে নাকি কিছুকিছু পুড়িযে ফেলাও হযে গেছে—মূল্যবান জিনিসপত্র বাঁধাছাঁদা চলছে।

আমিনা বুঝল আব নষ্ট কববাব মত সময় নেই। সে সেই দিনই অপবাহ্নে মহামান্য পেশোয়াব বিশ্রাম কববাব অবকাশে একেবাবে তাঁব শযনকক্ষে গিয়ে হাজিব হল।

দ্বাবে রক্ষী ছিল অবশ্যই, কিন্তু সে জানত যে বিশ্রামকক্ষে আব যাব যাওযাব বাধা থাক, বিশ্রাম-সঙ্গিনীর থাকা উচিত নয়। সে বিনা ওজবে পথ ছেড়ে দিল। আমিনা ভেতবে ঢুকে সন্তর্পণে দরজা বন্ধ করল, তাব পব যতদূর সম্ভব নিঃশব্দে কাছে গিয়ে তাঁর পায়ে একটা হাত বাখল।

'কে?' নানাসাহেব চমকে উঠে বসলেন।

'ভয় নেই, আপনার বাঁদী হুসেনী।'

'ও, হুসেনী! ব'স ব'স।'

ঘুমের ঘোরটা আর একটু কমতে নানাসাহেব ভাল করে চেয়ে দেখলেন। বলা বাহুল্য, সেখানে আসার আগে আমিনা প্রচ্ছন্ন নিপুণতার সঙ্গে প্রসাধন করে এসেছে। তার মুখের দিকে চেয়ে, হয়তো বা ক'দিন পূর্বের রভস-রজনীর স্মৃতি মনে পড়ায়, নানা প্রসন্ন হয়ে উঠলেন।

'এসে ভালই করেছ, ব'স।'

সস্নেহে হাত ধরে পাশে বসালেন তাকে।

'তোমার কথাই ভাবছিলাম। তুমি যে-আমাকে ত্যাগ করলে একেবারে।'

'কৈ, আমাকে স্মরণ করেন নি তো? করলেই আসতুম। আমি আপনার তলবের দাসী, পেশোয়া।'

'না—হ্যাঁ, মানে ব্যস্ত ছিলুম তো, অনেক রকমের চিন্তা মাথায়।'

পেশোয়া অপ্রতিভ হয়ে পড়েন।

'ঠিক সেইজন্যই আমিও আপনাকে বিরক্ত করি নি। কিন্তু সে কথা থাক, আপনি নাকি বিঠুরে চলে যাচ্ছেন?'

'হ্যাঁ, তাই স্থির করেছি।...ও, তোমাকে বুঝি কেউ বলে নি তৈরী হয়ে নিতে?'

আমিনা সে প্রসঙ্গের ধার দিয়েও গেল না। স্থির অপলক দুটি চোখ পেশোয়ার চোখের ওপর রেখে বলল, 'এটা কি আপনার পলায়নের ভূমিকা পেশোয়া?'

নানাসাহেব গম্ভীর হয়ে উঠলেন, কিন্তু আমিনার হাতটা ছাড়লেন না। বরং সেই দুর্লভ কোমল হাতে একটু চাপ দিয়ে বললেন, 'না হুসেনী, পলায়নের ভূমিকা ঠিক নয়। তোমার কাছে গোপন করব না। ওধারের পথটা খোলা রাখতে চাইছি মাত্র। অন্তঃপুরের একটা ব্যবস্থা করতে হবে, টাকা-কড়ি কিছু সরানো দরকার—সবই তো এলোমেলো হয়ে রয়েছে।... শীগগিরই একবার শত্রুর মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে সেটা তো বুঝতেই পারছ, আর যুদ্ধে হারজিত আছেই।'

'কিন্তু একবারের হার বা একবারের জিতটাকেই কি আপনি চরম বলে মনে করবেন?'

'তা নয় হুসেনী, কিন্তু যুদ্ধে নেমে পড়লে আর তো স্বাধীনতা থাকবে না। তখন ভাগ্যের হাতে খেলার পুতুল হয়ে পড়ব। ভাগ্য-তাড়িত হয়ে কোথায় যেতে হবে—এগোতে বা পেছোতে হবে, তার ঠিক কি? সব রকম অবস্থার জন্যই প্রস্তুত থাকা উচিত নয় কি? অন্তত ঘরটা সামলে যাওয়া দরকার।'

আমিনা কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তার পর বলল 'তা হলে আমাদের কথা কি চিন্তা করেছেন?'

নানাসাহেব যেন চমকে উঠলেন। বললেন, 'তুমি বিঠুরে যাবে না?'

'বিঠুরে গিয়ে কী করব বলুন? আপনি যদি ভাগ্য-তাড়িত হয়ে পেছিয়েই যান, তখন কী অবস্থা হবে ভেবে দেখেছেন? আপনার মহিষীদের কোন ভয় নেই, এমন কি আপনার প্রেয়সী আদালারও না। তারা শুধু বন্দীই হবে, এই মাত্র। তা ছাড়া শেষ-মুহূর্তে হয়তো আপনি মহিষীদের সরাবার ব্যবস্থা একটা করতে পারবেন, কিন্তু আমাদের নিয়ে বিব্রত হতে নিশ্চয়ই চাইবেন না। তখন? আমাকে হাতে পেলে ইংরেজরা কী করবে ভেবে দেখেছেন? আমি যে তাদের কী সাংঘাতিক শত্রু তা তারা এ ক'দিনে ভাল করেই জেনেছে জনাব।'

এবার নানাসাহেবের চুপ করে থাকবার পালা। একটু পরে বললেন, 'তা হলে তুমি কী করতে চাও?'

'এত দিন যা করলুম তা-ই। আপনার শত্রুদের সঙ্গে অবিশ্রাম বৈরিতা। আমাকে ছেড়ে দিন পেশোয়া আমার ব্যবস্থা আমি ঠিকই করে নিতে পারব। তা ছাড়া আপনার সঙ্গে থাকলে আপনার বোঝা মাত্র হয়ে থাকব—আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। ইংরেজ আমার জাত-বৈরী। ঠিক আমার মত বিদ্বেষ আপনারও নেই তাদের ওপর—একথা নিশ্চিত জানবেন।'

'হ্যাঁ তা আমি জানি হুসেনা। তাত্যা টোপী, আজিমুল্লা এদের কথা আমি বুঝতে পারি, কিন্তু তুমি বা মৌলবীসাহেব, তোমারা নিঃস্বার্থ ভাবেই ইংরেজের ধ্বংস চাও— সেটা আমি জানি; সেই সঙ্গে আমার উন্নতি—সেটা তোমাদের কাছে পরোক্ষ। আর একটি লোকের কথা শুনেছি—মহম্মদ আলি খাঁ, সেও নাকি এমনি শত্রু ইংরেজের। লক্ষ্ণৌতে সে অবিশ্রাম পরিশ্রম করছে সিপাইদের জন্য। সে নাকি এক পয়সাও চায় না—নিজের শরীরের দিকে তাকায় না। অদ্ভুত নিষ্ঠা তার। এদিকে লেখাপড়া জানা লোক, পাস-করা ইঞ্জিনিয়ার।

তাকে যদি আমার পাশে পেতুম !.. আজিমুল্লা তাকে চেনে, তাকে এখানে আনবার চেষ্টাও করেছিল, কিন্তু কে জানে কেন সে রাজী হয় ন।'

আমিনার মুখ অকস্মাৎ রক্তবর্ণ ধারণ করল। কিন্তু খস্‌খসের পর্দা ফেলা প্রায়ান্ধকার ঘরে বসে নানাসাহেব তা টের পেলেন না। এমন কি, তাঁর মুষ্টির মধ্যে ওর হাতখানা যে কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই ঘামে ভেসে গেল তাও লক্ষ্য করলেন না।

আমিনাই হাতটা টেনে নিয়ে অপর হাতের রুমালে তা মুছে নিল। তার পর বলল, 'কিন্তু যেখানেই হোক, আপনার কাজ হচ্ছে তো ?'

'তা বটে।' একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে নানা বললেন, 'তবু নিঃস্বার্থ লোকের এতই অভাব—নিজের পাশে এমন একটা লোক থাকলে বুকের বল বাড়ে। তুমিও থাকছ না—বড্ড অসহায় বোধ করব। চারদিকেই স্বার্থের চক্রান্ত, সত্যি সত্যি আমার মঙ্গল-চিন্তা করে এমন লোক কৈ ?'

'পাশে না ই বা রইলুম—আমরা অপনার মঙ্গল-চিন্তাই করব জনাব।'

নানাসাহেব হঠাৎ যেন নড়ে-চড়ে বসলেন। পুনশ্চ আমিনার হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে বললেন, 'কিন্তু আর যদি দেখা না হয় ? দু জনে যদি দু দিকে গিয়ে পড়ি ? কিংবা যদি—'

কথাটা শেষ করতে পারলেন না।

আমিনা অসমাপ্ত প্রশ্নের জবাবে বলল, 'যেখানেই থাকি সব সময় আপনার কল্যাণই আমার লক্ষ্য থাকবে। আর মৃত্যুর কথা ? আমি গেলে আপনার অসংখ্য সেবিকার এক জন যাবে মাত্র—সে অভাব আপনি টেরও পাবেন না আর খোদা না করুন, যদি আপনিই যান, দেহে যত দিন একবিন্দু খুনও থাকবে, আপনার শত্রুদের ক্ষতি করে যাব—এ বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।'

নানাসাহেব সস্নেহে আবারও তার হাতে একটা চাপ দিলেন।

'কিন্তু পেশোয়া, কথা তো অনেক হল, যদি প্রস্তুতই হচ্ছেন—আমারও তা হলে একটা ব্যবস্থা করে দিন। আমাকেও তো প্রস্তুত হতে হয়।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ—নিশ্চয়। তোমার কী করতে চাও বল। টাকাকড়ি কি দরকার—অবশ্য বেশি কী দিতে পারব বুঝি না, এদিকেও তো খরচ হচ্ছে জলের মত। তবু যা দরকার বল। আরও যদি কিছু বন্দোবস্ত করে নিতে চাও—'

'টাকাকড়ি যা পারেন দেবেন পেশোয়া, টাকা তো চাই-ই। আমার

নিজের ভবিষ্যতের জন্যে নয়, আপনার স্নেহের দান যে-সব অলঙ্কার আছে, তাতে একটা বাঁদীর জীবন কোন দূর গ্রামে বাস করলে অনায়াসে কেটে যাবে, কিন্তু কাজ করতে গেলে টাকা চাই বৈকি। তবে তার চেয়েও বেশি চাই···আপনার একটা পরোয়ানা।'

'পরোয়ানা? কিসের পরোয়ানা?'

'এখানে থেকে যদি আমাকে কাজ করতে হয়, অনেক সময়ই আপনার সেনা বা সেনাপতিদের সাহায্য নিতে হবে। তখন যাতে তারা আমার কথা শোনে, তারই একটা ক্ষমতাপত্র চাই। মানে, যা করছি আপনারই কাজ এবং আপনারই অনুমোদন-সাপেক্ষে করছি—এমনি একটা পরোয়ানা দিন। এখন আপনি আছেন, আমার কোন ভয় নেই, রাজশক্তি রয়েছে সঙ্গে; কিন্তু আপনি না থাকলে আমার শক্তি কতটুকু বলুন? আমার পরিচয়ই বা কী? প্রভু-পরিত্যক্তা সামান্য বাঁদী বৈ তো নয়।'

'ছিঃ ছিঃ, ও কথা বলছ কেন। আমি এমন পরোয়ানাই লিখে দেব যে আমার যতটুকু শক্তি—যদি কোন শক্তি থাকে, আর তা যদি রাজশক্তি হয়—সম্পূর্ণই তোমার সঙ্গে থাকবে। তুমি বরং মংগরকরকে ডেকে এখনই আমার মোহর, কাগজ আর কলমদান আনতে বল, ও কাজ সেরেই দিই। এর পর হয়তো আর অবসর থাকবে না।'

'আপনি কি আজই চলে যেতে চাইছেন?

'অন্তত কাল ভোরেই যেতে চাই।'

নিমেষকাল নিস্তব্ধ থেকে আমিনা বলল, 'এখানকার বন্দীদের কী করবেন?'

'প্রাসাদের বন্দীদের তো বিঠুরে পাঠাবার হুকুম দিয়েছি। এখন সমস্যা বিবিঘর নিয়ে—'

কণ্ঠে যতদূর সম্ভব নিরাশক্তি টেনে এনে আমিনা বলল, 'কেন, ওদের কী করতে চান?'

'তাত্যা বলছে অবিলম্বে ওদের ছেড়ে দিতে। ও বোঝা বেখে শুধু শুধু খরচ; তা ছাড়া অকারণ আরও বিদ্বেষ বাড়ানো। কিন্তু আজিমুল্লা বলছে যে ওরাই আমাদের বরং হাতের পাঁচ। যদি কখনও দুর্দিন আসে, ওদের বিনিময়ে আমরা শত্রু পক্ষের কাছ থেকে অনেক সুবিধা আদায় করতে পারব। তাই ভাবছি যে ওদেরও বিঠুরে পাঠিয়ে দেব কিনা।'

'আজিমুল্লাই বুদ্ধিমানের মত কথা বলেছেন জনাব। তবে মিছিমিছি

এখনই ওদের বিঠুরে নিয়ে গিয়ে ভিড় বাড়িয়ে লাভ কি ?...আমি তো রইলুমই, যদি তেমন বুঝি তো ওদের বিঠুরে সরিয়ে দেব—চাই কি এমনও হতে পারে যে আরও দূরে নিরাপদ কোন স্থানে পাঠানো দরকার হবে। একবার যুদ্ধ হলেই যে ওদের ব্যবহার করতে পারবেন, তা হয়তো নাও হতে পারে। নিজেদের নিরাপত্তার জন্য জামিন হিসেবে ব্যবহার করার প্রয়োজন—আমার মনে হয় কিছুদিন পরেই হবে বরং। হয় নিজেদের জন্যে কোন সুবিধা আদায় করতে কিংবা আমাদের কিছু বন্দী ছাড়িয়ে নিতে। সে প্রয়োজন তো এখনই হচ্ছে না!'

'তা বটে। কিন্তু সে রকম বুঝলে কোথায় পাঠাবে?'

'সে ঠিক ব্যবস্থা করব, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।'

'তা হলে ওদের ভারও তুমি নিলে?'

'আপনি দিলেই নেব।'

'আমি একেবারে লিখিত হুকুম দিয়ে যাচ্ছি। তোমার নির্দেশমতই ওদের রাখা বা সরানো হবে।'

'সে আপনার খুশি।' আমিনা নিস্পৃহ ঔদাসীন্যের সঙ্গে বলে।

॥ ৫৮ ॥

আজিমুল্লা স্তম্ভিত হয়ে চেয়ে রইলেন।

কথাটা স্পষ্টই শুনেছেন—আমিনার বাচনভঙ্গিতে বা কণ্ঠে কোন জড়তা ছিল না—তবু, তবু যেন বিশ্বাস হতে চায় না।

সত্য বটে, অবিরাম এই মোহময়ী রমণীর খেয়ালখুশির রসদ যোগাতে যোগাতে তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন—এও সত্য যে ইদানীং একটা কুটিল সন্দেহ মনের মধ্যে ধীরে ধীরে অঙ্কুরিত হচ্ছিল যে এই ছলনাময়ী নারীর সবটাই ছলনা, নিজের কার্যসিদ্ধির জন্যে সে কেবলই স্তোক বা মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে যাচ্ছে, শেষ পর্যন্ত কোনদিনই হয়তো তাঁর কাছে ধরা দেবে না—তবু এটাও তো মিথ্যে নয় যে, এসব সত্ত্বেও এর মোহ আজও দুর্নিবার। আজও এর রূপের, এর মনীষার জাদু তাঁর ওপর একটা অপ্রতিহত প্রভাব বিস্তার করে রেখেছে, আর তা রেখেছে বলেই আজও তিনি সহস্র কাজের মধ্যে ছুটে

এসেছেন এর আহ্বানে। মনে হয় আজও এর জন্তে অকরণীয়, একে অদেয় তাঁর কিছু নেই।

তবুও—এ প্রস্তাব, এ যে অবিশ্বাস্য—কল্পনাতীত!

তিনি ভুল শোনেন নি তো?

নাকি এ পরিহাস? তাঁকে একটু বাজিয়ে দেখতে চায় এই নারী?

কিন্তু না, এখনও তো সে সাগ্রহে উৎকণ্ঠা-ব্যাকুল দৃষ্টিতে চেয়ে আছে তাঁর মুখপানে!

'কি, কথা কইছেন না যে খাঁ সাহেব?'

'না, এ অসম্ভব—এ আমি পারব না!'

'পারবেন না? আমার জন্তেও পারবেন না?'

একই সঙ্গে যেন সে স্খলিত কণ্ঠস্বরে অভিমান, হতাশা, অনুনয় ঝরে পড়ে।

'না বেগমসাহেবা, মানুষের ক্ষমতার সীমা আছে। আপনার জন্তে অনেক কিছুই করেছি, কিন্তু তবু সে মনুষ্যত্বের সীমানার মধ্যে ছিল। এ পৈশাচিকতা। এ কাজ করলে আপনিই ঘৃণা করতেন আমাকে!'

'না, করব না। সত্যি বলছি খাঁ সাহেব, পুজো করব আপনাকে। এই শেষ, আর কখনও কোন অনুরোধ করব না। বলেছিলাম, স্বাধীনতা পেয়ে দু'জনে যখন সিংহাসন ভাগ করে নেব, তখনই ধরা দেব আপনাকে। সে কথা টেনে নিচ্ছি। এখনই, এই মুহূর্তে ধরা দিচ্ছি আপনার কাছে—দেখুন, এই মুহূর্তে!'

লোভ বড় বেশি। মায়াবিনীর দৃষ্টি যেন অমোঘ আকর্ষণে টানছে। কি অতল রহস্য, কি অনির্বচনীয় সুখের ইঙ্গিত সেখানে! এক সময় এ প্রস্তাব জীবনের দুর্লভতম সৌভাগ্য মনে হতে পারত। হয়তো আজও—

না।

মাথা নেড়ে আজিমুল্লা খাঁ বললেন, 'না, তা হয় না। এতটা আমি পারব না। সেদিনের ব্যাপারটাতেই লজ্জার সীমা নেই। আর এ তো কয়েক জন অসহায় রুগ্ণ স্ত্রীলোক, আর কতকগুলো শিশু—না সে সম্ভব নয়, আমাকে মাপ করবেন।'

অনুনয়ের ভঙ্গি নিমেষে মিলিয়ে গেল। সে জায়গায় ফুটে উঠল প্রবল আপাত-নিরুদ্ধ অভিমান। স্ফুরিত ওষ্ঠাধরে সোহাগের সেই অভিমান বর্ষণ করে আমিনা বলল, 'বেশ। যে পারবে তার কাছেই যাচ্ছি!'

'শুনুন বেগমসাহেবা, এ পারা উচিত নয়। আপনি প্রকৃতিস্থ হ'ন। এ

দানবীয় কাজ—পৈশাচিকতা। এ কথা শুনলে সমস্ত সভ্য জগৎ আমাদের অভিসম্পাত করবে।'

'তা জানি। তবুও আমরা চাই এ।' আমিনা ঘুরে দাঁড়াল।

'কিন্তু এতে কতটা ক্ষতি হবে ভেবে দেখেছেন? এরা হাতে থাকলে ভবিষ্যতে কতটা সুবিধা হতে পারে!'

'সব জানি খাঁ সাহেব, তবুও আমি চাই ওদের প্রাণ। আপনি জানেন না, বুক জ্বলে যাচ্ছে আমার, কী সে জ্বালা আপনি বুঝবেন না। ওদের রক্ত ছাড়া সে জ্বালার শান্তি হবে না। হিন্দুদের ডাকিনী-যোগিনীর মতই আমি আজ রুধির-পিয়াসী! যাক, আপনি আপনার কাজে যান। ছোট ছেলের মত ভয়ে কাঁপছেন আপনি, নিরাপদ দূরত্বে সরে থাকুন। এ কাজ স্ত্রীলোক বা শিশুর নয় তা জানি। ভয় নেই—এ দায়িত্ব আমারই থাক। আপনাকে এর জবাবদিহি করতে হবে না।'

শিশু ও স্ত্রীলোকের ইঙ্গিতে আজিমুল্লার মুখ অঙ্গারবর্ণ ধারণ করল। তিনি বললেন, 'কিন্তু নিরাপদ দূরত্বে সরে থেকে অসহায় ভাবে চেয়ে দেখতেও আমি পারব না বেগমসাহেবা। আমি বাধা দেব। বিবিঘরের ভার আমার হাতে —আমার হুকুম ছাড়া কিছুই হবে না।'

'পেশোয়ার হুকুমেও হবে না?'

'পেশোয়ার হুকুম?'

'হ্যাঁ, পেশোয়ার হুকুম!'

আবারও স্তম্ভিত হবার পালা আজিমুল্লার।

'কখনও না, হতে পারে না। তাঁর সঙ্গে আমি কালই কথা বলছি!'

'পেশোয়ার হুকুম!' শান্ত অচঞ্চলভাবে কথাগুলোর পুনরুক্তি করে আমিনা। তার পর যেন কতকটা বিজয়গর্বে ওড়নার মধ্যে থেকে কাগজ দুখানি বার করে আজিমুল্লার চোখের সামনে মেলে ধরে।

'এ পরোয়ানা জাল!' কতকটা অসহায় ভাবেই বলে আজিমুল্লা, মজ্জমান ব্যক্তির তৃণাবলম্বনের মত।

'সে পেশোয়া বুঝবেন! আপাতত এতেই আমি কাজ উদ্ধার করব।'

'কিন্তু পেশোয়ার নামে চালালেও এই হুকুম কোন সিপাই-ই তামিল করবে না হুসেনীবিবি—আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। সেদিন সতীচৌরা ঘাটে বেশ সরল সোজা ভাষাতেই তারা এ কাজ করতে অস্বীকার করেছিল, সেটা ভুলে যাবেন

না। তবু তখন চারদিকে হত্যার তাণ্ডব চলেছে—রক্তে সেদিন তাদের রক্তের নেশাই ছিল। তবুও তারা রাজী হয় নি।'

'আমি যে তাদের ভরসাতেই আছি এমন কথাই বা আপনাকে কে বললে? আমার ব্যবস্থা আমি করে নিতে পারব। এ পরোয়ানাতে আর যাই হোক বা না হোক, আমার কাজে তারা বাধা দিতে পারবে না—এটা তো ঠিক। ওখান থেকে তাদের সরিয়ে দিতে পারব!'

'আচ্ছা, আমিও দেখি এ পাগলামি বন্ধ করতে পারি কিনা। আমি পেশোয়ার কাছেই যাচ্ছি। এ পাপে আপনাকে আমি জড়িত হতে দেব না—আমার সাধ্য থাকতে নয়।'

আজিমুল্লা আর বাদানুবাদের অপেক্ষা করলেন না। এক রকম ছুটেই চলে গেলেন।

আমিনা বহুক্ষণ সেখানেই স্থাণুবৎ দাঁড়িয়ে রইল। তার মুখের সে বিজয়গর্ব কোথায় চলে গেছে—সে জায়গায় ফুটে উঠেছে একটা হতাশা এবং দুশ্চিন্তা।

তবে কি তার সমস্ত জাদু এই কদিনেই চলে গেছে? তবে কি সে এর মধ্যেই শক্তিহীনা হয়ে পড়ল? আজিমুল্লাও তাকে উপেক্ষা ও অবহেলা করে চলে গেল অনায়াসে।

তবে কি সে এত কাণ্ডের পর, এত বার বিজয়িনী হয়ে শেষমুহূর্তে ব্যর্থ হবে?

পেশোয়ার ভয় সে করে না, পেশোয়ার মরণকাঠি তার হাতে। হুইলারকে লেখা চিঠিখানা আজও তার কাছে সযত্নে রাখা আছে। কিন্তু—

সত্যিই তো আর এ কাজ নিজের হাতে করা যায় না! তার যা কিছু বল রূপে-যৌবনে কটাক্ষে-বুদ্ধিতে—এ কথা তার চেয়ে বেশি কে জানে। কিন্তু এ কাজ যে পেশীর।

বহুক্ষণ অসহায় স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে থাকবার পর সহসা তার ভ্রূকুটি মিলিয়ে গেল, নবীন আশায় চোখ দুটি উঠল জ্বলে।

আছে—এখনও তেমন সেবক আছে বৈকি। অন্তত সে এই দুর্দিনে আমিনাকে ত্যাগ করবে না।

আমিনা প্রায় ছুটে দোরের কাছে গিয়ে ডাকল, 'মুসম্মৎ, মুসম্মৎ!'

'জী মালেকান।' সম্ভবত কাছেই কোথাও ছিল—মনিবের জরুরী কণ্ঠস্বরে তখনই সামনে এসে দাঁড়াল মুসম্মৎ।

'এখনই একটা ঘোড়সওয়ার পাঠিয়ে দে কসাইটোলায়, সর্দার খাঁকে ডেকে নিয়ে আসুক এখনই।' জল্‌দি! বলতে বলবি যে খুব জরুরী দরকার—যেমন অবস্থায় আছে যেন তেমনি অবস্থাতেই চলে আসে! এই নে; একটা টাকা নে, ঘোড়সওয়ারকে দিবি—আগাম বকশিশ! সর্দার খাঁকে এক ঘণ্টার মধ্যে এনে হাজির করতে পারলে আরও এক টাকা পাবে—বলে দিস!'

* * *

সর্দার খাঁও কথাটা শুনে বহুক্ষণ স্থির অপলক নেত্রে প্রস্তাবকারিণীর মুখের দিকে চেয়ে রইল। তার পর ধীরে ধীরে বলল, 'মালেকান, তোমার হুকুম হলে একা শুধু-হাতে এক শ দুশমনের সামনে দাঁড়াতে পারি—জানের মায়া তোমার হুকুমের কাছে তুচ্ছ। কিন্তু এ যে··এ যে অন্য কথা মালেকান। অসহায় নিরপরাধ কতকগুলো জেনানা আর বাচ্চাদের কোতল করা—তাও খাঁচার মধ্যে পুরে—। এ হুকুম তুমি ফিরিয়ে নাও। এ হুকুম আমাকে তুমি দিও না।'

শেষ পর্যন্ত সর্দার খাঁও!

চির বিশ্বস্ত, চির অনুগত সেবক সর্দার খাঁ!

অকস্মাৎ আমিনার মনে হল, তার পা দুটোতে যেন কোন জোর নেই—হাঁটুর কাছে ভেঙে পড়ছে। বুকের মধ্যটাও যেন নিমেষে খালি হয়ে গেছে—কোথাও কোন জীবনশক্তি আর অবশিষ্ট নেই। ঐ অত্যল্প সময়ের মধ্যেই নিজের অবস্থায় সে বিস্মিত হল। এ তার কী হল? এমন একান্ত অসহায় এবং হতাশ বোধ করবার কোন কারণ এর আগে কিছুই ঘটে নি—অভিজ্ঞতাটা একেবারেই নতুন। বিস্ময় বোধ হয় সেই জন্যই।

কিন্তু কয়েক মুহূর্ত মাত্র।

না—হার মানলে চলবে না—কিছুতেই না।

মুহূর্তে নিজের ধনুতে নতুন সায়ক যোজনা করল আমিনা—এক লহমায় কর্তব্য স্থির করে নিল। একেবারে সর্দার খাঁর সামনে এসে দাঁড়িয়ে দু হাতে তার গলা জড়িয়ে ধরল, তার পর অভিমান-ক্ষুণ্ণ করুণ কণ্ঠে বলল, 'তুইও আমাকে ত্যাগ করবি সর্দার? তুইও আমার কথা শুনবি না? তা হলে আমি কার কাছে যাব বল্‌?'

তবুও সর্দারের দৃষ্টি তার চোখে এসে মিলল না। তার মুখের বিপন্ন ভাবও দূর হল না। বরং তার অন্তরের প্রবল ঝড়টাই আরও বেশি করে মুখে ফুটে উঠল।

'তুই না পারিস্, তোর কসাইটোলার অন্য লোক ঠিক কর্। আমি টাকা দেব—প্রচুর টাকা। এক-এক জনকে হাজার করে টাকা দেব। জানেরও ভয় নেই—এই দেখ্ নানাসাহেবের পরোয়ানা। আমি যা বলব তাঁরই হুকুম মনে করতে হবে। তা ছাড়াও—তাঁর মরণকাঠি আছে আমার হাতে—কিছুই করতে পারবে না সে।—সর্দার, সর্দার, এই শেষবারের মত আবদার কর্‌ছি তোর কাছে, আর কখনও কিছু বলব না। সর্দার, আমি—আমি তোর মনিবের মেয়ে, তোর আদরের মালেকান—তোর কাছে ভিক্ষা চাইছি!'

সর্দার খাঁ সযত্নে—তার পক্ষে যতটা সযত্নে সম্ভব, আমিনার হাত দুটো নিজের গলা থেকে ছাড়িয়ে দিল। তার সেই বীভৎস দানবীয় মুখে সেই মুহূর্তে যে হতাশা, যে গ্লানি, যে যন্ত্রণা ফুটে উঠল, তা দেখলে করুণা বোধ করবারই কথা—হয়তো আমিনাও করল, কিন্তু গলল না, মুক্ত হাত দুটো জোড় করে দাঁড়াল সামনে—ভিখিরীর মত।

অতি কষ্টে, যেন গভীর বেদনার সঙ্গে, একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল সর্দার খাঁ। তার পর বলল, 'জানি না আমাকে কোথায় টেনে নিয়ে যাচ্ছ মালেকান, পরলোকে গিয়ে খোদার কাছে কী জবাবদিহি করব—তাও জানি না। শুধু এই জানি যে তোমার হুকুম ঠেলবার শক্তি আমার নেই। যত বড় কঠিনই হোক, এ কাজ আমাকে করতে হবে—আমিও করব। কিন্তু এ না করলেই পারতে মালেকান—এ না করলেই পারতে।'

হয়তো শেষ মুহূর্তেও সর্দার খাঁর মনের মধ্যে তার মালেকানের মত পরিবর্তিত হবার একটা ক্ষীণ আশা ছিল, তাই সে চলে যেতে গিয়েও কয়েক লহমা উৎসুক ব্যাকুল নেত্রে, এক প্রকারের করুণ আশায় চেয়ে রইল আমিনার মুখের দিকে। কিন্তু দেখল সে মুখে এতটুকু দ্বিধা নেই, অনুকম্পা নেই, অনুশোচনার সম্ভাবনা মাত্র নেই।...

দীর্ঘশ্বাসও যেন আর ফেলতে পারল না সর্দার। নিশ্বাসটা বুকে চেপেই সে ধীরে ধীরে যন্ত্রচালিতের মত মাথা নীচু করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। তার অনিচ্ছুক ভারী পায়ের শব্দটা দূর অলিন্দে বাজতে বাজতে ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে এক সময় মিলিয়ে গেল।...

সর্দার যাওয়ার আগে অনুশোচনার পূর্বাভাস পায় নি সত্য কথা, কিন্তু এখন যদি সে আর এক বার ফিরে আসত তো তার বিস্ময়ের অন্ত থাকত না। দেখত যে তার মালেকানের সেই সুকঠিন দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে, সেই আশ্চর্য সুন্দর চোখ দুটির কূল ছাপিয়ে অশ্রু নেমে এসেছে এবং এরই মধ্যে সে অশ্রু ঐ রাক্ষসীর পাষাণ-অবিচল কপোল ভাসিয়ে ধারায় ধারায় তার বুকের ওড়নার ওপর ঝরে পড়ছে।

এ কি সার্থকতার আনন্দাশ্রু ?

এ কি আত্মগ্লানি ?—আত্ম-অনুকম্পা ? —অথবা অনুশোচনাই ?

এ অশ্রু কিসের তা আমিনা নিজেও তখন বলতে পারত না।

॥ ৫৯ ॥

হীরালাল মামার দেখা পায় নি। পাবার কথাও নয়, কারণ সে পৌঁছতে পৌঁছতে মামা বহু দূর চলে গিয়েছেন। মাঝখান থেকে তার নিজের জীবনটাই বিপন্ন হতে বসেছিল। তবু সে তো ঘাঁটিতে গিয়ে পড়ে নি, দূর থেকেই খোঁজ খবর নিয়ে মামার অন্তর্ধানের কাহিনী শুনেছিল। একেবারে সেই বাঘের গুহায় গিয়ে পড়লে কী হত, তা না গিয়েও হীরালাল বেশ অনুমান করতে পারে। কারণ পথের মধ্যেই বহুবার বহু দলের হাতে পড়ে জানটা যেতে বসেছিল। সে 'বাংগালী', অতএব আংরেজের দলের লোক অথবা তাদের গোয়েন্দা—এই সন্দেহ প্রায় সকলেরই। হীরালাল যতটা সম্ভব রাজপথ এড়িয়েই চলেছিল—সিপাহীদের হাতে ধরা পড়বার ভয়ে। গ্রামবাসীদের তবু নানা মিথ্যা বলে বোঝানো যায়—সিপাহীদের বোঝানো কঠিন।

কিন্তু গ্রামবাসীদের কাছেও জবাবদিহি বড় কম করতে হল না। এক-এক জায়গায় তারা রীতিমত নাস্তানাবুদ করে ছাড়ল।

গোয়েন্দা সন্দেহটাই বেশি। 'বেইমান বেশরম বাংগালী লড়াই করতে জানে না—জানে গোয়েন্দাগিরি করতে, আর চুকলি খেতে।'—এই অভিযোগ সর্বত্র।

গ্রামবাসীদেরও বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না। ওধারে 'পুরব'-থেকে-আসা-ইংরেজদের বর্বর অত্যাচারের কাহিনী,—কিছু কিছু হয়তো বা অতিরঞ্জিত

হয়েই ছড়িয়েছে। সেই অগ্রসরোন্মুখ দলেরই গোয়েন্দা সে,—এই সন্দেহটাই মারাত্মক। ভয় থেকে বিদ্বেষ। ও দলের একটা লোককে হাতে পেয়ে শোধ নেবার ইচ্ছাও স্বাভাবিক।

হীরালাল কোন মতে, অবস্থা বুঝে কোথাও ভয় দেখিয়ে, কোথাও যুক্তিতে সন্দেহ ভঞ্জন করে, কোথাও বা মিষ্ট কথায় তুষ্ট করে—অথবা দিব্যি গেলে, অব্যাহতি পেল। দিব্যি গালতে তার বাধে নি, কারণ গোয়েন্দা সে নিশ্চয়ই নয়।

নাস্তানাবুদ যতই হোক, এদের সম্বন্ধে একটা সহানুভূতি না করেও পারল না। ইংরেজদের যে দল কলকাতা থেকে এগিযে আসছে, তাদের বর্বর অত্যাচারের যে সব কাহিনী তার কানে আসতে লাগল, তাব অর্ধেক সত্যি হলেও ভয়াবহ। এখানকার গ্রামবাসীদের সঙ্গে কথা বলে সে বুঝল, এদের বেশির ভাগই নিরীহ। সিপাহী-অভ্যুত্থানের সঙ্গে তারা বিন্দুমাত্র জড়িত নয়, এমন কি সহানুভূতিসম্পন্নও নয। মুসলমানদের কেউ কেউ বরং স্থানীয় মোল্লা বা মৌলবীদের আদেশে 'গুনাহ্‌গারি'ব ভযে কিছু কিছু বরং সাহায্য করতে বাধ্য হযেছে, কিংবা কেউ কেউ হযতো মুসলমান বাদশাহির আশাও রাখে; হিন্দুরা কেউ প্রসন্ন নয। তাবা প্রায সকলেই মনে-প্রাণে 'আংরেজ সরকার' কামনা করে। কারণ এ রাজত্বে তাদের ওপর থেকে মোল্লা-মৌলবীর অত্যাচার কমেছে—বর্গী-জাঠ-রোহিলা-ঠগীর অত্যাচার বন্ধ হয়েছে। মোটামুটি অনেক দিন পরে একটু শান্তির মুখ দেখেছে তারা। এমন কি জাযগীরদাবের অত্যাচারও (যেটা স্বাভাবিক এবং সঙ্গত বলেই মনে করে অনেকে—ভাগ্যদোষে বা কর্মফলে যখন তারা গরীবের ঘরে জন্মেছে, এটা তো সইতেই হবে!) যে কিছুটা সংযত হয়েছে তাতেও তো সন্দেহ নেই। লড়াই বেধে পর্যন্ত এরা ইংরেজের জয়ই চেয়েছে। অথচ এই একেবারে সম্পূর্ণ নিরপরাধ ও নির্দোষ মানুষগুলোকেই অপরের নির্বুদ্ধিতা ও অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করতে হচ্ছে। আর, কি কঠোর সে প্রায়শ্চিত্ত। বৈব-নির্যাতনের নিত্য নূতন পৈশাচিক উপায় উদ্ভাবনই নাকি তরুণ ইংরেজ অফিসারদের একটা কৃতিত্ব-প্রতিযোগিতার বিষয় হয়ে উঠেছে।

তবু, যতই সে লক্ষ্ণৌএর দিকে অগ্রসর হয, এধারের খবরেও মনটা দমে যায়। এদিকে সর্বত্রই ইংরেজের শোচনীয় পরাজয় ঘটেছে—কোথাও এতটুকু আশার সংবাদ নেই। যদি এধার থেকে সত্যিই ইংরেজ-শক্তি একেবারে

বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং নিশ্চিন্ত সিপাহীরা সত্যই সংঘবদ্ধ হতে পারে (মনে তো হয় না, তবু—), তা হলেও এ 'পুরবী' ইংরেজরা কি তাদের সামনে দাঁড়াতে পারবে শেষ পর্যন্ত ?

হীরালালের বিলেত সম্বন্ধে কোন ধারণা নেই। ইংরেজের শক্তি কত তাও সে জানে না। সিপাহীদের মুখে কদিন ধরে অবিরত শুনছে যে সেটা নিতান্তই অতি ক্ষুদ্র দেশ, তাদের শক্তিও নগণ্য, সিপাহীরা আছে বলেই আংরেজ সরকার চলেছে। ফলে মামার সেই 'জাহাজ জাহাজ গোরা'র ওপর খুব ভরসা নেই তার। ইংরেজের সঙ্গে নিজের ভবিষ্যতের কথা ভেবেও সে একটু চিন্তাগ্রস্ত হল। চাকরি থাকবে না সেটাই বড় কথা নয়। শেষ পর্যন্ত সে বিশ্বস্তভাবে ইংরেজের নৌকরি করেছে—এ কথাটা কিছুতেই চাপা থাকবে না, ধরা পড়বেই। তখনকার কথাটা ভেবেই শিউরে উঠল সে। ইংরেজদের কাছে শেখা প্রতিহিংসার এই সব কৌশল কি তখন ইংরেজ ও তার নৌকরদের ওপর দিয়েই পরখ করা হবে না? মৃত্যু তো বটেই—হয়তো ভয়াবহ শোচনীয় মৃত্যুই অদৃষ্টে আছে!

এক এক বার মনে হল, মামার পথ অনুসরণ করে সে দেশের দিকেই পালায়। কিন্তু এতটা পথ একা নিঃসম্বল অবস্থায় যাওয়া কি সম্ভব? মামার সঙ্গে মোটা টাকা আছে—তার যে কিছুই নেই! তা ছাড়া বাংলাদেশে পৌঁছতে পারলে একরকম নিরাপদ বটে, কিন্তু তার আগে দীর্ঘ অরাজক পথ অতিক্রম করতে হবে। পাটনা, আরা সর্বত্র ইংরেজ-বিদ্বেষ মাথা তুলেছে—আবার ইংরেজের হাতে পড়লেই বা কী হবে কে জানে? শুনছে বলিষ্ঠ তরুণ 'নেটিভ'দের ওপরই ওদের আক্রোশ নাকি সবচেয়ে বেশি।

অর্থাৎ এক কথায় রামে মারলেও মারবে—রাবণে মারলেও মারবে।

তার চেয়ে যথাস্থানে ফিরে যাওয়াই ভাল। অদৃষ্টে যা আছে তাই হোক। কর্তব্য পালনের চেষ্টা তো তবু করতে পারবে।

কিন্তু কাছাকাছি এসে আরও যেসব সংবাদ পেল, তাতে বুকটা আরও দমে গেল। লক্ষ্ণৌএর যা অবস্থা শুনছে—ইংরেজ-শিবিরে ঢোকা যাবে তো? সেই চেষ্টাতেই না প্রাণটা খোয়াতে হয়!

শহরে গিয়ে তার সেই দোকানঘরের পিছনের বাসাতে দিনকতক ঘাপটি মেরে থাকতে পারে, কিন্তু সে তো আর বিনাপয়সায় থাকতে দেবে না—খেতে

তো দেবেই না। মামার ভাষায় 'রেস্ত' চাই। সে রেস্ত কোথায়? মাইনে-পত্র তো সব পড়ে রইল। সঙ্গে যা ছিল, কদিনে পথেই শেষ হয়ে গেছে।

শেষ পর্যন্ত কানপুরেই যাবে নাকি?

সেখানে সিপাহীদের হাতে পড়লেও তার রক্ষাকারিণী দেবী আছেন, সর্দার খাঁ আছে। পরিত্রাণ পেতে পারে। কিন্তু সেখানে গিয়েই বা কী করবে? সিপাহীদের দলে সে থাকবে না কিছুতেই। এক উপায় হুসেনী বেগমের কাছ থেকে কিছু অর্থ নিয়ে লক্ষ্ণৌতে ফেরা এবং ঘটনাবলীর পরিণতির অপেক্ষা করা। কিন্তু—কথাটা মনে আসার সঙ্গে সঙ্গেই তার কানের ডগা পর্যন্ত লাল হয়ে উঠল—যাঁকে তার সব কিছু উজাড় করে দেওয়া উচিত, তাঁর কছে হাত পেতে ভিক্ষে করা? ছিঃ! বরং পথে-ঘাটে মজুর খেটে খাওয়াও ভাল।

কোন কিছুই ঠিক হল না। কিন্তু অবশেষে এমন একটা সময় এল যে মন, আর স্থির না করলেই নয়। এই অবস্থায় কানপুর ও লক্ষ্ণৌএর মাঝামাঝি একটা জায়গায় পুরো একটা দিনই আলস্যে ও চিন্তায় কাটাতে হল। চটি-ওয়ালা দোকানী তার গতিবিধি ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ হয়ে জেরা করতে 'জ্বরভাব হয়েছে' এই অজুহাতে দিয়ে তখনকার মত অব্যাহতি পেল সত্য, কিন্তু পরের দিন কী অজুহাত দেবে, সে কথা ভেবে আরও চিন্তিত ও বিব্রত হয়ে পড়ল।······

সম্ভবত মা-কালীকে সে মন দিয়েই ডেকেছিল। সেই ঐকান্তিক ডাকেই তিনি তার কর্তব্য স্থির করে দিলেন।

এক বিচিত্র ঘটনা ঘটল সেদিনই।

সারা দিনটা গরমে এবং চিন্তায় দগ্ধ হয়ে সন্ধ্যার আগে প্রকৃতির রুদ্রতেজ প্রশমিত হলে সে স্নান করে চটির বাইরে একটা গাছতলায় এসে বসল। সবে বসেছে, নজরে পড়ল পশ্চিমদিকের রাস্তা ধরে একটি স্ত্রীলোক এদিকে আসছে। ঘটনাটা এমন কিছু আশ্চর্য নয়, তবু সে কিছু বিস্মিতই হল। কারণ স্ত্রীলোকটির পরনে মুসলমানের বেশ, অথচ বোরখা নেই। তার ওপর ওর গতিটাও যেন কেমন কেমন—উদ্দেশ্যহীন, উদাসীন, ক্লান্ত, মন্থর। সাধারণতঃ অপরিচিত স্ত্রীলোক আসতে দেখলে মাথা নামিয়ে নেওয়াই হীরালালের অভ্যাস, কিন্তু এর ভাবভঙ্গি এমনই যে চেয়ে না থেকে পারল না। আর চেয়ে থাকতে থাকতেই মনে হল—এই চলনটা তার একেবারে অপরিচিত

নয়; আরও একটু পরে মনে পড়ল, ঐ দৈহিক গঠনটার সঙ্গেও তার কোন সূত্রে পরিচয় আছে।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সে লাফিয়ে উঠল।

হুসেনী বেগম? তার রক্ষাকর্ত্রী দেবী? এই সংকটকালে কি তিনিই আবার দেখা দিলেন?

বোধ করি সে সারাদিন আমিনার কথাই ভাবছিল, অথবা এমন বার বার এই মহিলাই তাকে রক্ষা করেছেন যে হযতো মনের অবচেতনে তাঁরই আবির্ভাব সে আশা করেছিল। তাই কথাটা মনে হবামাত্র কোন অগ্রপশ্চাৎ না ভেবেই সে ছুটে একেবারে তাঁর সেই গমনপথের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। এ কথা এক বারও মনে হল না যে হুসেনী বেগমের পক্ষে এমন সামান্য বেশে পায়ে হেঁটে এভাবে আসা সম্ভবপর নয়।

কিন্তু সামনে গিয়েই অপ্রস্তুত হল।

অনেকটা সেই রকম, কিন্তু তবু সে নয়।

লজ্জার পরিসীমা রইল না। ইনিই বা কী মনে করছেন—অপর কেউ দেখলেই বা কী ভাববে! অসৎ উদ্দেশ্য আছে মনে করে মারধোর করাও তো বিচিত্র নয়। কোনমতে প্রায় অস্ফুট কণ্ঠে 'মাপ করবেন' বলে সে ফিরে আসছিল—শশকের মতই তখন মুখটা কোথাও লুকোতে পারলে যেন বেঁচে যায় এমন অবস্থা—সহসা সেই স্ত্রীলোকটিই পেছন থেকে ডাকল, 'শোন' তুমি বাঙালী'

বিস্ময়ের বুঝি শেষ হবে না আজ! আরক্ত নতমুখে ফিরে দাঁড়াল হীরালাল—কোনক্রমে ঘাড় নাড়ল।

'তোমার নাম হীরালাল?'

আরও বিস্ময়! হীরালাল এবার ঘাড় না তুলে পারল না।

বলল, 'হ্যাঁ। কিন্তু আপনি?'

'আমাকে তুমি হুসেনী বেগম ভেবেছিলে, না?'

বিস্ময়ের মধ্যেও কোথায় যেন অস্পষ্টতা কেটে যাচ্ছে।

'হ্যাঁ।'

'আমি তারই বোন। তোমাকে দেখেই চিনেছি।'

এবার হীরালালও বুঝতে পারল।

জরুন্নিসা বিবি—এর কথা সে শুনেছে!

কিন্তু এভাবে কেন? এবার কথাটা মনে হল—যেটা বহু আগে মনে হওয়া উচিত ছিল। সে প্রশ্নটা করেও বসল।

ক্লান্ত কণ্ঠে উত্তর এল, 'সে কথা থাক।—তুমি আমিনাকে খুব ভালবাস, না? খুব ভক্তি কর। আমি তার মুখেই তোমার কথা সব শুনেছি। তুমি ভক্তি কর বলেই সে তোমাকে সমীহ করে—হয়তো তোমার কথা সে শুনবে। দেখ, তুমি একবার কানপুরে যাও। সে সর্বনাশের নেশায় মেতেছে, রক্তে হোলি খেলছে সে। অকারণ, অর্থহীন রক্তপাত। ভুল পথে যাচ্ছে। এপথে গেলে সে বাঁচবে না। যাও একবার, যদি তাকে ফেরাতে পার।'

'কিন্তু—'বিস্মিত হতচকিত হীরালাল আরও কী প্রশ্ন করতে গেল, ইঙ্গিতে নিরস্ত করে আজিজন বলল, 'আর বেশি বলতে পারব না হয়তো সময়ও নেই, তবু বলছি তুমি যাও। যেতে যেতে পথেই শুনবে সব। পার তাকে নিরস্ত কর।'

আজিজন আর দাঁড়াল না। যেমন চলছিল তেমনি উদ্দেশ্যহীন লক্ষ্যহীন ভাবেই হাঁটতে লাগল।

হীরালাল তাকে বাধা দিতে পারল না, কথা বলারও আর অবসর পেল না, কতকটা স্তম্ভিতভাবে সেদিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল শুধু।

মলিন রৌদ্রদগ্ধ মুখ, ধূলিধূসর বেশভূষা—

এরকম হবার তো কথা নয়।

পাগল হয়ে যায় নি তো?

কিন্তু তবু তার কর্তব্য স্থির করেই দিয়ে গেল আজিজন, একটা যা হোক পথ সে দেখতে পেয়েছে।

ওর কথা যদি সত্যি হয়?

হয়তো না-ও হতে পারে, হয়তো কথাটা উন্মাদের প্রলাপ, কিন্তু তবু হীরালাল সে 'হয়তো'র ওপর ভরসা করে থাকতে পারবে না।

আমিনা বিপন্ন—হীরালাল তার কাজে লাগতে পারে, তাকে বাঁচাতে পারে, এ সম্ভাবনাটাও তো কম নয়!

সুতরাং তার এখন এই একটিই মাত্র পথ—কানপুরের পথ।

কানপুরের উপান্তে পৌঁছেই সাংঘাতিক সংবাদটি পেল হীরালাল। ইংরেজদের অবরোধ আর নেই, তাদের নিরাপদে এলাহাবাদে যাবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে নানাসাহেব সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেছেন, সতীচৌরা ঘাটে নৌকায় ওঠবার পর নৃশংসভাবে তাদের হত্যা করিয়েছেন। কিন্তু মেমসাহেব ও কয়েকটি শিশু বেঁচেছে—সে-ও সিপাহীরা তাদের মারতে অস্বীকার করেছিল বলে। তাদের বিবিঘর নামক একটি ছোট্ট বাড়িতে আটক রাখা হয়েছে—তারাই বা কদিন কে জানে।

যে দোকানে হীরালাল আশ্রয় নিয়েছিল সে দোকানীটি বেশ ওয়াকিফ-হাল। সে গলার স্বর নামিয়ে বলল, 'অবিশ্যি শুনছি নানাসাহেব একথা ঘুণাক্ষরেও জানতেন না, ওঁর সেই মারাঠী উজিরও না। এমন কি সিপাহীরা নাকি গোড়াতেই সাফ জবাব দিয়েছিল। করিয়েছে ঐ আজিমুল্লা খাঁ। ভারি ধড়িবাজ। এমনভাবেই নানাসাহেবকে জড়াতে চাইছে যাতে নানার না ফেরার পথ থাকে। এদের ডুবিয়ে উনি যে বেঁচে গিয়ে, আবার আংরেজের সঙ্গে খাতির জমাবেন—সেটি হতে দিচ্ছে না এরা। শুনছি'—গলার স্বর আরও নামিয়ে দোকানীটি বলল, 'ঐ মেমসাহেবগুলোকেও ছেড়ে কথা কইবে না। তারই নাকি মতলব আঁটছে।—নানাসাহেব তো বিঠুরে চলে গেছেন। ওঁর যে সব বন্দী নিয়ে যাবার নিয়েই তো গেছেন সঙ্গে। এদের ছেড়ে গেলেন কেন? সবই ঐ খাঁ সাহেবটির বুদ্ধি।...দেখা যাক্, আমাদের কী বল না ভাই, বসে বসে দেখা বৈ তো নয়। তবে যদি আংরেজ আসে আবার—এর জন্যে শোধ তুলবে। কাউকে আর আস্ত রাখবে না শহরে।··· আমি সেই ভয়ে ঘরওয়ালীদের সব লক্ষ্ণৌহাতে পাঠিয়ে দিয়েছি—একা আছি, আমি আর এই বুদ্ধু চাকরটা। তেমন বুঝলে আমিও সরব।'

নিজের বুদ্ধির গর্বে দোকানীর মুখখানা উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

এতক্ষণে আজিজন বিবির বক্তব্য হীরালাল বুঝল।

'রক্তে হোলি খেলা' ও 'সর্বনাশের নেশা' কোনটাই বাহুল্য-উক্তি করে নি সে। আজিমুল্লা খাঁই সব করিয়েছেন, কিন্তু তাঁর পেছনে কোন্ শক্তি

কাজ করছে না করছে তা দোকানী বুঝবে না। হীরালাল স্বচ্ছন্দে অনুমান করতে পারে।

সে আর বসল না। সামান্য তল্পী দোকানীর জিম্মা করে দিয়ে কুয়ার জলে মুখ-হাত ধুয়ে নিয়েই বার হয়ে পড়ল।

প্রথমেই গেল সে কসাইটোলা। একেবারে প্রাসাদে যেতে সাহস হল না। সিপাহীর বেশ সে কিছুদিন আগেই ফেলে দিয়েছে—পথে নানা জাবাবদিহি করতে হত। এখন সাদাসিধে বাঙালীর পোশাক—ধুতি ও পিরান। এ অবস্থায় প্রাসাদে ঢুকতে পারবে কিনা ঠিক কি? হয়তো বাঙালী দেখেই আগে গ্রেপ্তার করবে।

কিন্তু সর্দার খাঁর দোকানে গিয়ে দেখল সর্দার নেই, তার সহকারী কসাইটিও নেই; একটা বাচ্চা চাকর অতি সামান্য মাংসের পণ্য নিয়ে বসে আছে। সে কিছু বলতে পারল না, শুধু বলল যে সকালের দিকেই প্রাসাদ থেকে কে এক জন সর্দার খাঁকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল। অল্পক্ষণ পরেই সর্দার ফিরে এসে তার সহকারী এবং আশপাশের দোকান থেকে অপর কয়েক জন কসাইকে সঙ্গে নিয়ে চলে গেছে—এখনও ফেরে নি।

অতি সাধারণ খবর, হয়তো নিতান্তই তুচ্ছ ঘটনার ইতিহাস --কিন্তু কে জানে কেন, হীরালাল বুকের মধ্যে একটা হিম শৈত্য অনুভব করল। নিজেকে বড় দুর্বলও মনে হল কিছুক্ষণের জন্যে।

কিন্তু দাঁড়ালে চলবে না। অপেক্ষা করার সময় নেই।

অথচ কোথাই বা যাবে সে? প্রাসাদে? হুসেনীকে আগে খুঁজে বার করাই তো উচিত।

ওদিকে সর্দার খাঁ অনেকক্ষণ বের হয়েছে, এখনও ফেরে নি। তার মনের মধ্যে কে যেন বলতে লাগল তার এই স-দলবল অভিযানের সঙ্গে বিবিঘরের ঐ বন্দিনীদের কোথায় একটা যোগাযোগ আছে।

সে মুহূর্ত-খানেক ভেবে স্থির করল, কিছু হোক বা না হোক, বিবিঘরে যাওয়াই ভাল। সেখানে সিপাই-সান্ত্রী এবং সর্দার খাঁর দলের মধ্যে গিয়ে হয়তো কিছু করতে পারবে না সত্য কথা, কিন্তু অনুনয়-বিনয় করে অল্প কিছুক্ষণ সময় তো অন্তত চেয়ে নিতে পারবে। ..

কিন্তু বিবিঘর কোন্ দিকে? কেউই তো জানে না।

দু-একজন পথিককে জিজ্ঞাসা করল, তারা কেউ বলতে পারল না। এক জন বলল, নামটা সে কদিন শুনেছে বটে, তবে কোথায় কী বৃত্তান্ত তা সে জানে না।

অবশেষে এক মিঠাইওয়ালার কাছে হদিস মিলল। সে প্রথমে সন্দিগ্ধ ভাবে তার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, 'কেন বল তো? সেখানে তোমার কী দরকার?' তার পর হীরালাল সেদিক দিয়ে তাকে সন্তুষ্ট করবার চেষ্টা না দেখানোয় নিতান্ত বিরক্ত হয়েই একটা পথের নির্দেশ দিল।

হীরালাল যতদূর সম্ভব জোরে পা চালাল এবার।

কিন্তু পথের নির্দেশ অর্থে কতকটা শুধু দিকেরই নির্দেশ। কিছু দূর গিয়ে আবার পথ জিজ্ঞাসা করবার প্রয়োজন হল। এবার যাকে জিজ্ঞাসা করল, সে শুধু পথটা জানে না, দেখা গেল আরও অনেক কিছু জানে।

সে একেবারে হীরালালের হাত দুটো চেপে ধরল, বলল, 'ওঁহা? মৎ যাইয়ে ভাই সাহাব, মৎ যাইয়ে। ওঁহা শয়তান কা এক আজব খেল চল্ রহা হ্যায়।'

হীরালাল বুঝল সে খুবই অভিভূত হয়ে পড়েছে, যে দুটো হাতে তার হাত ধরে আছে, তা থর থর করে কাঁপছে।

কিন্তু হীরালালের আর তখন অপেক্ষা করলে চলে না, সে উদ্বিগ্ন ব্যাকুল কণ্ঠে তাকে একটা ঝাঁকি দিয়ে প্রকৃতিস্থ করবার চেষ্টা করল।

'কী হয়েছে ভাইয়া, বল, বল, জলদি বল। কী চলছে সেখানে?'

লোকটি অল্পবয়সী, বেশভূষায় মনে হয় শিক্ষিত ভদ্রঘরের ছেলে। সে সত্যিই ভয় পেয়েছে। এতক্ষণে হীরালাল ভাল করে চেয়ে দেখল তার মুখেচোখে দারুণ আতঙ্ক।

সে কোনমতে, জড়িয়ে জড়িয়ে বহু অসংলগ্ন কথার সঙ্গে যা বলল তার অর্থ হচ্ছে এই যে, আজ দুপুরের দিকে বিবিঘর থেকে সিপাই-সান্ত্রী সরিয়ে নেওয়া হয়েছে, ফটকের চাবি দেওয়া হয়েছে একদল কসাইএর হাতে—তারা ভেতরে ঢুকে নির্বিচারে সবাইকে কাটছে, এক জনও, এমন কি একটা শিশুও বোধ হয় তাদের সে রুধির-তৃষা থেকে অব্যাহতি পাবে না। কাটছে আর কুয়ায় ফেলছে—কুয়াটা বোধ হয় এতক্ষণে ভরে গেল!

কথাটা শুনেছিল অপরের মুখে, বিশ্বাস হয় নি, কৌতূহলী হয়ে দেখতে গিয়েছিল। ভেতরে ঢোকে নি, বাইরে থেকেই যা দেখেছে তাতেই তার

কৌতূহল মিটে গেছে। সম্ভবত এখন কিছুকাল সে মুখে কোন খাদ্য তুলতে পারবে না—রাত্রের ঘুম তো গেলই!

হীরালালের পা দুটো ভারী পাথর হয়ে উঠল।

তবু তাকে যেতেই হবে—এখনও যদি এক জনকেও সে বাঁচাতে পারে ছসেনীর পাপের বোঝা থেকে যদি এতটুকুও কমে!

সে ব্যগ্র ব্যাকুল কণ্ঠে বলল, 'তবু আমাকে যেতেই হবে ভাইসাব। বল, কোনদিকে, কতদূরে?'

কাঁধের ও হাতের একটা হতাশ ভঙ্গি করে কোনমতে পথটা দেখিয়ে দিয়ে ছেলেটি প্রায় টলতে টলতে চলে গেল। আর হীরালাল নির্দিষ্ট পথে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটল।...

কিন্তু বিবিঘর পর্যন্ত তার আর যাওয়ার প্রযোজন হল না। কাছাকাছি আসতেই নজরে পড়ল, সর্দার খাঁ এই পথ ধরেই এদিকে আসছে। সর্দার খাঁ—কিন্তু এ কী মূর্তি তার!

ভয়ে হীরালালের বুক কেঁপে উঠল।

সাক্ষাৎ কৃতান্ত-সহচরের মতই দেখাচ্ছে তাকে। দানবীয় মুখখানা আরও দানবীয়, আরও পৈশাচিক হয়ে উঠেছে। চোখদুটো জবাফুলের মতই লাল, আর তার সর্বাঙ্গে—দু হাতে, কাপড়ে-জামায়, মুখে-মাথায় রক্ত। তাজা রক্তে তার জামাটা ভিজে, বোধ করি পথে রক্ত ঝরতে ঝরতেই এসেছে। মনে হচ্ছে, সাক্ষাৎ রক্তবর্ণ একটা দানব হেঁটে আসছে!

হীরালালের হাত-পা অবশ অনড় হয়ে গিয়েছিল। ছুটে পালাবার ইচ্ছে হল একবার—পালাতে-পারল না। পা দুটো টানবার শক্তি ছিল না। কিছু ভাবতেও পারল না। আপৎকালে কোনকিছুই যেন মনে পড়ল না। পাষাণের মত অচল হয়ে দাঁড়িয়ে অসহায়ভাবে চেয়ে রইল শুধু।

সর্দারের হাতে তখনও একখানা তলোয়ার ধরা রয়েছে। সেটারও সবটা, মায় বাঁটের কাছ পর্যন্ত, রক্তে রাঙা, এখনও তাতে কাঁচা রক্ত লেগে। হীরালাল বুঝল মাথায় খুন চড়েছে দানবটার, হত্যার নেশা পেয়ে বসেছে তাকে! ঐ তলোয়ার এখনই—সামনে পড়ে গেলে—হয়তো তারই গলায় পড়বে।

কিন্তু একেবারে তার সামনে এসে সর্দার থেমে গেল। থামতে হল, কারণ হীরালাল দাঁড়িয়ে আছে পথ জোড়া করেই। একটা ক্রুদ্ধ ভ্রূকুটি করল সে, একবার অভ্যস্তমত তলোয়ারটাও তুলল, তার পরই যেন চিনতে পারল

হীরালালকে। একবার তার দিকে একবার তলোয়ারের দিকে, আর একবার স্বপ্নাবিষ্টের মত চারিদিকে তাকিয়ে দেখল। ধীরে ধীরে ভ্রূকুটি মিলিয়ে গেল ললাট থেকে—প্রায় চুপি চুপি বলল, 'ও, হীরালাল ভাইয়া।'

আর একবার নিজের পোশাকের দিকে ও হাতের দিকে চাইল, তার পর তলোয়ারখানা দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে পাগলের মত খানিকটা হেসে নিল। তেমনি চুপিচুপিই বলল, 'হীরালাল ভাইয়া, আমার একটা উপকার করবে?, মালেকানের কাছে যাবে এক বার? তাঁকে ব'ল যে, তাঁর বান্দা সর্দার তাঁর হুকুম তামিল করেছে—অক্ষরে অক্ষরে করেছে, কেউ বাকি নেই, বাল-বাচ্চা কেউ না···আমি, আমি আর এখন যেতে পারছি না। এই খবরটা শুধু পৌঁছে দিও তাঁকে, কেমন?'

আরও খানিকটা হেসে নিয়ে সর্দার খাঁ চলে গেল।

হীরালাল আর দাঁড়াতে পারল না। সেখানেই পথের ধুলোর ওপর বসে পড়ল। তার হাতে-পায়ে কোন জোর নেই, মাথা ঝিম্ ঝিম্ করছে, ভেতরে ভেতরে একটা কাঁপুনি লেগেছে—এই প্রচণ্ড গ্রীষ্মের অপরাহ্নে যার কোন বাহ্য কারণ বা যৌক্তিকতা নেই।

সৌভাগ্যক্রমে পথটা তখন নির্জন—খুবই নির্জন। একে এখানটায় এমনিই বসতি কম—আশেপাশে অধিকাংশ বাড়িই আবাস-গৃহ নয়, গোলদারী গুদাম। তার ওপর সিপাহীরা এদিকে আড্ডা করায় দু-এক জন যারা ছিল, তারাও ঘরবাড়ি ছেড়ে পালিয়ে গেছে। সিপাহীরাও আজ নেই, সুতরাং লোকজন এদিকে থাকবার বা আনাগোনা করবার কথা নয়।

হীরালাল অনেকক্ষণ বিহ্বল হয়ে বসে রইল। এত রক্ত সে জীবনে দেখে নি। পুজোর সময় মামার বাড়ি যেত প্রায়ই। মামার এক জ্ঞাতি কাকার বাড়িতে ঘটা করে দুর্গাপুজো হত, নবমীর দিন পাঁঠা ও মহিষ বলি হত অনেকগুলি। পাড়ায় অনেকে 'মানত'-বলিও দিতে আনত ঐ দিনে। খুব ছেলেবেলায় কী দেখেছে মনে নেই—একটু বড় হলে, সে একবার বলি দেখতে দেখতে অজ্ঞানের মত হয়ে গিয়েছিল! অবশ্য সে শুধুই রক্ত দেখে নয়, অবিরাম বলি দিতে দিতে শেষ অবধি কামারটার মাথায় খুন চেপে গিয়েছিল, সে কেবল নাচছিল এবং খড়্গ আস্ফালন করে হুঙ্কার দিচ্ছিল, 'লে আও, আভি লে আও!' তার সেই অবস্থা দেখে সকলে সন্ত্রস্ত এবং কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে

পড়েছিল। অনেক চেষ্টায় অনেক কৌশলে তার কাছ থেকে খাঁড়াটা কেড়ে নেওয়া হয় এবং একটা দড়ি দিয়ে বেঁধে তার মাথায় বালতি বালতি জল ঢেলে তবে তাকে শান্ত করা হয়। সেই কামারটার কাণ্ড দেখেই বালক হীরালাল নাকি 'ভিরমি' গিয়েছিল। সেই থেকে তার মা তাকে নবমীর দিন আর পুজোবাড়ি যেতে দিতেন না।

আজও তার সেই অবস্থা হল নাকি? তবু সর্দার খাঁকে বাহাদুরি দিতে হবে—এতগুলো নরবলি দিয়েও সে প্রকৃতিস্থ কাছে।

আর সে? শুধু সেই লোকটাকে দেখেই এমন হয়ে গেল? সে না জোয়ান পুরুষ?

মাথাটায় ঝাঁকানি দিয়ে যেন নিজেকে কিছুটা সহজ করতে চাইল।

এখন তার কাজই বা কী? নির্বোধের মত প্রশ্ন করল নিজেকে।

হুসেনীর কাছে যাওয়া? আর কি প্রয়োজন? সর্দার খাঁ তাকে খবর দিতে বলেছে, কিন্তু খবর তো সে পাবেই।

তবু হয়তো এখনও ভয়ঙ্কর আরও কী মতলব আঁটছে সে—গিয়ে পড়লে এখনও হয়তো সেই সম্ভাব্য ভয়াবহ পাপ থেকে নিবৃত্ত করা যায়।

তা ছাড়া এই সমস্ত রকম অরুচিকর ইতিহাস এবং বীভৎস ঘটনার পরও, বোধ করি এই সকলের প্রাণকেন্দ্র সেই নারীকে দেখবার একটা ইচ্ছাও প্রবল হয়ে উঠল। তাই কর্তব্যের যুক্তিতে মনকে বুঝিয়ে আবার ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল।

কিন্তু পা বাড়াতে গিয়েই যেন একটা ধাক্কা খেয়ে থেমে গেল সে।

এতক্ষণ অর্ধ-অচেতন হয়ে বসেছিল বলেই বোধ হয় দেখতে পায় নি—দূরে, এই পথেরই প্রান্তে, পাষাণ-প্রতিমার মত এক রমণী দাঁড়িয়ে আছে, সম্ভবত তারই দিকে চেয়ে। 'সম্ভবত' এইজন্য যে তার আপাদমস্তক বোরখায় ঢাকা। ঠিক বোঝবার উপায় নেই।

দেখবার সঙ্গে সঙ্গে হীরালালের সর্বাঙ্গে একটা শিহরণ খেলে গেল।

মুখ এবং সর্বাঙ্গ আবৃত থাকলেও তার বুঝতে দেরি হল না যে ঐ রমণীই আমিনা।

সে দাঁড়িয়ে গেল, আর তার থমকে দাঁড়িয়ে যাবার ভঙ্গিতেই আমিনা বুঝতে পারল যে, হীরালাল তাকে চিনেছে। হয়তো তার দেখা করবার ইচ্ছা ছিল না, হয়তো হীরালাল তাকে না দেখে চলে গেলে সে আর ডাকত না।

কিন্তু এখন আর আত্মগোপনের প্রযোজন রইল না—সে-ই হীরালালের দিকে এগিয়ে এল।

কাছে এসে মুখের ওপর থেকে বোরখা সরিয়ে একটা অস্বাভাবিক কর্কশকণ্ঠে বলল, 'তুমি এখানে কেন? কী করছ?'

তার চোখের দিকে চাইতে পারে নি হীরালাল, কাছে আসতেই মুখ নামিয়েছিল। তেমনি ভাবেই ধীরে ধীরে জবাব দিল, 'আমি, আমি আপনাকে এ কাজ থেকে, এই সর্বনাশ থেকে নিবৃত্ত করবার জন্য এসেছিলাম বেগমসাহেবা, কিন্তু আমার দেরী হয়ে গেছে। আপনার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে—একজনও আর ওখানে বেঁচে নেই, সর্দার খাঁ সব শেষ করেছে। সে নিজে আপনার কাছে আর যেতে পারে নি—আমাকে এই খবরটা দিতে বলে গেছে।''

বলতে বলতেই তার গলা ভেঙে এসেছিল, এবার সে হু হু-হু করে কেঁদে ফেলে বলল, 'কেন, কেন এ কাজ করলেন বেগমসাহেবা, কেন এমন সর্বনাশা বুদ্ধ আপনার মাথায় এল? আমি যে আপনার সম্বন্ধে খারাপ কিছু ভাবতেই পারি না। আমি যে আপনাকে দেবী বলেই জানি।'

আমিনার রূঢ় কণ্ঠ কোমল হয়ে এল। সে কাছে এসে হীরালালের কাঁধে একটা হাত রাখল, তার পর ঈষৎ ম্লান হেসে বলল, 'মিথ্যে একটা ধারণা নিয়ে কষ্ট পাচ্ছিলে বাবুজী, ভালই হল ভুল ভেঙে গেল। আমি দেবী নই, মানবীও নই—আমি পিশাচী, এ-ই আমার সত্য পরিচয়। যদি কখনও তোমার কাজে এসে থাকি, যদি কোন উপকার করে থাকি তো সে নিজের স্বার্থের জন্যেই করেছি। তুমি আমাকে ভুলে যাও। নিতান্ত ভুলতে না পার, আমার স্বরূপ তো দেখে গেলে—পিশাচী বলে ঘৃণা ক'র। তা হলে আর অশান্তি ভোগ করবে না।—এ সব গোলমাল থেকে বাঁচতে চেষ্টা কর হীরালাল—এখানে আর থেকো না। ইংরেজ আসছে—তার প্রতিহিংসার মুখে পড়লে তুমি বাঁচবে না। যাও, লক্ষ্ণৌতে ফিরে যাও, যেমন করেই হোক তোমার দপ্তরে গিয়ে যোগ দাও। ইংরেজের আশ্রয়ই তোমার সবচেয়ে নিরাপদ। দেশে ফিরে যেতেই বলতাম, কিন্তু এখন আর নিরাপদে তোমার দেশে ফেরবার উপায় নেই। তুমি আজই লক্ষ্ণৌ রওনা হও। আর, আর মনে রেখো—আমি পিশাচী, শয়তানী—আমাকে ঘৃণা ক'র।'

এবার হীরালাল মুখ তুলে চাইল, অশ্রুরুদ্ধ গাঢ়কণ্ঠে বলল, 'তুমি পিশাচী নও, তুমি দেবী। যখন তুমি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছিলে, তখন স্বার্থের কথা ছিল না।

এখনও আমার কল্যাণ-চিন্তাই করছ। তুমি যা করেছ—যা করছ, তার অর্থ তুমিই জান। আমার কাছে তুমি দেবী। তোমাকে আমি ভুলব না—তোমার বিচারও করব না। এ প্রাণ তোমারই দেওয়া, যতদিন প্রাণ থাকবে তোমারই মঙ্গল-চিন্তা করব—মনে মনে তোমাকে পুজো করব।'

আমিনা আর কথা বলল না, ত্রস্তে বোরখাটা আবার মুখের ওপর ফেলে দিল—কে জানে উদ্গত অশ্রু গোপন করতেই কিনা,—তার পর দ্রুতবেগে সেই সংকীর্ণ ধূলিবহুল উত্তপ্ত পথ ধরে প্রাসাদের দিকে ফিরে চলল।

॥ ৬১ ॥

প্রাসাদে ফিরে আমিনা সোজা গোসলখানায় গিয়ে স্নান করতে বসল। পর পর কয়েক কলসী জল ঢেলেও যেন মাথা ঠাণ্ডা হয় না—অবশেষে জল ফুরিয়ে যেতে সে সেখানেই সেই ভিজে মাথায় ভিজে কাপড়ে চুপ করে বসে রইল।

আজিমুল্লা বহুক্ষণ বিঠুরে গিয়েছে—হয়তো এখনই ফিরবে। সঙ্গে আনবে নানার পরোয়ানা অথবা স্বয়ং নানাকেই—বিশ্রী একটা জবাবদিহিতে পড়তে হবে। তার উপর্যুপরি অসহ স্পর্ধায় বিরক্ত হয়ে নানা তাকে কয়েদও করাতে পারেন। সত্য বটে নানার নিজ হাতে লেখা সাংঘাতিক চিঠি তার কাছে আছে। কিন্তু অতর্কিতে কয়েদ করলে সে অস্ত্র প্রয়োগেরই হয়তো সময় মিলবে না। তবে এসব কোন চিন্তাই তার মনের মধ্যে বড় হয়ে ছিল না তখন। সে পরাজিত হয়েছে এবং লজ্জা পেয়েছে। তার পরাজয় ঘটছে সব দিকেই।

সে জানত সর্দার খাঁ তার কাজ সুচারুরূপেই সমাধা করবে—তা সে যত গর্হিত এবং কঠিন কাজই হোক না কেন, সেজন্য সে নিজে এই প্রচণ্ড গ্রীষ্মে বোরখা চড়িয়ে খবরদারি করতে যায় নি, সে গিয়েছিল প্রতিহিংসা সম্পূর্ণ দেখে সেই 'দীপ্তজ্বালা অগ্নিঢালা সুধা' পান করতে, নিজের বীভৎস কীর্তি সম্ভোগ করতে! কিন্তু পারে নি। বাড়িটার সামনা-সামনি গিয়ে তার পা দুটো যেন পাথর হয়ে গিয়েছিল, কিসে যেন টেনে রেখেছিল তাকে। দূর থেকে শেষ দু-একটা আর্তনাদও কানে গিয়েছিল এবং সেটা ঠিক বিজয়ধ্বনির মত সুখদায়ক মনে হয় নি, বরং কানের মধ্যে দিয়ে মর্মে বিঁধেছে—কানটাও যেন জ্বলে গিয়েছে সে আওয়াজে।

এ আমিনার শোচনীয় ব্যর্থতা—নিজের অকল্পিত পরাজয়।

তার লজ্জার আরও কারণ আছে। আজ অকস্মাৎ সর্দার খাঁর কাছে নিজেকে বড় ছোট মনে হয়েছে। সর্দার খাঁ যখন রুধিরাক্ত দেহে রক্তস্নাত তরবারি নিয়ে মাতালের মত টলতে টলতে বার হযেছে বিবিঘর থেকে,তখন তার হয়তো ছুটে কাছে যাওয়া উচিত ছিল, ওকে প্রকৃতিস্থ করবার চেষ্টা-করাও উচিত ছিল, কিন্তু সে পারে নি। তখন সে ব্যকুলভাবে শুধু বার বার এই প্রার্থনাই করেছে খোদার কাছে যে, সর্দার যেন না তাকে দেখতে পায়।

সেই লজ্জা তার কতকটা হীরালালের কাছেও। হীরালাল তাকে দেবী মনে করে, আজও সে তাকে পুজো করে মনে মনে। এটা কিছুদিন আগেও হাস্যকর ছিল হয়তো, অন্তত তার সুবৃহৎ হিংসাযজ্ঞের কাছে হীরালালের মত তরুণ বালকের শ্রদ্ধা এমন কিছু বিবেচনার যোগ্য বলে মনে হত না, কিন্তু আজ ওর ঐ শ্রদ্ধাটুকু তাকে নিজের কাছেই হেয়, তুচ্ছ করে দিয়ে গেল! কতকটা নিজের সেই লজ্জার জন্যই ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছিল আমিনা, আর সেই ক্রোধই তাব কণ্ঠস্বরকে অকারণে রূঢ় ও কর্কশ করে তুলেছিল।

তবে কি সে ভুলই করল?

তবে কি, তবে কি সে প্রতিহিংসার নামে শুধু দানবীয় হিংসাই এতদিন লালন করেছে মনে মনে?...

বাইরে থেকে মুসম্মৎ ডাকল, 'মালেকান!'

দেরি দেখে সে উদ্বিগ্ন হযে উঠেছে।

আমিনার মনে পড়ল আজ মুসম্মৎও তার চোখের দিকে চাইছে না—সামনে পড়লেই মাথা হেঁট করছে।

আজ পৃথিবীর সকলেই বোধ হয ঘৃণায মুখ ফিরিয়ে নেবে তার দিক থেকে।

আবারও মুসম্মৎ ডাকল, 'মালেকান!'

না, না, এ কী ভাবছে সে, নিজের কাছে অন্তত সে খাঁটি আছে। সে মাথা উঁচু করেই থাকবে। এখন এতটুকু মাথা হেঁট করলে আর পৃথিবীতে সে মাথা লুকোবার স্থান থাকবে না। নিজেই যদি ছোট মনে করতে থাকে নিজেকে, তা হলে অপরে যে একেবারে মাথায পা তুলে দেবে।

সে যতদূর সম্ভব সহজকণ্ঠে সাড়া দিল, 'হ্যাঁ রে মুসম্মৎ, এই যে যাই!'

গা-মাথা মোছবার আর প্রয়োজন ছিল না, অগ্নিময় বাতাসে সে কাজটা আপনিই সারা হয়ে গেছে, এখন তাড়াতাড়ি একটা শুকনো পোশাক জড়িয়ে বার হয়ে এল গোসলখানা থেকে।

'কিরে? খাঁ সাহেব এসেছেন?'

'না।' কতকটা অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে জবাব দিল মুসম্মৎ, 'খাঁ সাহেব আর পেশোয়া দুজনেই নাকি আসছিলেন, এক জন সান্ত্রী দেখেছে—কিন্তু তাঁরা এখনও প্রাসাদে আসেন নি। হয়তো—'

সে চুপ করে গেল।

হয়তো চরম সংবাদ পেয়ে অনর্থক বোধেই আর আসেন নি।

আমিনা মনে মনে একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল।

ভয়? না, ভয় নয়—ভয় আর তার কাউকেই নেই, কিছুতেই নেই। প্রাণের ভয় সে কোনদিনই করে না—এখন আর কাজ অসম্পূর্ণ থাকবার ভয়ও নেই। কে জানে কেন, আজ জীবনধারণের উদ্দেশ্যটাও যেন গেছে ফুরিয়ে।

ভয় নয়—বিরক্তি। এখন এই ক্লান্ত দেহ-মন নিয়ে যে কতকগুলো কথা-কাটাকাটি করতে হল না, তাইতেই সে বেঁচে গেল।

মুসম্মতের দেওয়া শরবত পান করে আমিনা অনেকক্ষণ বিছানাতে পড়ে রইল মড়ার মত। ঘরের আবহাওয়া আগুন হয়ে উঠেছে, বাইরে একটু ঠাণ্ডায় কোথাও বসতে পারলে হত, কিন্তু সেটুকু উদ্যমেরও যেন আর শক্তি অবশিষ্ট ছিল না। ঘামে জামা-বালিশ ভিজে উঠল ক্রমশ—তবে তাতে কোন অসুবিধা হল না। কিছুতেই আর তার কোন অসুবিধা নেই।

অনেকক্ষণ পরে, সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে যাবারও কয়েকদণ্ড পরে সে উঠে বসল। বোধ করি মুসম্মৎ কাছেই কোথাও ছিল, তার উঠে বসবার শব্দ পেতেই একটা আলো হাতে করে ঘরে ঢুকল।

'মুসম্মৎ, শোন্, কাছে আয়!' স্নেহমাখানো কোমল কণ্ঠে ডাক দিল আমিনা।

মুসম্মৎ কতকটা কাঠের মতই নিঃশব্দে কাছে এসে দাঁড়াল। আমিনা হাত বাড়িয়ে তার একটা হাত ধরে টেনে একেবারে পাশে বসাল। মুসম্মৎ দু হাতে মুখ ঢেকে বসল। না, কান্না নয়—বোধ করি তার নিজের মনোভাব মালেকানের কাছে ধরা পড়বার জন্যই লজ্জা।

গাঢ় কণ্ঠে আমিনা বলল, 'মুসম্মৎ, অনেকদিন তুই আমার সঙ্গে আছিস,

সুখে-দুঃখে ছায়ার মত পাশে পাশে থাকিস, বোনের মত মায়ের মত সেবা করিস, কিন্তু তোর দিকে কোনদিন তাকানো হয় নি। তুই অনেক সহ্য করেছিস, আমার মত ডাইনীর সঙ্গে থেকে বহুকষ্ট পেয়েছিস।—তোর কথা আমার অনেক আগে ভাবা উচিত ছিল।'

এই পর্যন্ত বলে আমিনা একটু থামল। তার পর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল, 'কিন্তু তা হয় নি—আজ হয়তো অনেক দেরি হয়ে গেছে। তবু শোন্, আমি আর কানপুরে থাকব না। ইংরেজ এসে পড়েছে। যুদ্ধের একটা অভিনয় হয়েছে—হয়তো আরও একবার হবে। তবে যা-ই হোক, এরা হারবে। হেরে কে কোথায় ছিটকে গিয়ে পড়বে নানাও হয়তো তখন আমাকে সঙ্গে নিতে চাইবেন না, আমারও আর থাকবার প্রবৃত্তি নেই। ওঁকে দিয়ে আমার যা দরকার ছিল তা মিটে গেছে। আমি, আমি এবার লক্ষ্ণৌ যাব। গোপনে, আমার মত আমি যাব। পেশোয়ার বেগম হিসেবে নয়—'

বাধা দিয়ে মুসম্মৎ বলল, 'ওখানে মহম্মদ আলি খাঁ আছেন, না?'

'হ্যাঁ আছে, কিন্তু তাকেও আমি বিব্রত করব না। সে তার কাজ করবে আমি আমার কাজ করব। আমি হয়তো আরও ওদিকে—দিল্লীও যেতে পারি। তার সঙ্গে দেখা না হলেও চলবে। কিন্তু সে কথা থাক, এবার সামনে বিষম বিপদ, এবার চলেছি মৃত্যুর সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়াতে। ইংরেজের মার খাওয়া এবার শেষ হয়ে এল—সে এবার ফিরে মারতে শুরু করেছে। শেষ কী হবে জানি না, কিন্তু ইংরেজের হাতে অনেকেই মরবে। আমার বিশ্বাস তাদেরই জয় হবে। ওদের বাদশাহ শেষ হবার সময় আসে নি এখনও। তবু আমি আমার কাজ করে যাব—সাধ্যমত ওদের প্রাণ নিতে থাকব, যতদিন না ওরা আমার প্রাণ নিতে পারে। এ বিপদে আর তোকে টানতে চাই না মুসম্মৎ—এখনও হয়তো সময় আছে কোনও দূর দেশে গিয়ে বাসা বাঁধবার, সুখী হবার। তুই আমায় ঘেন্না করতে শুরু করেছিস, শীগগিরই আমার সঙ্গও তোর অসহ্য বোধ হবে। তার চেয়ে তুই এখনই কোথাও চলে যা। নগদ টাকা যা আছে—অন্তত তোর জীবন সুখে কেটে যাবে। তুই বরং আজই ব্যবস্থা কর্—কোথায় যেতে চাস্। খুব দূরে কোথাও ঠিক কর্। আমি লোক দিচ্ছি সঙ্গে, নিরাপদে রেখে আসুক তোকে।'

মুসম্মৎ অনেকক্ষণ চুপ করে রইল, তার পর বলল, 'না, তা আর হয় না মালেকান, এখন তোমাকে একা ছেড়ে দিতে পারব না।'

আমিনা ঈষৎ ব্যাকুল কণ্ঠেই বলল, 'কিন্তু শেষ পর্যন্ত তুই কিছুতেই আমার কাছে থাকতে পারবি না মুসম্মৎ ! তখন বড় বিপদে পড়বি। ভুল করিস নি।'

'যতক্ষণ পারব থাকব। যখন একেবারে অসম্ভব হবে আমার ব্যবস্থা আমি করে নেব। এতকাল তোমার সঙ্গে থেকে সেটুকু ভরসা কি আর হয় নি।—আমার জন্যে ভেবো না।'

আর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে, কতকটা স্বগতোক্তির ভঙ্গিতেই আমিনা বলল, 'তোরা যদি আমাকে পুরোপুরি ঘেন্না করতে পারতিস্, আমার পথ অনেকটা সহজ হত—অনেক সহজ হত !'

আরও কয়েক মুহূর্ত তেমনি অন্যমনস্কের মত বসে থাকবার পর হঠাৎ এক সময় উঠে বাতিদানটা নিয়ে আয়নার পাশে রাখতে রাখতে বলল, 'তা হলে তুই সব গোছ-গাছ করে নে। যা নিতান্ত না নিলে নয়, তা-ই শুধু নিবি। হ্যাঁ, আর শোন, আমার তো পিস্তল আছে—তুই একটা যা হোক হাতিয়ার নে।—কাল ভোরেই রওনা হয়ে যেতে চাই—সেই মত তৈরী থাকবি।'

তার পর চুল খুলে বেণী বাঁধতে বসল। প্রসাধনের পূর্বাভাস।

মুসম্মৎ বিস্মিত হয়ে বলল, 'এখন আবার কোথাও যাবে নাকি ?'

'হ্যাঁ।' মুহূর্তের মধ্যে অরুণ-রাঙা হয়ে উঠল তার মুখ, কিন্তু সামান্য বাতির আলোয় মুসম্মৎ অত লক্ষ্য করল না।

'হ্যাঁ'—বলে গলাটা যেন একটু সাফ করে নিয়ে আমিনা বলল, 'এক জায়গায় কিছু দেনা আছে—সেইটে যাওয়ার আগে শোধ করে দিয়ে যাব।'

বেশ একটু যত্নের সঙ্গেই সে প্রসাধন করতে লাগল।

ঋণ শোধ করতে যাওয়ার সঙ্গে এমন প্রসাধন-পারিপাট্যের কি সম্পর্ক এবং আমিনার নিজেকেই বা যেতে হবে কেন—এমন সহস্র প্রশ্ন করা যেতে পারত, কিন্তু মুসম্মৎ কিছুই করল না। সে নিঃশব্দে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে বার হয়ে গেল।

সে এতকাল বৃথা আমিনার সঙ্গে ঘর করে নি।

বাচ্যার্থের পেছনে গূঢ়ার্থ থাকে তা সে জানে।

* * * *

মাংসের দোকানের উপরতলায় নিজের ছোট্ট ঘরটিতে চারপাইএর ওপরে স্তব্ধ হয়ে বসেছিল সর্দার খাঁ। সে এখানে পৌঁছতে বাচ্চা চাকরটা ভয় পেয়ে বিকট চিৎকার করতে করতে পালিয়ে গিয়েছিল—তাতেই তার সম্বিৎ ফিরে

আসে; নিজের চেহারাটার কথা তার খেয়াল হয়। তার পর সে ওপরে এসে ভাল করে স্নান করেছে, রক্তমাখা পোশাকগুলো উনুনে দিয়ে জ্বালিয়ে দিয়েছে, কিন্তু সে সবই কতকটা যন্ত্রচালিতের মত। হুঁশ তার পুরোপুরি না হোক, কিছুটা আছে। নীচে দোকানটা খোলা হা-হা করছে, টাকা-পয়সার বাক্সও সম্ভবত সামনেই পড়ে—তা সে সবই জানে, কিন্তু আবার নীচে গিয়ে সব বন্ধ করা বা গুছিয়ে আসার আর প্রবৃত্তি নেই।

কিছুতেই যেন আর তার কোন স্পৃহা নেই। মাংসের দোকান সে আর দিতে পারবে না—সুতরাং ও যে পারে নিক্। এ জায়গাটাও তাকে ছাড়তে হবে—কোথায় যাবে তা সে এখনও ঠিক করে নি। সেই কথাটাই বসে ভাববার চেষ্টা করছে। যেখানে হোক, যত দূরে হয় ততই ভাল।

ভাববার চেষ্টা করছে, কিন্তু কিছু যেন স্পষ্ট মাথাতে আসছে না। আসলে সে যেটা প্রাণপণে চেষ্টা করেছে সেটা দুপুরের ঐ ঘটনাটা মনে না আনবার।

কিন্তু কিছুই হচ্ছে না—শুধু দেহ নয়, মনটাও যেন জড় হয়ে গেছে। হয়তো সে একদিক দিয়ে খোদার আশীর্বাদ, নইলে সে হয়তো পাগলই হয়ে যেত।

সহসা সিঁড়িতে কার পদশব্দ শোনা গেল। খুব হাল্কা কোন পায়ের আওয়াজ—নরম চটি টানার শব্দ।

এতরাত্রে তার এখানে কে আসে? সর্দার সোজা হয়ে বসল।

পরক্ষণেই তার দৃষ্টি কোমল হয়ে এল।

আমিনা!

আমিনাকে দেখলে তার দৃষ্টি আজও কোমল হযে আসে—আজও সে তার নয়নানন্দ।

আমিনা ঘরে ঢুকে সন্তর্পণে দোর ভেজিয়ে দিল।

বলল, 'সিঁড়ির দরজা অমন খোলা রেখেছিস কেন রে সর্দার?'

সর্দার কেমন একটা বিহ্বল ভাবে বলল, 'খোলা ছিল?'

'হ্যাঁ, কিন্তু ব্যস্ত হতে হবে না, আমি বন্ধ করে দিয়ে এসেছি।'

ওড়নাটা দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আমিনা কাছে এসে একেবারে পাশটিতে বসল। তার পর সর্দারের একটা হাত নিজের হাতের মধ্যে জড়িয়ে তার সেই স্থূল কঠিন বাহুমূলে নিজের গালটা চেপে ধরে আস্তে আস্তে ডাকল, 'সর্দার!'

সে স্পর্শে ও সে ডাকে সর্দারের সর্বাঙ্গ শিউরে উঠল, কিন্তু সে কোন উত্তর দিল না।

আমিনা হয়তো তার মনের অবস্থাটা বুঝল, তাই সে-ও আর কোন কথা বলল না। শুধু বাহুবন্ধনটা আরও নিবিড় করে, গলাটা তার বাহুতে আরও জোরে চেপে ধরে চুপ করে বসে রইল। দু জনেরই বুকের রক্ত উত্তাল—দু জনের দু কারণে সম্ভবত, তবু উভয়েই সেই ভৈরব উত্তাল বক্ষঃস্পন্দন নীরবে অনুভব করতে লাগল, কেউই কথা বলবার চেষ্টা মাত্র করল না।

অনেক—অনেকক্ষণ পরে, সর্দারের মনে হল এক যুগ পরে, প্রায় অস্ফুট গাঢ়কণ্ঠে আমিনা বলল, 'সর্দার, আমার আর ক্ষমা চাইবার মুখও নেই—তুই কি আমায় ক্ষমা করতে পারবি ?'

এবার সর্দার কথা বলল। তার বুকের মধ্যে কী হচ্ছিল তা ঈশ্বর জানেন-হয়তো আমিনাও কিছু বুঝল, কিন্তু কণ্ঠে কোনরূপ আবেগ-উচ্ছ্বাস প্রকাশ পেল না। ধীরে ধীরে শুধু বলল, 'ও কথা থাক্ মালেকান। তোমার কোন কসুর কোনদিন আমার কাছে হতে পারে না।'

স্খলিত ভগ্নকণ্ঠে আমিনা বলল, 'কতটা যে করছি, কতটা জুলুম যে করা যায়, তা আগে বুঝি নি সর্দার, বিশ্বাস কর্। তোর জীবনটা হয়তো নষ্টই করে দিলুম চিরকালের মত। তুই, তুই যদি অমন নির্বিচারে আমার সব খেয়াল না মেটাতিস, তুই যদি আমাকে বাধা দিতিস্, তা হলে হয়তো এতটা বিবেচনা-হীন হতে পারতুম না!'

সর্দার তবুও কথা কইল না। প্রশ্নহীন বিচারহীন বিশ্বস্ত সেবার বদলে এই অনুযোগের পুরস্কারও সে নিঃশব্দে সহ্য করল। আজ সারাদিন বিভিন্ন অনুভূতি ও আবেগের যে তুফান উঠেছে তার মনে—তাতেই সে ক্লান্ত, অবসন্ন হয়ে পড়েছে। বোধ করি এসবে সে অভ্যস্ত নয় বলেই আরও বেশি অবসন্ন—আরও বেশি ক্লান্ত বোধ করছে নিজেক।

'শোন্ সর্দার, কাল আমি চলে যাব।'

এবার সর্দার চমকে উঠল, 'কোথায় যাবে মালেকান ? বিঠুর ?'

'না, এবার নানাসাহেবের সঙ্গে সম্পর্ক চুকে গেল। কোথায় যাব, তা আর তোকে বলে যাব না। আর তোকে আমার জীবনের সঙ্গে জড়াব না। তুইও দূরে কোথাও পালিয়ে যা, ইংরেজদের বিদ্বেষ থেকে বহু দূরে কোথাও—

সেখানে গিয়ে নতুন করে জীবন শুরু কর্। এবার, এবার তুই বিয়ে-থা করার চেষ্টা কর্ সর্দার!'

সর্দার তবু নীরবে বসে রইল। আমিনা বুকটা আরও জোরে চেপে ধরেছে তার বাহুতে। একান্ত নিবিড়—একান্ত ঘনিষ্ঠ। বোধ করি সেই অভূতপূর্ব অকল্পিত অবস্থাটাই অনুভব করতে চেষ্টা করছে সে।

আমিনা একটু চুপ করে থেকে মাথাটা সরিয়ে সর্দারের বুকের ওপর নিয়ে এল। তার পর বলল, 'তোকে পুরস্কার দেবার বৃথা চেষ্টা করব না। কিন্তু তুই তো অন্য লোক নিয়ে গিয়েছিলি, তাদের জন্যে পাঁচ হাজার টাকা কাল ভোরেই পাঠিয়ে দেব মুসম্মৎকে দিয়ে। তাদের দিয়ে দিস্। আর তোর—তোর যদি কোন দরকার থাকে তো বলিস্ আমাকে—কোন সংকোচ করিস্ নি।'

'আমার নিজের কোন দরকার নেই মালেকান!' এবার সর্দার উত্তর দিল, আগের মতই শান্ত ধীরভাবে।

'আমার কাছে কি তোর কিছুই চাইবার নেই সর্দার?'

বুকের কাছেই মাথাটা রেখে মুখটা তুলে ধরল আমিনা, তার উষ্ণ নিঃশ্বাস এসে পড়তে লাগল সর্দারের মুখে ও গালে। আমিনার দেহে ও কেশে প্রসাধনের সুগন্ধ। উত্তপ্ত তার স্পর্শ। রগের কাছে শিরা দুটো দপ্ দপ্ করছে সর্দার খাঁর। এমন অনুভূতি তো এর আগে কখনও হয় নি।

'ভেবে দ্যাখ! আর হয়তো জীবনে দেখাই হবে না আমাদের। যদি কিছু চাইবার থাকে—তা সে যা-ই-হোক, দ্বিধা করিস নি—নিঃসংকোচে বল্!'

প্রাণপণে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে, পাছে এদিকে ফিরে কথা কইতে গেলে আমিনার মুখের মধ্যেই নিজের মুখের বাতাসটা লাগে—সর্দার বলল, 'তুমি খুশী হয়েছে মালেকান, এ-ই আমার যথেষ্ট পুরস্কার! তবে এখনও আর একটা সাধ আছে—'

একটু ইতস্তত করে যেন শেষের কথাগুলি বলল সে।

'বল্, বল্—কী সাধ?' উৎসুক ভাবে প্রশ্ন করে আমিনা। এবার জোর করে নিজের কপালটা সর্দারের দাড়িতে চেপে ধরে।

'তুমি এসবের বাইরে নিরাপদে কোথাও চলে গেছ, তোমার কোন ভয় নেই আর—এইটে জানতে পারলেই আমি সুখী হতাম, নিশ্চিন্ত হতাম!'

অকস্মাৎ আমিনার দু চোখের কোণ উপ্‌চে তপ্ত অশ্রু উঠে পড়ল। দাঁতে

দাঁত দিয়ে সেই অশ্রু সংবরণ করতে লাগল কিছুকাল ধরে। তার পর ধরা-ধরা গলায় বলল, 'তুই আমার কথা আর ভাবিস নি সর্দার,' আমি এতখানি ভালবাসার উপযুক্ত নই।'

তারপর বাহুবন্ধন শিথিল করে সোজা হয়ে বসল। একটুখানি তেমনি ভাবে স্থির হয়ে থেকে বলল, 'আমার আর ফেরবার—দূরে যাবার কোন পথ নেই তা তো তুই জানিসই। যে আগুন জ্বেলেছি সে আগুনেই মরতে হবে। শুধু যেন ওদের হাতে ধরা পড়ে ফাঁসিকাঠে না মরতে হয়, খোদার কাছে এই দোয়া জানা।'

সর্দার আবারও শিউরে উঠল—সম্ভবত আমিনার সম্ভাব্য অনিষ্ট আশঙ্কা করেই। স্পর্শ করে না থাকলেও আমিনার তা অনুভব করতে অসুবিধা হল না। আবারও দু চোখে অশ্রু অবাধ্য হয়ে উঠতে চায়। চকিতে কামিজের প্রান্তে তা মুছে নিল সে।

তার পর অনেক চেষ্টায় সহজ হয়ে একটু আলস্যের ভঙ্গ করে বলল, 'বড্ড ঘুম পেয়েছে সর্দার, এখানেই ঘুমোব।'

সর্দার চমকে উঠল। বিহ্বল ব্যাকুল দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে চেয়ে কথাটার সম্যক অর্থ উপলব্ধি করবার চেষ্টা করতে করতে বলল, 'এখানে ঘুমোবে! না-না, সে হয় না,—তুমি বাড়ি চল মালেকান, আমি পৌঁছে দিচ্ছি।'

'কেন, এখানে ঘুমোলে দোষ কী? লোকে কী বলবে? লোকের কথায় কি এখনও আমার এসে যায় কিছু?'

'না, তা নয়, কিন্তু এখানে এই ময়লা বিছানায়—ছিঃ ছিঃ, সে হয় না মালেকান!'

'খুব হয়।' আমিনা কামিজের বোতামটা আগেই খুলতে শুরু করেছিল, এবার জামাটা খুলতে খুলতে একটু হেসে বলল, 'জানিসই তো আমাকে, আমার খেয়াল চিরদিনই মেটাতে হয়েছে তোকে—আজও মেটা! আজই তো শেষ!'

সর্দার উঠে দাঁড়াল। বিব্রতভাবে বলল, 'তা হলে তুমি ঘুমোও মালেকান, আমি এই বাইরে সিঁড়িতে রইলাম।'

সে বাইরে যাবার জন্যে পা বাড়াল।

আমিনা হাত বাড়িয়ে তার হাতটা ধরল।

'তোর সঙ্গেই শোব সর্দার। একা শোবার জন্য আসি নি!'

সর্দারের অনিচ্ছুক চোখ তার দিকে না পড়ে পারল না। সেই দেব-দুর্লভ অপরূপ দেহ-লাবণ্যের দিকে চেয়ে তার মাথা ঝিম্ ঝিম্ করে উঠল। সে কেমন বিহ্বল অবশভাবে অমিনার মৃদু আকর্ষণে আবার সেই শয্যার ওপরই এসে বসে পড়ল।

আমিনা প্রায় ফিস্ ফিস্ করে বলল, 'তোকে আজ দেবার আমার কিছুই নেই সর্দার—নিজেকে ছাড়া। তাতেও তোর ঋণ শোধ হবে না আমি জানি, তবু কতকটা তৃপ্তি পাব। তুই দয়া করে আমাকে এটুকু দে—'

সে বিছানার ওপর এলিয়ে শুয়ে পড়ল।

সর্দারের সর্বাঙ্গ কাঁপছে। এরকম অনুভূতি তার জীবনে কখনও হয় নি। মনে হল সমস্ত রক্ত মাথায় উঠেছে—বুকটাও বুঝি ফেটে যাবে এখনই।

তবু প্রাণপণ চেষ্টায় চোখ বুজে নিজেকে সে সংবরণ করে নিল। আরও একটু ইতস্তত করল, তার পর হেট হয়ে আমিনার সেই রক্ত-কমলের মত রক্তাভ কোমল পা দুটিতে অতি সন্তর্পণে—যেন ভয়ে ভয়ে দুটি চুম্বন করল। তার পর, আবেগ অসংবরণীয় হওয়াতেই বোধ করি, সেই দুর্লভ এবং ঈপ্সিত চরণ দুটি নিজের বুকে সজোরে ও সবেগে চেপে ধরল একবার। এইভাবে কয়েক মুহূর্ত নিজের এই সৌভাগ্য—দীর্ঘকাল সেবার এই আশাতীত পুরস্কার অনুভব করার পর সহসা সে যেন কী এক মর্মান্তিক আঘাতে লাফিয়ে উঠল।

বিকৃত গাঢ় কণ্ঠে শুধু বলল, 'তুমি তৈরি হয়ে নাও মালেকান, আমি নীচে রাস্তায় অপেক্ষা করছি।' এবং ব্যাপারটা কী ঘটল আমিনা তা ভাল করে বোঝবার আগেই সে ঘর থেকে—বাড়ি থেকে ছুটে বার হয়ে গেল।

॥ ৬২ ॥

কাল্কাপ্রসাদ কদিন যাবৎ নানকচাঁদকে খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়ে গিয়েছেন। লোকটা শহরে আছে বা আসা-যাওয়া করছে—এ খবরটা তিনি বহু লোকের কাছেই পেয়েছেন, কিন্তু আসল লোকটার টিকিও ধরতে পারছেন না। নিশ্চয়ই কোন একটা বড় রকমের 'তালে' ঘুরছে—সেজন্যেই আরও কাল্কাপ্রসাদ তার জন্যে ব্যাকুল। লোকটা চতুর, এবং টাকার গন্ধ পায়, ঐ লোকটাই পায়—তিনি পান না কেন? মহাবীরজীর এ রীতিমত

একদেশদর্শিতা।) একথা তিনি জানেন ; সে যখন এমন করে ঘুরছে তখন টাকাই কোথাও আছে আশেপাশে। একবার নাগাল ধরতে পারলে বোঝা যেত।

টাকা পাওয়া তো দূরে থাক্, চাবটে শুয়োর-খেগোকে বাঁচাতে গিয়ে তাঁব বেশ কিছু বরং খরচই হয়ে গেল। হয়তো আখেবেব কাজ কিছু হয়ে রইল—শোনা যাচ্ছে 'আংরেজ' এসে পড়ল বলে, এলে এবং তারা জয়ী হলে তাঁর কিছু সুবিধে হবে সন্দেহ নেই—অন্তত ফাঁসিকাঠে প্রণটা যাবে না, কিন্তু যদি শেষ অবধি আংরেজরা না জিততে পারে ? যদি সত্যি সত্যিই নানা আর তাত্যা টোপীব দল জয়লাভ করে—তখন ? তাঁর এই কুকীর্তির কথা কি আর চাপা থাকবে ? হয়তো দিগ্বিজয় সিং-ই সব দোষটা তাঁর ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে নিজের গলাটা বাঁচাবে।

তখন কি উপায় হবে—এটাই একবার নানকচাঁদের কাছ থেকে জেনে নিতে চান কাল্‌কাপ্রসাদ। ওর পরামর্শেই কাজটা করলেন, এখন যদি শেষ-রক্ষা না হয় ? নানকচাঁদের তো বুদ্ধির বড় অহঙ্কার—এখন দিক বুদ্ধি একটা।

কিন্তু মানুষটাকেই কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না যে। গোটা শহরটাই তো প্রায় গরু-খোঁজা করে ফেললেন—লোকটা কৈ ?

অবশেষে সেদিন উৎকণ্ঠিত, উদ্বিগ্ন এবং প্রায়-অবসন্ন কাল্‌কাপ্রসাদ মহা-বীরের কাছে লাড্ডু-ভোগ মানসিক করে ফেললেন। আর সেইদিনই (জয় বজরঙ্গজী মহারাজকি !) একটা হদিস মিলল উকিলসাহেবের।

হঠাৎ ঘুরতে ঘুরতে নবাবগঞ্জ বাজারের কাছে পুরাতন বন্ধু কানহাইয়া-লালের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। এ লোকটিরও বুদ্ধি খুব, অনেকবার অনেক রকমে যাচিয়ে দেখেছেন কাল্‌কাপ্রসাদ—মনে মনে তারিফ না করে পারেন নি। কানহাইয়ালাল তাঁর অনেক আগেই দেহাতে গিয়ে বাস করতে শুরু করছেন—এখন আলাপ করে জানা গেল তিনিও বসে নেই, সেখানে বসেই 'দু পয়সা' বেশ কামাচ্ছেন। ওদিকে লক্ষ্ণৌতে, এদিকে কানপুরে—সিপাহীদের কাছে রসদ যোগাচ্ছেন এবং পোশাক থেকে শুরু করে জুতো মেরামত পর্যন্ত যাবতীয় ঠিকাদারি নিয়েছেন। নিজে বড় একটা এইসব হাঙ্গামের মধ্যে যান না—লোক রেখে চালান, এর দপ্তরটাও বাড়ির কাছাকাছি রাখেন নি—নিজের গাঁ থেকে বহু দূরে সদর ফতেপুরের কাছে একটা গাঁয়ে বসিয়েছেন। আবার

ওদিকেও তলে তলে কিছু কাজ গুছিয়ে রেখেছেন বৈকি। দুটি মেমসাহেবকে প্রায় মৃত্যুর মুখ থেকে বাঁচিয়ে কদিন ঘরে রেখে শেষ পর্যন্ত গোরুর গাড়িতে চড়িয়ে সীতাপুরের জঙ্গল পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছেন। আর কী করতে পারেন তিনি! তাঁর যা করবার তো করলেন—এখন তাদের বরাত। অবশ্য শোনা যাচ্ছে, তারা শেষ পর্যন্ত কজন সিপাহীর হাতে ধরা পড়েছে এবং সে অবস্থায় ফলাফল কী হয়েছে তাও অনুমান করা কঠিন নয়—তবে কানহাইয়ালালের তাতে কিছু এসে-যায় না। তিনি গোরুর গাড়িতে তোলবার আগে মেমসাহেবদের দিয়ে দুখানি 'সাটিকফিকিট' লিখিয়ে নিয়েছেন—তাঁর ইংরেজভক্তি ও বিশ্বস্ততার উচ্চ প্রশংসা লিখে দিয়ে গিয়েছে তারা—সুতরাং ও-পক্ষই জয়ী হোক, আর এ-পক্ষই জয়ী হোক—তিনি নিশ্চিন্ত। যে-ই জয়ী হোক, সাময়িকভাবে অপর পক্ষের সঙ্গে কাজ-কারবারের চিহ্নগুলি রাতারাতি মাটির নীচে পুঁতে ফেলতে কতক্ষণ!

কালকাপ্রসাদ মুগ্ধ হয়ে শুনছিলেন। সকলেই বেশ গুছিয়ে নিল, কেবল তিনিই আহাম্মক—কিছু করতে পারলেন না! অবশ্য তিনি প্রাক্তন (এবং সম্ভবত স্বর্গত) মনিবের কিছু পয়সা শেষের দিকে নিজের সিন্দুকে পুরেছেন ঠিকই এবং এই কদিন সব্জি জুগিয়েও দু-চার পয়সা করেছেন--তবে সে আর কতটুকু! সে কি এদের আয়ের সঙ্গে তুলনীয়?

একই সঙ্গে অপরের বুদ্ধিতে তৃপ্তি এবং নিজের নির্বুদ্ধিতা ও দুর্ভাগ্যে দুঃখবোধ হওয়ায় একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে কালকাপ্রসাদ বললেন, 'তা আজ এখানে কী করছ? শহরের হাওয়া তো ভাল ঠেকছে না।'

'সেই জন্যই তো এসেছি রে ভাই প্রাণের দায়ে! অনেক টাকা পাওনা—লোক পাঠিয়ে সুবিধে হচ্ছে না, তাই নিজে ছুটে এসেছি। আংরেজ এসে পড়ল বলে, কাল-পরশুর মধ্যেই শহরে ঢুকে পড়বে—হয় এদের লড়াই দিতে হবে, নয় পালাতে হবে। এখন জিতুক বা হারুক, এদের কি আর কোন পাত্তা পাওয়া যাবে? কে কার কড়ি ধারে—এই হয়ে দাঁড়াবে। তাই এসেছি হেস্তনেস্ত করে যেতে। তা কাজ উদ্ধার হয়ে গেছে; খাজাঞ্চির সঙ্গে আধাআধি রফা করতেই নগদ টাকা বেরিয়ে এল এক লহমায়।'

'আধাআধি?'

'তাতে আমার লোকসান হয় নি।...আগে তো অনেক মুনাফা করেছি, এটায় না হয় না হল।' হাসতে লাগলেন কানহাইয়ালাল।

সঙ্গে সঙ্গে ওর মুনাফার একটা আনুমানিক অঙ্ক মনে মনে হিসেব করে নিয়ে কালুকাপ্রসাদ ঘেমে উঠলেন।

'তা তুমি এখানে কী করছ মুনশী কালুকাপ্রসাদ?'

কালুকাপ্রসাদ সব কথা না বলে সংক্ষেপে শুধু বললেন, 'আমি নানকচাঁদকে খুঁজছি। তার সঙ্গে একটা জরুরী দরকার আছে।'

'ও, নানকচাঁদকে খুঁজছ? তা এখানে কেন? বিঠুরে যাও—দেখবে প্রাসাদের আনাচে-কানাচে সে ঘুরছে। আরে, ওরা হল শকুনির জাত—ভাগাড়ে আর শ্মশানেই ওরা ঘোরে। বিঠুরের এখন হল শ্মশানপুরীর অবস্থা—বুড়ো শকুনি দেখ ঠিক সেখানে গিয়ে হাজির হয়েছে।'

'কেন, কেন, বিঠুরের অমন হাল বলছ কেন?' সাগ্রহে প্রশ্ন করেন কালুকাপ্রসাদ।

'আরে, নানাসাহেব তো ওখান থেকে চাটি-বাটি গুটিয়ে ভাগবার তালে আছে—শোন নি? এধারে যে বহুৎ কাণ্ড হয়ে গেছে, ছিলে কোথায়? আমি তো একদিনের জন্যে এসেই সব শুনে নিয়েছি। এর ভেতর একটা লড়াইএ সিপাইদের হার হয়েছে—ইংরেজ এগিয়ে আসছে। এবার যে শিয়রে শমন!... তার ওপর ঐ যে বিবিঘর না কোথায় এক পাল মেমসাহেব আর তাদের বাচ্চাকাচ্চা ছিল, তাদের নাকি নানারই এক বিবি আজ খুন করিয়েছে। অন্য নাম করে নানার কাছ থেকে পরোয়ানা নিয়েছিল—সেই পরোয়ানার জোরে কসাই দিয়ে কোতল করেছে। খবর পেয়ে নানাসাহেব ছুটে এসেছিল—শহরে পা দিয়েই শোনে কম্ম ফরসা। তখন ভেঙে পড়েছিল নানা—সিধে নাকি গঙ্গায় চলে গিয়েছিল ডুবে মরতে। আজিমুল্লা খাঁ অতি কষ্টে টেনে ফিরিয়েছে। তার মানে ইংরেজদের হাতে পড়লে ওর আর রক্ষে নেই। • এধারে ইংরেজ তো দোরে—কাজেই নানাসাহেব বিঠুর ছেড়ে যাওয়ার জন্যে তৈরী হবে বৈকি।... যাওয়ার আগে দামী জিনিসপত্র, হীরে-জহরৎ, সোনার থালা-বাসনগুলোর কোন একটা কিনারা করে রেখে যাবে নিশ্চয়—হয়তো মাটির নীচে পুঁতেই রেখে যাবে কোথাও। ভাখো গে যাও, তোমার নানকচাঁদ সেই তালে ঘুরছে। ওরা ধড়িবাজ—আমাদের মত খেটে খেতে তো শেখে নি, মেহনতের মধ্যে ও নেই, ওর হল মারি তো গণ্ডার লুটি তো ভাণ্ডার। নিশ্চয়ই ঐখানেই উঁকি-ঝুঁকি মারছে, গুপ্তধনের যদি সন্ধান পায় তো রাতারাতি মহারাজা!—বুঝলে না!'

চোখ টিপে হাসলেন কান্‌হাইয়ালাল।

'আচ্ছা চলি তা হলে। জয় রামজীকি। আবার এতটা পথ যেতে হবে। আজ অবশ্য রাতটা শহরের বাইরেই থাকব আমার এক জামাইএর বাড়ি। তবু দেরি করা ঠিক নয়—যা অরাজক দিনকাল যাচ্ছে। সঙ্গে আবার কাঁচামাল রয়েছে তো।'

তিনি রওনা দিলেন। কিন্তু কাল্‌কাপ্রসাদ অনেকক্ষণ নড়তে পারলেন না। যেন মন্ত্রমুগ্ধের মত অবস্থা তাঁর।

টাকাকড়ি, হীরা-জহরৎ, সোনার বাসন—গুপ্তধন!

উঃ, নানকচাঁদটা কি সাংঘাতিক ধূর্ত! ঠিক বলেছে কান্‌হাইয়ালাল, বুড়ো শকুনি!

কান্‌হাইয়ালালের কথা যে নির্জলা সত্য সে বিষয়ে তাঁর সন্দেহ মাত্র রইল না। আরও একবার কান্‌হাইয়ালালের বুদ্ধির তারিফ করলেন। এসব কাহিনী তিনিও কিছু কিছু শুনেছেন, কিন্তু তার সঙ্গে নানাসাহেবের টাকাকড়ি পুঁতে রাখার প্রয়োজন হবে—এমন কল্পনা তো তাঁর মাথাতে আসে নি কখনও। আর ঐ নানকচাঁদ, ঐ ধূর্ত শৃগালটার কথাও তিনি অমন করে ভাবতে পারেন নি তো।

অবশেষে যখন সম্বিৎ ফিরে পেলেন, তখন কাল্‌কাপ্রসাদ সেই রাত্রেই একটা একা ডাকিয়ে বিঠুরের দিকে রওনা দিলেন। একাওয়ালারা আবার এখন রাতবিরেতে ওদিকে যেতে চায় না—বিশেষত সিপাহীদের খাস এলাকা এটা—ওখানে পৌঁছে অনেকেই ভাড়া দেয় না। চেঁচামেচি করলে সিপাহীরা সঙ্গীন উঁচিয়ে তেড়ে আসে।…অনেকেই ঘাড় নেড়ে সরে পড়ল, শেষকালে—ঠিক বিঠুর অবধি না গেলেও চলবে, তিনি না হয় কিছু দূরেই নেমে পড়বেন, অবিশ্বাস হয় তো আগাম ভাড়া দিতেও রাজী আছেন—এই রকম অনেক বুঝিয়ে তবে রাজী করালেন একটাকে।

কী দিনকালই পড়ল, সামান্য একাওয়ালারও খোশামোদ করতে হচ্ছে তাঁকে। হাত্তোর কপাল!

নানাসাহেবের হুকুমে কদিনই প্রাসাদের বাইরের দিক্‌কার সব আলো সন্ধ্যার পর নিভিয়ে দেওয়া হচ্ছে। নানকচাঁদ এ তথ্য সংগ্রহ করেছেন বাইরের পাহারাদারদের কাছ থেকে—আর সেই সূত্র ধরেই তিনি

কদিন যাবত প্রায় সারারাতই বিঠুর প্রাসাদের পেছন দিক্‌কার বাগানে কাটাচ্ছেন। মশার উৎপাতে চাদর মুড়ি দিয়ে থাকতে হয়—সাদা চাদরের রং আবার বহু দূর থেকে অন্ধকারেও দেখা যায়, কালো রংও খুব সুবিধের নয়—পাতলা অন্ধকারে বোঝা যেতে পারে—সেজন্যে তিনি গাঢ় সবুজ রঙের বড় চাদর একটা সংগ্রহ করেছেন। প্রাসাদ থেকে বাগানের দিকে বের হবার যে দরজা—তারই কাছাকাছি ঝোপে গা-ঢাকা দিয়ে বসে থাকেন। আলো নিভোনোর আদেশ কেন? নিশ্চয়ই অন্ধকারে কোন কাজ করতে হবে। পাছে এক।· হঠাৎ আলো নিভোতে বললে অপর কোন ভৃত্য বা আত্মীয় সন্দেহ করে, তাই প্রত্যহই আলো নিভোবার হুকুম হয়েছে। শুধু যখন বাইরের জন্যেই এই হুকুম, তখন কাজটা বাইরেই সারা হবে। বাইরে কী এমন গোপন কাজ থাকতে পারে—ধনরত্ন পুঁতে রাখা ছাড়া?

নানকচাঁদ এক আঁচড়ে লোকের মলতব বুঝতে পারেন—এটা পারা আর এমন শক্ত কি? তিনি তাই প্রত্যহই সারারাত এখানে কাটাচ্ছেন এবং ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গে নিজের বাড়িরই পেছনের দরজা খুলে ওপরে উঠে সারাদিন বিশ্রাম করছেন। সেই জন্যেই কাল্‌কাপ্রসাদ তাঁর পাত্তা পান নি —যে বাড়ি দীর্ঘকাল তালাবন্ধ পড়ে আছে, যে বাড়ি স্বেচ্ছায় ত্যাগ করে গেছে—মানুষ সেই বাড়িতেই এসে ঘাপটি মেরে বসে থাকবে, এটা কল্পনা করা কাল্‌কাপ্রসাদের সাধ্যের অতীত—বিশেষ যখন বাইরের সদর যেমন বন্ধ তেমনিই আছে। শুধু ভোরে ও সন্ধ্যার পর যাওয়া-আসার সময় দু-একজন পরিচিতের সঙ্গে দৈবাৎ দেখা হয়ে গেছে—তাদের মুখেই কাল্‌কাপ্রসাদ খবর পেয়েছেন যে নানকচাঁদ শহরে আছেন বা আসা-যাওয়া করছেন।

সেদিনও যথারীতি নানকচাঁদ সন্ধ্যার পর আঁধারে গা ঢেকে পেছনের পাঁচিল ডিঙিয়ে বাগানে নিজের ঘাঁটিতে এসে বসেছেন।

পাঁচিলের একটা জায়গায় তিনি খানিকটা ইঁট খসিয়েছেন যাতায়াতের সুবিধার জন্য। যে সান্ত্রীর কাছ থেকে তিনি মাসিক একটি রজতমুদ্রার বিনিময়ে নিয়মিত প্রাসাদের সংবাদ সংগ্রহ করেন, সেই সান্ত্রীটিকেই আর একটি মুদ্রা কবুল করে এই কাজটি করিয়ে নিয়েছেন—তাঁর নিজের কোন মেহনৎ হয় নি। সে লোকটাও দীর্ঘকাল ধরে দেখছে নানকচাঁদকে—কখন কী মতলবে তিনি কী করেন, কতদিন আগে থেকে কোন্ ঘটনার জন্য কী ভাবে

তৈরী হন—তা সে বহু বার বোঝবার চেষ্টা করে হাল ছেড়ে দিয়েছে। আজকাল আর প্রশ্নও করে না।

কদিনে বাগানের পথঘাট ঝোপঝাড় সব পরিচিত হয়ে গেছে। তাই নিঃশব্দে আনাগোনা করতে কোন অসুবিধে হয় না। দড়ির জুতোও এক জোড়া সংগ্রহ করে নিয়েছেন—খালি পায়েও যেটুকু শব্দ হয় এতে তাও হবে না। সাধারণ লোক হলে তিন-চার রাত এভাবে বৃথা কষ্ট করেই হতাশ হয়ে পড়ত। বিশেষত যখন সবটাই অনুমান মাত্র, ঠিক কিছু জানা যায় নি। কিন্তু নানকচাঁদ সাধারণ লোক নন। তিনি হাল ছাড়েন নি—নিজ বিশ্বাসে দৃঢ় আছেন। এজন্যে কদিন একাহার ধরেছেন। এখান থেকে ফেরবার পথেই 'দহি' সংগ্রহ করে নিয়ে যান। বাড়ি ফিরেই স্নান করে সেই দহি-সহযোগে ছাতু খেয়ে নেন খানিকটা। সন্ধ্যায় আর কিছু আহার করেন না—ভরা পেটে ঘুম পায় বলে।

অবশেষে এত কষ্টের 'কেষ্ট' মিলল।

হঠাৎ মধ্যরাত্রের পর খুট্ করে পেছনের দরজা খুলে গেল।

নিঃশব্দে বাড়ির মধ্য থেকে বের হল দু জন লোক। যতদূর সম্ভব বিনা শব্দেই দরজা খোলা হয়েছিল, কিন্তু তবু যে সামান্য আওয়াজটুকু হয়েছে নানকচাঁদের সদাজাগ্রত কানে সেটুকুও এড়ায় নি—তিনি তৎক্ষণাৎ সতর্ক ও সজাগ হয়ে উঠলেন।

অন্ধকারেই দুটো লোক বের হল। অন্ধকারেই সাবধানে চলল। দু জনেরই খালি পা। সেজন্য এক জনের খুবই কষ্ট হচ্ছে তা বেশ বোঝা যায়।

নানাসাহেব ও কোন বিশ্বস্ত চাকর। তাতে সন্দেহ মাত্র নেই।

আর একটু ভাল করে চেয়ে দেখলেন—পেছনের লোকটির কাঁধে দুটো বস্তা।

ওরা খানিকটা পথ এগিয়ে গেলে নানকচাঁদ তাঁর ঘাঁটি থেকে বের হয়ে এলেন। যারা এ বাগানের মালিক তাদের যতটা কষ্ট হচ্ছে, নানকচাঁদের সেটুকুও কষ্ট নেই। তিনি স্বচ্ছন্দে নিঃশব্দ সতর্কতার সঙ্গে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছেন। পাতা ঝরার কাল বহুদিন অতীত হয়ে গিয়েছে তাই রক্ষা, বাগানও নিত্য ঝাঁট দেওয়া হয়—শুকনো পাতায় পা দিয়ে শব্দ তোলবার ভয় নেই।

অগ্রগামী লোক দুটো বহু পথ ঘুরে একেবারে বাগানের শেষ প্রান্তে একটা পরিত্যক্ত অব্যবহৃত কুয়ার সামনে এসে থামল।

বাঃ! নানাসাহেবের বুদ্ধির তারিফ করলেন মনে মনে নানকচাঁদ। মাটি খুঁড়তে গেলেই শব্দ হবে, তাছাড়া খুব গভীর করে মাটি কাটলে তার চিহ্ন ঢাকা শক্ত। আস্তে আস্তে কুয়ার মধ্যে নামিয়ে দিলে বাইরে থেকে কোন চিহ্নই থাকবে না। এ কুয়াটা এককালে মালীদের জন্যে কাটানো হয়েছিল বোধ হয়—এখন ওপাশে একটা বড় কুয়া থেকে বলদ দিয়ে জল ওঠে, তাই কষ্ট করে এখান থেকে আর কেউ জল তোলে না। বহুদিনের অব্যবহারে জলও খারাপ হয়ে গেছে—পাঁকও নিশ্চয় খুব বেশি জমেছে। সহসা কেউ জল তুলতে গেলেও গুপ্তরত্ন বার হয়ে পড়বার ভয় নেই।

কুয়ার কাছে পৌঁছে আগের লোকটি কাঁধের ওপর থেকে পাতলা দড়ির মত কী নামাল। গাঢ় অন্ধকার, কিন্তু সেটা চোখে সয়ে গেছে। এখন নক্ষত্রের আলোতেও স্পষ্ট দেখা যায়।

নানকচাঁদ ভরসা করে আর একটু কাছে গেলেন।

হ্যাঁ, দড়িই বটে। সম্ভবত রেশমের দড়ি—মিহি অথচ মজবুত।

নানা—কাছ থেকে দেখে আর সন্দেহের অবকাশ রইল না—নানা একটা পুঁটলির সঙ্গে একগাছি দড়ি বাঁধলেন, তার পর চাকরটি সেই পুঁটলি ধীরে ধীরে নীচে নামিয়ে দিল—খুব সন্তর্পণে; তবু সামান্য একটা শব্দ উঠল ছলাৎ করে—আর একটু নামাল দড়ি, তার পর দড়িটাও ছেড়ে দিল। আর একবার নানকচাঁদ মনে মনে নানার বুদ্ধির প্রশংসা করলেন। ওপর থেকে ছাড়লে বিষম শব্দ হত, ঐ সামান্য দড়ি এখনই জলে ভিজে মিশে যাবে—একটু পরে কোন চিহ্নও পাওয়া যাবে না।

ঐ ভাবেই আর একটি পুঁটলি জলস্থ হলে চাকরটি একা ফিরে গেল নিঃশব্দে। নানা দাঁড়িয়ে রইলেন—আর তাঁর মাত্র ছ হাত দূরে নানকচাঁদ। নানা মশার তাড়নায় এদিক-ওদিক ফিরছিলেন, একবার সোজা নানকচাঁদের দিকেও তাকালেন—ভয়ে নানকচাঁদের বুকটা ঢিপ ঢিপ করে উঠল, কিন্তু নানা কিছুই লক্ষ্য করলেন না। সবুজ পাতাবাহারের ঝোপের সঙ্গে গাঢ় সবুজ রঙের চাদরটা মিশে গেছে। এবার নানকচাঁদ তারিফ করলেন নিজেকেই।

অপেক্ষা করার কারণটা বোঝা গেল একটু পরেই।

ভৃত্যটি আরও দুটি পুঁটলি আনতে গিয়েছিল। এসব কাজে বেশী লোককে বিশ্বাস করতে নেই—তা নানা জানেন।

নানকচাঁদ মনে মনে হিসেব করলেন—পুঁটুলিগুলো নিশ্চয় খুব ভারী, নইলে একসঙ্গেই সবগুলি আসত।

পূর্বের ব্যবস্থানুযায়ীই এ পুঁটুলিগুলিও জলস্থ হল। নানাসাহেব হিসেব করেই দড়ি এনেছিলেন। কাজ শেষ হলে নানা ইঙ্গিতে লোকটিকে আরও কাছে ডাকলেন, তার পর নিজের পিরানের মধ্যে থেকে উপবীতটা বের করে তার হাতে ঠেকিয়ে প্রায় অস্ফুটকণ্ঠে বললেন, 'আমি তোর মনিব, রাজা, ব্রাহ্মণ—এই আমার জেনেউ ছুঁয়ে আছিস্, বল্, একথা তোর গলা কেটে ফেললেও কাউকে বলবি না! স্ত্রীকে না, ছেলেকে না, মাকে না—এমন কি আমার কোন আত্মীয়কেও না। বলবি না—নিজেও কোন দিন নেবার চেষ্টা করবি না, বল্—দিব্যি কর্।'

ভৃত্যটি ভীত কম্পিত কণ্ঠে ফিস্ ফিস্ করে বলল, 'আমি আপনার জেনেউ ছুঁয়ে, ভগবান গণপতির নামে, আপনার নামে দিব্যি গালছি পেশোয়া, একথা স্বয়ং ভগবান এসে জিজ্ঞাসা করলেও বলব না—মানুষ তো ছার!'

নানাসাহেব সন্তুষ্ট হলেন। পৈতেটা আবার জামার মধ্যে ঢুকিয়ে বললেন, 'ওপারের ঘরে যেখানে এইসব মাল ছিল, সেখানে আর একটা ছোট থলি আছে দেখেছি তো? এবার চুপি চুপি গিয়ে সেটা নিয়ে চলে যা—ওতে দুশ মোহর আছে। যদি আমি জিতি, আমার রাজগী থাকে তো তোকে জায়গীর দেব—নইলে ঐটেই তোর বকশিশ। আর যদি কোনদিন নিশ্চিত জানিস যে, আমি মরে গেছি, তুই এগুলো নিতে পারিস্।'

ভৃত্যটি হেঁট হয়ে পেশোয়াকে প্রণাম করে প্রস্থান করল। নানাসাহেব আরও কিছুক্ষণ চুপ করে সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলেন। সম্ভবত নিজের ইষ্টদেবতা শিব ও গণপতি ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানালেন—এই পৈতৃক ঐশ্বর্যের রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে। তার পর তিনিও প্রাসাদে ফিরে গেলেন।

এত রাত্রে বিশেষত এ অঞ্চলে পথে-ঘাটে বার হওয়া নিরাপদ নয়, তাই নানকচাঁদ বাকি-রাতটুকু সেই বাগানেই কাটালেন। অবশ্য এবার পাঁচিলের ধারে—অপেক্ষাকৃত ফাঁকা জায়গাতেই। তার পর উষার আভাসমাত্র দেখা দিতেই—শুধু ভোরাই বাতাসে এবং শুকতারার অবস্থানে সে আভাস পেয়ে পাঁচিল ডিঙিয়ে বাইরে এলেন।

কিন্তু প্রাসাদের পেছন দিকটা ঘুরে এদিকের পথে এসে পড়তেই এক

বিপত্তি। পাশের গভীর শুষ্ক নালায় কে একটা লোক ঘাপটি মেরে বসেছিল। এখন এক লাফে উঠে পড়ে একেবারে তাঁর সামনে পথরোধ করে দাঁড়াল।

চমকে উঠে সভয়ে তিন পা পেছিয়ে এলেন নানকচাঁদ। কী বিপদ, সঙ্গে একটা হাতিয়ার পর্যন্ত নেই। আর থাকলেই বা কী হত, আতঙ্কে তিনি এই মুহূর্তে ইষ্টনামই ভুলে গেলেন তো হাতিয়ার।

কিন্তু যে লোকটা পথরোধ করে দাঁড়িয়েছিল, সে হি হি করে হেসে উঠতেই চিনলেন—কাল্কাপ্রসাদ।

রাগে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত জ্বলে উঠল নানকচাঁদের। কী ভয়টাই না দেখিয়ে দিয়েছিল আহাম্মকটা। তিনি ক্রুদ্ধ অথচ নিম্নকণ্ঠে বললেন, 'তুমি এখানে কি করছ—এত রাত্রে, বোকার মত? স্বভাব-চরিত্র বিগড়োল নাকি?'

'আরে বাবু নানকচাঁদজী, গুস্‌সা মৎ কবিযে। কান্‌হাইয়ালাল তা হলে ঠিকই বলেছিল—'

এক নিমিষে সজাগ হয়ে উঠলেন নানকচাঁদ, 'কান্‌হাইয়ালাল কি বলেছিল?'

অন্ধকারেই জিভ কাটলেন মুনশী কাল্কাপ্রসাদ। কথাটা বলা আদৌ ঠিক হয় নি। বললেন, 'না, কান্‌হাইয়ালাল বলেছিল যে, এই শহরেই তুমি আছ!'

'ও, বলেছিল নাকি? সে শহরে ফিরেছে?'

'না, আসা-যাওয়া করছে।'

দু জনেই হাঁটতে শুরু করলেন।

'হ্যাঁ, কী বলছিলে উকিলসাহেব, স্বভাব-চরিত্র বিগড়োল নাকি? সে কথা তো তোমাকেও জিজ্ঞাসা করা যায়।...তুমিই বা এত রাত্রে এখানে কী করছিলে? পাঁচিল ডিঙিয়ে নানার পেয়ারের আউলা বেগমের ঘরে গিছলে নাকি?'

কথাটা ক্রমশই বিপজ্জনক এলাকায় গিয়ে পড়ছে। নানকচাঁদ সে প্রসঙ্গ চাপা দিয়ে বললেন, 'ওসব বাজে কথা থাক। তার পর, তুমি কী মনে করে এখানে বসেছিলে বল দিকি?'

'তোমাকে খুঁজে হয়রান হয়ে যাচ্ছি কদিন। ওধারে তো সবই খোঁজা হয়েছে, ভাবলুম আজ একবার বিঠুরটা দেখে যাই। তাই এ ধারে—'

'তা আমার খোঁজে—সারা রাত—' সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠেন নানকচাঁদ। সেটা কালকাপ্রসাদও টের পান। তাড়াতাড়ি বলেন, 'না, মানে আসতেই রাত হয়ে গেল। এদিক-ওদিক খুঁজতে আবও রাত হয়ে পড়ল। ভাবলাম যে এখন পথে-ঘাটে একা চলা ঠিক নয়, তাই লুকিয়ে বসেছিলাম। তা মহাবীর ভগবান সদয় আছেন—এই পথেই তোমাকে আনিয়ে দিলেন।' .. এই পর্যন্ত বলে একটু থেমে ভালমানুষের মত পুনশ্চ বললেন, 'তা বিঠুরে কী করতে এলে নানকচাঁদজী—নানাসাহেবের সঙ্গে কোন কাজ-কারবার চলছে নাকি? টাকা-পয়সা বেশ আমদানি হচ্ছে তা হলে? তুমি তো পয়সা ছাড়া চল না এক পা-ও!'

'দূর মূর্খ, নানাসাহেবের সঙ্গে কাজ-করবাব চললে আর প্রাসাদের পেছনে আসব কেন? এক আংরেজ সাহেবের সঙ্গে কাজ ছিল।' গম্ভীরভাবে বললেন নানকচাঁদ।

'আংরেজ!' সামনে সাপ দেখলে মানুষ যেমন লাফিয়ে ওঠে, তেমনিই লাফিয়ে উঠলেন কালকাপ্রসাদ।

'হ্যাঁ, বাবুজী, হ্যাঁ, আংবেজ। এসে পড়ল বলে। ওরা একেবারে চুপি-চুপি এসে নানাসাহেবকে ধরতে চায—লড়াইএর আগে। তাই পেছনদিকেব পথ-ঘাট দেখতে এসেছিল। আমি দেখিয়ে দিলাম।'

'ও, তা সে সায়েব কোথায়?'

'সে নদীর দিকে চলে গেল। ঐ পথেই এসেছে তো।'

'জয় বজরঙ্গবলী। আংবেজই তা হলে জিতবে—কী বল উকিলসাহেব?'

'তাতে সন্দেহ আছে নাকি?'

'তা হলে আমি বেঁচে গেলাম। চাই কি, কপালও ফিরতে পারে।' কালকাপ্রসাদ সংক্ষেপে চার জন ইংরেজ বাঁচানোর ইতিহাস বিবৃত কবলেন। যে সংশয়টা তাঁকে পীড়া দিচ্ছিল, যে কারণে তিনি এমন হন্তে হয়ে তাঁকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন—তাও বললেন। শুধু বললেন না কানহাইয়ালালের সঙ্গে নিজেব কথোপকথনটা। এখন থেকে বলে সতর্ক করে দেওযাটাই কিছু নয়। ওদিকে কালকাপ্রসাদও নিজের মত করে একটু খোঁজখবর নিতে পারবেন বরং অবসরমত।

সব শুনে নানকচাঁদ 'ফুঃ' করে কথাটা উড়িয়ে দিলেন। বললেন, 'আংরেজদের জয় অনিবার্য, মুনশী, তুমি নিশ্চিন্ত থাক।' এই বলে তিনি একটু কাব্যেরও

আশ্রয় নিলেন। পূর্ব-দিগন্তের রক্তিমাভার দিকে দেখিয়ে বললেন, 'রাতের পরে দিন আসে। ওদের রাত এই আষাঢ়েরই রাত—কেটে গেছে। ওদের বরাতেই ঐ ভোর হচ্ছে। এখন মাসখানেক গিয়ে নিজের দেহাতে বসে থাক। কাল-পরশুই এখানে গণ্ডগোল লাগবে। আমিও চললুম, আজই আবার বদরুকা চলে যাব। আর টাকার কথা?—কাল্‌কাপ্রসাদ, বড় সাদা খাতা যোগাড় করতে পার কয়েকটা? শহরে তো সব দোকান বন্ধ—পাওয়া যাচ্ছে না।' থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন নানকচাঁদ।

'সাদা খাতা!' কাল্‌কাপ্রসাদও স্তম্ভিত।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, খাতা! আমি এখন বসে শুধু খাতা লিখব। ঐ খাতাতেই পয়সা। যদি বাঁচতে চাও, খাতা এনে দাও!'

'খাতা?' তবুও মূঢ়ের মত প্রশ্ন করেন কাল্‌কাপ্রসাদ।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ' বুঝতে পারছে না সাদা কথাটা?' অসহিষ্ণুভাবে নানকচাঁদ জবাব দেন, 'আমি যে কিতাব লিখছি! আরও লিখব, ঢের লিখব, যারা বাঁচতে চাইবে, তারা আমার ঐ রোজনামচায় নামটা ওঠাবার জন্যে রাশি রাশি টাকা ঢেলে দিয়ে যাবে আমার কাছে। ঐতেই লাখ লাখ টাকা কামাব।'

'কিতাবে লাখ লাখ টাকা কামাবে। কী কিতাব উকিলসাহেব? রামায়ণের মত বড় কোন পুঁথি নাকি?' কণ্ঠে একটু বিদ্রূপের আভাসও দেখা দেয় কাল্‌কাপ্রসাদের।

'না ভাই, সামান্য এই নানকচাঁদ বাবুসাহেবের জীবনী, রোজকার জীবনী-যাকে রোজনামচা বলে।'

নানকচাঁদ আর অপেক্ষা করলেন না। পাড়া জাগতে শুরু করেছে। সহসা একটা চলতি এক্কায় লাফিয়ে চড়ে বসে মুখটা বাড়িয়ে বললেন, 'আচ্ছা আপাতত চলি ভাই কাল্‌কাপ্রসাদ, রাম রাম।'

সত্যিই লোকটার তল পাওয়া যায় না। কখন যে কী তালে থাকে—কী যে বলে। দূর হোক, মরুক গে ছাই, ওর ও হেঁয়ালি বোঝা তার কর্ম নয়।

কাল্‌কাপ্রসাদ হাল ছেড়ে দেন।

তাঁরও একটা এক্কা প্রয়োজন। এখনই শহর ছাড়তে হবে।

আমিনা অন্তর্হিত হবার পরও বহুক্ষণ হীরালাল সেইখানে দাঁড়িয়ে রইল। পিছনের অভিশপ্ত বাড়িটা থেকে তখনও যেন দু-একটা অস্ফুট গোঙানি ভেসে আসছে, হয়তো এখনও গিয়ে পড়লে কাউকে কাউকে বাঁচানো যায়, অন্তত অন্তিমমুহূর্তে দু-এক জন মুমূর্ষুকে এতটুকু স্বাচ্ছন্দ্য, একটু আশ্বাস দেওয়া যায় —কিন্তু হীরালাল সে চেষ্টাও করতে পারলে না। 'বিবিঘরের হত্যাকাণ্ড শেষ হয়েছে' এই খবর বাতাসে ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে—এরই মধ্যে এক জন দু জন করে কৌতূহলী দর্শক ভরসা বা সাহস সঞ্চয় করে এসে জমতে শুরু করেছে আশেপাশে—যদি কিছু করার থাকে ওরাই করবে। হীরালালের এত মনের বল নেই।

অনেকক্ষণ পরে একটা কথা ওর তখনকার সেই অর্ধ-বিকারাচ্ছন্ন মাথাতেও ঢুকল, উপস্থিত কৌতূহলী জনতার ঔৎসুক্য ওর সম্বন্ধেও কম নয়। তারা ওকেই তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে যেন বেশি করে। অর্থাৎ ওর সঙ্গে এই হত্যাকাণ্ডের সম্পর্কটা অনুমান করতে চায়।

চিন্তা বা ধারণাশক্তি যতই আচ্ছন্ন থেকে—এই ধরনের কৌতূহলের পিছনে যে জবাবদিহি, এমন কি টানাটানি থাকে সাধারণত, সে কথাটাও ওর মাথায় যেতে দেরি হল না। সে এরকম জোর করেই অর্ধ-অবশ দেহটাকে টেনে নিয়ে সেখান থেকে সরে এল।

কিন্তু কোথায় যাবে.কোথায় গেলে একটু নির্জনতা, একটু শান্তি, সত্যকার একটু বিশ্রাম পাবে তা সে ভেবে ঠিক করতে পারলে না। সকালে যে দোকানে আশ্রয় নিয়েছিল—সেখানে ফিরে গেলেই এই ঘটনার আলোচনা শুরু করবে দোকানী, সে কথা মনে হতেই একটা চরম বিতৃষ্ণায় মনটা ভরে গেল। এখন এই প্রসঙ্গ আর একটুও সহ্য হবে না ওর। অথচ আজ এ শহরে কারও মুখে কি অন্য কোনও প্রসঙ্গ আছে!

অগত্যা অনেকক্ষণ পর্যন্ত পথে পথেই ঘুরে বেড়াল হীরালাল। আষাঢ়ে আকাশ, কিন্তু এতটুকু মেঘের চিহ্ন নেই কোথাও। অথচ বর্ষার গুমোটটা আছে যোল আনা। এখানে এই প্রথম গ্রীষ্মকালের অভিজ্ঞতা হীরালালের—

পশ্চিমের যে ভয়াবহ গরমের কথা সে ছেলাবেলা থেকে শুনেছিল সে গরম ওর এতদিন অসহ্য লাগে নি, তার কারণ এতদিন ঘাম হত না। উত্তপ্ত বাতাসে মুখ-চোখ ঝল্‌সে যেত, কিন্তু ঘামের কষ্টটা টের পায় নি। এই কদিন শুরু হয়েছে সেটাও। তাপ কমে নি—বাতাস কমেছে। ফলে অবস্থা হয়েছে আরও শোচনীয়। ঘামে ওর পিরানটা গায়ের সঙ্গে সেঁটে গেছে, তার ওপর রৌদ্রের তাপে যেন ও সিদ্ধ হচ্ছে ভেতরে ভেতরে। পিপাসায় বুক অবধি শুকিয়ে উঠেছে, ধুলো তেতে হাঁটু পর্যন্ত পা দুটো ঝলসে যাচ্ছে।

অনেকক্ষণ আচ্ছন্নের মত, অভিভূতের মত পথে পথে ঘোরবার পর একসময় নিজের এই অবস্থাটা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠল হীরালাল। শরীরটা বহুক্ষণই ভারী পাথর হয়ে উঠেছিল—সে ভার পা দুটো আর বইতে পারছিল না। একটু একটু করে সচেতনতাটা ফিরে আসবার পর আর একেবারেই নড়বার অবস্থা রইল না। মনে হল আরও একবার হয়তো এখনই পথের ওপর বসে পড়তে হবে।

ঠিক সেই সময়ই চোখে পড়ল—সামনেই গঙ্গা। অন্যমনস্ক ভাবে ভূতগ্রস্তের মত পথ চললেও প্রকৃতি বুঝি নিজের কাজ ঠিক করে গেছেন—তৃষ্ণার্তকে জলের কাছেই টেনে এনেছেন।

সর্বসন্তাপহারিণী, সর্বদুঃখবিনাশিনী গঙ্গা।

হীরালালের আর জ্ঞান রইল না। সে কোন দিকে চাইল না, অগ্রপশ্চাৎ কিছু ভেবেও দেখল না। যে অবস্থায় ছিল সেই অবস্থাতেই—জামা-কাপড়-সুদ্ধ জলে গিয়ে নামল!

আঃ—! সব তাপ জুড়িয়ে গেল বুঝি। সব জ্বালা। শুধু দেহের নয়—মনেরও।

শীতল, মধুর জল। পশুর মত মুখ দিয়েই আকণ্ঠ পান করলে হীরালাল, বার বার ডুব দিলে। তার পর গলা অবধি ডুবিয়ে অনেকক্ষণ পড়ে রইল জলে।...

আর কিছু চায় না সে। আর কিছু ভাববেও না। এই ভাল। এই ভাবেই যদি সারা জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারে তো আরও ভাল। এমনি আরাম, এমনি বিস্মৃতি-ভরা শীতল শান্তিতে।...

কিন্তু আষাঢ়ের বেলাও ক্রমশ শেষ হয়ে আসে। গঙ্গার জলে, ওপারের বনরেখায় সন্ধ্যা নামে। হঠাৎ এক সময় হীরালালের মনে হল ওর শীত

করছে। বুকের মধ্যে গুর গুর করে উঠছে কাঁপুনি। সে তাড়াতাড়ি জল থেকে উঠে পড়ল।

এতক্ষণে তার খেযাল হল যে, এই প্রচণ্ড রৌদ্র থেকে এসেই ঘর্মাক্ত দেহে ঠাণ্ডা জলে নামা তার ঠিক হয নি। এরই মধ্যে সর্দি হযে উঠেছে—প্রবল সর্দি। অথচ এখনও—জল থেকে উঠেও—ভিজে জামা-কাপড় ছাড়ার কোন উপায় হল না। কিছুই সে খুলে রাখে নি পাড়ে, নামবার সময় অত বিবেচনা করার অবস্থাও ছিল না। যদি উড়নিটাও অন্তত খুলে রেখে নামত তো এখন সেটা পরা চলত।

কিন্তু তা যখন রাখেই নি—তখন নিজের নির্বুদ্ধিতাকে ধিক্কার দেওযা ছাড়া আর করবার কিছু নেই। জামা-কাপড় যতটা সম্ভব নিংড়ে নিযে আবার সেইগুলোই পরে—জুতো জোড়াটা হাতে ঝুলিযে ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপতে কাঁপতে বাসার পথ ধরল হীরালাল—এবং সেই অবস্থাতেই বিস্তর ঘুরে বিস্তর খুঁজে যখন শেষ পর্যন্ত সেই দেকানটায এসে পৌঁছল তখন তার সত্যিই আর দাঁড়াবার বা কথা কইবার শক্তি রইল না। প্রবল জ্বরে তখনই সে অভিভূত হয়ে পড়েছে। কোনমতে টলতে টলতে দোকানের পাশে অতিথিদের জন্য নির্দিষ্ট ঘরটায় ঢুকে সেই আধ-শুকনো কাপড়-জামাসুদ্ধই খাটিয়াতে চলে পড়ল। এতক্ষণে তার পূর্ণ শান্তি অর্থাৎ পূর্ণ বিস্মৃতি মিলেছে।

দোকানী পড়ল মহা আতান্তরে। লোকটা সম্পূর্ণ অপরিচিত, বিদেশী। কোথায় কে আছে ওর তাও জানা যায় নি! নিষ্ফল জেনেও সে হীরালালকেই বার বার উৎকণ্ঠিত প্রশ্ন করেছে—কিন্তু ওর তখন পূর্ণ বিকার। উত্তর দেবে কে? সঙ্গে এমন কোন কাগজপত্র নেই যাতে পরিচয় মেলে। টাকা-পয়সার অবস্থাও তথৈবচ। এ কী ঝঞ্ঝাটে তাকে ফেললেন মহাবীরজী!

এধারে শহরে তখন ঘোর অরাজক অবস্থা চলছে। ইংরেজরা এসে পৌঁছেছে। নানাসাহেব যুদ্ধের একটা ক্ষীণ চেষ্টা করেছিলেন ভাইকে পাঠিযে—সে ভাই পরাজিত হয়ে পালিয়ে এসেছে। নানাসাহেব, কানপুর তো বটেই, বিঠুরও ছেড়ে চলে গিয়েছেন কাল্‌পীর দিকে। ইংরেজরা এখন কানপুরের পূর্ণ মালিক। মাত্র কদিন আগে যাদের কুকুরের মত গুলি করে মারা হয়েছে যাদের মেয়েরা এই দু দিন আগেই কসাইয়ের হাতে খাসীর মত কচুকাটা হয়েছে—তাদের জাতি, স্বদেশবাসী এরা—এই বিজয়ীরা।

সুতরাং সেদিনের সেই বিশ্বাসঘাতকতা, অকারণ নিষ্ঠুরতার পূর্ণ শোধ উঠবে—এইটাই স্বাভাবিক। সে শোধও উঠছে তেমনিই, যেমন ঋণ, তার তেমনি ওয়াসিল। শোধ হচ্ছে সুদ সুদ্ধ, হয়তো চক্রবৃদ্ধি-সুদসুদ্ধ—কিন্তু তাতেই বা বলবার কী আছে? দেনা করলেই সুদ দিতে হয়।

ইংরেজরা যে-কোন এদেশী লোককে হাতের সামনে পাচ্ছে, বলতে গেলে তাকেই ফাঁসির-কাঠে চড়াচ্ছে। কিন্তু শুধুই ফাঁসি নয়—তার আগেও লাঞ্ছনা বড কম হচ্ছে না। যে না প্রমাণ করতে পারছে যে, সে ইংরেজের শত্রু নয়, কোন রকমে তাদের বিরুদ্ধাচরণ করে নি—তারই এই পরিণাম ঘটছে। আর সাধারণ লোক প্রমাণ প্রযোগের কথা জানেও না। তারা ওসব গরজ করে রাখতেই বা যাবে কেন? সুতরাং তারাই এই ভাবে মরতে লাগল দলে দলে। যারা হুঁশিয়ার, যারা ইংরেজের বাংলো লুট করে দু পয়সা করেছে—তারাই এখন সাড়ম্বরে ইংরেজ-ভক্তি প্রচার করতে লেগে গেছে—উঠে পড়ে, আর তাদের প্রমাণেরও অভাব হচ্ছে না।

এই হালচালের মধ্যে বেচারী দোকানদারের অবস্থাটা হয়ে উঠেছে অবর্ণনীয়। তার দিনের আহার রাত্রের নিদ্রা দুই-ই চলে গেছে। ব্যবসা তো গোল্লায় গেছেই—তা যাক্—এখন সে কোনমতে দেহাত-টেহাতে পালিয়ে যেতে পারলে বাঁচে—কিন্তু সে উপায়ও যে বন্ধ হতে বসল। এই অজ্ঞান, অচৈতন্য মুমূর্ষু লোকটাকে ফেলে সে যায় কেমন করে? বিশেষ করে লোকটা ব্রাহ্মণ—জাতের পরিচয় আগেই দিয়েছিল, তা ছাড়া জেনেউ দেখেও মালুম হচ্ছে। ব্রাহ্মণ-সন্তানকে নিশ্চিত মৃত্যুর মধ্যে ফেলে যেতেও ঠিক মনটা সরছে না।

মরীয়া হয়ে সে ঐ গোলমালের মধ্যেই শহরে কে কোথায় 'বাংগালী' আছে খোঁজ করতে লেগে গেল। খবর পাওয়াও গেল শেষ পর্যন্ত। অধিকাংশ বাঙালী—যারাই সুযোগ পেয়েছে কোন রকম—শহর ছেড়ে পালিয়েছে। যারা পালাতে পারে নি তারা দু-তিনটে জায়গায় জড়ো হয়ে অহরহ মৃত্যুভয়ের মধ্যে কোনমতে দিন কাটাচ্ছে। মৃত্যুভয় এই জন্যে যে—বাঙালীমাত্রেই সাহেবের পা-চাটা এবং গোপনে গোপনে তাদের সাহায্যকারী—সিপাহীদের এই বিশ্বাস। তারা এতদিন ঘোর সন্দেহের চোখে দেখে এসেছে, হুমকিও বড় কম দেয় নি! কড়া নজর রেখেছে ওদের ওপর। অথচ যা দু-এক জন সাহেব কোনমতে সিপাহীদের হাত থেকে অব্যাহতি পেয়েছে—ছুটে এসেছে

বাঙালীদের কাছেই একটু সাহায্য বা আশ্রয়ের জন্য। কখনও কখনও সেটুকুও দেওয়া যায় নি—তবে দেবার চেষ্টা করেছে অধিকাংশ সময়ই। তারা জানত যে, সাহেবরাই জিতবে শেষ অবধি—এবং তা না জিতলে বাঙালীদের মঙ্গল নেই। কিন্তু আপাতত শমন শিয়রে যে! যদি এতটুকু এই আনুকূল্যের সংবাদ প্রকাশ পায় তো কারুর শির থাকবে না।

অবশ্য সিপাহীদের ভয় আপাতত কমেছে বটে কিন্তু এখনও চূড়ান্ত মীমাংসার অনেক দেরী। তা ছাড়া সাহেবরাও যে সবাই বাঙালীকে পূর্ণ বিশ্বাসের দৃষ্টিতে দেখেন তা-ও নয়। বিশেষত ছেলে-ছোকরাদের সম্বন্ধে খুব যেন নিশ্চিত হতে পারেন না। কতকটা সেই জন্যেই—দোকানী প্রথম যে বাসায় এসে খবর দিলে যে, এক অপরিচিত বাঙালী ছোকরা বাবু জ্বরে অচৈতন্য হয়ে পড়ে আছে তার দোকানে—এবং 'খুন' 'রক্ত' এই সব কী বকছে—তখন সে বাসার কেউ ও উড়ো আপদ ঘাড়ে নিতে রাজী হলেন না। ব্যাপার-গতিক দেখে দ্বিতীয় বাসাতে গিয়ে অনুমতি নেবারও চেষ্টা করলে না দোকানী —দূর থেকে বাসাটা দেখে এসে অতিকষ্টে একটা ডুলি যোগাড় করে হীরালালকে তুলে এনে একেবারে দোরের কাছে নামিয়ে দিলে।

এঁরা আর এড়াতে পারলেন না। একে বাঙালী (চেহারা দেখেও তাই মনে হচ্ছিল, আর বিকারের ঘোরে যা বকছিল তা বাংলা ভাষাই), তায় ব্রাহ্মণ এই দুর্যোগের দিনে কোথায়ই বা ফেলেন? আশঙ্কায় কণ্টকিত হয়েও 'আপদ'কে আশ্রয় দিতে হল এবং শহরের অবস্থা একটু সহজ হতে বৈদ্য ডাকতে হল। আশঙ্কা এবার ইংরাজের কাছ থেকে—কথায় কথায় তারা ধরে নিয়ে যাচ্ছে—তার পর এ ছোকরা যা বকছে তা আরও সাংঘাতিক; 'বিবিঘর', 'সর্দার খাঁ', 'খুন', 'রক্ত', তলোয়ার',—এই সব। সাহেবের কানে গেলে তো রক্ষা নেই-ই, পথে-ঘাটে এখন অসংখ্য গোয়েন্দা, তাদের কানে গেলেই যথেষ্ট।

বৈদ্য এসে অবস্থা দেখে মুখ বিকৃত করলেও হীরালাল শেষ পর্যন্ত সেরেই উঠল। হয়তো তার স্বাস্থ্য অসাধারণ ভাল ছিল বলেই, কিংবা অল্প বয়সে রোগের সঙ্গে লড়াই করবার ক্ষমতা বেশি থাকে বলে—বৈদ্যরাজের 'সান্নিপাতিক বিকার'ও তাকে পেড়ে ফেলতে পারল না।

কিন্তু সে সেরে উঠে বসতে [illegible] দিন কেটে গেল। বহু ঘটনাই ঘটে

গেছে ইতিমধ্যে। ধারণা ও চিন্তাশক্তি যেমন একটু একটু করে ফিরে আসতে লাগল—একটু একটু করেই শুনলে সব খবর।

হীরালাল যেদিন জ্বরে অচৈতন্য হয়ে পড়ে—তার পরের দিনই বিজয়ী ইংরেজ দল কানপুরে প্রবেশ করেছে। তখনও নানাসাহেব বিঠুরে ছিলেন—পরের দিন রাত্রে তিনি বিঠুর ত্যাগ করে গঙ্গা পেরিয়ে ওপারে পালিয়ে গেছেন। ঠিক সময়ই গিয়েছিলেন, কেন না—সেই রাত্রিশেষেই ইংরেজরা বিঠুর প্রাসাদ দখল করেছে ও ধ্বংস করেছে। ইংরেজদের এ-দলের প্রধান সেনাপতি হ্যাভলক কানপুরে বেশী দিন থাকেন নি, আট-ন দিন পরেই লক্ষ্ণৌএর দিকে রওনা হয়ে গেছেন—রেখে গেছেন নীলকে। নীল তার অভ্যাস ও স্বভাব মত পৈশাচিকতার তাণ্ডব শুরু করেছে।

কানপুর পর্যন্ত হ্যাভলকের গতি অব্যাহত থাকলেও, তার পরে বিশেষ সুবিধা করতে পারেন নি। কানপুরে পৌঁছবার আগে বার-দুই নানার প্রেরিত বাহিনী তাঁকে বাধা দেবার চেষ্টা করেছিল—পারে নি। কিন্তু লক্ষ্ণৌএর পথে বশিরৎগঞ্জ পার হতে গিয়ে হ্যাভলককেই পিছিয়ে আসতে হয়েছে—দু দু বার।

এর পর এসেছেন সেনাপতি আউটরাম। ওঁকে পারস্য থেকে আনানো হয়েছে। আগে ঠিক হয়েছিল আউটরাম বিহারেই থাকবেন—কারণ আরা ও দানাপুরে আগুন জ্বলেছে ভাল ভাবেই। কিন্তু কানপুর সম্বন্ধে অস্বস্তিকর সংবাদ পৌঁছলে তাঁকে সোজা কানপুরেই চলে আসতে হল। এর মধ্যে কানপুর গ্যারিসনের অবস্থা সত্যিই শোচনায় হয়ে উঠেছিল। দু বার যুদ্ধ এবং মড়কে হ্যাভলকের দলে বিস্তর লোক মারা গেছে, দলে যোদ্ধার সংখ্যা মাত্র শ-সাতেক এসে ঠেকেছে। অথচ চারিদিকেই প্রবল শত্রু। গোয়ালিয়রে নাকি বিরাট একটি দল প্রস্তুত হচ্ছে, যে কোন মুহূর্তে তারা কানপুরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে হয়তো। নানাসাহেবও অদূরেই বসে আছেন—ফতেপুর চৌরাশীতে ঘাঁটি করে ঐ দলের অপেক্ষা করছেন, ওদের অগ্রগমনের সংবাদ পেলেই তিনিও এগিয়ে আসবেন। গোয়ালিয়র দল এতদিন এসেই পড়ত—শুধু নাকি সিন্ধিয়ার কৌশলেই তারা এখনও চুপ করে বসে আছে, এখনও ইতস্তত করছে। তার জন্য নাকি সিন্ধিয়া ইংরেজের কাছে ঘুষ খাচ্ছেনও প্রচুর।

ইতিমধ্যে লক্ষ্ণৌতেও নাকি অনেক কাণ্ড হয়ে গেছে। লরেন্স মারা

গেছেন—সে খবরটা অবশ্য হীরালাল আগেই পেয়েছিল পথে আসতে আসতে ; ইংরেজরা বেগতিক দেখে মচ্ছিভবন থেকে ঘাঁটি সরিয়ে এনেছে, সবাই এসে আশ্রয় নিয়েছে রেসিডেন্সিতেই। আসবার আগে মচ্ছিভবনের প্রাসাদ তোপের মুখে উড়িয়ে দিয়ে এসেছিল খানিকটা—কিন্তু তাতে সিপাহীদের ভয় দেখানো যায় নি। বরং অবরোধ তীব্রতর হয়েছে। মৌলবীসাহেব ও অযোধ্যার বেগম হজরৎমহল সিপাহীদের নেতৃত্ব নিয়েছেন—বহু সিপাহী এসে জড়ো হয়েছে, সিপাহী ছাড়াও বহু লোক এসেছে—তালুকদারেরা অনেকেই এসেছেন লোকলস্কর নিয়ে বেগমসাহেবার আহ্বানে। অবরোধের মধ্যে ইংরেজের জীবন দুর্বহ হয়ে উঠেছে, প্রতিদিন বহুলোক মারা যাচ্ছে—শত্রুপক্ষের গুলিতে, রোগে, খাদ্যাভাবে। খাদ্য নেই, বস্ত্র নেই, ঔষধ নেই। স্নান, কাপড়-কাচা—এসব কল্পনাতীত বিলাস হয়ে উঠেছে।

তবুও ওরা কোনমতে বাইরের জগতের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছে। অঙ্গদ তেওয়ারী নামে এক গুপ্তচর অসাধ্যসাধন করছে, ঐ নীরন্ধ্র অবরোধের মধ্য দিয়েও খবর আদানপ্রদানের কাজ অব্যাহত রেখে যাচ্ছে। তাইতেই এইসব শোচনীয় সংবাদ কানপুরে এসে পৌঁছেছে এবং আউটরামও পেছনে গোয়ালিয়র বাহিনীর উদ্যত বজ্র উপেক্ষা করে এগিয়ে গেছেন লক্ষ্ণৌএর দিকে।

কিন্তু লক্ষ্ণৌএর দুঃখ তাতে ঘোচে নি! হ্যাভলক ও আউটরাম লক্ষ্ণৌএ অবরোধ ভেদ করে রেসিডেন্সিতে ঢুকেছেন বটে, বেরিয়ে আসতে পারেন নি—অবরোধও বন্ধ হয় নি। তাঁরা সুদ্ধ আটকা পড়েছেন সেখানে। ফলে সেখানকার সেই সামান্য খাদ্যেই ভাগ বসাবার লোক বেড়েছে শুধু, আর কোন উপকার হয় নি। সব মিলিয়েও সমর্থ লোকের সংখ্যা এমন দাঁড়ায় নি যে শত্রুব্যূহ কেটে বেরিয়ে আসা যায়।

অভিভূতের মত হীরালাল শুনল এই সব কাহিনী। সে এতদিন রোগে পড়ে ছিল? এত ঘটনা ঘটে গেছে এখানে—আর সে কিছুই টের পায় নি!

এ যেন একেবারেই অবিশ্বাস্য, গল্পকথা।

কিন্তু বিস্ময়ের ধাক্কা শেষ হতেই দেখা দিল সমস্যা।

ভবিষ্যৎ এসে দাঁড়াল সামনে।

এখন কী করবে? যাঁদের আশ্রয়ে আছে—তাঁদের অবস্থাও কম শোচনীয়

নয়, তাঁদের গলগ্রহ হয়ে আর এক দণ্ডও থাকা উচিত হবে না। অথচ করবেই বা কী? শরীর দুর্বল; তা ছাড়া ওর প্রাক্তন মনিবদেরও তো কোন খোঁজ-খবর নেই। দেশে ফিরে যাবে? তাই বা কেমন করে ফিরবে—এখনও তো পথঘাট কিছুমাত্র নিরাপদ হয় নি। টাকাই বা কই?

অবশেষে ঐ বাসারই এক প্রবীণ ভদ্রলোক সুপরামর্শ দিলেন। ইংরেজরা এখানে এসে বসলেও ওদের ভিতটা এখনও পাকা হয় নি।—আবারও উৎখাতের ভয় আছে—সেইজন্যে বাঙালীরা এখনও প্রকাশ্যে খুব একটা ঘনিষ্ঠতা করতে সাহস করে নি, তবে গোপনে পূর্ণ সহযোগিতাই করছে, কেউ কেউ যতটা সম্ভব ওদের কাজও করে দিচ্ছে। রামগোপাল চক্রবর্তী এই দলেরই লোক—তিনি এই সব গোলমালের আগে ছিলেন এক কাপড়ওয়ালা সাহেবের কেরানী, খাতাপত্রে পাকা। তিনিই এখন ইংরেজ গ্যারিসনের হিসাবপত্রের কাজে সাহায্য করছেন। রামগোপালবাবু ওকে বললেন, 'তুমি এখানকার অফিসারের সঙ্গে দেখা কর। সব কথা খুলে বল, এখানেই চাকরি পেয়ে যাবে!'

'এঁরা বিশ্বাস করবেন আমার কথা?'

'অবিশ্বাস করবার কী আছে? তুমি আমাদের এখানে এই আড়াই মাস রোগে পড়ে আছ এটা তো মিছে কথা নয়, আমরা সবাই জানি। আমরাই সাক্ষী দিতে পারব। আর তুমি কমিসারিয়েটে কাজ করতে কি না—সেটা তো তোমাকে জেরা করলেই তাঁরা টের পাবেন! চল বরং আমিই তোমাকে নিয়ে যাই একদিন।'

রোগ ওষুধে সারে—শরীর সারাবার জন্য দরকার হয় রসায়ন। রামগোপাল বাবুর এই আশ্বাসটুকু রসায়নের কাজ করল। হীরালাল এই ভরসা পাওয়ার তিন-চার দিনের মধ্যেই যেন বেশ খানিকটা সবল ও সুস্থ হয়ে উঠল। সে অবশ্য সেই দিন থেকেই নিত্য তাগাদা শুরু করেছিল—কিন্তু রামগোপালবাবু আরও কয়েকদিন সময় নিলেন—সাংঘাতিক রোগে রক্তশূন্য ও দুর্বল করে দিয়েছে, এই অবস্থায় বেশী পরিশ্রম করলে আবার পড়তে পারে—বৈদ্য বার বার সাবধান করে দিয়েছেন।

অবশ্য বেশীদিন অপেক্ষা করা গেল না। হীরালাল এই নিষ্ক্রিয়তা ও পরমুখাপেক্ষিতা থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য ছট্‌ফট্ করতে লাগল—আর এক দিনও এমন করে পরের অন্ন খেয়ে বেঁচে থাকতে চায় না সে। ওর

পীড়াপীড়িতে বাধ্য হয়েই রামগোপালবাবুকে শীগগির একটা ভাল দিন দেখে ওকে সঙ্গে করে মেজর সাহেবের কাছে নিয়ে যেতে হল।

মেজর সাহেব ওর সব কথা শুনলেন। জেরা করলেন বিস্তর। লক্ষ্ণৌ ছেড়ে আসার অজুহাতটা তাঁর খুব পছন্দ হল না। হীরালাল অবশ্য সত্য কথাই বলেছিল—কিন্তু তাতে ওঁদের খুশী হবার কথা নয়। যাই হোক, সব শুনে বললেন, 'সার কলিন ক্যাম্পবেল আর তাঁর হাইল্যাণ্ডাররা আসছে লক্ষ্ণৌ জয় করতে। তাঁদের কমিসারিয়েটে অভিজ্ঞ লোক দরকার। আরও দরকার লক্ষ্ণৌএর পথঘাট চেনে, রেসিডেন্সির ম্যাপটা বোঝে এমন লোক। আমাদের এখানে এখন কেরানীর প্রয়োজন নেই—সে লোক ঢের আছে। আমাদের এখন যোদ্ধার দরকার।·· তুমি এক কাজ কর—যদি সত্য-সত্যিই আমাদের সার্ভ করতে চাও তো আজই রওনা হয়ে যাও ফতেপুরের দিকে। সম্ভবত তুমি সেখানে পৌঁছতে পৌঁছতে সার কলিনের দল সেখানে এসে যাবে। তাঁদের কাছে গিয়ে রিপোর্ট কর গে। ফতেপুর পর্যন্ত পথ পরিষ্কারই আছে এখনও—যেতে কোন অসুবিধা হবে না। চাও তো একটা চিঠি লিখে দিতে পারি—এখান থেকে একটা ঘোড়াও দিতে পারি।'

অগত্যা! হীরালাল মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে রইল।

আবার অনিশ্চিতের উদ্দেশে যাত্রা।

কিন্তু উপায়ই বা কী! সাহেবের মুখ দেখে বোঝা গেল যে, এর বেশি কোন সুবিধাই সেখানে হবে না।

সাহেব আর এক বার শুধু প্রশ্ন করলেন, 'ঘোড়ায় চড়তে জান তো?'

মাথা হেলিয়ে হীরালাল উত্তর দিল, জানে সে।

'তা হলে কাল ভোরে তৈরী হয়ে এস—ঘোড়া ও চিঠি প্রস্তুত থাকবে।'

॥ ৬৪ ॥

৯৩নং গর্ডন হাইল্যাণ্ডারদের দলে এসে যে ছেলেটির সঙ্গে হীরালালের সব চেয়ে ভাব হল সে হচ্ছে কর্পোরাল উইলিয়াম মিচেল। ঠিক এক-বয়সী নয় ওরা—বিলি মিচেলের বয়স বোধ হয় চব্বিশ-পঁচিশ হবে। ওর চেয়ে কম বয়সের ছেলে আরও ঢের আছে, কেউ কেউ এমন কি হীরালালের চেয়েও এক আধ বছরের

ছোট হবে হয়তো—তবু মিচেলের সঙ্গেই যে ওর ভাব হয়ে গেল, তার কারণ বোধ হয় মিচেলের সহানুভূতিপ্রবণ এবং উৎসুক মনটি। এ দেশ সম্বন্ধে, দেশবাসী সম্বন্ধে জানবার ও বোঝবার আগ্রহ ওর অসাধারণ। আর সম্ভবত বোঝে ও বুঝতে চায় বলেই একটি সহানুভূতির ভাবও প্রকাশ পায় ওর প্রত্যেকটি আচরণেই। এখন শ্বেতাঙ্গ মাত্রেই 'কালা আদমী'দের সম্বন্ধে বিদ্বিষ্ট —সে প্রকট বিদ্বেষ যখন-তখন বীভৎস প্রতিহিংসার আকারে প্রকাশ পায়—এমন কি সে বিদ্বেষ থেকে বাঙালীরাও সম্পূর্ণ অব্যাহতি পায় না—যখন-তখন সেই প্রচ্ছন্ন রোষবহ্নি প্রকাশ হয়ে পড়ে তাদের সঙ্গে আচার-ব্যবহারে। এ হাইল্যাণ্ডাররা এদেশে নবাগত হলেও জনশ্রুতিতে স্বদেশীয়দের উপর অত্যাচারের কাহিনী বেশ একটু পল্লবিত হয়েই কানে পৌঁছেছে তাদের—সেজন্য তাদেরও জিঘাংসা বা প্রতিহিংসাবোধ কম নয়। হীরালাল তাদের কাছাকাছি থাকতে থাকতে প্রত্যহই সেই আচ্ছাদিত রোষবহ্নির তাপটা অনুভব করত। বন্ধুত্ব যে শ্রেণীর ভাব দেওয়া-নেওয়ার ওপর নির্ভর করে সে শ্রেণীর মানসিক আদানপ্রদান তাই সম্ভব হত না ওদের সঙ্গে।

এর একমাত্র ব্যতিক্রম ছিল বোধ হয় বিলি মিচেল। সে এ-দেশবাসীর মনের ভাবটা বুঝতে চেষ্টা করত এবং এদেশের সকলেই যে এই সব নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত নয়, এই সত্যটা সে স্বীকার করত। সেই জন্যই হীরালালের সঙ্গে তার সহজেই একটা অন্তরঙ্গতা গড়ে উঠেছিল।

এদের প্রথম আলাপের সূত্রটাও বড় বিচিত্র।

সুস্থ সবল জোয়ান পাহাড়ী হাইল্যাণ্ডরদের যা রেশন দেওয়া হত—বলা বাহুল্য তা তাদের পক্ষে পর্যাপ্ত নয়। কর্তৃপক্ষেরও তার চেয়ে বেশি দেওয়া সম্ভব ছিল না। তাই তারা সর্বদাই ক্ষুধার্ত থাকত। তিন দিনের বিস্কুট এক-এক সঙ্গে দিয়ে দেওয়া হত—কথা থাকত যে ওরা এক-এক বেলায় দুখানা করে খাবে। কিন্তু লম্বা 'মার্চ'-এর মুখে প্রথম প্রভাতেই সে বিস্কুটগুলি ঐ ষণ্ড-খাদকদের উদর-গহ্বরে চির-নির্বাণ লাভ করত। তার পরে বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা-মাত্র থাকত সম্বল।

এরই মধ্যে একদিন একটা বিস্কুটের গাড়ির চাকা ভেঙে গাড়িখানা উল্টে পড়ে গেল আর তার ফলে বিস্কুটের থলিগুলো পড়ল রাস্তার ওপর ছত্রাকার হয়ে ছড়িয়ে। দৈবক্রমে সেদিন হীরালালের ওপরও ভার পড়েছিল ঐ বিস্কুটের গাড়িগুলো পাহারা দেবার। কিন্তু সে কী করবে, থলিগুলো জড়ো

করার বা অন্য গাড়িতে তোলবার চেষ্টা করতে না করতে—অথবা কোন চেষ্টা করবার আগেই—পিছনের ক্ষুধার্ত হাইল্যাণ্ডাররা এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং থলিগুলোর মুখ কেটে মুঠো মুঠো যে যার কাঁধ-ঝোলায় পুরতে শুরু করে দিলে।

বেচারী হীরালাল অবশ্য বাধা দেবার যথেষ্ট চেষ্টা করেছিল—মানে তার পক্ষে যতটা বাধা দেওয়া সম্ভব। কিন্তু দৈত্যের মত বলিষ্ঠ পাহাড়ে-গোরার কাছে তার শক্তি আর কতটুকু। দু-চারটে কেঠো হাতের ধাক্কাতে আর গুঁতোতেই ওর শক্তি খতম হয়ে গেল। তবুও মার খেয়েও—বলতে গেলে জীবনপণ করেই ও বাধা দিয়ে যেত হয়তো, কিন্তু সেই সময় পিছন থেকে স্বয়ং সার কলিন এসে পড়ায় ব্যাপারটা সহজে মিটে গেল।

তিনি এসে ঘটনাটা কী খোঁজ করতেই হীরালাল কাঁদো-কাঁদো হয়ে এসে নালিশ করল—'এরা জোর করে সব বিস্কুট কেড়ে খাচ্ছে হুজুর, আমার কোন কথা শুনছে না। উল্‌টে বাধা দিতে গেলে ভয় দেখাচ্ছে, মেরে ফেলবে বলছে।'

সার কলিন ক্যাম্পবেল কঠিন দৃষ্টিতে চাইলেন ওদের দিকে।

ওদের মধ্যে 'অফিসার' বলতে কর্পোরাল মিচেল। অগত্যা তাকেই এগিয়ে আসতে হল। সে ঘাড় চুলকে আমতা-আমতা করে বললে, 'না বিস্কুটগুলো মাটিতে পড়ে নষ্ট হচ্ছিল—তাই আমরা—মানে নষ্টই তো হত—তাই হ্যাভারস্যাকে পুরে রাখছিলুম!'

'হুঁ, বুঝেছি। অতিকষ্টে হাসি দমন করলেন সেনাপতি ক্যাম্পবেল, 'এবারের মত বিস্কুটগুলো তোমাদের দিলুম, কিন্তু ভবিষ্যতে সাবধান। বিশেষত মদের গাড়ি ভাঙলে যেন এমনি করে কুড়িয়ে নেবার চেষ্টা ক'র না!'

তিনি এগিয়েই যাচ্ছিলেন, কিন্তু হীরালাল অসীম সাহসে ভর করে তাঁর পথ আটকে দাঁড়াল।

'তা হলে হুজুর আপনিই আমাকে একটা রসিদ দিয়ে যান—নইলে মেজর ফিটজেরাল্ড আমাকে ছাড়বেন না—আমাকে চাবুক খেতে হবে শেষ পর্যন্ত।

'তা বটে।' কলিন হেসে তাঁর সঙ্গের আর একজন অফিসারকে ইঙ্গিত করলেন, 'দাও হে, একটা ভাউচার করে দাও। লিখে দাও যে, প্রধান সেনাপতি এই বিস্কুটগুলো বিশেষ উপহার হিসেবে দিয়েছেন।—তোমরা বন্ধুদের মধ্যে ভাগ্যযোগ করে নিও কিন্তু, স্বার্থপরের মত একা খেও না!'

সামান্য ঘটনা। কিন্তু সে-ই ওদের বন্ধুত্বের সূত্রপাত। ক্ষীণজীবী বাঙালীর ছেলের পক্ষে অতগুলো ষণ্ডা ষণ্ডা হাইল্যাণ্ডারদের বাধা দেবার চেষ্টা করা বা স্বয়ং প্রধান সেনাপতির পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে ন্যায়বিচার দাবি করা—কোনটাই কম দুঃসাহসের ব্যাপার নয়। আর সেই কারণেই বিলি মিচেলের দৃষ্টি পড়ল ওর দিকে। মনে মনে ওকে তারিফ না করে পারল না মিচেল। 'বাবু'রা ওদের কাছে একপ্রকারের অতি-নিরীহ পোষ-মানা জীব মাত্র। তাদেরই মধ্যে হঠাৎ একটা মানুষ দেখতে পেলে বিস্মিত হবার বা তার সম্বন্ধে সম্ভ্রম বোধ করারই কথা। আর সেই জন্যেই—এই নতুন পরিচয়ের পর কতকটা সমানে সমানে মিশতে পেরেই, দু জনে অচিরে বন্ধু হয়ে উঠল।

অসুবিধা ছিল অবশ্য ঢের। ইংরেজদের ভাষা গত কয়েক মাসে ওর যদি বা কিছু বোধগম্য হয়েছে—স্কচ্‌দের বুলি একেবারেই দুর্বোধ্য। অতিকষ্টে আকারে-ইঙ্গিতে বুঝতে হত প্রথম প্রথম। তার পর—বোঝা হয়তো গেল—বোঝায় কী করে? ভাঙা ভাঙা ভুল ইংরেজি—এই তো ভরসা। তবুও দুটি মন যখন সত্যি সত্যিই পরস্পরকে বোঝার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠে—তখন ভাষার বেড়া ডিঙোতে কি সত্যিই খুব অসুবিধা হয়?

অন্তত ওদের হয় নি।

আর মিচেলের মারফত রেজিমেন্টের আরও কয়েকটি লোকের সঙ্গে ওর পরিচয় হল। সাহেব বলতেই হীরালালের মনে যে একটা বিচিত্র জীব জাগত এত কাল—তাদের মন তো এত নরম, এত ভাবপ্রবণ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন নয়। সে এই প্রথম বুঝলে যে, মানুষ হিসেবে এরা সকলে যেমন ভাল নয়, সকলে তেমনি খারাপও নয়। এবং চামড়ার যতই তফাত থাক, আচার-আচরণে যত পার্থক্যই ধরা পড়ুক—আসলে ভেতরের মানুষগুলো তাদের মতই ভাবে তাদের মতই কাঁদে হাসে, তাদের মতই সুখ-শান্তি কামনা করে। ওরাও মায়ের চিঠির জন্য উন্মুখ হয়ে থাকে, স্বপ্ন দেখে মন খারাপ করে—এবং দুর্লক্ষণ দেখলে মুখ শুকিয়ে ভাবতে বসে যে, এ যাত্রা আর জীবন নিয়ে এ দেশ থেকে ফিরতে হবে না। পাশের লোককে অনুরোধ করে যে মরবার পর তার গলায় ঝোলানো ক্রুশ এবং জিনিসপত্র যেন দেশে মার কাছে পাঠাবার ব্যবস্থা করে দেয় সে!...

কিন্তু তবু—অসাধারণ মানুষও দু-এক জন ছিল বৈকি!

সেটা অন্তত দুটি লোককে দেখে স্বীকার করতেই হল হীরালালকে।

'কোয়েকার' ওয়ালেস আর হোপ। বিচিত্র মানুষ দু জন।

মিচেলের মুখে শুনতে পেলে যে, এরা দু জনেই উচ্চশিক্ষিত—এবং নিঃসন্দেহে সম্ভ্রান্ত বংশজাত। আর যা-ই হোক এদের ঠিক সাধারণ সৈনিক রূপে কাজ করার কথা নয়। অথচ মজা এই, এরা কোন পদোন্নতি চায় না, উন্নতির প্রস্তাব এলেও গ্রহণ করে না।···দু জনের এই পর্যন্ত মিল থাকলেও অপরদিকে ছিল ঘোরতর অমিল। ওয়ালেস মদ খায় না, হল্লা করে না, মুখ খারাপ করে না। শান্ত সমাহিত মানুষ, অবসর সময়ে বাইবেল বা অন্য ধর্ম গ্রন্থ পড়ে কাটায়। আর হোপ দুর্দান্ত মাতাল, উচ্ছৃঙ্খল, দুর্ভাষী। জীবনটা যেন সে নিঃশেষে উড়িয়ে দিতে, নষ্ট করতেই চায়—সে-ই যেন তার সাধনা। কাউকেই তার ভয় নেই, কিছুতেই সে পরোয়া করে না, কেবল সাধ্যমত ওয়ালেসকে এড়িয়ে চলে প্রাণপণে! আর ওয়ালেসও নাকি—এমনিতে অত শান্ত হলেও, হোপের কাছাকাছি এলেই সব প্রশান্তি হারিয়ে ফেলে। ওকে দেখামাত্র পৈশাচিক জিঘাংসা ফুটে ওঠে ওয়ালেসের মুখেচোখে—চোখ দুটো দানবীয় হয়ে ওঠে। মিচেল বলে যে, হোপের জন্যেই ওয়ালেস এই দলে নাম লিখিয়েছে। হোপকে সে ছায়ার মত অনুসরণ করে সর্বদা—পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে, এক রণক্ষেত্র থেকে আর এক রণক্ষেত্রে। অথচ হাতের কাছে থাকা সত্ত্বেও কেন যে ওরা কোনদিন ডুএল লড়ে না, এমন কি ঝগড়াও করে না—এইটেই আশ্চর্য।

আরও একটি বিষয়ে মিল ছিল—মিচেল একদিন চুপিচুপি বলছিল হীরালালকে। দু জনেরই গলায় নাকি চেনে বাঁধা দুটি লকেট ঝোলানো আছে। দুটিতেই আছে দুটি মেয়ের মুখ। হোপ প্রায়ই খালি গায়ে থাকে—এবং প্রকাশ্যেই সেই ছবিতে চুমো খায়—কাজেই ওর ছবি দেখেছে অনেকেই, কিন্তু ওয়ালেসের খবরটা আর কেউ জানে না। মিচেল বলে, জাহাজে আসতে আসতে একবার স্নানের সময় দৈবাৎ দেখতে পেয়েছিল সে। অবশ্য দূর থেকে চকিতে দেখা—মেয়েছেলে এবং সুশ্রী দেখতে—এ ছাড়া আর কিছুই ভাল করে বুঝতে পারে নি।··

হীরালাল এতদিনে এদের মাসিক আয় সম্বন্ধে রীতিমত ওয়াকিফহাল হয়ে উঠেছে। সে একদিন প্রশ্ন করলে মিচেলকে, 'হোপ যে এত মদ খায়—টাকা পায় কোথায়? এই তো তোমাদের মাইনে। ওতে হয়?'

'দূর পাগল, তা কখনও হয়! ও টাকাতে কিছুই হয় না। হোপের

দেশ থেকে টাকা আসে।...কনস্ট্যান্স বলে কে একটি মেয়ে নাকি মধ্যে মধ্যে ওকে প্রচুর টাকা পাঠায়। তাতেই ওর এত নবাবি।'

খানিকটা চুপ করে থেকে হীরালাল আবারও প্রশ্ন করলে, 'আচ্ছা তা হলে কি সেই মেয়েটিরই ছবি ও বুকে করে নিয়ে বেড়ায়? কে হয় সে ওর? বোন—মা—না স্ত্রী?'

'কি জানি। তা জানি না।' মিচেল উত্তর দিলে, 'হয়তো এর কোনটাই নয়—অন্য কিছু। কিন্তু সে তো জানবার উপায়ও নেই। এ সব কথা তো জিজ্ঞাসা করা যায় না।'

তা বটে।

হীরালাল চুপ করে গেল।

মিচেলের পক্ষে যদি ও প্রশ্ন করা অশোভন হয় তো হীরালালের পক্ষে একেবারে ধৃষ্টতা। তাই কৌতূহল যতই থাক্—প্রসঙ্গটা সে মন থেকে দূর করে দিলে একেবারেই।

কিন্তু এই কথাবার্তার ঠিক এক দিন পরেই—লক্ষ্ণৌতে প্রবেশ করার মুখে রাত্রিবেলা আপনা থেকেই এ প্রশ্নের উত্তর মিলে গেল হীরালালের।

খোলা মাঠেই রাত কাটাবার হুকুম হয়েছিল সেদিন। স্থানে স্থানে আগুন করে তারই চারপাশে মালপত্র হাতিয়ার সমেত গোল হয়ে ঘিরে শুয়েছে সবাই—কেউ ঘুমিয়েছে, কেউ বা গল্প করছে—এমনিই অবস্থা। কে জানে কেন, হীরালালের সেদিন বহু রাত্রি পর্যন্ত ঘুম আসে নি। পরের দিন লক্ষ্ণৌতে ঢোকা হবে—সেই উপলক্ষে হয়তো রীতিমত লড়াই বাধবে—ওরা জিততে পারবে না পিছু হঠতে হবে—এইসব নানা চিন্তার ফলেই বোধ হয় মাথা গরম হয়ে উঠেছিল। অথবা আর একটি বিশেষ মানুষের চিন্তাও ছিল তার সঙ্গে। দীর্ঘকাল দেখা হয় নি—সম্ভবত আর হবেও না—কিন্তু তবু মনের কোণে আজ সন্ধ্যা থেকে কেবলই একটা অকারণ আশা বার বার উঁকি মারছেই—হয়তো লক্ষ্ণৌতে গেলে তাঁর দেখা মিললেও মিলতে পারে। এ আশার কোন ভিত্তিই নেই—তা সে-ও জানে, তবু এক্ষেত্রে আশা করাটা তার নিজের গরজ বলেই বোধ হয়, কারণ যুক্তির বাইরে এই ক্ষীণ আশাটুকুকেই সে প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে ছিল। আর চোখের ঘুম চলে যাবার পক্ষে সেই তো যথেষ্ট।

কারণ যা-ই হোক—বহুরাত্রি পর্যন্ত কম্বল জড়িয়ে বিনিদ্র পড়ে থাকবার পর সে উঠে মিচেলের সন্ধানে এ দিকটায় এসে পড়ল। আলো নেই,

কাঠ-ঘুঁটের স্তিমিত আগুন একমাত্র ভরসা। তাইতেই হেঁট হয়ে হয়ে মুখগুলো চিনে চিনে এগোতে হচ্ছিল। আর এইভাবে চলতে চলতেই এক সময় সে হঠাৎ হোপের সামনাসামনি পড়ে গেল। সেখানটায় আর কেউ জেগে নেই,—একমাত্র হোপ ছাড়া। একা নিঃশব্দে বসে বসে মদ খাচ্ছে আর নিবন্তপ্রায় আগুনের ক্ষীণ আলোতে কী একটা দেখবার চেষ্টা করছে প্রাণপণে। কাছে এসে ওকে চিনতে পেরে হীরালাল সরে যাচ্ছিল, কিন্তু সে চেষ্টা করার আগেই মাতালের কাছে ধরা পড়ে গেল। মদ যতই খাক—চোখের নজর কমে নি লোকটার। পাশে পায়ের শব্দ পেয়ে প্রথমটা চাপা অথচ উগ্রকণ্ঠেই 'কে' বলে বন্দুকটার দিকে হাত বাড়িয়েছিল, তার পরই ওর দিকে চেয়ে সেই সামান্য আলোতেই চিনতে পারলে ওকে।

'ও—বাবু চ্যাটার্জি। কাম ইয়া—ইধার আও। বৈঠো।'

অনুরোধ নয়—জোরই। কথার সঙ্গে সঙ্গে ওর একটা হাত ধরে টেনে কাছে বসাল হোপ।

মদের উগ্র গন্ধে হীরালালের গা বমি-বমি করছে তখন, একটু ভয়ও যে হচ্ছে না তা নয়, কিন্তু গায়ের জোর নিষ্ফল জেনেই শান্ত হয়ে বসে রইল।

অবশ্য অত খেয়াল করার মত অবস্থা হোপের নয়, সে বাঁ হাতের তালুটা ওর সামনে মেলে ধরে বললে, 'দেখতে পাচ্ছ বাবু—এটা কী? পাচ্ছ না? ভাল করে তাকিয়ে দেখ। এ সুযোগ হয়তো আর না-ও পেতে পার। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতমা সুন্দরীর ছবি, মহত্তমা নারীও বলতে পার। সুইটেস্ট কনস্ট্যান্স!'

সেই সময় একটা কাঠের গুঁড়ি পুড়তে পুড়তে অকস্মাৎ তার গায়ে-লেগে-থাকা একটা ছোট ছালের টুকরোতে আগুন লেগে দপ করে সেটা জ্বলে উঠল। তারই ক্ষণিক দীপ্তিতে হীরালাল সত্যই ভাল করে তাকিয়ে দেখল। ছোট্ট হাতীর দাঁতের ফলকে আঁকা একটি কমবয়সী মেয়ের মুখ। সেই অত্যল্প সময়ের মধ্যে তার সোনালী চুল ছাড়া আর কোন বৈশিষ্ট্যই লক্ষ্য করা গেল না। হয়তো লক্ষ্য করলেও সে বিশেষ কিছু বুঝত না—কারণ মেম তার কাছে মেমই—তাদের চেহারার ভালমন্দ অত তার মাথায় ঢোকে না। কিন্তু সেই সামান্য অবসরই হোপের পক্ষে যথেষ্ট। হয়তো তার সেটুকু আলোরও প্রয়োজন ছিল না—কারণ সেই ক্ষণদীপ্তি মিলিয়ে যাবার পরও অনেকক্ষণ পর্যন্ত সে মুগ্ধ দৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে রইল। তার পর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, 'আমাকে বড্ড ভালবাসে বাবু, যেখানেই আমি যাই সেখানেই ওর মন আমায়

সঙ্গে সঙ্গে থাকে। এখন এই মুহূর্তেও আমার মত সে-ও বিনিদ্র বসে আমার কথা ভাবছে—এ আমি বাজি রেখে বলতে পারি।'

এতক্ষণে হীরালাল অনেকটা সহজ হয়ে এসেছে। সে আস্তে আস্তে প্রশ্ন করলে, 'উনি কি আপনার স্ত্রী ?'

'স্ত্রী !' যেন সাপের মত হিস্ হিস্ করে উঠল হোপ, 'স্ত্রীই তো হবার কথা ! কিন্তু—না, সে কথা থাক বাবু। সে যদি আমার স্ত্রীই হত তা হলে কি আর আমি এমন করে ভেসে বেড়াই !'

'তা, তাকে বিয়ে করেন নি কেন ?' অসীম সাহসে ভর করেই আবার প্রশ্ন করে হীরালাল। হোপের কণ্ঠস্বরে সে বেশ একটু ভয় পেয়েছিল—তবু কৌতূহলও চাপতে পারল না শেষ পর্যন্ত।

'না বাবু, সে ভাগ্য আমার হবার নয়। কিন্তু ইউ রাস্কা, হাউ ডেয়া ইউ আস্ক সাচ্ কোয়েশ্চেনস্ !···ভাগো, ভাগো হিঁয়াসে।'

অকস্মাৎ উগ্র হয়ে ওঠে মাতালটা। পাশ থেকে বন্দুকটা তুলে নিয়ে সঙ্গীনটা উঁচিয়ে ধরে একেবারে।

হীরালাল ভয় পেয়ে এক লাফে খানিকটা সরে যায়। হোপ কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই শান্ত হয়ে এসেছে। কতকটা বিড বিড করে বলে, 'কুজ মি বাবু। ডরো মৎ !···আমি তামাশা করছিলুম !···মানুষ আমি লড়াই ছাড়া মারি না—কন্স্ট্যান্স আমাকে বারণ করে দিয়েছে !'

হীরালাল কিন্তু তার মতি-পরিবর্তনের ওপর আর বিশেষ ভরসা করতে পারল না। মাতালের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা করার ইচ্ছাও তার ছিল না—সে দূরত্বের ও অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে দ্রুত সরে পড়ল সেখান থেকে।

যাবার সময় দৃষ্টি ছিল তার হোপের দিকেই। ঐ দিকটায় নজর রেখে চলতে গিয়ে হঠাৎ আর একটা প্রচণ্ড ভয় পেয়ে গেল সে। সেই ঘুমন্ত পুরীর নিস্তব্ধ প্রান্তরে একেবারে কাছে একটা নিশ্বাসের শব্দ পেয়ে চমকে উঠল, চেয়ে দেখবার আগেই বুকটা ঢিপ্ করে উঠল। চেয়ে দেখেও ভয় কমল না—অন্ধকারে প্রেতমূর্তির মতই স্থির নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটা লোক। এত নিশ্চল এত স্থির যে—জীবন্ত মানুষ বলে মনে হওয়া কঠিন। হয়তো চমকে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে আতঙ্কে একটা মৃদু শব্দও তার মুখ থেকে বার হয়ে থাকবে—আর সেই শব্দেই সম্ভবত সে মূর্তিটা একটু নড়ে-চড়ে উঠল। তখন খানিকটা আশ্বস্ত হয়ে ভাল করে চেয়ে দেখল হীরালাল—লোকটা ওয়ালেস।

হয়তো অনেকক্ষণ ধরেই দাঁড়িয়ে আছে সে সেখানে। হয়তো হীরালাল আসার আগে থেকেই। একদৃষ্টে চেয়ে আছে সে হোপের দিকে, মনে হয় চোখের পলকও পড়ছে না তার। আলো নেই বিশেষ—আশপাশের সব আগুনগুলোই প্রায় নিভে এসেছে।—তবু সেই ক্ষীণ আভাতেই হীরালালের মনে হল সে দৃষ্টিতে অমানুষিক একটা ঘৃণাই উপচে পড়ছে।

ঘৃণা আর বিদ্বেষ! যেন এই মুহূর্তে হাতে পেলে লোকটাকে ও টুকরো টুকরো করে ফেলতে পারে নখেতেই—

হীরালাল আর দাঁড়াল না। উপর্যুপরি ভয় পাবার ফলে তার বুকের মধ্যে ঢেঁকির পাড় পড়ছে। মানুষটাকে চিনতে পারলেও অন্ধকারে এইভাবে মূর্তিমান হিংসার মত দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সে সময় তাকে একটা পিশাচ বলেই মনে হল। বিলি মিচেলকে খুঁজে বার করবার আশা বিসর্জন দিয়ে যতদূর সম্ভব দ্রুত সে নিজেদের ঘাঁটির দিকে সরে পড়ল।

॥ ৬৫ ॥

এ তক্ষণ কথাটা মনেই ছিল না মিচেলের। দুপুরে অত ঠাণ্ডা ছিল না, তখন —বিশেষত সেই লড়াইএর মধ্যে—গ্রেটকোটটাকে অকারণ বোঝা বলেই মনে হচ্ছিল। তাই নিজের জীবন দিয়ে সে যখন ওর প্রাণরক্ষা করল—অর্থাৎ এক মুসলমান সিপাহীর তলোয়ারে জামাটা কাঁধের কাছ থেকে নীচে পর্যন্ত চিরে দুখান হয়ে গেলে—তখন সেটা ফেলে দিতে পেরে ও যেন বাঁচল। তলোয়ারটা ওর ঘাড় লক্ষ্য করেই পড়েছিল, কোটটা না থাকলে ঘাড়টা হযতো বাঁচানো যেত না কিছুতেই—সেটার ওপর দিয়েই ফাঁড়াটা কেটে গেছে ভালয় ভালয়—সেজন্য একটু কৃতজ্ঞ থাকবারই কথা, কিন্তু দুখানা হয়ে চিরে যাওয়া ঝলঝলে জামা পরে চলা যেমন সুদৃশ্য নয় তেমনি সেভাবে লড়াই করাও সুবিধা নয়। সুতরাং সেটা ফেলে দেবার উত্তম অজুহাত পেয়ে বেঁচে গেল ও। দুপুরের রোদে, গোলা-গুলির তাপে আর লড়াইএর পরিশ্রমে ওটা অসহ্যই লাগছিল।

অবশ্য গ্রেটকোটের অভাবও ছিল না। সন্ধ্যা নাগাদ যে-কোন মৃত সহকর্মীর গা থেকে একটা খুলে নিলেই চলত—আসলে কথাটা মনেই পড়ে নি।

মনে পড়ে নি তার কারণ তখনও বিশেষ ঠাণ্ডা বোধ হয় নি বলেই। কিন্তু এখন তাপও নেই—উত্তেজনাও নেই—এমন কি দুঃসাধ্য জয়লাভের আনন্দও অনেকটা থিতিয়ে এসেছে—এখন শীতটা বেশ জানান দিচ্ছে। একটু-আধটু নয়—রীতিমত হাড়-কাঁপানো শীত। দুপুরের গরম দেখে এ শীত কল্পনা করাও শক্ত। অমন যে ঠাণ্ডা দেশের মানুষ ওরা—ওদের দাঁতে দাঁতে লাগছে ঠকঠক করে।

সারাদিনের পরিশ্রমে শরীর ভেঙে আসছে। কিন্তু ঘুমের এখনও ঢের দেরি। দু ঘণ্টা করে পাহারা ভাগ হয়েছে। প্রথম দু ঘণ্টার দলে পড়েছে মিচেল। সেটা তবু মন্দের ভাল। পায়চারি করে শরীরটা একটু তাজা থাকছে—এর পর?

মিচেল স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে এক বার চারদিকে চাইল।

জায়গায় জায়গায় আগুন করে গোল হয়ে শুয়েছে ক্লান্ত সৈনিকের দল। বন্দুকগুলো পাশেই পরস্পরের গায়ে টাল দিয়ে খাড়া করা রয়েছে—এক-একটা ছোট ঢিপির মত। শান্ত নিস্তব্ধ চারিদিক। শুধু ওরই মত আরও দু-এক জন হতভাগ্য এখনও যুদ্ধশ্রান্ত দেহটাকে টেনে টেনে সান্ত্রীর কর্তব্য সম্পাদন করছে।

পরিশ্রম তাঁদের বড় কম হয় নি। গত কয়েক মাস ধরেই হচ্ছে। দিনের পর দিন অবিশ্রাম হাঁটতে হয়েছে তাদের। তার ওপর কদিন ধরে চলছে লড়াই। আজ তো ভোর থেকেই শুরু হয়েছে—জীবনমরণ যুদ্ধ বলতে গেলে। শত্রুর একটি বড় ঘাঁটি দখল করে ওরা এইখানে আসে। প্রত্যেকটির জন্যই বহু প্রাণ দিতে হয়েছে তাদের। সূচ্যগ্র জায়গাও দুশমনরা সহজে ছাড়ে নি। সব চেয়ে সাংঘাতিক পরিশ্রম করতে হয়েছে এই জায়গাটার জন্যে। এটাকে স্থানীয় লোকেরা বলে শাহ্‌নজফ্—আসলে এটা বুঝি কোন্ এক নবাবের সমাধি-মন্দির। কিন্তু সমাধি-মন্দির বলে চেনার উপায় আর রাখে নি ওরা—কিল্লার মতই সুদৃঢ় ও দুর্ভেদ্য করে তুলেছে। তাদের যা সাধারণ কামান—তার গোলা এর দেওয়ালে একটা গর্তও করতে পারে না—এমনই এর বজ্র-গাঁথুনি।

শাহ্‌নজফের কিল্লার ওপর অনেক ভরসা ছিল সিপাহীদের। এখানে শিক্ষিত সিপাহীই ছিল অন্তত আড়াই হাজার। তা ছাড়া সাধারণ লোকও কিছু ছিল। আর তারাও খুব অবহেলা করার মত নয়—তারা পাকা গোলন্দাজ না হোক—পাকা তীরন্দাজ। তাদের লক্ষ্যও অব্যর্থ এবং সে তীরও জলিয়া,

চেয়ে কম মারাত্মক নয়। এছাড়া প্রাকারের ওপর ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে ছিল কামান। এবং শুধুই কি সামনের শাহ্‌নজফ—আশপাশের ঘাঁটিগুলোও নীরব বা নিষ্ক্রিয় ছিল না। পাশের ঐ কদম রসুলের বড় মসজিদটা বোঝাই ছিল দুশমন; আর সেখান থেকেও আসছিল গোলা-গুলি-তীর—অবিশ্রান্ত বেগে।

মিচেলরা কিছুই করতে পারত না হয়তো—শাহ্‌নজফের এই কিল্লার সামনে অধিকাংশ সহকর্মী বন্ধুকে চিরকালের মত রেখে হয়তো ওদের ম্লান নতমুখে পিছু হঠতেই হত —যদি না শেষ পর্যন্ত দৈব সহায় হতেন! একেবারে সন্ধ্যার মুখে জন প্যাটন বলে এক সার্জেণ্ট নিজের জীবন বিপন্ন করে পিছনের একটা পথের সন্ধান নিয়ে এল। কদম রসুলের দিকে শাহ্‌নজফের যে পাঁচিলটা পড়ে, তাতে প্রকাণ্ড একটা গর্ত হয়েছে; সম্ভবত ওদেরই গোলা এসে পড়ে গর্তটা হয়েছে। সিপাহীরা অতটা লক্ষ্য করে নি, করলেও ওদিক দিয়ে শত্রুর আক্রমণ আশঙ্কা করে নি—কারণ ওদিকেই কদম রসুল।

কদম রসুল তখন এদের দিকে অগ্নিবর্ষণেই ব্যস্ত। তাদের লক্ষ্য দূরেব দুশমনকে—ঠিক তাদের চোখের নীচেই যে গভীর পরিখা—শাহ্‌নজফ আব কদম রসুলের মাঝখানে—সেদিকে তাদের নজর ছিল না। সেখান দিয়ে কোন এক জন প্যাটন নিঃশব্দে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে ইংরেজ ফৌজকে তা তারা কল্পনাও করে নি। আর সেই সামান্য অনবধানতাই তাদের কাল হল। শত্রু অতর্কিতে ভেতরে ঢুকে পড়তে তাদের এতক্ষণকার সমস্ত সাহস, সমস্ত বীর্য, জীবনমরণ পণ নিমেষে কোথায় মিলিয়ে গেল। মনোবল পড়ল একেবারে ভেঙে। তখন শুধু প্রাণপণে পালানো ছাড়া আর কোন পথই দেখতে পেলে না তারা। তখনও যে ঘুরে দাঁড়ানো যায়, সকলে মিলে জড়ো হয়ে আবারও যে প্রত্যাঘাত করা যায়—সে কথাটা একবারও তাদের মাথায় এল না।

অবশ্য তখন ইংরেজদেরও আর পরাজিত শত্রুর পিছনে তেড়ে যাওয়ার মত শক্তি ছিল না। তখন এরা কোনমতে কোথাও একটু বসতে পেলেই খুশী। 'যায় বিশ্ব যাক্ রসাতলে'—তখন এদের কতকটা এই মনোভাব। একটু খানি ঘুমের অবসর, দু ঘণ্টার বিশ্রাম—স্বর্গসুখের চেয়েও লোভনীয়।

সে সময় মিচেলেরও তাই গ্রেটকোটের কথা মনে পড়ে নি। পড়বার কথাও নয়। এখন সে ভুলের জন্য অনুতাপের সীমা নেই, কিন্তু এখন বোধ হয় আর পাওয়া সম্ভব হবে না। রাজকীয় সমাধি-মন্দিরের এই বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে আজ মৃতদেহের অভাব নেই, কিন্তু এর অধিকাংশই শত্রুর মৃতদেহ—

সিপাহীদের মৃতদেহ, ওদের গ্রেটকোটের বালাই নেই। এখানে মিচেলের স্বজাতীয়রা বিশেষ মরে নি।···বাইরে গেলে অবশ্য অভাব থাকবে না—কিন্তু বিনা হুকুমে যাওয়া যায় না। কথাটা একবার ওপরওলার কাছে পাড়তে গিয়েছিল—সুবিধা হয় নি। তাঁরা ছাড়তে রাজী হন নি—কারণ এখন একা একা বাইরে যাওয়া অত্যন্ত বিপজ্জনক। তা ছাড়া···এই অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে কঠিন শীতল শবদেহ থেকে জামা ছাড়িয়ে নেওয়া—না, সে সম্ভব নয়। ভাবতেই যেন কেমন লাগে। এ পিশাচের কাজ—মানুষে পারে না।

দেখা যাক্—এখানেই কিছু পাওয়া যায় কি না। কোথাও কিছু একটা নেই? নিদেন একটা কম্বল কি লেপও কি কেউ ফেলে যায় নি? খুঁজলে নিশ্চয় একটা বেরোবে। উদ্যোগে কী না মেলে?

মিচেল মনে মনে নিজের মনকেই আশ্বাস দেয়।

কিন্তু চরিদিকে তখন জমাট অন্ধকার। নক্ষত্রের আলোও কুয়াশায় ম্লান। আগুন জ্বলছে বটে অনেকগুলো—কিন্তু সে সবই ধুঁইয়ে ধুঁইয়ে—হয়তো তার তাপ আছে, কিন্তু দীপ্তি নেই। ভাল করে খুঁজে দেখতে গেলে আর একটু আলো চাই।

কথাটা সঙ্গে সঙ্গেই মনে পড়ে গেল। আছে, আলো নিশ্চয়ই আছে। ওরা যখন এখানে ঢোকে—তখন অনেকগুলো আলোই জ্বলতে দেখেছিল। নবাবের সমাধি-মন্দিরে বহু তীর্থযাত্রী অতিথি আসে। তাদের জন্যে পাঁচিলের গায়ে সার সার খুপরি ঘর করা আছে চারিদিক ঘিরে—কতকটা সরাইখানা বা অতিথিশালার মত। এধারে একটু বড় গোছের সব সমাধিতেই এই ব্যবস্থা থাকে। সেই ঘরগুলো সিপাহীরা ব্যারাকে পরিণত করেছিল। মিচেলরা যখন ভেতরে ঢোকে তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে—প্রায় সব ঘরেই চিরাগ জ্বলছে। সে চিরাগ নিভিয়ে যাবার অবসর পায়নি কেউ, এরা যখন আসে তখনও জ্বলছিল। সেগুলো কিছু সবই নিভে যায় নি এর মধ্যে—এখনও এক-আধটার তেল আছে নিশ্চয়।

মিচেল সেই দিকেই পা চালাল। কাছে গিয়ে দেখল তার অনুমানই ঠিক। মধ্যে মধ্যে এক-আধটা নিভে গেছে—নইলে বেশির ভাগ ঘরের কুলুঙ্গীতেই চিরাগ জ্বলছে এখনও। সে ওরই মধ্যে থেকে বেছে—যেটার তেল বেশি আছে সেইটে তুলে নিল, তার পর ঘরগুলো ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল।

খুবই তাড়াতাড়ি গেছে বেচারীরা। কোথাও আটার তাল মাখা—

রুটি বানাতে বসবার আগেই ফেলে চলে যেতে হয়েছে। কোথাও রুটির গোছা তৈরী—শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাচ্ছে; উনুনে ডাল চেপেছিল, সে ডাল ফুটছে এখনও। এক জায়গায় ডাল পুড়ে কয়লা হয়ে গেছে। এছাড়া টুকরো টুকরো জিনিস প্রচুর পড়ে আছে—থালা-লোটা, কাপড়-চোপড়। বিছানাও আছে, কিন্তু বড়ই নোংরা সব। মিচেল যা খুঁজছে সেইটেই শুধু নেই। কম্বল দু-একখানা পড়ে আছে বটে, তবে তার অবস্থা দেখে গায়ে দেবার প্রবৃত্তি হল না ওর। সম্ভবত পিশুতে বোঝাই।

দক্ষিণের সারি দেখে শেষ করে মিচেল বাইরে এসে থমকে দাঁড়াল। আর কোথাও ঘুরে লাভ আছে? এতগুলো ঘরে যা মিলল না—তা কি আর বাকি ঘরগুলোতে মিলবে? তার চেয়ে বরং ফিরে গিয়ে যা হয় ঐ আগুনেই শীত-নিবৃত্তি করা ভাল।...

নিজের ঘাঁটিতে ফিরতে গেল মিচেল—কিন্তু তার আগেই আর এক কাণ্ড ঘটে গেল। ওদিকে মুখ ফেরাতেই চমকে উঠল মিচেল।

দূরে ওটা কী—নিঃশব্দে চলে যাচ্ছে?

ছায়া, না কোন জানোয়ার? জানোয়ার কেমন করে হবে, শিয়াল-টিয়াল তো হতেই পারে না—অত উঁচু আর লম্বা? তা ছাড়া দু-পায়ে হাঁটছে বলেই তো মনে হচ্ছে। মানুষ, নিশ্চয়ই মানুষ।

ওদেরই কোন সান্ত্রী কি? কিন্তু সান্ত্রীর পোশাক তো ওটা নয়। মনে হচ্ছে ওড়নার মত কী একটা উড়ছে ওর পিছনে—দ্রুত চলার ফলে যেমন মেয়েদের পেছনে ওড়ে।

স্ত্রীলোক। এখানে স্ত্রীলোক॥

তবে কি গুপ্তচর?

নিমেষে মাথা গরম হয়ে উঠল মিচেলের, রক্ত উঠল চঞ্চল হয়ে। ভুলে গেল যে রাইফেলটা সে রেখে এসেছে ওখানে—কোন হাতিয়ারই নেই সঙ্গে। হাত দিয়ে প্রদীপটা আড়াল করে যতদূর সম্ভব নিঃশব্দে দ্রুতগতিতে সে সেই ছায়ামূর্তির পিছু নিল।

মূর্তিটা অবশ্য সে দেখেছিল দূরে—খুবই দূরে। এখন আর দেখাও যাচ্ছে না। কিন্তু একেবারে নজরের বাইরে মিলিয়ে যাবার আগেই সে দেখে নিয়েছে—মূল সমাধি-গহ্বরের অন্ধকার কোটরেই গিয়ে ঢুকছে সে; অন্তত ওখানে পৌঁছেই মিলিয়ে গেছে।

এদেশে এসে এই একটা বিচিত্র ব্যাপার লক্ষ্য করেছে মিচেল। বড় বড় রাজা-বাদশার সমাধিতে দুটো করে কবর থাকে। প্রকাণ্ড চতুষ্কোণ জমি নিয়ে এই সব কবর-মহল তৈরী হয়—ঠিক মাঝখানে থাকে মূল সৌধটা। আর সেই সৌধের মাঝখান থাকে কবর-বেদী। কিন্তু সাধারণত সে ঘরটা হয় দোতলায়, সিঁড়ি দিয়ে উঠে যেতে হয়। মাটিতে যেখানে আসল কবরের বেদীটা—সে ঘরটায় সাজ-সজ্জা বিশেষ কিছুই থাকে না। সাধারণ ঘর, আরও সাধারণ সাদা-সিধা একটা বেদী। সাধারণত এ ঘরের মেঝেও মাটির থেকে বিশেষ উঁচু হয় না—বাইরের বাগানের সঙ্গে মিশে থাকে। শুধু মেঝেটা বাঁধানো থাকে, এইমাত্র। কোন কোন ছোট দরের সমাধিতে আবার তাও থাকে না—ঠাণ্ডা স্যাঁত্‌স্যাঁত্‌ করে জায়গাটা।

অথচ ঠিক এর ওপরেই যে ঐ মাপের দ্বিতীয় ঘরখানা থাকে—যাকে অনায়াসে নকল কবর-ঘর বলা যেতে পারে—সেটায় নানা কারুকার্য, দামী গাঁথুনি—মূল্যবান পাথর ও মিনার কাজ। আর সেই ঘরের মাঝখানে—নীচের মূল কবরের ঠিক ওপরেই থাকে আর একটা কবর, মাপে নীচেরটার একেবারে সমান কিন্তু আর কিছুতে নয়। এ বেদীটা সাধারণত সাদা বা কালো মার্বেল পাথরে তৈরী হয়, তার চারিদিকে ধারে ধারে মিনার ফুল লতাপাতা থাকে—নামও লেখা থাকে ঐখানেই। এই বেদীতে পড়ে দামী ভেলভেট বা কিংখাপের আস্তরণ, পড়ে ফুল, জ্বলে চিরাগ। এইটেই দেখবে সকলে—এই ভেবেই বোধ করি এ ব্যবস্থা করা হয়।

শাহ্‌ নজফের এই কবরেও সে ব্যবস্থার অন্যথা ছিল না। আর মিচেল তার সামনের ছায়ামূর্তিকে ঐ মূল কবরখানতেই ঢুকতে দেখেছে।

বহু মৃতদেহ ডিঙিয়ে, বহু স্থানে হোঁচট খেয়ে মিচেল এসে সেই ঘরটার সামনে পৌঁছল। চারিদিক নির্জন, নিস্তব্ধ। মানুষ তো দূরের কথা, কোথাও কোন জীবিত প্রাণীরই চিহ্ন নেই। দরজার সামনে চিরাগটা উঁচু করে তুলে ধরল এক বার—ভেতরেও যতদূর দৃষ্টি চলে—কোথাও কেউ নেই।

তবে কি—এই প্রথম নিজের দৃষ্টি সম্বন্ধে সংশয় জাগল মিচেলের মনে—তবে কি সে-ই ভুল দেখেছে? মায়া? মরীচিকা? দৃষ্টি-বিভ্রম?

না কি কোন অশরীরী আত্মা? রাশি রাশি শব চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে আছে—তাদেরই কোন আত্মা কি উঠে এল প্রতিহিংসা নিতে?

কথাটা আবছা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মিচেল যীশু ও সেন্ট

অ্যান্‌ড্রুজকে স্মরণ করলে। মনে-মনেই একবার দ্রুত ক্রুশ-চিহ্ন এঁকে নিলে কপালে ও বুকে।

কিন্তু না—এমন ভুল ওর নিশ্চয়ই হয় নি। একটা মানুষকেই যে ও দেখেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। অত সহজে সে ছাড়বে না—অত সহজে তাকে ভয় দেখানোও চলবে না।···মনে জোর আনে মিচেল—সে এর শেষ না দেখে ফিরে যাবে না। ভেতরে ঢুকে দেখবে নীচেটা—তার পর ওপরের নকল কবরখানা—তার চারপাশের ঘেরা অলিন্দ, সিঁড়ি এ সব তো আছেই।...

ভেতরে ঢুকতে গিয়ে একবার বুকটা ছাঁৎ করে উঠল। এতক্ষণে মনে পড়ল, সঙ্গে কোন হাতিয়ার নেই। ইস্, কাজটা বড়ই খারাপ হয়ে গেছে। নিশীথরাত্রির অন্ধকারে—চারিদিকে এত ঘর, এত সিঁড়ি, এত দেওয়াল, এত গাছপালা—অসংখ্য ছায়া-ঘন গুপ্তস্থান—শত্রুর লুকিয়ে থাকার হাজার সুবিধা সর্বত্র। কে জানে সবাই পালিয়েছে কিনা—হয়তো এখনও কেউ লুকিয়ে বসে আছে কোথাও, ফাঁক পেলেই জিঘাংসা চরিতার্থ করবে বলে। মরবার জন্য প্রস্তুত হয়ে মারবার সংকল্প গ্রহণ করার লোক খুব কম নেই এদেশে—সে পরিচয় মিচেল এই কদিনেই পেয়েছে ঢের।

কিন্তু এখন আর উপায় কী? ফিরে যাওয়া চলে না কিছুতেই। আলোটা মাথার ওপর ধরে—যাতে নিজের আলোতেই দৃষ্টি না ব্যাহত হয় এবং আলোটা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে—বাঁ হাতটা কোমরবন্ধের এক জয়গায় মুঠি করে ধরে (যেন ওখানে কোন অস্ত্র গোঁজা আছে এমনি ভাবে) মিচেল সন্তর্পণে ঘরে ঢুকল। এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখল—না, লোক যে কেউ নেই এটা ঠিক। শুধু ওদিকে কবরের ওপাশে কতকগুলো পিপে পড়ে আছে। কে জানে কিসের পিপে ওগুলো—হয়তো খালি পিপেই হবে।

কিন্তু নরম নরম ধুলোর মত পায়ে কী লাগে?

এতক্ষণে ভরসা করে মিচেল নীচের দিকে চেয়ে দেখলে। সত্যই তো, কয়লার গুঁড়োর মত—তাই বা কেন—তার চেয়েও মিহি ধুলোর মত কালো একরাশ কী মেঝেতে পড়ে। তাইতেই ওর দু পায়ের গোছ পর্যন্ত ডুবে গেছে।

কী এগুলো? কৌতূহল হয় মিচেলের।

মাথার ওপর আলো—সুতরাং ঠিক ওর নীচেই অন্ধকার, ভাল করে কিছুই দেখা যায় না। আলোটা ধরে দেখা দরকার।

চিরাগটা মাথার ওপর থেকে নামাল মিচেল, আলো ধরে হেঁট হয়ে দেখতে গেল বস্তুটা—

ঠিক সেই সময়, চকিতের মধ্যে—ব্যাপারটা কী ঘটল তা বোঝা তো দূরে থাক, সে সম্বন্ধে কোনরকম অবহিত হবার আগেই—পিছন থেকে কে একজন নিঃশব্দে এসে এক হাতে ওকে জড়িয়ে—আর এক হাতে চট করে প্রদীপের শিখাটি টিপে ধরল।

দেখতে দেখতে গাঢ় অন্ধকারে ডুবে গেল চারিদিক।

প্রদীপের শিখা নিভে গেল।

'ভয় নেই বিলি, ভয় পেও না। আমি চ্যাটার্জি।··চল চল—বাইরে চল—এখনই।'

চ্যাটার্জি।

হীরালাল? সেকি।

মিচেল ব্যাপারটা কিছুই বুঝতে পারল না, ভাবতেও পারল না। কতকটা যন্ত্রচালিতের মতই হীরালালের মৃদু আকর্ষণে বাইরে এসে দাঁড়াল!

এখানটায় অত অন্ধকার নেই। হীরালালকে চিনতে অসুবিধা হল না।

হীরালাল তখন ওকে ছেড়ে দিয়ে পোড়া আঙুল দুটো মুখের কাছে তুলে ফুঁ দিচ্ছে।

'ইস্। হাতটা পুড়ে গেল একেবারে। জ্বালা করছে।'

'কিন্তু তুমি একাজ করতে গেলেই বা কেন? ব্যাপারটা কী?'

'এদিকে এস বলছি। ঐ সাংঘাতিক ঘরটা থেকে আগে দূরে এস দিকি।'

সে মিচেলকে টানতে টানতে একটা আগুনের ধারে নিয়ে গেল।

'পা-টা দেখ তো আলোতে—জিনিসটা কী?'

মিচেল বিস্ময়ে কৌতূহলে তাড়াতাড়ি আগুনের কাছে গিয়ে পা-টা প্রায় শিখার ওপরই ধরতে যাচ্ছিল—আবারও এক হ্যাঁচকা দিয়ে টেনে সরিয়ে আনল হীরালাল, 'নির্বোধ! এখনই মরতে যে। পা-টা জ্বলে যেত।'

'কে—কেন?'

'ওটা যে বারুদ—বুঝতে পারছ না?'

'বারুদ!'

'হ্যাঁ—বারুদ। স্তূপাকার করা বারুদ। পিদিমটা নিয়ে আর একটু হেঁট হলেই কাজ খতম হয়ে যেত। শুধু তুমিই যেতে না—এই কবর, চারপাশের এই সব বাড়ি—তোমার এই হাইল্যাণ্ডারের দল কিছুই থাকত না। ওখানে কত বারুদ পড়ে আছে জান? অন্তত দেড় শ মন।'

সম্ভাবনাটা সম্পূর্ণ বুঝতে পারবার সঙ্গে সঙ্গেই—বিপদের গুরুত্বটা ধারণায় এসে—সর্বাঙ্গে কাঁটা দিয়ে উঠল মিচেলের। একটা হিমশৈত্য শিরদাঁড়া বেয়ে নামতে লাগল সমস্ত দেহে—

'বারুদ! বাই জোভ! কে রাখলে ওখানে?'

'দুশমনরা। সম্ভবত ঐ ঘরটায় ওরা ম্যাগাজিন করেছিল। ঐটেই ছিল বারুদের ভাঁড়ার। যাবার সময় নিয়ে যেতে পারে নি। তা ছাড়া এ রকম একটা সম্ভাবনার কথাও ভেবেছিল হয়তো। যায় তো ওর ওপর দিয়েই নিপাত যাক শত্রুরা।'

'কিন্তু তুমি টের পেলে কী করে?'

একটু দেরি হয় হীরালালের উত্তর দিতে।

সামান্য ইতস্তত করে বলে, 'তোমার সন্ধানে এসে ঘুরছি—দূর থেকে তোমাকে দেখতে পেলুম। একটু চমকে দেব বলেই ডাকি নি, শুধু নিঃশব্দে পিছনে পিছনে আসছিলুম। তুমি যখন ভেতরে ঢুকলে তখন তোমার মাথার ওপর আলো ছিল—তা ছাড়া তুমি পায়ের দিকে চাও নি কিন্তু আমি গোড়া থেকেই লক্ষ্য করেছিলুম। অনুমান করতেও দেরি হয় নি—কবর-ঘরের মধ্যে আর কী রাখবে এমন স্তূপাকার করে? নিশ্চয়ই বারুদ!...তোমাকে ডেকে বলতে গেলে তুমি হয়তো চমকে উঠে সাবধান হবার আগেই একটা কাণ্ড করে বসবে—এই ভয়েই কিছু বলি নি—আগে আলোটা নিভিয়েছি!'

মিচেল কৃতজ্ঞতাভরে ওর হাত-দুটো দু হাতে চেপে ধরে বললে, 'তুমি আমার প্রাণরক্ষা করলে চ্যাটারজি—এ কথা—এ ঋণ আমি জীবনে ভুলব না।'

'ও কিছু নয়। ও অবস্থা দেখলে তুমিও এ-ই করতে। করতে না কি?'

'তা হয়তো করতুম। কিন্তু তুমিও এই অবস্থায় পড়লে কৃতজ্ঞই হতে। সে কথা থাক্—আমি যাই, ক্যাপ্টেন ডসনকে কথাটা এখনই জানানো দরকার। তুমি একটু দাঁড়াও—'

সে যেতে গিয়েও বাধা পায়। হীরালাল তার হাত ধরে টানে।

'এক মিনিট মিচেল। তুমি আমার একটা অনুরোধ রাখবে?'

'তোমার অনুরোধ রাখব না! বিশষত এই ঘটনার পর? তোমার এ প্রশ্ন করাই অন্যায় চ্যাটার্জি।'

'বেশ তাহলে শোন।···তুমি আরও কিছুক্ষণ এ-কথাটা কাউকে জানিও না। অন্তত—অন্তত আধ ঘণ্টা!'

'কেন বল তো?' বিস্ময়ের সীমা থাকে না মিচেলের, সে সেই অন্ধকারেই ওর মুখটা লক্ষ্য করার চেষ্টা করে।

'কী ব্যাপার? তোমার সঙ্গে এর ..মানে, এই খবরটা রিপোর্ট করার কী সম্পর্ক।

'সেটা এখনই বলতে পারব না বিলি, মাপ কর। পরে বলব একদিন, যদি সময় পাই। মাত্র আধ ঘণ্টা—তার পর তুমি রিপোর্ট ক'র। আমার কথা বলতে হবে না—তুমিই আবিষ্কার করেছ, এই-ই-র'ল। আমার কোন কৃতিত্ব চাই না। তোমার পালা শেষ হতে এখনও বোধ হয় ঐ রকম সময়ই আছে, শেষ হবার মুখেই বরং খবরটা দিও—'

একটু সংশয়ের সুরে মিচেল বলল, 'কিন্তু সেটা কি উচিত হবে। এসব খবর দিতে দেরি করা ঠিক নয়—অনেক কিছু বিপদ ঘটতে পারে। তা ছাড়া আরও একটা কথা—আমার সন্দেহ হচ্ছে, এই বাড়িটার মধ্যে কোন একজন স্ত্রীলোক লুকিয়ে আছে। আসলে আমি তার সন্ধানেই ওখানে গিয়েছিলুম। সম্ভবত সে গুপ্তচর—দেরি হলে সে পালাতে পারে।'

সংক্ষেপে সে নিজের অভিজ্ঞতাটা বিবৃত করে।

'প্লীজ মিচেল, আমার এটা একান্ত অনুরোধ। তুমি আমার কাছে ঋণের কথা বলছিলে—যদি সত্যই কোন ঋণ আছে মনে কর এই অনুরোধটি রাখ, তোমার সব ঋণ শোধ হয়ে যাবে। প্লীজ।'

মিচেল একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললে, 'অল রাইট। তাই হোক। আধ ঘণ্টা পরেই আমি রিপোর্ট করব।···কিন্তু তুমি চললে কোথায়?'

'সেটাও আজ বলতে পারব না ভাই—তবে যে জন্যে এই আধ ঘণ্টা সময় নিলুম সেই কাজটাই সারতে যাচ্ছি, এইটুকু জেনে রাখ।'

তার পর একটু হেসে বললে, 'মনে কর আমি তোমার সেই ছায়ামূর্তি, সেই মায়াবিনী—সেই গুপ্তচরকেই খুঁজতে যাচ্ছি!'

সে হেসে মিচেলের কাঁধে একটা সস্নেহ মৃদু চাপড় মেরে—অন্ধকারেই অদৃশ্য হয়ে গেল।

॥ ৬৬ ॥

সমাধি-সৌধটার গা ঘেঁষে ওর ছায়ায় ছায়ায় হীরালাল নিঃশব্দে দ্রুত এগিয়ে চলল—এদিক দিয়ে ঘুরে, বলতে গেলে বাড়িটাকে প্রদক্ষিণ করে একেবারে ওপারে গিয়ে মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়াল সে। সামনেই কদম রসুল—আর ঐ দিকেরই প্রাকারের গায়ে সেই বড় ফুটোটা, যেখান দিয়ে আজ ইংরেজরা ঢুকেছে কিছু আগে। ওর ওপারে অন্ধকার গভীর খাদ, গা-ঢাকা দিয়ে লুকিয়ে থাকার পক্ষে, পালাবার পক্ষে ভারি সুবিধা।...

কিন্তু এখান থেকে ঐ পাঁচিলটা পর্যন্ত অনেকখানি জমি পেরিয়ে যেতে হয়। চারিদিক নিস্তব্ধ, মনে হচ্ছে সকলেই ঘুমে অচেতন। তবু ঠিক সকলেই যে ঘুমিয়ে নেই তা হীরালাল জানে। এটুকু এ জাতটাকে সে এই কদিনে চিনেছে শ্রান্তি যতই হোক—যাদের জেগে পাহারা দেবার কথা তারা ঠিকই জেগে আছে এবং পাহারা দিচ্ছে। তাদের সামনে পড়লে এখন নানা কৈফিয়ত। প্রাণ যাবার সম্ভাবনা নেই বটে, 'পাস ওয়ার্ড'টা সে জেনেই এখানে আসতে সাহস করেছে—কিন্তু অনর্থক খানিকটা দেরি হয়ে যাবে। আর সেটাই কোন মতে বাঞ্ছনীয় নয়। আধ ঘণ্টা মোটে সময় ওর হাতে।

অন্ধকারে চোখ অভ্যস্ত হয়ে গেছে। একটু থমকে থমকে চেয়ে দেখতেই চোখে পড়ল সান্ত্রী একজন ঘুরে ওধারের বাঁকে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। এই উত্তম সুযোগ। সে দ্রুত মাঠটা পেরিয়ে গেল। জুতো খুলে রেখে এসেছে সে—শুকনো শক্ত মাটিতে শব্দ জাগবার ভয়ে। সুতরাং প্রায় নিঃশব্দেই প্রাঙ্গণটা পার হয়ে প্রাকারের সেই বড় ফুটোটার সামনে এসে পৌঁছল।

আরও একবার ইতস্তত করলে সে। পাঁচিলের বাইরে যেন আরও জমাট অন্ধকার। গভীর নালাটা নেমে গেছে পাঁচিলের গা থেকেই, পা ঠিক রাখতে না পারলে গড়িয়ে পড়বে অনেক নীচে—হাত পা ভাঙবার সম্ভাবনা ষোল আনা। তা ছাড়া কদম রসুল হয়তো এখনও খালি হয় নি—সেখানে শত্রুরা হয়তো এখনও কড়া পাহারা রেখেছে। এই নালার দিকটাতে পাহারা রাখাও আশ্চর্য নয়—বরং সেইটাই সম্ভব। তাদের হাতে পড়লে আর রক্ষা থাকবে না কোনমতেই। এ অন্ধকারে সতর্ক হবারও উপায় নেই।

হয়তো পা বাড়ালেই একেবারে কোন প্রহরারত সিপাহীর বাহুবন্ধনের মধ্যে গিয়ে পড়বে।

তবু—উপায়ও আর নেই। যেতেই হবে ওকে।

মাত্র আধ ঘণ্টা সময় চেয়ে নিয়েছে সে মিচেলের কাছ থেকে।

এর ভেতর খুঁজে বার করতেই হবে তাঁকে।

তাঁকে খোঁজবার জন্য—তাঁর দেখা পাবার জন্য কদিন থেকে সে বার বার জীবন বিপন্ন করছে। তার কাজ এখানে নয়, যুদ্ধক্ষেত্র থেকে অনেক দূরে অনেক নিরাপদে তার থাকবার কথা। তবু সে ইচ্ছা করেই বার বার সামনে আসছে, সৈন্যব্যূহের মধ্যে মাথা গলাচ্ছে।

অসুখের পর ভাল করে জ্ঞান হওয়ার সময় থেকেই সে তাঁর খোঁজ করেছে। কানপুর ত্যাগের আগে যতটা সম্ভব ঘুরে ঘুরে খবর নিয়েছে। কেউই বলতে পারে নি—জীবিত কি মৃত তিনি তাও জানতে পারত না, যদি না দৈবাৎ নানকচাঁদজীর সঙ্গে দেখা হয়ে যেত। তিনিও প্রথমটা ভাঙতে চান নি—শেষে কী ভেবে, হয়তো ওর রোগশীর্ণ পাণ্ডুর মুখের দিকে চেয়ে দয়াপরবশ হয়েই খবর দিয়েছিলেন, হুসেনী বেগম লক্ষ্ণৌতেই আছে, সেখানে সে মৌলবী সাহেবের সঙ্গে মিলে নিজেই যুদ্ধ-পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছে। শুনছি বন্দুক ঘাড়ে করে সিপাইদের সঙ্গে সে-ও প্যারেড করতে শিখছে—'

এই বলে একটু হেসে বলেছিলেন, 'যদি তাকে চাও তো সোজা লক্ষ্ণৌ চলে যাও, সিপাইদের সঙ্গে গিয়ে ভিড়ে পড়—আর যদি জান বাঁচাতে চাও তো আংরেজদের ছেড়ো না! ভাল করে ভেবেচিন্তে কাজ ক'র।'

শুধু নিজের কথা হলে হয়তো জানের পরোয়া করত না—ভিড়েই পড়ত সিপাহীদের সঙ্গে, কিন্তু দেশে তার বিধবা মা তার মুখ চেয়েই দিন গুনছেন, সে ছাড়া তাঁর আর কোথাও কেউ নেই, কোন আশা বা আশ্বাস নেই। অনেক কষ্টে তাকে মানুষ করে তুলেছেন তিনি—শেষ জীবনে একটু সুখ, একটু আশ্রয় পাবার আশায়। জেনে শুনে ইচ্ছা করে সর্বনাশের মুখে এগিয়ে যাবার তার অধিকার নেই।

সুতরাং তখন লক্ষ্ণৌএর দিকে যেতে পারে নি। ইংরেজ কর্নেলের চিঠি নিয়ে উল্টো দিকেই আসতে হয়েছিল। কিন্তু হুসেনী বেগমের চিন্তা সে এক মুহূর্তের জন্যও ভুলতে পারে নি। সব কাজের মধ্যে, মনের সব ভাবনার সঙ্গেই জড়িয়ে ছিল তাঁর কথাটা। আর একবার তাঁকে দেখবার জন্য, তাঁর

সঙ্গে দুটো কথা কইবার জন্য মনটা আকুলি-বিকুলি করত। এবার তাঁর দেখা পেলে তাঁকে আর একবার বুঝিয়ে বলবে সে, আর একবার এই সাংঘাতিক পথ থেকে নিবৃত্ত করবার চেষ্টা করবে। যদি না পারে তাঁকে চোখে চোখে রাখবে—সাধ্যমত তাঁর বিপদ, তাঁর পথের কাঁটা দূর করবে। তাঁকে নিরাপদে রাখার জন্য শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করবে। আর যদি—যদি এমন কোন মুহূর্ত আসে যে নিজের জীবন ও তাঁর জীবনের মধ্যে যে কোন একটার কথা ভাবতে হয় তো তারই জীবনের কথা ভাববে, নিজের জীবন দিয়ে জীবনের ঋণ শোধ করবে! তখন আর মায়ের কথাও ভাববে না সে। এ জীবন যিনি রক্ষা করেছেন বাব বার—তাঁর জন্য এ জীবন উৎসর্গ করতে সে ন্যায়ত ধর্মত বাধ্য, মাকে তাঁর ইষ্টদেবী মা কালীই রক্ষা করবেন!

কিন্তু নানকচাঁদের সঙ্গে দেখা হবার পর থেকে আর কোন সংবাদই পায় নি সে। পথে বহু লোককেই জিজ্ঞাসা করেছে—কেউই ঠিক খবরটি দিতে পারে নি। এক-এক জন এক-এক রকম বলেছে। কেউ বলেছে হুসেনী বেগম দিল্লীতে গেছে—কেউ বলেছে এখনও পর্যন্ত নানাসাহেবের সঙ্গেই আছে সে—কেউ বলেছে সাহেবদের হাতে ধরা পড়ে তার ফাঁসি হয়েছে।

এই সব পরস্পরবিরোধী সংবাদে তার মনটা যে এক-এক সময় ভেঙে পড়ত না তা নয়, কিন্তু আবার পরক্ষণেই সে জোর করে মনে ভরসা আনত। বাবু নানকচাঁদ পাকা লোক, খবর রাখাই তাঁর একরকম পেশা—তিনি যা বলেছেন সেইটেই ঠিক।

হুসেনী বেগম লক্ষ্ণৌতেই আছেন নিশ্চয়।

আর, থাকাই তো সম্ভব। এ ভাগ্য-পরীক্ষা থেকে—নিজেরই আয়োজিত এই মহা-আহব থেকে দূরে থাকতে তিনি পারেন না।...

এই আশ্বাস মনে মনে জপ করতে করতেই সে কটা দিন এসেছে! তার ফলে যতই সে এ শহরের কাছাকাছি এসেছে ততই তার উৎকণ্ঠা ও ব্যাকুলতা বেড়েছে। আর গত দু দিন—শহরের উপকণ্ঠে পৌঁছে তো তার দিনের আহার এবং রাত্রের নিদ্রা দুই-ই ঘুচে গেছে। আশা ও আশঙ্কায় কণ্টকিত হয়ে না পারছে সে কোন কাজ ঠিক-মত করতে, না পারছে একটু স্থির হয়ে বসতে বা বিশ্রাম করতে।

এই শহরেই আছেন তিনি—হয়তো তাদের খুব কাছেই আছেন!

হয়তো—ঐ যারা সামনে দাঁড়িয়ে লড়াই করছে—তাদের পাশেই আছেন, কে জানে হয়তো বা তিনিও ওদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে গুলি ছুঁড়ছেন।

তবু দেখা করবার উপায় নেই, কাছে যেতে পারছে না সে !

তাঁর আর ওর মধ্যে আজ বলতে গেলে মৃত্যুর ব্যবধান !

এপারে সে, ওপারে তিনি। মাঝে সর্বাত্মক বৈরিতাব দুস্তর নদী। জীবন পণ না করলে ওপারে পৌঁছনো যাবে না—হয়তো করলেও যাবে না। সে চেষ্টায় জীবনটাই যাবে শুধু, জীবনদায়িনীর কাছে পৌঁছতে পারবে না শেষ পর্যন্ত।

তবে কি সে আর কোনদিনই তাঁর দেখা পাবে না ?

তাঁকে এই ধ্বংসের মুখ থেকে, সর্বনাশের মুখ থেকে বাঁচবার কোন চেষ্টাও কবতে পারবে না ? এই চরম বিপদের দিনে তাঁর কোন কাজেই সে লাগতে পারবে না ?

অবশেষে আজ সন্ধ্যায—আজকের সারাদিনব্যাপী এই ভয়াবহ ও বিপুল রক্তক্ষয়ী প্রচণ্ড সংগ্রাম প্রত্যক্ষ করবার পর—তার মনের আকাজ্ঞা ও ব্যাকুলতা আর এক নতুন রূপ পরিগ্রহ করেছে।

এই যে হাজার হাজার শত্রুর শবদেহ ছড়িযে পড়ে আছে চারিদিকে—এর মধ্যে, এদের মধ্যে কোন পুরুষবেশিনী নারীর দেহ নেই তো ?

কথাটা ভাল করে ভাবেও নি সে—আশঙ্কাটা মনের মধ্যে কোন স্পষ্ট রূপ গ্রহণ করার আগেই তার বুকের মধ্যেটা হিম হয়ে এসেছে, উত্তাল বক্ষ-স্পন্দনের শব্দ বাইরে থেকেই শুনতে পেয়েছে সে। জোর করে সে মনে অন্য চিন্তা এনেছে, বিনা প্রযোজনে চেঁচিযে কথা বলে—অকারণে ছুটোছুটি করে কথাটা ভুলতে চেষ্টা করেছে—কিন্তু কোনটাই পারে নি। শেষ অবধি হাল ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছে, মনে মনে স্বীকার করতে হয়েছে যে—চিন্তাটা মন থেকে কখনই তাড়াতে পারে নি সে—সেখানকার কপাট বন্ধ করেছে—কিন্তু তার ফলে কপাটের বাইরে সে-ই থেকেছে আশঙ্কাটা নয। সেটা কখন মনের মধ্যে মূল বিস্তার করে পল্লবিত হয়ে উঠেছে।

কতকটা সেই আশঙ্কাই আজ সারাদিনের উদ্বেগ ও পরিশ্রমের পরেও তাকে তাঁবুর মধ্যে স্থির থাকতে দেয় নি—টেনে এনেছে সহস্র-শব-বিকীর্ণ এই শ্মশানভূমিতে। কেন এসেছে—এই অন্ধকারে এত মৃতদেহের মধ্যে বিশেষ একটি দেহ খুঁজে বেড়ানো সম্ভব কি না—অথবা সবগুলো দেখার সময় পাবে

কি না রাত্রের মধ্যে—এসব কোন কথাই সে ভাবে নি। শুধু মনের একটা প্রবল আবেগই ছুটে চলে এসেছে।

কিন্তু এখানে, শাহ্ নজফের প্রাঙ্গণে পা দেওয়া মাত্র সব যেন ওলটপালট হয়ে গেছে—সে আবেগ নতুন এক ধাক্কা খেয়েছে। শবদেহ খুঁজে বেড়ানোর আর প্রয়োজন হয় নি—জীবিতাকেই দেখতে পেযেছে। বোধ করি তাব আন্তরিক আকুলতাই দৈবকে স্থির থাকতে দেয় নি—তাব ইচ্ছাশক্তিব সাধনাই সিদ্ধিকে টেনে এনেছে। বিলি মিচেল দেখতে পাবাব বহু আগেই তার নজরে পড়েছে—বহু দূরে, একেবারে দৃষ্টিরেখার শেষ সীমায, মাযাবিনী ছাযারূপিনী এক নারীমূর্তি।

হোক জমাট গাঢ় অন্ধকার, থাক দূরত্বের ব্যবধান—তবু সে গতি, সে দেহছন্দ, সে গঠনসুষমা তার ভুল হবার কথা নয়—দেখেই চিনেছে। ঐ লঘুসঞ্চারিণী নাবী আর কেউ নয়—হুসেনী বেগম!

হয়তো তখনই ছুটে কাছে যেত সে—প্রথম ঝোঁকে সে পা উঠিযেওছিল সেই ভাবে—কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ওঁর বিপদাশঙ্কার কথাটা মনে পড়ে যাওযায় নিজের আবেগকে দমন করলে।

সান্ত্রীরা কেউ না কেউ জেগে আছে, পাহারা দিচ্ছে। কাছেই আছে হযতো। সে দৌড়লেই তাদের নজবে পড়বে এবং নজরটা সেইখানেই আবদ্ধ থাকবে না। সেক্ষেত্রে যে অবস্থা হবে, চারিদিকে যে শোরগোল হৈচৈ পড়ে যাবে, তা হীরালাল বিলক্ষণ অনুমান করতে পাবে। তখন সেই সদ্য-জাগ্রত এতগুলি প্রতিহিংসাতুর দৃষ্টির সামনে থেকে হুসেনী পালাতে পাববে না। আর বিবিঘর হত্যাকাণ্ডের নায়িকা ইংরেজদের হাতে ধরা পড়লে কী হবে তাও সে জানে।

না। ছুটে কাছে যাওযা বা অন্য উপায়ে ওঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করা সম্ভব নয়। এখানে দেখা করা বা কথা কওয়া কোনটাই উচিত হবে না। কিন্তু সে কাছে না গেলেও—যদি এমনিই আর কারুর নজবে পড়েন উনি?

কথাটা মনে হওযা মাত্র সেই শীতের রাত্রেই নিমেষে ঘেমে উঠল হীরালাল। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই নজরে পড়ল তার সামনে—সামান্য দূরে বিলি মিচেল। আর একটু লক্ষ্য করে দেখার পব বুঝতে পারল সে ছায়ামূর্তি মিচেলের নজরে পড়ছে—এবং সে-ও ওরই মত নিঃশব্দে সতর্কতার সঙ্গে সেই গোপনচারিণীকে ধরবার চেষ্টায় পিছু পিছু চলেছে।

অর্থাৎ আজ আর হুসেনী বেগমের রক্ষা নেই!

এখনও সাড়াশব্দ করে নি বিলি, তার কারণ হয়তো এখনও একা ধরবার আশা ছাড়ে নি সে, বাহাদুরিটা নিজে নিজেই রাখতে চায়—কিন্তু শেষ অবধি একেবারে নাগালের বাইরে যেতে দেখলেও কি আর চুপ করে থাকবে!

আশঙ্কা এবং আতঙ্কেরও বুঝি একটা সীমা আছে—সেই সীমায় পৌঁছে গেলে ও দুটোই কেটে যায়—সে জায়গায় আসে সাহস। মরীয়ার সাহস।

সহসা সেই সাহসই পেয়ে বসল হীরালালকে। দুর্জয় এক সংকল্পে ওর ওষ্ঠদুটি দৃঢ়সংবদ্ধ হল। সে নিজের মন স্থির করে ফেললে—প্রাণ দেওয়ার এই-ই সুবর্ণসুযোগ, প্রাণ দিয়েই ওঁর প্রাণ রক্ষা করবে সে। প্রয়োজন হলে বিলির প্রাণ নিতেও ইতস্তত করবে না।

বন্ধু-হত্যার পাপ? সে প্রায়শ্চিত্তের বহু সময় থাকবে।...

কিন্তু শেষ পর্যন্ত অত কিছুই করতে হল না।

বিলির হাতে আলো ছিল, তাই তার দৃষ্টি ছিল সীমিত—সে লক্ষ্য করে নি, কবরঘরের দোর পর্যন্ত গিয়েই কখন আবার বিস্ময়কর ক্ষিপ্রতার সঙ্গে সেই ছায়ারূপিণী নারী ওপাশে সরে গেছে, দেওয়ালেব ছায়ায় গিয়ে পড়ছে—সে ভেবেছে তাঁর অগ্রবর্তিনী নীচের ঐ বড় ঘরটাতেই বুঝি ঢুকে পড়েছে, অন্ধকারের মধ্যে আশ্রয় নিয়েছে।

বিলি ভুল দেখলেও হীরালাল দেখে নি।

সে ঠিকই দেখেছে—শুধু এই ঘটনাই নয, ঘটনার কারণটাও।

প্রহেলিকা আর তাব কাছে প্রহেলিকা থাকে নি।

আমিনা অকারণে জীবন বিপন্ন করে এই শত্রুপুরীতে ঢোকে নি। বৃহত্তর কোন সর্বনাশেরই আযোজনে এসেছে।

এ যাওয়া পালানো নয—লোভ দেখিয়ে নিয়ে যাওয়া।

বিলিকে সে ইচ্ছে কবেই দেখা দিয়েছে, জেনেশুনে চোখে পড়ে অদৃশ্য একটা রহস্যের সুতোয বেঁধে নিয়ে যাচ্ছে।

কেন? ঐ কবরখানাতে বিলিকে নিয়ে যেতে চায কেন সে? ওখানেই কি আছে সর্বনাশের কোন ফাঁদ পাতা, সেই ফাঁদে ফেলবার জন্যই কি বিলিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে সে?

হীরালাল জুতোটা খুলে ফেলেত দ্রুগতিতে বিলির কাছে এসে পড়ল—কিন্তু বিলিকে জানতে দিল না। সে তার সঙ্গে সঙ্গেই ভেতরে ঢুকল—একই

সঙ্গে চেয়ে দেখল ভেতরের দিকে। তবে বিলি খুঁজছিল মানুষ, তার দৃষ্টি তাই মাটির দিকে পড়ে নি—কোণে কোণে ঘুরছিল। কিন্তু হীরালাল প্রথমেই দেখেছে—কবরবেদীর ওপাশে সার সার পিপে—আর তার পরই নজরে পড়েছে বিলি মিচেলের পায়ের তলায় ধুলোর মত স্তূপাকার পদার্থটা।

এসব কয়েক মুহূর্তের কথা, বরং বলা যায় কয়েকটি পলকের।

অবসরও ছিল না আর কয়েক মুহূর্তের বেশি, চিন্তা বা কল্পনা করার—সেই অত্যন্ত মূল্যবান কটি মুহূর্তেরও চার পাঁচটি কেটে গেল জিনিসটা কি অনুমান করতে।

তার পরই মাথাতে খেলে গেল—বিদ্যুৎবিকাশের মত।

বারুদ—স্তূপাকার বারুদ—একটা বড় কিল্লা উড়িয়ে দেবার মতই যথেষ্ট। হুসেনী জানে যে এখানে এই বারুদ আছে—তাই এসেছিল সম্ভবত নিজেই আগুন লাগিয়ে এই বাহিনীকে, তার সঙ্গে নিজেকেও নিশ্চিহ্ন করতে—সে প্রয়োজনের কাছে শাহ্‌নজফ বা কদম রসুলের ইমারত কত তুচ্ছ। কিন্তু আলো হাতে মিচেলকে দেখা মাত্র অন্য চিন্তা তার মাথায় খেলেছে, ওকে দিয়েই ওদের মারবার মধ্যে প্রতিহিংসার সাধারণ আনন্দ ছাড়াও বেশী কিছু আছে—আছে মারাত্মক কৌতুক। আর আছে নিজের নিরাপত্তার প্রশ্ন। তাই মায়া-কুরঙ্গীর মতই লোভ দেখিয়ে টেনে এনেছে সে বিলিকে—

এক লহমার বেশি এসব ভাববার সময় পায় নি হীরালাল—কেন না ততক্ষণেও পায়ের নীচের ধুলোটা অনুভব করে আলোটা নামাতে শুরু করেছে বিলি।

সাবধান করার সময় নেই—বোঝাবার তো নয়ই—তাই একমাত্র যা করা যেতে পারত হীরালাল তাই করল—হাত দিয়ে জ্বলন্ত শিখাটা চেপে ধরল।

॥ ৬৭ ॥

এই পাঁচিলের ওপারে আছে সমস্যার সমাধান, আগ্রহের সমাপ্তি—আছে বহু প্রশ্নের উত্তর। অথবা আছে মৃত্যু,—আশা-আকাঙ্ক্ষা-সম্ভাবনা-ভরা এক তরুণ জীবনের অকাল অবসান।

কে জানে কী আছে!

তবু ইতস্তত করার সময় নেই। সময় মাত্র ওর হাতে আধ ঘণ্টা। তারও অনেকখানি কেটে গেছে ইতিমধ্যে।

হীরালাল মনে মনে একবার মাকে আর মা কালীকে স্মরণ করল, তার পরই সেই রন্ধ্রপথ দিয়ে বাইরেব গাঢ় অন্ধকারে পা বাড়াল।

পাঁচিলের প্রায় গা থেকেই কঙ্করময় ঢালু জমি নেমে গেছে নালার দিকে। সে জমিতে ঘাস নেই, এমন সময থাকাব কথাও নয—শুধু দুর্বাঘাসের শুকনো মূলগুলো মাত্র আছে, তাতে পা আটকায় না। আর আছে কতকগুলো নীচু নীচু কাঁটা-ঝোপ, সেখানে পড়লে আরও বিপদ।

সামান্য একটু দাঁড়াতেই অন্ধকারে চোখটা অভ্যস্ত হযে গেল—চারিদিকে তাকিযে দেখল সে। এ দিকটা সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ, জনমানবহীন। কিন্তু হীরালাল জানে—এ স্তব্ধতার কোন মূল্য নেই। হযতো কাছেই লোক আছে, অন্তত কদম রসুলে যে আছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। সে দেখতে পাচ্ছে না, কিন্তু তারা তাকে ঠিকই দেখছে! আর না দেখলেও—এখনই, একটু অসতর্ক হলেই তার অস্তিত্ব টের পাবে। সেক্ষেত্রে—

কিন্তু এ সব চিন্তা অনাবশ্যক। এখন প্রশ্ন—কোথায় যাবে সে?

এদিকে সিপাহীদের ঘাঁটি বলতে কদম রসুল! কিন্তু সেখানে ঢোকবার এদিক দিয়ে কোন পথ নেই। নিরন্ধ্র পাঁচিল। সুতরাং, হীরালাল মনে মনে দ্রুত হিসেব কবে নিল, এখান থেকে নেমে নালার পথ ধরে নদীর দিকে পৌঁছে ওদিকের ফটক দিয়ে কদম রসুলে পড়াই সুবিধা। সে-ও সেই পথেই চলল।

কিন্তু অন্ধকারে নামতে গিয়ে প্রথম পদক্ষেপেই ওব পা পিছলে গেল। পড়েই যেত গড়িযে—কারণ আশে-পাশে সামলে নেবাব মত কিছু নেই—যদি না ঠিক সেই মুহূর্তে একখানি অদৃশ্য কোমল হাত ওর বাঁ হাতের কনুইএর কাছটা ধরে টেনে নিত।

'আস্তে বাবুজী, আস্তে। এ সব পথ তোমাদের মত সুখী বাবুদের জন্যে নয়!'

অভ্যস্ত বিদ্রূপের ভঙ্গি, চিরপরিচিত কণ্ঠস্বর।

কিন্তু তাইতেই হীরালালের বুকের রক্ত যেন চলকে উঠল, হৃৎপিণ্ডটা উঠল লাফিয়ে। সমস্ত স্নায়ুগুলো যেন নিমেষে অবশ হয়ে এল।

যে ধরেছিল, সে ছাড়ে নি। বরং বেশ শক্ত করেই ধরে ওকে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ স্থানে নিয়ে দাঁড় করিয়ে পুনশ্চ বলল, 'তুমি কি আমাকেই খুঁজছিলে বাবুজী?'

এবার হীরালাল কথা কইল। কোনমতে জড়িয়ে জড়িয়ে বলল, 'হ্যাঁ।'

'ভালই হয়েছে তা হলে, দেখা হয়ে গেছে। এখানেই একটু ব'স বরং—তোমার পা কাঁপছে।'

এবিষয়ে আর দ্বিরুক্তির প্রয়োজন ছিল না, সত্যিই তখন হীরালালের দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই। সে পাঁচিলের গা ঘেঁষে অপ্রশস্ত সেই সামান্য জায়গা-টুকুতেই বসে পড়ল।

আমিনাও ওর পাশে বসল। একেবারে কাছে। তার পর মুহূর্তকাল নীরব থেকে ওর অবশ শিথিল ডান হাতখানার ওপর আলতোভাবে নিজের একটা হাত রেখে স্নেহ-কোমল কণ্ঠে বলল, 'কেমন আছ বাবুজী?'

হীরালাল সে কথার উত্তর দিল না।

এই প্রচণ্ড শীতের রাতেও ওর ললাটে ঘাম দেখা দিয়েছে। সরকারী গরম জামার ভেতরে সাদা বেনিয়ানটা জড়িয়ে গেছে গায়ের সঙ্গে। সে বাঁ হাতটা তুলে জামার হাতায় কপালটা মুছে নিয়ে কেমন একরকম আলগা ভাবে বলল, 'আপনি আরও একবার আমায় বাঁচালেন।'

'হ্যাঁ, কিন্তু'—এবার যেন একটু অসহিষ্ণু ভাবেই বলে আমিনা, 'কিন্তু তুমি এসব বিপদের মধ্যে আসতেই বা যাও কেন? তোমাকে বার বার সাবধান করে দিচ্ছি, তুমি কথা শোন না কেন? একটা সাধারণ বিপদ থেকে আত্মরক্ষা করারও তো তোমার শক্তি নেই। এখনই তো গড়িয়ে পড়তে নীচে—হাত-পা তো ভাঙতেই, সেই শব্দে ওখানকার সিপাইরা টের পেলে জানটাও বাঁচত না। আজ আমাদের যা ক্ষতি হয়েছে তার পর কারুর কোন অনুরোধেই ইংরেজের চাকরকে হাতে পেয়ে ওরা ছেড়ে দিত না।...কেন এ কাজ করতে যাচ্ছিলে বল তো?'

'আপনাকে আমি দেখতে পেয়েছিলাম। আপনি যে এই পথেই—'

'দেখতে পেয়েছিলে তা জানি। তাই আমার কাজটি পণ্ড করলে! কেন, আমার সঙ্গে দেখা করে তোমার লাভ কী? শুধু শুধু বিপদের মধ্যে পড়া বৈ তো নয়। তুমি কেন আমার কথা শুনছ না বলতে পার হীরালাল, বারবার সাবধান করা সত্ত্বেও এসব পাগলামি কেন করছ? আমাকে ছাড়, আমাকে

না ছাড়লে তোমার মঙ্গল নেই!' স্নেহময়ী জ্যেঠার মতই উদ্বেগ ফুটে ওঠে আমিনার আপাত-কঠোর তিরস্কারে।

হীরালাল কি আমিনার কণ্ঠস্বরে প্রশ্রয় পায় কিছু? সে বেশ একটু জোর দিয়েই বলে, 'তা হলে আপনিও ছাড়ুন এই সব।'

'কী সব?' বিস্মিত ভাবে প্রশ্ন করে আমিনা।

'এই সব বীভৎস কাজ। এ পথ আপনি ছেড়ে দিন—এই ধ্বংসের পথ, মৃত্যুর পথ, অকল্যাণের পথ। একটু আগেই কী সর্বনাশ আপনি করতে গিয়েছিলেন বলুন তো!' হীরালাল অনেক চেষ্টায় যেন খানিকটা সাহস সঞ্চয় করে—নিজের হাত উল্‌টে আমিনার হাতখানা নিজের মুঠোর মধ্যে চেপে ধরে, 'যুদ্ধের কথা আলাদা, কিন্তু এই ঘুমন্ত মানুষগুলোকে মারা—এ তো হত্যারই নামান্তর। আমি না দেখতে পেলে ওদের একজনও বাঁচত না। এতগুলো মানুষের মৃত্যুর জন্য দায়ী হতেন আপনি। ওদের সঙ্গে আপনি আমি—সবাই যেতুম। হয়তো সামনের এই সিপাইগুলোও বাঁচত না।' সে কদম রসুলের দিকটা দেখিয়ে দেয়।

'না-ই বাঁচত।' যেন চাপা গর্জন করে ওঠে আমিনা, 'এর সিকির সিকি দুশমন মারবার জন্যে আজ সারাদিনে অন্তত তিন-চার হাজার সিপাইএর প্রাণ গেছে। তার জায়গায় এই কটা প্রাণের মূল্য কি! আমি তো জেনেশুনেই গিয়েছিলাম।...আর তুমি? তোমারও মরাই উচিত ছিল। তোমার তো এখানে থাকার কথা নয়, তোমার ছাউনি তো অনেক পেছনে। কেন এর ভেতর, এই এতিমখানাতে এসেছিলে তুমি? কেন আস?'

ক্রমশ ক্রুদ্ধ ও উত্তেজিত হয়ে ওঠে আমিনা। যেন হাঁপাতে থাকে সে—কথাগুলো বলতে বলতে।

কিন্তু হীরালাল ভয় পায় না। বলে, 'আপনার কথা ভেবেই আমি যে স্থির থাকতে পারি না বেগমসাহেবা, আপনার খোঁজেই আমি এসেছিলাম এখানে! এতে যদি আমার অপরাধ হয়ে থাকে—মাপ করবেন।'

'আমার খোঁজে?' চমকে ওঠে আমিনা, শেষের কথাগুলো তার কানেও যায় না, 'কেমন করে জানলে আমি এখানে থাকব?'

'তা নয়।' একটু অপ্রতিভ হয়ে পড়ে হীরালাল, 'ক দিন কেবলই মনে হচ্ছে, আপনি এখানে আছেন। আর যদি থাকেন—যুদ্ধের জায়গা থেকে দূরে থাকতে আপনি পারবেন না, কাছেই থাকবেন, এদের সঙ্গেই থাকবেন।...

আজ এখন'—বলতে বলতে সহজ করার চেষ্টা সত্ত্বেও গলা কেঁপে যায় হীরালালের, 'সন্ধ্যের এই লড়াইএর পর, কে জানে কেন, কেবলই ভয় হচ্ছিল যে, হয়তো—হয়তো আপনিও ছিলেন এখানে—'

'ও, ভেবেছিলে মরে গেছি? তাই মড়ার গাদার মধ্যে খুঁজতে এসেছিলে? কিন্তু সেইটেই বিশ্বাস করে নিশ্চিন্ত থাকতে পার নি কেন হীরালাল? কেন আবার খুঁজতে এসেছিলে?...ইস্। সব ঠিক ছিল, আমার হিসেবে কোথাও এতটুকু ভুল হত না—শুধু যদি তুমি না এসে পড়তে।...কেন এলে তুমি বাবুজী—কেন এলে? এলে তো চুপ করে মরতে পারলে না? কী ক্ষতি হত তুমি মারা গেলে!...কেন আমার সব আয়োজন পণ্ড করলে! কেন, কেন?'

নির্মম কথাগুলো যেন বুকে দাগ কেটে কেটে বসে। অকস্মাৎ চোখে জল এসে যায় হীরালালের। নিরুদ্ধ অভিমানে গলার স্বরও ফোটে না ভাল করে। অনেক চেষ্টায় বলে, 'আমি সহজেই মরতে পারতাম বেগম-সাহেবা, আপনাকে সুখী করতে আমি এখনও মরতে পারি। আমার রক্তে যদি আপনার রুধিরতৃষা মেটে তো এখনই হাসতে হাসতে সে রক্ত আপনাকে উপহার দিচ্ছি। কিন্তু এতগুলো মানুষকে খুন করার পাপে আপনাকে জড়াতে আমি দেব না। আমার সাধ্য থাকতে, আমার সামনে আপনাকে কোন অন্যায়ই করতে দেব না। এই লোকগুলো ব্যক্তিগতভাবে আপনার কোন অনিষ্টই তো করে নি, কোন দোষে দোষী নয় তো আপনার কাছে—তবে এদের আপনি কেন মারছিলেন? শুধু শুধু নরহত্যার পাতকী হতে যাচ্ছিলেন কেন?'

'এদের জন্যে তোমার বড় দরদ বাবুসাহেব। কিন্তু এরা কী করছে সে খবরটা রেখেছ? এরা বিনা দোষে হাজার হাজার লোক মারছে না? যে সব লোক প্রত্যহ এদের ফাঁসিকাঠে, এদের গুলিতে প্রাণ দিচ্ছে, এদের কোড়ায় জর্জরিত হচ্ছে তার আগে—তারা কী অনিষ্ট করেছিল এদের? সিপাইদের অপরাধে নিরীহ চাষীদের ওপর এ অকথ্য নির্যাতন কেন? কানপুরে কী হয়েছে তার খবর রাখ বাবুজী? একেবারে নির্দোষ লোকগুলোকে ধরে ফাঁসি দিয়েছে, কিন্তু তাতেও ওদের তৃপ্তি হয় নি—শুধু মরেও অব্যাহতি পায় নি বেচারীরা—মরার আগে প্রত্যেককে বিবিঘরের জমাটবাঁধা শুকনো রক্ত জিভ দিয়ে চেটে পরিষ্কার করতে হয়েছে। কোড়ার চোটে এই অমানুষিক কাজ করিয়েছে ওরা—যে ইতস্তত করেছে তারই পিঠের চামড়া গেছে। এর পরেও কি ওদের মানুষ হিসেবে দেখতে বল তুমি!'

আমিনা আরও কী বলতে যাচ্ছিল, বাধা দিয়ে হীরালাল আস্তে আস্তে বলল, 'কিন্তু তাদের কি খুব দোষ দেওয়া যায় বেগমসাহেবা? বিবিঘরে যা হয়েছে তার পর সেই হতভাগিনীদের স্বজাতীয়রা যদি মাথার ঠিক রাখতে না পেরে এ কাজ করেই থাকে—খুব বেশী অপরাধী কি তাদের করতে পারেন?'

এই বোধ হয় প্রথম আমিনা নিরুত্তর রইল। এই প্রথম যেন সে কোন জবাব খুঁজে পেল না। হীরালাল অনুভব করল ওর হাতের মধ্যে তার হাতখানা শিউরে কেঁপে উঠল একবার।

হীরালাল সভয়ে সসংকোচে সে হাতে একটু চাপ দিয়ে বলল, 'দোহাই আপনার—আমার মিনতি শুনুন। যা হবার হয়ে গেছে, আর এর মধ্যে আপনি নিজেকে জড়াবেন না। আপনি এ থেকে সরে যান!'

হয়তো হীরালালের কণ্ঠে সেই মুহূর্তে ঠিক আকুতিটি ফুটেছিল, হয়তো সেই নিশীথ-অন্ধকারে তার মনের চেহারাটা, তার আন্তরিকতাটা যথার্থ ধরা পড়েছিল—কিছুক্ষণের জন্য কেমন বিহ্বল হয়ে গেল আমিনা। চুপ করে বসে রইল সে, পাষাণ-প্রতিমার মতই নিশ্চল নিস্পন্দ হয়ে। তার পর স্খলিত কণ্ঠে ধীরে ধীরে উত্তর দিল, 'আমি তো তোমাকে আগেই বলেছি বাবুজী, আমার পক্ষে এখন আর ফেরবার বা বাঁচবার কোনও পথ কোথাও খোলা নেই। আমার সব কথা তুমি জান না, আজ আর জানাবার সময়ও নেই। জানলে হয়তো বুঝতে পারতে কেন আমি এই সর্বনাশের নেশায় এমন করে মেতে উঠেছি। কিন্তু সে কথা এখন থাক্। শুধু এইটুকুই জেনে রাখ—এখন মৃত্যুর পথই আমার একমাত্র পথ। ··আমাকে তুমি ছেড়ে দাও, ধরে নাও সত্যিই আমি মরে গেছি। আমার কথা ভেবে তুমি আর নিজের জীবনে দুঃখ-দুর্গতি ডেকে এনো না!'

এর উত্তর দিতে গিয়ে হীরালালের গলা কেঁপে গেল। সে দু হাতে ওর দুটো হাত চেপে ধরে পাগলের মত বলে উঠল, 'তা হয় না বেগমসাহেবা, তা হয় না। আমি মার মুখে বহু বার শুনেছি এমন কোন কুকর্ম, এমন কোন পাপ মানুষ করতে পারে না—যা থেকে ফেরবার, যার জন্য অনুতপ্ত হবার বা প্রায়শ্চিত্ত করবার উপায় তার না থাকে!···এখনও দীর্ঘ জীবন আপনার সামনে পড়ে আছে, এখনও সময় আছে সে জীবনকে সার্থক করে তোলবার। কেন এমন করে শুধু শুধু মৃত্যুর পথে এগিয়ে যাচ্ছেন?'

'কিন্তু বেঁচেই বা আমার লাভ কী? জীবনের উদ্দেশ্য গেছে ফুরিয়ে বাঁচবার আর ইচ্ছেও আমার নেই বাবুজী!'

'কে বললে লাভ নেই বেগমসাহেবা, কে বললে উদ্দেশ্য গেছে শেষ হয়ে! এখনও সময় আছে, এখনও হয়তো চেষ্টা করলে পারেন নতুন করে বাঁচতে, জীবনের নতুন অর্থ নতুন উদ্দেশ্য খুঁজে পেতে।···চলুন আজই আমরা কোন দূর দেশে চলে যাই,—বহু দূরে, এসবের বাইরে কোন সুদূর নিরাপদ স্থানে—যেখানে এই মালিন্য, এই জ্বালা আপনাকে স্পর্শ করবে না—আবার আপনি মনের শান্তি খুঁজে পাবেন, ঈশ্বরের আশীর্বাদ লাভ করবেন।'

আমিনা যেন কেমন অবাক হয়ে যায়। সাগ্রহে ঝুঁকে পড়ে বলে, 'তুমি—তুমি আমার সঙ্গে যাবে বাবুজী? আমাকে নিয়ে যাবে? সত্যি বলছ?'

'হ্যাঁ বেগমসাহেবা, আমি যাব—এই মুহূর্তে, এখনই। কোন দিকে তাকাব না, কিছু ভাবব না। আপনি যাতে শান্তি পান, আপনি নিশ্চিন্ত নিরাপদ হতে পারেন—তার জন্য এখনই আমি সব ছেড়ে দিতে রাজী আছি!'

তবু যেন কথাটা বিশ্বাস হয় না আমিনার। বোধ করি এতখানি আশা করতে তার সাহসেও কুলোয় না। সে ছেলেমানুষের মতই ব্যাকুল ভাবে উপর্যুপরি প্রশ্ন করতে থাকে—'তুমি যাবে? সত্যিই যাবে? আমাকে নিয়ে যাবে?...সেখানে আমাকে কী দেবে তুমি? কতটুকু দিতে পারবে? বল বল বাবুজী—আমার পুড়ে যাওয়া, ছাই হয়ে যাওয়া জীবনের কতটুকু ফিরিয়ে দিতে পারবে?'

'আমি তোমাকে সব দেব বেগমসাহেবা। আমার যা কিছু আছে সব দেব!'

'ইজ্জত? ইজ্জত দিতে পারবে?' রুদ্ধ নিঃশ্বাসে প্রশ্ন করে আমিনা।

'তার চেয়েও বেশি দেব। আমার ধর্ম, আমার ইহকাল পরকাল, সব দেব। ঘর দেব, পদবী দেব—আমি, আমি তোমাকে বিয়ে করব।'

ঝোঁকের মাথায় পাগলের মত বলতে থাকে হীরালাল। হয়তো কী বলছে, কতটা বলছে, তা সেও বোঝে না। কিংবা হয়তো মনের অবচেতনে যা ছিল সুপ্ত, যার দিকে সে জোর করে পিছন ফিরে ছিল এতকাল—সেই সত্যই এখন আপনার নিরুদ্ধ বেগে বেরিয়ে আসছে—তাকে রোধ করা ওর নিজেরও সাধ্যের অতীত!

'বিয়ে করবে! আমাকে বিয়ে করবে! বাবুজী, এ কি সত্যি? তুমি, তুমি আমাকে এত ভালবাস?' চুপিচুপি প্রশ্ন করে আমিনা। যেন সে প্রশ্ন সে নিজেকেই করছে।

'হ্যাঁ।' চুপিচুপিই উত্তর দেয় হীরালাল। কথা কইতে গিয়ে ওর কণ্ঠস্বর

ভাবাবেগে বিকৃত হয়ে যায়, মুখের স্নায়ু ও পেশী পড়ে এলিয়ে—আল্‌গা আল্‌গা কথাগুলো বেরিয়ে আসে, তবু, বলে, 'হ্যাঁ। তোমাকে আমি ভালবাসি। এ জীবনে এ পৃথিবীতে যা কিছু আছে সকলের চেয়ে ভালবাসি। চল, আমরা এখনই রওনা হই, এখনই পালিয়ে যাই চল।'

'কোথায় যাব? কী করব সেখানে গিয়ে?'

'কোন দূর গ্রামে চলে যাব। সেখানে কেউ আমাদের খোঁজ পাবে না। সেখানে গিয়ে আমরা নতুন করে ঘর বাঁধব। আমি চাষ করব, মজুরি করব—তোমার সেবা করব। তোমাকে কিছুই করতে হবে না—তুমি শুধু শান্ত হবে, নিরাপদ হবে, সুখী হবে—সংসারের একটা কাঁটাও তোমার পায়ে বিঁধবে না—শুধু এই।...চল, এখনই যাই। দেরি হয়ে যাচ্ছে!'

হীরালাল অধীর আগ্রহে ওর দুটো বাহুমূল ধরে তুলতে চেষ্টা করে। আমিনা কিন্তু ওঠে না। আপন মনেই হেসে ওঠে সে—ছেলেমানুষের মত হাসি। তৃপ্তির হাসি, সুখের হাসি।

তার পরই অকস্মাৎ দু হাতে নিবিড় ভাবে হীরালালের গলা জড়িয়ে ধরে। ওর কানের কাছে মুখটা এনে অস্ফুট বিহ্বল কণ্ঠে বলে, 'তুমি আমাকে এত ভালবাস? এত ভালবাস হীরালাল? কৈ এতদিন তো বল নি! আমাকে দেবী বলেছ, কিন্তু এমন ভালবাস, আমাকে বিয়ে করতে চাও, একথা তো বল নি। বড় যে দেরি হয়ে গেল বাবুজী, বড্ড দেরি হয়ে গেল!'

তার পর মুখটা তুলে অন্ধকারেই হীরালালের মুখখানা দেখতে চেষ্টা করে সে, খুব চুপিচুপি ফিসফিস করে বলে, 'আমিও তোমাকে ভালবাসি বাবুজী, এতটা যে ভালবাসি তা আগে বুঝি নি, এখন বুঝতে পারছি—আমিও হয়তো তোমার মতই ভালবাসি।...কেন আমাকে এতদিন বুঝতে দাও নি—কেন এমন করে বুঝিয়ে দাও নি? হয়তো তা হলে সত্যিই ফিরতে পারতুম—মৃত্যুর সাগর পেরিয়ে আবার একদিন জীবনের কূলে ভেড়াতে পারতুম নিজের ভাগ্যের এই নৌকোখানা! আজ—আজ যে বড্ডই দেরি হয়ে গেছে বাবুজী!'

আরও নিবিড় করে জড়িয়ে ধরল সে হীরালালকে, আরও জোরে চেপে ধরল নিজের মাথাটা ওর বুকে। থর থর করে কাঁপছে সে, বসন্তের নতুন বাতাস লাগা শুষ্কপত্রের মত কাঁপছে! তার বুঝি তখন স্বজনপরিত্যক্ত পথহারা ভীত শিশুর মতই অবস্থা। যে তীক্ষ্ণবুদ্ধিমতী প্রতিহিংসাময়ী নারী সর্বপ্রযত্নে এই দিগ্‌দাহকারী বহ্নিকাণ্ডের আয়োজন করেছিল—এ যেন

সে নয়, এ যেন আর কেউ। হীরালালের জীবনদাত্রী, অলৌকিক মনীষা ও প্রতিভার অধিকারিণী অসীম প্রতিপত্তিশালিনী দেবী আজ যেন সংসারের সকল পথ থেকে প্রতারিত ও প্রবঞ্চিত হয়ে ফিরে এসে একমাত্র তারই তরুণ বুকে এতটুকু আশ্রয় প্রার্থনা করছে।

কেঁপে উঠল হীরালালও। কিন্তু সবটাই আবেগে নয়, কিছুটা আশঙ্কাতেও। শেষের দিকে আমিনার কণ্ঠে যে একান্ত হতাশা, যে করুণ হতাশ্বাস ফুটে উঠেছিল—তাইতেই যেন কোন্ এক সর্বনাশের ইঙ্গিত লুকোনো ছিল সে-ও মনে মনে একটা হতাশা অনুভব না করে পারল না।

তবু মুখে জোর আনল সে। ভীতা অসহায়া আশ্রয়প্রার্থিনী সেই নারীকে সজোরে বুকে চেপে ধরে তার রুক্ষ কেশের মধ্যে মুখটা গুঁজে দিয়ে বললে, 'কে বললে দেরি হয়ে গেছে—কিছু দেরি হয় নি। এখনও ঢের সময় আছে। আমরা যে আবার নতুন করে জীবন আরম্ভ করতে যাচ্ছি আমিনা। পুরনো জীবনের হিসেব-নিকেশে কী দরকার আমাদের?'

সে স্পর্শে, সে আলিঙ্গনে, সে আশ্বাসে যেন শিউরে উঠল আমিনা।

'হ্যাঁ তাই যাব। আর কিছু ভাবব না, নিজে আর কিছুই করব না, আজ থেকে সম্পূর্ণ ছেড়ে দেব নিজেকে তোমার কাছে।'

দু জনে তেমনি বসে রইল ক্ষণকাল—তেমনি অন্তরঙ্গ, তেমনি ঘনিষ্ঠ, পরস্পর নির্ভরশীল হয়ে। স্থান কাল পাত্র সব কিছু মুছে গেছে ওদের মানসচক্ষের সামনে থেকে, মুছে গেছে অতীত তার তিক্ত স্মৃতি নিয়ে। সমস্ত অনুভূতি দিয়ে ওরা এখন একাগ্রভাবে অনুভব করছে এই বর্তমান পরিস্থিতির অভাবনীয়তা—আর প্রাণপণে তাকাবার চেষ্টা করছে কল্পনার রঙীন ভবিষ্যতের দিকে।...

ইতিমধ্যে আধ ঘণ্টা কেটে গেছে। কখন কেটে গেছে তা হীরালাল বুঝতে পারে নি। বিলি মিচেল আর তার কাছ থেকে চেয়ে-নেওয়া সময় সবই ওর কাছে অবাস্তব অকিঞ্চিৎকর, সুদূর কোন্ অতীতের সামগ্রী হয়ে গেছে।

মিচেল কিন্তু বসে নেই। সে ঘড়ি ধরে আধ ঘণ্টা অপেক্ষা করে খবর দিয়েছে তার ওপরওলাকে। বিশ্বাসে-অবিশ্বাসে ভরা সে কাহিনী, ঘুমে-জাগরণে ভরা তাঁর চৈতন্য। তবু একসময় বিশ্বাসও করতে হয়! তখন ঘুম ভাঙানো [illegible] আরও অনেকের। নিদ্রিত মৃত্যুপুরীতে আবার জীবনের পদশব্দ জাগে, কর্মস্পন্দন সঞ্চারিত হয়।

সে শব্দ-তরঙ্গের আভাস এতদূরে এসে হীরালালের অভিভূত আচ্ছন্ন চেতন্যকেও আঘাত করে। মনে পড়ে সব কথা। এতক্ষণে ওরা তা হলে জেনেছে সব কথা, জেগেছে ওরা, ছুটোছুটি পড়ে গেছে ভেতরে। নিশ্চয় এখনই তারও খোঁজ পড়বে, আর সেই প্রহেলিকাময়ী ছলনাময়ী স্বর্ণমৃগী রমণীর।

তার সম্বিৎ ফিরে আসে। সে সামান্য একটু নড়ে বসে, বলে, 'এবার ওঠ আমিনা, এখনই ওরা এদিকে এসে পড়বে হয়তো—এতক্ষণে তোমার কথা নিশ্চয়ই বলেছে বিলি মিচেল! আর দেরি করো না, লক্ষ্মীটি!'

সে ডাকে অমিনারও সম্বিৎ ফেরে। আর সেই সঙ্গে ওর সমস্ত রক্তে জাগে একটা নিদারুণ ঘৃণা, প্রচণ্ড ধিক্কার। সে ধিক্কার ওর নিজেকেই, সে ঘৃণা নিজের জীবনের ওপর। এই প্রবল আত্মগ্লানিতে আর একবার শিউরে কেঁপে ওঠে সে। তার পরই নিজেকে হীরালালের বাহুবন্ধন থেকে মুক্ত করে সোজা হয়ে বসে। মোহ কেটে গেছে তার, সেই সঙ্গে আবেগের দুর্বলতাও আর নেই।

গলাটা শুধু বোধ হয় তখনও কাঁপছে একটু। তবু সে সহজ শান্ত কোমল কণ্ঠেই বলল, 'হ্যাঁ হীরালাল, আমিও তোমাকে ভালবাসি—সেই জন্যেই তোমার প্রস্তাবে রাজী হতে পারব না। এই গলিত, ঘৃণ্য জীবনটা তার সমস্ত কলঙ্ক পাপ ও অপরাধের বোঝাসুদ্ধ তোমার ঘাড়ে চাপিয়ে তোমার জীবনকে বিড়ম্বিত করব না।...করলে সুখীও হতে পারব না। একদিন তোমার কাছে সে বোঝা অসহ্য হবে, একদিন তুমিও ঘৃণা করবে—সে ঘৃণা সে অবহেলা আমি সইতে পারব না। তোমার ভালবাসা তোমার শ্রদ্ধাই জীবনে আমার একমাত্র জমা, একমাত্র লাভ। আজ মনে হচ্ছে এই ভালবাসা পাবার জন্যেই সারা জীবন অপেক্ষা করেছি, সারা জীবন তৃষ্ণার্ত হয়ে ছিলাম। সে তৃষ্ণা দূর হয়েছে, অন্তর ভরে গেছে আমার! এই অমৃতস্বাদকে বিড়ম্বনায় তিক্ত করতে চাই না।...তুমি ভেতরে যাও হীরালাল, আমাকে ছেড়ে দাও—'

হীরালাল যেন হাহাকার করে উঠল, 'এ কী বলছ তুমি বেগমসাহেবা, এ সব কী ছেলেমানুষি করছ! তোমাকে আমার বোঝা বলে মনে হবে! এ কথা কেমন করে ভাবতে পারলে তুমি? তোমার জন্যে কোনদিনই জীবনকে বিড়ম্বিত মনে করব না, তুমি বিশ্বাস কর।'

আমিনা উঠে দাঁড়াতে যাচ্ছিল, হীরালাল সজোরে তার হাতটা চেপে ধরল।

'না, ছিঃ!' ছেলেমানুষকে যেমন ভাবে নিরস্ত করে তেমনি ভাবেই ওর আবেগকে প্রতিহত করে হাতখানা ছাড়িয়ে নিল আমিনা। বলল, 'কৃতজ্ঞতা ও করুণায় তুমি জীবনের সত্যকে অস্বীকার করতে চাইছ—কিন্তু আমি তোমার চেয়ে বয়সে অনেক বড়, জগৎকে তোমার চেয়ে ঢের বেশি চিনেছি। তোমার পক্ষে এ একেবারে আত্মহত্যা। এ আত্মদান আমি কিছুতেই নিতে পারব না বাবুজী। তুমি ফিরে যাও—আমি ভিক্ষা চাইছি তোমার কাছে, আমাকে, ভুলে যাও। ভুলতে না পার, ত্যাগ কর। তোমার কাছে, আমার যদি কোন কৃতজ্ঞতা প্রাপ্য থাকে তা আজ আমাকে ত্যাগ করেই শোধ কর। বল, করবে? কথা দাও আমাকে।'

হীরালাল স্তম্ভিতের মত বসে রইল কিছুক্ষণ, তার পর ভগ্নকণ্ঠে বললে, 'তা হয় না বেগমসাহেবা। যতদিন তুমি বেঁচে থাকবে, ততদিন তোমাকে ছাড়তে পারব না—তোমার কল্যাণ-চিন্তা থেকে বিরত থাকতে পারব না।'

'আমি বেঁচে থাকতে আমাকে ছাড়তে পারবে না! তাই তো।'

একটু হাসল আমিনা। শব্দ করেই হাসল। এই আবেগ-গম্ভীর আবহাওয়ার মধ্যে সে হাসি যেন কেমন বেমানান অদ্ভুত বলে মনে হল হীরালালের—সে একটু চমকেও উঠল।

ওধারে শাহ্‌ নজফের ঘুম ভেঙেছে, বহুলোকের কোলাহল শোনা যাচ্ছে সেখানে। সেই সঙ্গে পদশব্দও। কারা যেন এই দিকেই আসছে।

হীরালাল কী বলতে যাচ্ছিল, সম্ভবত এই আসন্ন বিপদের কথাটাই—কিন্তু সহসা আমিনা এক কাণ্ড করে বসল। একটু উঠে ওর সামনে হাঁটু গেড়ে বসে দু হাত দিয়ে হীরালালের মাথাটা কাছে টেনে আনল। সেই ভাবেই দুই হাতের তালুতে ওর দুই গাল নেড়ে আদর করল খানিকটা—একবার কী ভেবে ওর মুখটা নিজের মুখের কাছে নিয়ে এল—তার পরই, বেশ একটু যেন ঠেলেই সরিয়ে দিয়ে একেবারে উঠে দাঁড়াল।

সমস্ত ব্যাপারটাই এমন আকস্মিক, এমন অভাবিত যে হীরালাল কিছুই করতে পারল না। ভাল করে বুঝতে বুঝতেই সবটা ঘটে শেষ হয়ে গেল। তাই তার পরই যখন 'আচ্ছা বাবুজী, তবে তাই হোক। আমিই যাই।' বলে অত্যন্ত দ্রুত ও লঘু পদক্ষেপে সেই ঢালু জমি বেয়ে নেমে চলে গেল আমিনা, তখনও তাকে কোন বাধা দিতে পারল না।

আর সময়ও ছিল না। কারণ বোধ করি চোখের পলকও ফেলবার

আগে চকিতের মধ্যে সে খাদে নেমে নদীর দিকে চলে গেল এবং দেখতে দেখতে কদম রসুলের পাঁচিলের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল। প্রাণপণে চোখ মেলেও তার সেই চাঁপা রঙের ওড়নার আভাসমাত্র আর দেখতে পেল না হীরালাল।

॥ ৬০ ॥

চিঠিখানা আগের দিনই এসেছিল—কিন্তু সেটা আর খোলা হয় নি। তখন অবশ্য খোলার কথাও নয়, কিন্তু তার পরও মনে ছিল না। যুদ্ধের মধ্যেই কে যেন একজন এসে কী-একটা পকেটে গুঁজে দিয়ে গিয়েছিল—অতটা খেয়ালও করে নি। একেবারে শেষ রাত্রে বিউগলের আওয়াজে ঘুম ভেঙে উঠে বসে পাইপটার জন্য পকেটে হাত দিতেই খামখানা হাতে ঠেকল। তখন মনে পড়ল চিঠি এসেছে, আর তাতে সম্ভবত কনস্ট্যান্সের খবরই আছে। হয়তো সে নিজেই লিখেছে। গত সপ্তাহে চিঠি এসেছিল এক হাসপাতাল থেকে—কনির অসুখ, সে সেই হাসপাতালে আছে—এক নার্স সেই খবরটা দিয়েছিল। সামান্য অসুখ, ভয়ের কোন কারণ নেই—তবু নিজে হাতে লিখতে অকারণ বেশী পরিশ্রম করতে হবে বলে নার্স লিখতে দেয় নি—এই কথাই ছিল তাতে।

হোপ চিঠিখানা হাতে নিয়ে অসহায় ভাবে এদিক-ওদিক তাকাল। আলো নেই—আগুন যা ছিল সব নিভে গিয়েছে। শীতের শেষ রাত্রি কুয়াশায় ভরা আলোর আভাস মাত্র নেই আকাশে।

কোথাও কি আগুন নেই?

এদিক-ওদিক তাকাতে নজরে পড়ল—দূরে এক জায়গায় একটা আগুনের ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। অগত্যা উঠে কোনমতে বেল্ট্‌টা এঁটে সেই দিকেই চলল সে। কাজটা খুব সহজ নয়, কারণ মাথা ছিঁড়ে পড়ছে তখন, মনে হচ্ছে সেখানে বিশ হন্দর ওজনের একটা পাথর কে চাপিয়ে রেখেছে। তার ফলে চোখটাও ভাল করে চাইতে পারছে না। কাল সারাদিন যেমন অমানুষিক পরিশ্রম গেছে—সেই মাপেই মদ খেয়েছে সে বলতে গেলে সারারাত—মাথার আর অপরাধ কী!

তবু—উঠতেই হবে। এখনই বিউগল্ বাজবে, প্রস্তুত হতে হবে আর

একটি ভয়াবহ দিনের জন্য। শেষ রাত্রেই শুরু হবে লড়াই—কাল ক্যাপ্টেন ডসন বার বার বলে দিয়েছেন।

আগুনটার কাছে গিয়ে হোপ দেখল—সেটাতে তখনও বিস্তর কাঠ আছে, সম্ভবত আগুনটা নতুনই জ্বালা হয়েছে, শেষ রাতের দিকে। পাশেই কে একজন আগাগোড়া একটা এই-দেশী ছিটের 'রেজাই' গায়ে মুড়ি দিয়ে ঘুমোচ্ছে। কে জানে কেন ওর শুয়ে থাকার ভঙ্গিতে হোপের বড় হাসি পেল।

সে কাঠগুলো ঠেলেঠুলে দিয়ে—আশেপাশে যা দু-কটা শুকনো পাতা পড়ে ছিল সেগুলোও কুড়িয়ে ওর মধ্যে গুঁজে দিয়ে আগুনটা বেশ জাঁকিয়ে তুলল! ততক্ষণে চোখের অবস্থাটাও অনেকখানি সহজ হয়েছে। সে খামখানা আলোর কাছে তুলে ধরল। না, কনির হাতের লেখা নয়—একেবারেই অপরিচিত হস্তাক্ষর।

একটু বুকটা ছাঁৎ করে উঠল বৈকি!

কিন্তু পরক্ষণেই মনে জোর আনল হোপ। সামান্য অসুখ—নার্স বেশ স্পষ্ট করেই লিখেছিল। এ বোধ হয় অপর কারুর চিঠি। কিন্তু তাকেই বা আর কে চিঠি লিখবে ছাই! কেউ তো কোনদিন লেখে না তাকে।...খামখানা হাতে নিয়ে আরও মিনিট দুই চুপ করে বসে রইল সে। কৌতূহল, আর কিছুটা বিস্ময় তো আছেই—যেন সেই সঙ্গে কেমন একটা ভয়ও বোধ করছে। চিঠিটা খুলতে যেন কিছুতেই ভরসা হচ্ছে না।

পাশে যে লোকটা লম্বা হয়ে ঘুমোচ্ছিল সে এর মধ্যে একটু আড়মোড়া ভাঙল। কী যেন ঘুমের ঘোরেই বলল জড়িয়ে জড়িয়ে। কিন্তু লেপ মুড়ি থাকায় তার কিছুই বোঝা গেল না। আবার হাসি পেল হোপের, আর সেই সঙ্গেই মনের দ্বিধার ভাবটাও কতকটা কেটে গেল। সে সোজা হয়ে বসে খামখানা ছিঁড়ে চিঠিটা বার করে আলোর কাছে ধরল।

কিন্তু তার পরও অনেকক্ষণ সেটা সেইভাবে ধরেই বসে রইল হোপ। যেন চিঠিটার মাথামুণ্ডু কিছুই বোধগম্য হচ্ছে না—অথবা যেন কোন সম্পূর্ণ অপরিচিত ভাষায় লেখা সে চিঠি।

কে লিখেছে এ চিঠি? কারা এরা? কী লিখেছে? কার কথা লিখেছে?

কাগজখানার মাথায় কী একটা শিরোনাম ছাপা রয়েছে—কী যেন উদ্ভট নামের এক অ্যাটর্নীর ফার্ম। অনেক চেষ্টার পর অন্তত তাই মনে হল

ওর। কিন্তু ওর সঙ্গে কী সম্পর্ক এদের? কী লিখেছে—কী যেন··· কন্স্ট্যান্স মারা গেছে? তার শেষ ইচ্ছানুসারে ওকে জানানো হচ্ছে খবরটা? তার সব সম্পত্তি এবং মাসোহারা সে হোপকেই দিয়ে গেছে? হোপের অ্যাটর্নীদের নাম-ঠিকানা পেলে এরা সে সব হিসাব-নিকাশ বুঝিয়ে দিতে রাজী আছে?

কী লিখেছে এসব ছাই-ভস্ম মাথামুণ্ডু?

আবারও একবার পড়ল চিঠির গোড়ার দিকটা।

মাত্র সাত দিনের জ্বরে মারা গেছেন্ কন্স্ট্যান্স। কী যেন একটা উদ্ভট নামের জ্বর—আরে, এ জ্বর হবেই বা কেন কন্স্ট্যান্সের?

বিমূঢ়ের মত তাকায় হোপ চারিদিকে।

দূরে কোথায় বিউগল্ বাজছে না? না কি তাদেরই এখানে? প্রস্তুত হবার ইঙ্গিত? যুদ্ধের জন্য, মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হবার আহ্বান? মৃত্যু-মহোৎসবের বাঁশি?

পাশে যে লোকটা ঘুমোচ্ছিল সে বিউগলের শব্দে ধড়মড়িয়ে উঠে বসেছে ইতিমধ্যে, বোকার মত তাকাচ্ছে এদিক-ওদিক। তার দিকেও।

বিলি মিচেল। কোথা থেকে বুঝি কোন্ এক মরা সিপাহীর লেপ যোগাড় করেছে। মৃতের সম্পত্তি।—কিন্তু ওর তো অ্যাটর্নীর প্রয়োজন হয় নি!

অকস্মাৎ বড় হাসি পেল হোপের। সমস্ত পেটে মোচড় দিয়ে যেন কুলকুল করে হাসি বেরিয়ে আসছে তার। সে হো হো করে হেসে উঠল। হাসতে হাসতে পেট চেপে ধরে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

বিলি আগে ওকে চিনতে পারে নি। কিছু বুঝতে পারে নি প্রথমটা। কারণ মাত্র একঘণ্টা আগেই শুয়েছে সে। অনেক হৈ চৈ হয়েছে, অনেক খোঁজাখুঁজি—বারুদগুলো পাহারা দেবার ব্যবস্থা—সব সেরে এই লেপটা যোগাড় করে শুতে একেবারে শেষ রাত্রিই হয়ে গেছে। ফলে চোখটাই ভাল করে খুলতে পারছে না—এমন অবস্থা ওর।

কিন্তু হোপের এই উৎকট হাসিতে ওর জড়তা কেটে গেল।

আরে, কে এ লোকটা এমন করে পাগলের মত হাসছে?

আরও ভাল করে তাকিয়ে চিনতে পারল—হোপ!

সত্যিই পাগল হয়ে গেল, না মাতলামি করছে? সারারাত মদ খেয়েছে বুঝি?

'এই হোপ, ও কী করছ! আরে, ওকি, অত হাসছ কেন? কী হয়েছে?' কাছে এসে ওর কাঁধটা ধরে নাড়া দেয় বিলি।

তবু কথা কইতে পারে না হোপ। অনেকক্ষণ ধরে চেষ্টা করেও না।

থামতে চেষ্টা করে, একটু সংযত হয়ে আসে, আবার প্রচণ্ডতর এক হাসির ধমকে লুটিয়ে পড়ে মাটিতে—

'এই, কী হচ্ছে, শান্ত হও। তৈরী হয়ে নাও, রোল-কল হবে যে এখনই, বিউগল্ বেজে গেছে শোন নি?' বিলি ওকে প্রকৃতিস্থ করবার চেষ্টা করে প্রাণপণে—ওর যেন কেমন ভয় করতে থাকে।

অবশেষে হোপ খানিক সামলে নেয়, অনেক চেষ্টায়।

উঠে বসে ওর দিকে কিছুক্ষণ সকৌতুকে তাকিয়ে থেকে বলে, 'ভারি মজা হয়েছে শোন নি? কন্‌স্ট্যান্স মারা গেছে—কী যেন একটা জ্বর হয়েছিল ওর, সে এক মজার নাম—তাইতেই মারা গেছে। সাত দিনে। আর জান? ওর সব টাকাকড়ি আমাকে দিয়ে গেছে। ওর অ্যাটর্নী আমার অ্যাটর্নীর নাম জানতে চেয়েছে—বুঝিয়ে দেবে বলে। আচ্ছা বল, এর চেয়ে মজার খবর আর কিছু হতে পারে?'

সে আবারও বিপুল এক হাসির ধমকে লুটিয়ে পড়ে মাটিতে।

বিলি স্তম্ভিত হয়ে গেছে তখন। প্রবল শোকের এই উন্মত্ত অভিব্যক্তির সামনে সান্ত্বনা দেবার মত একটি কথাও সে খুঁজে পেলে না। এ হাসির মত করুণ জিনিস বোধ হয় কিছুই দেখে নি সে—তার এই অল্প ক'বছরের জীবনে। এ ব্যাপারে তার কোন অভিজ্ঞতাই নেই। এক্ষেত্রে কী করা উচিত, কী বললে শান্ত হবে লোকটা—তা কিছুই বুঝতে না পেরে অভিভূতের মত দাঁড়িয়ে রইল শুধু।

অবশেষে আর একটা বিউগল্ বাজতে হোপ নিজেই খানিকটা প্রকৃতিস্থ হল যেন। উঠে বসল সে। বিলির দিকে তাকিয়ে বলল, 'ও, রোল-কল হবে এইবার, না? চা দেবে না ওরা একটু? চা আর রেশন? আমার বন্দুকটা কোথায়? ও, রেখে এসেছি বুঝি ওখানে? কোথায় ছিলুম বল তো? কোন্‌দিক থেকে এসে পড়েছিলাম? তুমিও তো জান না ছাই! চিঠিটা পড়তে আলোর খোঁজে এখানে এসেছিলাম।......এই চিঠিটা—মজার চিঠি, না?'

আবার হাসিতে ফেটে পড়ল সে।

হো-হো—হা-হা—! প্রচণ্ড হাসি।

তার পর তেমনি হাসতে হাসতেই এক হাতে কোমরের কাছে বেল্ট্টা আর এক হাতে চিঠিখানা ধরে ছুটে চলে গেল সে একদিকে।

সেদিন রাত্রিশেষে আবার যখন প্রচণ্ড লড়াই শুরু হল—তখন ইংরেজবাহিনী আর যাই হোক মত্তপ ও লম্পট হোপের এই অসামান্য বীরত্বের জন্য প্রস্তুত ছিল না। প্রায় সকলেই চোখ রগড়ে তাকাল একবার করে—ঠিক দেখছে তো তারা? হোপই তো বটে ঐ লোকটা—যে বেছে বেছে সবচেয়ে যেখানে বিপদ্ সেইখানেই এগিয়ে যাচ্ছে, সর্বাপেক্ষা যেখানে অগ্নিবৃষ্টি সেই দিকে গিয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়াচ্ছে? হোপই তো—না আর কেউ?

কিন্তু সন্দেহের কোন কারণ নেই। কেন না, শুধু যে ওর হাত চলছে তাই তো নয়—মুখও যে চলছে। অমন অশ্রাব্য অশ্লীল গালিগালাজ আর কারুর মুখ দিয়ে সহজে বেরোয় না। লোকটা নিশ্চয়ই ভোরবেলাই মদ গিলেছে খানিকটা।

অসহ্য সে-সব গালিগালাজ। হোপ আজ যেখানে যাচ্ছে বহুদূর অবধি বাতাস যেন বিষাক্ত করে দিচ্ছে। অবশেষে আর থাকতে না পেরে ক্যাপ্টেন তাকে সতর্ক করতে গেলেন, 'দেখ বাপু, লড়াই করছ কর—অত মুখ-খারাপ করছ কেন? আর যাই হোক অশ্লীল গালিগালাজটা যুদ্ধের অঙ্গ নয়!'

হোপ রক্তচক্ষুতে তাঁর দিকে তাকিয়ে তাঁকেই গালাগাল দিয়ে উঠল বিশ্রী ভাষায়। বললে, 'যা পার কর গে—তোমার মত ক্যাপ্টেন আমি ঢের ঢের দেখেছি। তোমাকে আমি এক তিল পরোয়া করি না। যমকেই পরোয়া করি না, তা তুমি। দেখছ না একটা গুলিও আমাকে বিঁধতে পারছে না!'

এই বলে উদ্ধতভাবে হা হা করে হেসে উঠে ছুটে চলে গেল আরও সামনের দিকে।

ক্যাপ্টেনের মুখচোখ লাল হয়ে উঠল এই ঔদ্ধত্যে ও ধৃষ্টতায়। তিনি বিলি মিচেলের দিকে ফিরে বললেন, 'এই, তোমরা জন-দুই লোক ওকে ধরে পেছনে নিয়ে যাও তো। ওকে কয়েদখানায় রাখবার হুকুম দিলাম। যুদ্ধের সময় মাতলামি করা অমার্জনীয় অপরাধ।'

পাশেই ছিল ম্যাকলিয়ড়—সে আস্তে আস্তে বললে, 'মাপ করবেন ক্যাপ্টেন

কিন্তু মদ ও খায় নি—ওর নিয়তিই ঘনিয়ে এসেছে। আসলে ও আত্মহত্যা করতেই চায়।’

‘তাই নাকি! কী করে জানলে?’ ক্যাপ্টেন ডসন কৌতূহলী হয়ে ওঠেন।

ম্যাকলিয়ড বললে, ‘এ জিনিস আমি চিনি ক্যাপ্টেন, অনেক দেখেছি। মৃত্যু ওকে টেনেছে, এ সেই চেহারা!’

‘ও তোমার অনুমান!’ বলে ডসন উড়িয়ে দিচ্ছিলেন কথাটা। কিন্তু তার আগেই এগিয়ে এল বিলি মিচেল। সে ছোট্ট একটা অভিবাদনের ভঙ্গি করে বললে, ‘পাইপ-মেজর ম্যাকলিয়ড় ঠিকই বলেছে ক্যাপ্টেন, ও আত্মহত্যারই চেষ্টা করছে। কাল খবর এসেছে ওর প্রণয়িনী বা ওর বাগ্‌দত্তা মারা গেছে। সে চিঠি কাল খুলতে পারে নি—আজ ভোরে পড়েছে, তার পর থেকেই অমনি পাগলের মত হয়ে উঠেছে!’

‘তাই নাকি! কে, সেই যে মেয়েটা ওকে মদ খাবার টাকা যোগায়? হ্যাঁ, হ্যাঁ, শুনেছি কে যেন ওর আছে, কন্‌স্ট্যান্স না কী যেন নাম। সে মারা গেছে?’

‘হ্যাঁ ক্যাপ্টেন। কনস্ট্যান্সই তার নাম বলেছিল ও।’

‘বাই জোভ্‌।...ঐ লোকটার মধ্যে এত প্রেম ছিল তা কে জানত!...তা হলেও তো ওকে সরিয়ে আনা দরকার। মিছিমিছি আত্মহত্যা করতে দেওয়া ঠিক নয়। তোমরা কেউ—’

কিন্তু ক্যাপ্টেন ডসন তাঁর কথাটা শেষ করবার সময় পেলেন না। এরমধ্যেই হোপ যখন একটা উঁচু ঢিপিতে লাফিয়ে উঠেছিল, সকলের মাথা ছাড়িয়ে উঠেছিল হাঁটু পর্যন্ত ওর গোটা দেহটা। তাই শত্রুপক্ষের লক্ষ্য ভ্রষ্ট হবার কোন উপায় ছিল না। সে উঠে দাঁড়াতে না দাঁড়াতে একটা ছোট গোলা এসে লাগল ওর পেটে—এবং তাইতেই পেট ফেটে নাড়ি-ভুঁড়িগুলো বেরিয়ে একেবারে ওর হাঁটুর কাছে এসে ঝুলে পড়ল। আর সে ধাক্কা সাম্‌লাবার আগেই আরো দুটো গুলি প্রায় এক সঙ্গে এসে বিঁধল ওর বুকে। একটা আর্তনাদ, এমন কি একটা শব্দও করবার সময় পেল না লোকটা—মুহূর্তের মধ্যে তার প্রাণহীন দেহটা গড়িয়ে পড়ল ঢিপি থেকে।

॥ ৬৯ ॥

স্বল্প কয়েকটি নিমেষের জন্য সকলেই স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। আত্মহত্যারই রূপান্তর এই বীভৎস মৃত্যু—কদর্য জীবনের এই শোচনীয় পরিসমাপ্তি দেখে অল্পক্ষণ সকলেরই একটা চিত্তবৈকল্য ঘটেছিল—কিন্তু তার পরই এগিয়ে যেতে হল সবাইকে। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ভাববিলাসের অবসর থাকে না। মরছে চারিদিকেই—বন্ধু, সহকর্মী, স্বদেশবাসী সকলেই—কে কার জন্য শোক করবে! কে কতক্ষণ আছে তাই বা কে জানে। যে এই মৃত্যু দেখে বিচলিত হচ্ছে—আরও কোন ভয়াবহ মৃত্যু তার নিজের অদৃষ্টেই আছে কিনা কে বলবে। ওসব দিকে তাকালে চলবে না। গোলা এবং গুলি বৃষ্টির মত বর্ষিত হচ্ছে—মৃত্যু-বর্ষণই বলা যায় তাকে। এ পক্ষের কামান অল্প, তাদের শক্তিও সামান্য। সামনের পাষাণ-প্রাচীর ভাঙবার পক্ষে মোটেই পর্যাপ্ত নয়। বার বার পাঁচিল ডিঙিয়ে ভেতরে যাবার চেষ্টায় এদের লোকই বেশি মরছে।

সবাই চলে গেল—কেবল যেতে পারল না বিলি মিচেল। হোপ লোকটাকে সে কখনই প্রীতির চোখে দেখে নি, মাতাল বলে দুর্বৃত্ত বলে ঘৃণাই করছে বরাবর—তবু আজ ওর ঘৃণিত জীবনেরই এই পরিসমাপ্তি দেখে বিচলিত না হয়ে পারল না। সকাল থেকে আরও কয়েকটা মৃত্যু দেখেছে; ঘনিষ্ঠ বন্ধু গেছে, এক বালক পড়ল চোখের সামনে—তার ওপর এই হোপ। পর পর কটা আঘাত কয়েক মিনিটের মত বিলিকে যেন স্থাণু করে দিল।

তবু উঠতেই হবে। পিছনের যারা আগে চলে যাচ্ছে, ডেকে যাচ্ছে ওকে। বিপদকে আগু বেড়ে বরণ করার সে আহ্বানে সাড়া না দিলে পৌরুষ লজ্জা পায়। মিচেলও উঠে দাঁড়াল। দুঃখ—না হোপের জন্য দুঃখ নয়। মানুষের পরিণাম দেখে দুঃখিত ও। আর সে পরিণাম স্বেচ্ছা-বৃত বলেই আরও দুঃখ। হোপের মত শিক্ষিত তরুণের সামনে ওপরে ওঠবার ও নীচে নামবার দুটো পথই খোলা ছিল। প্রথমটা ঈষৎ আয়াস-সাধ্য বলেই হয়তো ছেড়ে দিয়েছিল সে—বেছে নিয়েছিল সহজ পথটা। নিজের প্রবৃত্তির কাছে দাসখৎ লিখে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছিল। কিন্তু তাতেই কি সুখী হতে পেরেছিল সে…?

থাক সে কথা। যুদ্ধে যেতে হবে এখন ওকে। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ঘুরে দাঁড়াল মিচেল। কিন্তু সে যাবার আগেই কে একজন ওদিক থেকে সবাইকে ঠেলে ধাক্কা দিয়ে এদিকে এগিয়ে এল।

এ সময় এ আচরণে বিস্মিত হবারই কথা। আরও বিস্মিত হল মিচেল লোকটার দিকে তাকিয়ে।

কোয়েকার ওয়ালেস!

'একি শুনছি, পাপিষ্ঠটা নাকি মরেছে শেষ পর্যন্ত?...ও, এই যে।'

কয়েক জনকে ঠেলে সরিয়ে একেবারে সামনে এসে দাঁড়াল সে। যে দৃশ্য থেকে সকলেই চোখ ফিরিয়ে চলে যাচ্ছে, সেইটেই ভাল করে তাকিয়ে দেখতে লাগল। যেন নিজের চোখে দেখে নিশ্চিন্ত হতে চায়।

কিন্তু মৃত্যুর সামনে এসে দাঁড়িয়েও তো ওর চোখ থেকে ঘৃণা যায় নি। প্রবল ঘৃণা আর অমানুষিক বিদ্বেষ। হোপের মৃত্যু-বিবর্ণ পাণ্ডুর বিকৃত মুখের দিকে চেয়েও তো দৃষ্টি কোমল হল না ওর—কিংবা মুখের রেখায় এতটুকু সহানুভূতি কি অনুশোচনা প্রকাশ পেল না! বরং মনে হতে লাগল অনেক দিন পরে পরিপূর্ণ একটা তৃপ্তির কারণ ঘটেছে, এই ভয়াবহ দৃশ্য উপভোগই করছে সে।

লোকটা কি পিশাচ?

বিলি মুখ ফিরিয়ে চলে যাচ্ছিল, হঠাৎ ওয়ালেস আবার কথা কইলে।

মনে হল ওঁকেই উপলক্ষ করে বললে, 'এই লোকটা এককালে আমার বন্ধু ছিল।...তবু ওর এই অবস্থা দেখব বলেই সেনাদলে নাম লিখিয়েছিলাম আমি, ওর সঙ্গে সঙ্গে সারা পৃথিবী ঘুরেছি। এতদিনে সে আশা মিটল!'

তারপর আস্তে আস্তে যেন কতকটা অনিচ্ছাতেই হাত তুলে ক্রুশচিহ্ন আঁকলে নিজের মাথায় আর বুকে।

এর পর ওয়ালেসও যেন ক্ষেপে উঠল। সে এগিয়ে গেল সকলের আগে—প্রথম সারিতে। বেছে বেছে কামানের সামনে গিয়েই দাঁড়াতে লাগল সে। যেখানে শত্রুর দল ঘনীভূত—সেখানেই গিয়ে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে, মরীয়া বেপরোয়া ভাবে। হোপেরই মত মরীয়া, সেই রকমই বেপরোয়া—কেবল ওয়ালেসের মুখে অশ্লীল ভাষা বা গালিগালাজ ছিল না—ছিল বাইবেলের স্তোত্র। উচ্চৈঃস্বরে সেই স্তোত্র গাইতে গাইতে উন্মত্তের মত এগিয়ে যাচ্ছে

শত্রুর সামনে—উন্মত্তেরই মত শত্রুনিধন করছে সে। একা তার বন্দুকেই কুড়ি-পঁচিশটি দুশমন ঘায়েল হল সেদিন—কিন্তু তবু তার শ্রান্তি নেই, ক্লান্তি নেই—বিরতি নেই।

হয়তো মৃত্যুই চাইছিল সে হোপের মত, আত্মহত্যার উপায় খুঁজে বেড়াচ্ছিল। কিন্তু কোন্ এক দুর্জ্ঞেয় কারণে মৃত্যু হল না, বরং মনে হল সঙ্গীনধারী ওর সেই কালান্তক মূর্তি দেখে স্বয়ং কালই ভয় পেয়ে পালিয়ে গেল।

অবশেষে একসময় যুদ্ধবিরতির বাঁশি বাজল। যে প্রাসাদভবনের জন্য এই প্রচণ্ড লড়াই চলছিল সে প্রাসাদ ইংরেজপক্ষের হস্তগত হয়েছে, শত্রুরা পালিয়েছে ওদিক দিয়ে—আপাতত কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেওয়া যেতে পারে। পরে আবার নতুন কোন ঘাঁটির দিকে অভিযান করতে হবে হয়তো—তবে তার কিছু বিলম্ব আছে।

এইবার ওয়ালেস কিছুটা আত্মসংবরণ করল। এতক্ষণ ছিল মরণের নেশায় আচ্ছন্ন, তাই নিজের দেহটার দিকে তাকাবার অবসর হয় নি, সে সম্বন্ধে কোন অনুভূতিই ছিল না ওর—কিন্তু এইবার যেন সব কটা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ভেঙে পড়তে চাইল, সব চেয়ে বেশি কষ্ট হতে লাগল তৃষ্ণায়, বুক অবধি যেন শুকিয়ে গেছে।

জল চাই একটু—এখনই।

ভাগ্যক্রমে বাগানের মধ্যে ঢুকতেই প্রথম যে দৃশ্য ওর চোখে পড়ল তা হচ্ছে প্রকাণ্ড একটা পাকুড় গাছের নীচে সার সার মাটির জালা বসানো। তাতে যে জলই আছে তা একবার সেদিকে তাকালে আর সন্দেহের অবকাশ থাকে না। মাটির পাত্র—অনেকক্ষণ জল থাকায় বাইরেটা পর্যন্ত ভিজে উঠেছে।

সুশীতল, সুমিষ্ট, সুপেয় জল। তৃষ্ণার্তকে পাগল করার পক্ষে এ দৃশ্য যথেষ্ট। ওয়ালেস পাগলের মতই দৌড়তে গেল। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে কে যেন ওর কনুইটা ধরে পেছনে টানল। ভীষণ ভ্রূকুটি করে মুখ ফেরাল ওয়ালেস—দেখল বাধাদানকারী স্বয়ং ক্যাপ্টেন।

'আস্তে বন্ধু—আস্তে।' ডসন বললেন, 'একবার ভাল করে তাকাও তো গাছতলাটায়—মৃতদেহগুলো লক্ষ্য করে দেখ তো!'

ওয়ালেস বিস্মিত হয়ে তাকাল—কিন্তু চাইবার সঙ্গে সঙ্গেই ডসনের প্রশ্নটা বুঝতে পারল সে। ইংরেজ-বাহিনী তো মাত্র কিছু আগে এখানে ঢুকেছে,

ভেতরে আসবার পর তেমন যুদ্ধও হয় নি—তবে এত শ্বেতাঙ্গ এর মধ্যে মরল কী করে ? আর, এখানেই !

ডসন বললেন, 'চারিদিকে কোথাও তো ইংরেজের মৃতদেহ বিশেষ নেই—শুধু এখানেই এত এল কোথা থেকে ? আরও একটা জিনিস দেখছ—অধিকাংশেরই মাথাতে বা কপালে গুলি লেগেছে। গাছটা একটু ভাল করে লক্ষ্য কর দেখি—ওপরে কেউ আছে কিনা। কে জানে এই সার সার জলের জালা—এ হয়তো একটা ফাঁদই—'

ওয়ালেস ও ডসন দু জনেই ওপর দিকে তাকাল।

ঘনপল্লব বিরাট গাছ। প্রথমটা কিছুই চোখে পড়ল না। আরও ভাল করে কিছুক্ষণ দেখার পর ওয়ালেসের চোখে পড়ল সাদা-মত একটা কি। সাদা শঙ্খচিলও হতে পারে—সাদা পোশাকের প্রান্ত হওয়া'ও অশ্চর্য নয়।

ক্ষুধা-তৃষ্ণা-শ্রান্তিতে অধীর অসহিষ্ণু ওয়ালেসের আর বেশি ভাল করে দেখার মত অবস্থা নয়। সে বিনা বাক্যব্যয়ে বন্দুকটা তুলে নিয়ে সেই শ্বেত-বিন্দুটা লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ল।

অব্যর্থ লক্ষ্য ! সঙ্গে সঙ্গেই একটি দেহ ওপর থেকে পত্র পল্লব শাখা কাঁপিয়ে দুলিয়ে শব্দ করে মাটিতে এসে পড়ল।

ডসনই প্রথম লক্ষ্য করলেন।

'মাই গড্ !...এ যে স্ত্রীলোক !'

এবার ওয়ালেসেরও চোখে পড়ল—ওড়নাটা কোমরে বাঁধা কোমরবন্ধের মত, সম্ভবত তারই খাঁজে কার্তুজের থলি, হাতে একটা বন্দুক।

কিন্তু তবু স্ত্রীলোকই—তাতে কোন সন্দেহ নেই।

বারুদের গুঁড়ো, ধুলো, অনাহার, স্নানের অভাব—নানা কারণে সে উজ্জ্বল গৌর কান্তির কিছুই আর প্রায় অবশিষ্ট নেই ; মুখেরও অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে গত ক বছরে, বিস্তর রেখা পড়েছে সেই আশ্চর্য ললাটে—কিন্তু তবু ওয়ালেসের চিনতে বিলম্ব হয় না। এত ধুলো, এত কালি, এত রূপান্তরও সে অনিন্দ্য লাবণ্য সম্পূর্ণ নষ্ট করতে পারে নি—শীত-মধ্যাহ্নের ঈষৎ ধূসর আলোয় সে দেহ আজও যেন বিভ্রান্তির সৃষ্টি করছে—রক্তমাখা সে তনু রক্তচন্দনমাখানো পদ্মের মতই অপরূপ মনে হচ্ছে।...

দুই চোখ বিস্ফারিত করেই চেয়ে রইল ওয়ালেস, চোখে পলক নেই... পাষাণের মতই স্থির, নিস্পন্দ হয়ে গেছে সে।

তার মুখের ভাব দেখে ভয় পেয়ে গেলেন ডসন—কাঁধ ধরে ঝাঁকানি দিতে দিতে ডাকতে লাগলেন—'ওয়ালেস। ওয়ালেস!'

এইবার চোখে পলক পড়ল—বোধ হয় দুই চোখ জ্বালা করে জল ভরে এসেছিল বলেই পড়ল। সেই শীর্ণ, রুক্ষ, কর্কশ গাল বেয়ে অবিরলধারায় সে জল ঝরতে লাগল—তারই মধ্যে অস্ফুট ভগ্নকণ্ঠে বললে, 'আমিনা!...আমিই তোমাকে মারলাম শেষ পর্যন্ত।...এই জন্যই কি আবার ভারতে এসেছিলাম! হা ঈশ্বর!'

তার পর আস্তে আস্তে সেইখানেই আমিনার মৃতদেহের পায়ের কাছে মাটিতেই বসে পড়ল সে।

ডসন কিছুই বুঝতে পারলেন না, আর সেই জন্যই বাধা দেওয়া বা সান্ত্বনা দেওযারও কোন চেষ্টা করতে পারলেন না—শুধু বিস্মিত হয়ে চেয়ে দেখলেন, এতকাল যে মানুষটিকে নির্মম, কঠোর, ইস্পাতের মতই অনমনীয় বলে জানতেন, সেই মানুষটিই সহসা আজ এক অপরিচিতা, বিদেশিনী, শত্রু-নারীর পায়ের ওপর বিহ্বল হয়ে ভেঙে পড়ল!

॥ ৭০ ॥

যুদ্ধ এমন একটা অবস্থা যা মানুষকে ভেঙে পড়তে দেয় না। কারণ তার মধ্যে কোথাও থামবার কি থমকে দাঁড়াবার কোন অবসর নেই। দুঃখ শোক বেদনা—এগুলো অনুভব করবার বা তাতে বিহ্বল হবারও একটু সময় দরকার। সেটুকু সময়ও যুদ্ধক্ষেত্রে নেই। মরা, অথবা সজাগ সতর্ক সক্রিয় থাকা, এ দুটোর মাঝামাঝি কোন অবস্থা নেই সেখানে।

ওয়ালেসও ভেঙে পড়বার অবসর পেল না। অপরাহ্নে আবার নতুন এক ঘাটি আক্রমণ করা হল—বাধল প্রচণ্ড লড়াই। ওয়ালেসকেও তার সেই ভেঙে-পড়া, প্রায় টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়া দেহটাকে টেনে তুলে বন্দুক হাতে দাঁড়াতে হল এসে, মানুষ মারবারও চেষ্টা করতে হল যথারীতি। এ-বেলা ওর মধ্যে আর সেই দুঃসহ তেজের কিছুই অবশিষ্ট নেই—দু-তিন ঘণ্টার মধ্যে যেন বৃদ্ধ হয়ে পড়েছে লোকটা—তবু দাঁড়িয়ে রইল ঠিকই, এগিয়েও গেল সময়-মত। একেবারে লড়াই যে না করল তাও নয়—মানুষও

যথানিয়মেই মারা পড়ল দু-চারটে তার হাতে—কিন্তু চলা-ফেরা, বন্দুক ছোড়া সব কাজই করে গেল সে যন্ত্রের মত। মুখভাবে যেমন বেদনার পরিচয় নেই, তেমনি অন্য কোন হৃদযাবেগের আভাসও তা থেকে বোঝা যায় না—শান্ত উদাসীন সে মুখ। কোন কিছুতে অভীপ্সা বা বিতৃষ্ণা কিছুই তার নেই—এ পৃথিবীর কোন অনুভূতিই হয়তো তাকে স্পর্শ করবে না আর কোন দিন।

শুধু একটা কথা তখনও মনে ছিল—সেটা হীরালালেব কথা।

দুঃখের দিনে মানুষ অভাবনীয় বন্ধুলাভ করে। কে যে তার যথার্থ বন্ধু, বিপদের অংশভাগী, সেটা সুখেব দিনে বোঝা যায় না—দুঃখের দিনেই আসল বন্ধুটি এসে পাশে দাঁড়ায়—অপ্রত্যাশিত পথ ধরে।

হীরালালকে আজ ওর সেই রকম বন্ধু বলেই বোধ হচ্ছে। তাকে খুজে বার করা দরকার। আজ প্রথম দেখেছে তাকে, হয়তো আগেও দেখেছিল, অতটা লক্ষ্য করে নি—কিন্তু দেখার সঙ্গে সঙ্গেই জেনেছে—সম্পূর্ণ অপবিচিত বিদেশী বিধর্মী এই তরুণ বালকটিই এ বিশাল পৃথিবীতে তাব একমাত্র ব্যথার-ব্যথী—শোকের দুঃখের অংশভাগী।

সেটা বিস্ময়ের কথাও বটে এবং কৌতূহলেবও।

আজকের সব দুঃখ সব ব্যথা সমস্ত মানসিক বিবর্ণতার মধ্যেও কৌতূহলটা জেগে আছে মনে। এতটা বিস্মিত জীবনে আর কোনদিন হয় নি ওযালেস, ওর মত আশ্চর্য আর কেউ কখনও হয়েছে কিনা সন্দেহ।

শোকের প্রথম আবেগটা কেটে গেলে যখন ক্যাপ্টেন ডসনের অনুরোধে কোন এক সহকর্মী ওর মুখের কাছে জলের পাত্র এনে ধরেছে—তখনই হীরালালকে প্রথম দেখলে ও। তাকে দেখে সবাই বিস্মিত, সকলেই প্রশ্ন করেছে, 'বাবু, বাবু, তুমি এখানে কেন?...লড়াইএর জায়গায় তুমি কেন?... ফিরে যাও, ফেরো—নইলে হয়তো কযেদ হয়ে যাবে।' কিন্তু কারুর কথায় কান দেয় নি সে, কারুর দিকে ফিরেও তাকায নি—সবাইকে ঠেলে সরিযে ছুটে এসে আমিনার দেহেব ওপর আছড়ে পড়েছে!

পাগলের মত কেঁদেছে আর কপাল চাপড়েছে। আমিনার পায়ে মুখ ঘষেছে।

কী বলছিল ও।

বুঝতে পারে নি ওয়ালেস—ও বলছিল, 'আমার জন্যেই তুমি প্রাণটা দিলে বেগমসাহেবা, আমার জন্যেই! আমি তোমার ঋণের খুব শোধ

দিলুম! তুমি বার বার আমায় বাঁচিয়েছ—আর আমিই তোমার মৃত্যুর কারণ হলুম!'

কিন্তু তার মুখের কথা না বুঝলেও শোকের প্রচণ্ডতা ভুল বোঝবার কারণ নেই। সেটা দিনের আলোর মতই স্পষ্ট।

যে ছেলেটি ওকে জল এনে দিয়েছিল—এক কর্পোরাল, সে গিয়ে ওকে তুলে ধরলে, বোঝাবার চেষ্টা করতে লাগল, 'হীরালাল, হীরালাল চ্যাটারজি, প্লীজ প্লীজ—শান্ত হও, স্থির হও। কী ব্যাপার বুঝিয়ে বল।'

হীরালাল তার দিকে ফিরেও চাইল না। মুখই তোলাতে পারল না সে কর্পোরাল।

শেষ পর্যন্ত আশ্চর্য উপায়ে শান্ত করলে ওয়ালেসই। কী মনে হল ওর,—কেন মনে হল কে জানে, হয়তো ঈশ্বরই ওকে দিয়ে করালেন এবং বলালেন সব—সে কাছে গিয়ে হীরালালের কাঁধে হাত দিয়েই পরিষ্কার হিন্দী ভাষায় বললে, 'বাবু, তুমিও এঁকে ভালবাসতে? ... তাই শোক করছ?...কিন্তু আমাকে দেখে তুমিও শান্ত হও।..জেনে রাখ আমার চেয়ে এঁকে কেউই ভালবাসত না, ভালবাসতে পারে না—এঁর জন্য আমার সমস্ত জীবন শ্মশান হয়ে গেছে—আত্মীয় স্বজন দেশ ভুঁই সব ছেড়েছি—তবু দেখ আমি তো কেমন স্থির হয়ে রয়েছি। আমার হাতে, আমার গুলিতেই মরেছেন ইনি—তবু দেখ আমি তো হাহাকার করছি না।'

ওর স্পর্শে, ওর কথাতে হীরালাল সত্যিই শান্ত হল। মুখ তুলে তাকাল সে।

ওয়ালেস!

আশ্চর্য। ওয়ালেসের সঙ্গে আমিনার কী সম্পর্ক? পৃথিবীর কোন্ সুদূর প্রান্ত থেকে এসেছে সে, শ্বেতাঙ্গ ক্রীশ্চান—সে কী করে চিনলে এঁকে... হুসেনী বেগমকে? এত ব্যবধান এত দূরত্ব সত্ত্বেও কি এত ভালবাসা সম্ভব?

কিন্তু মিছেকথাও তো বলছে বলে মনে হচ্ছে না। মুখের রেখায় সুগভীর শোক ও প্রচণ্ড আত্মগ্লানি তো ভুল হবার নয়। তবে?

বিহ্বল হয়ে খানিক তাকিয়ে থেকে বলে সে, 'ইনি দেবী, ইনি আমার নমস্যা, যতদিন বাঁচব মনে মনে পুজো করব এঁকে!'

ওয়ালেস হাত বাড়িয়ে ওর ডান হাতটা চেপে ধরল, 'তোমার সে পূজায়

আমিও একজন অংশীদার রইলাম বাবু, তোমার সঙ্গে এ শোক আমি ভাগ করে নিলাম; তুমি আমার বন্ধু হলে—আজ থেকে তুমিই আমার একমাত্র বন্ধু।...কিন্তু তুমি শান্ত হও বন্ধু, স্থির হও। এ যুদ্ধক্ষেত্র, শোক করার স্থান এ নয়।...তা ছাড়া, আমাদের যে বিরাট একটা কাজ, একটা দায়িত্ব রয়েছে ভাই। সেটা ভুললে তো চলবে না। ওঁর এ দেহ না শেয়াল-কুকুরে খায় সেইটে দেখাই যে এখন সর্বাগ্রে দরকার। আর সে কাজটা তোমাকেই করতে হবে। আমার তো আর সময় নেই—এখন আমাদের অন্যত্র যেতে হবে, নতুন আক্রমণ শুরু হবে।'

বুঝল হীরালাল। মন্ত্রমুগ্ধের মত চোখের জল মুছে দাঁড়াল।

সে-ই সব ব্যবস্থার ভার নিযেছিল—ওয়ালেসদের আর সত্যিই সময ছিল না।

একেবারে সময় মিলল অনেক রাত্রে—আরও একটা লড়াইএর পর যখন বিশ্রামের আদেশ পাওয়া গেল, তখন।

বিশ্রাম নেওয়াই হয়তো উচিত ছিল, কিন্তু ওয়ালেস তা নিতে পারল না। কাঁধের বোঝাগুলো এক জাযগায় নামিয়ে রেখে সে তখনই বেরিযে পডল। হীরালালকে তার চাই, তাকে খুঁজে বের করতেই হবে। শেষের ব্যবস্থাটা কী হল সেটা জানা দরকার।

অনেক পিছনে কমিসারিয়েটের আস্তানা—সেইখানেই যাচ্ছিল হীরালালের সন্ধানে, কিন্তু অত দূর যেতে হল না। শিবিরের প্রান্তসীমায় পৌঁছতেই দেখা হযে গেল বিলি মিচেলের সঙ্গে। বিলি ওকে দেখে কাছে এগিযে এল, সোজা প্রশ্ন করল, 'তুমি কি চ্যাটার্জিকে খুঁজছ?'

বিস্মিত হলেও ওযালেস তা মুখে প্রকাশ করল না। বলল, 'হ্যাঁ। তাকে দেখেছ?'

'সে নদীতে স্নান করতে গেছে। ওদের দেশে নাকি আত্মীয-স্বজন মারা গেলে স্নান করাই নিয়ম।...আমি সেখানেই যচ্ছি। যাবে তুমি?'

'চল' বলে ওয়ালেস ওর সঙ্গে নদীর পথ ধরল।

খানিকটা চলবার পর ওয়ালেস খুব কুণ্ঠিত হয়ে প্রশ্ন করল, 'আচ্ছা সে মহিলার—মানে সেই মৃতদেহটার কী করতে পেরেছে জান?'

'হ্যাঁ।' সহজ ভাবেই উত্তর দিল বিলি, 'জানি বৈকি। অনেক ঘুরে

গ্রামের মধ্যে থেকে এক মোল্লাকে ধরে এই একটু আগে সব ব্যবস্থা ঠিক করেছে—সে-ই যা কিছু করবার করে কাল ভোরে মাটি দেবে।'

ওয়ালেস আর কিছু বললে না। শুধু যেন একটু সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে নিঃশব্দে পথ চলতে লাগল।

হীরালালের স্নান শেষ হলে নদীর ধারেই একটা গাছতলায় বসল ওরা। এদিক থেকে শত্রুর ঘাঁটি নির্মূল হয়েছে—এপারে ওপারে অনেকখানি পর্যন্ত এখন ইংরেজ-অধিকারে। নিশ্চিন্ত হয়ে বসা চলবে।

প্রথমটা তিন জনেই কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইল।

পাশেই গোমতী নদী—শান্ত অচঞ্চল নিরুদ্বিগ্ন। হয়তো নিঃশব্দে প্রবাহিত হচ্ছে কিন্তু সে বেগ বাইরে থেকে বোঝা যায় না। পাতলা একটা ধোঁয়াটে কুয়াশা জমে আছে জলের ওপর—সেটাও স্থির। কাল এ সময় কন্‌কনে ঠাণ্ডা বাতাস চলছিল কিন্তু আজ সমস্ত প্রকৃতি নিস্পন্দ থম্‌থম্ করছে। কোথাও একটা গাছের পাতা-নড়ার শব্দ পর্যন্ত নেই।

এমনি থম্‌থমে অবস্থা বুঝি ওদের মনেরও। হীরালাল একদৃষ্টে নদীর দিকে চেয়ে স্থির হয়ে বসে আছে একটা হাঁটুর ওপর মুখ রেখে। নিকট-আত্মীয়কে দাহ করে উঠলে যেমন হয়, তেমনি করুণ উদাস ভাব ওর মুখ-চোখের।...

বিলি এদের ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে না পারলেও শোকের তীব্রতাটা বুঝেছিল—সেই জন্যে একটা স্বাভাবিক সহানুভূতিতেই এতক্ষণ চুপ করে ছিল। সে এইবার একটা দুটো সাধারণ কথা বলে আবহাওয়াটাকে অপেক্ষাকৃত সহজ করে আনল।

একথা-সেকথার পর সে আসল প্রশ্নে পৌঁছল। যে কৌতূহলটা মনের মধ্যে প্রধান হয়ে উঠেছে সেটা আর চেপে রাখতে পারল না।

'আচ্ছা ভাই চ্যাটারজি, এই বেগমসাহেবা, মানে এ মহিলার সঙ্গে তোমার এত ঘনিষ্ঠ পরিচয় কী করে হল?'

হীরালাল একটু চুপ করে থেকে তার কাহিনীটা বিবৃত করল। তার বক্তব্য বেশি নয়—সহজ সংক্ষিপ্ত কথায় হুসেনী বেগমের সঙ্গে তার আকস্মিক পরিচয়ের ইতিহাস থেকে শুরু করে গত রাত্রির ঘটনা পর্যন্ত সবই খুলে বলল। সে যে কাল মিচেলেরও আগে আমিনাকে দেখেছিল এবং তাকে দেখেই যে

কোন একটা মৃত্যুফাঁদ আশঙ্কা করেছিল, আর শেষকালে যে ওর জন্তেই মিচেলের কাছ থেকে আধ ঘণ্টা সময় চেয়ে নিয়েছিল—এসব কিছুই গোপন করল না। আজ আর গোপন করার প্রয়োজনই বা কী ?

পরিশেষে বলল, 'কাল যখন কথাটা বলেছিলেন তখন অতটা বুঝি নি, আজ বুঝছি। তিনি জীবিত থাকতে আমি তাঁকে ছাড়ব না জেনেই প্রায় স্বেচ্ছায় প্রাণ দিয়ে আমাকে মুক্ত করে দিয়ে গেলেন !'

সে আবারও হু-হু করে কেঁদে উঠল।

বিলি আস্তে আস্তে ওর কাঁধে একটা হাত রেখে বলল, 'তুমি অনর্থক দুঃখ করছ চ্যাটার্জি। সমস্ত ঘটনারই একটা পরিণতি আছে, সেই সঙ্গে ভাগ্যেরও। এ-ই ওঁর জীবনের—ভাগ্যের পরিণতি—তুমি বা ওয়ালেস উপলক্ষ্য মাত্র।'

আবার কিছুক্ষণ সকলেই চুপ করে রইল। বিলি একবার নিঃশব্দে ওয়ালেসের দিকে তাকাল—কিন্তু কোন প্রশ্ন করতে বোধ করি ওর ভরসায় কুলোল না।

ওয়ালেস এতক্ষণ চুপ করে বসে শুনছিল। ঠিক চুপ করেও না—ওর ঠোঁট দুটি নিঃশব্দে নড়ছিল। সম্ভবত মনে মনে নিরন্তর প্রার্থনাই করে যাচ্ছিল মৃতের আত্মার জন্য, অথবা বাইবেল আবৃত্তি করছিল। সে এইবার কথা কইল। বলল, 'আমার কাহিনী এ জীবনে আর কাউকে বলব না ভেবেছিলাম, ঠিক বলবার মতও নয়। তবে হীরালালকে বন্ধু বলেছি, আর বিলি তুমি ওর বন্ধু। এখন মনে হচ্ছে তোমাদের কাছে বলা দরকার—না বললে বুঝি আমার এক মহৎ পাপ, এক ঘোর অবিচারের প্রায়শ্চিত্ত হবে না। ভুলই সেটা আমার—কিন্তু যে ভুলে এতগুলো লোকের সর্বনাশ হয়ে যায়. এক মহান প্রাণ এমন করে জ্বলে ও জ্বালিয়ে ছারখার হয়—সে ভুল করার আমার কোন অধিকার ছিল না।...সেইটেই আজ বলব।...অবশ্য আজ আর এ ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কেউই বেঁচে নেই—প্রায়—অন্তত এ কাহিনী প্রচারিত হলে ক্ষতি হতে পারে এমন কেউ নেই সুতরাং প্রত্যবায়ভাগী হবার কোন সম্ভবনা নেই।

এই বলে আরও কিছুক্ষণ মৌন থেকে ধীরে ধীরে আবার বলতে শুরু করলে সে। বলতে বলতে সংকোচ ও কুণ্ঠায় বার বার কণ্ঠ জড়িয়ে যেতে লাগল, অন্তরে অন্তরে ক্ষতবিক্ষত হতে লাগল—তবুও থামল না। কঠোর কর্তব্য অপ্রিয় হলেও যেমন ভাবে পালন করে মানুষ, তেমনি ভাবেই সেই অত্যাশ্চর্য কাহিনী বিবৃত করে গেল।

'ওয়ালেসও যেমন আমার নাম নয়—তেমনি ওরও নাম হোপ নয়। কিন্তু কী হবে আসল নাম বলে, মিছিমিছি পূজনীয় পূর্বপুরুষদের নামে খানিকটা কালি দিয়ে। যে নামের মর্যাদা আমরা রাখতে পারি নি—যে নাম আমরা গৌরবমণ্ডিত করতে পারি নি, সে নামে আমাদের অধিকার নেই।

'আমরা দু জনেই ভারতে এসেছিলাম অতি শৈশবে। আমাদের বাবারা ছিলেন ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির পদস্থ কর্মচারী। তার মধ্যে আমার বাবা ছিলেন যুদ্ধ-ব্যবসায়ী, সেনাপতি। আমাদের ভাল করে লেখাপড়া শেখাবার জন্যে ওঁরা দুই বন্ধু ব্যবস্থা করে তাঁদের পরিবার রেখেছিলেন স্থায়ীভাবে হিমালয়ের ওপরে এক পাহাড়ী শহরে। সেখানে আমরা এক সাহেবী স্কুলে পড়তাম, সেইখানেই থাকতে হত—তবু কাছাকাছি থাকবেন বলে মায়েরাও গিয়ে ওখানে বাসা বেঁধে ছিলেন। ঐখানেই আমাদের সঙ্গে পরিচয় হয় আমিনাদের। ওর বাবা খুব বড় জায়গীরদার ছিলেন—এ দেশের পুরোনো জমিদার বংশের লোক হলেও ওঁর মতামত ছিল খুব আধুনিক। ছেলেমেয়েদের ইংরেজি পড়ানো দরকার এটা তিনি বুঝেছিলেন। ছেলেকে লক্ষ্ণৌএর এক মিশনারী স্কুলে পড়িয়ে রুড়কিতে পাঠিয়েছিলেন ইঞ্জিনীয়ারিং পড়তে আর মেয়েদের দিয়েছিলেন আমাদের ঐ শহরের এক কন্‌ভেণ্টে। মেয়েদের টানে ওঁরাও মাঝে মাঝে আসতেন—সেজন্যে ওখানে একটা বাড়িও কিনেছিলেন।

'একই শহরে বাস—তা ছাড়া আমিনার বাবা ছিলেন সাহেবভক্ত মানুষ—কাজেই আমাদের তিন পরিবারে ঘনিষ্ঠতা হতে দেরি লাগে নি। অল্প বয়সে বন্ধুত্ব হয় বড় সহজে—ফলে শীগ্‌গিরই আমিনা-আজিজন ওদের দুই বোনের সঙ্গেও আমাদের বেশ আলাপ-পরিচয় হয়ে গেল। সে পরিচয় অচিরে অন্তরঙ্গতায় দাঁড়াল।

'ওরা দুই বোন হলেও ওদের প্রকৃতি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। আজিজন বরাবরই চপল চটুল কৌতুকপ্রিয়। আমিনা স্থির, ধীর, বেশী বুদ্ধিমতী। আমাদের দুই বন্ধুর প্রকৃতিও ছিল কতকটা অমনি। আমি আমার বাবার কাছ থেকে তাঁর ধর্মবিশ্বাস ও ভগবদ্ভক্তির কিছুটা পেয়েছিলাম, কিন্তু হোপের ওসবের বালাই ছিল না। কিছুই মানত না—সুখ ভোগবিলাস ছাড়া কিছু জানতও না সে। জেদী দুর্দান্ত মেজাজের ছেলে ছিল। ফলে ওদের দুই বোন একটা সূক্ষ্ম অলক্ষ্য নিয়মে আমাদের দুই বন্ধুর মধ্যে ভাগ হয়ে গেল। আমিনা পড়ল আমার ভাগে, আজিজন হোপের। এক কথায় জোড় বেঁধে গেলাম আমরা।

'তরুণ-তরুণীর বন্ধুত্ব প্রণয়ে পরিণত হতে দেরি হয় না। আমাদেরও হল না। শৈশবের খেলার সাথী যৌবনে প্রণয়ীতে পরিণত হবে এটা স্বাভাবিকও। আমরা স্থির করলাম আমরা কোন পারিবারিক বাধা মানব না—আমরা ওদেরই বিয়ে করব। আমিনার বাবার আপত্তি হত না—হত আমাদের বাপ-মায়ের, সেই জন্যই জীবিকা সংস্থানের কোন একটা উপায় না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করছিলাম আমরা। কিন্তু হেপের ধৈর্য ছিল না—বিয়ের আগেই আজিজনের সঙ্গে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক পাতিয়ে বসল। আমি এ নিয়ে তাকে অনেক তিরস্কার করলাম, কিন্তু সে হেসে উড়িয়ে দিল। বললে—যা হবেই, তা দু দিন আগে হলে ক্ষতি কী পাদরীসাহেব?

'কোন জিনিস করায়ত্ত হয়ে গেলে তাতে আর বিশেষ স্পৃহা থাকে না। হোপেরও রইল না। আজিজন সম্বন্ধে কৌতূহল মিটে গেছে তার—এবার সে নতুনের জন্য উৎসুক হয়ে উঠল। এ মনোভাবটা আমি বুঝেছিলাম—বুঝি নি কেবল যে, সে নতুন লক্ষ্য তার কোন্‌টি। সে যে এতবড় বিশ্বাসঘাতকতা করবে—তা আশৈশব তাকে দেখেও বুঝি নি। একদিন···একদিন একা বেড়াতে বেরিয়ে·· আমিনার মাথা ধরেছিল বলে বেরোতে চায় নি···আমি একাই বেরিয়েছিলাম · হঠাৎ ঘুরতে ঘুরতে আমাদের একটি প্রিয় পরিচিত জায়গাতে গিয়ে পড়লাম। সেখানে উঠতে উঠতে দূর থেকেই এক নারকীয় দৃশ্য চোখে পড়ল। এক পলকই দেখেছিলাম—কিন্তু তা-ই যথেষ্ট, আর বেশ দেখবার ইচ্ছা ছিল না। সেই এক লহমাতেই সমস্ত মানুষ, সমস্ত পৃথিবী, ঈশ্বরের সৃষ্টি এই জগৎসংসার তিক্ত বিষাক্ত হয়ে গেল। জীবনে আর কোন স্বাদ রুচি রইল না—যা কিছু তার রঙ রস, সব চলে গেল—ধূসর বিবর্ণ হয়ে গেল সব কিছু। আমিনাকে উপলক্ষ্য করে সমস্ত নারীজাতির ওপরই আমার একটা প্রবল ঘৃণা এসে গেল।

'সেখানে আর দাঁড়ালাম না। একেবারে পাগল হয়েই গিয়েছিলাম বোধ হয়—তাই এতদিনের সম্পর্কে এত সুগভীর ভালবাসায়ও এতটুকু বিশ্বাস রাখতে পারলাম না। সেই দিনই বাড়ি ছেড়ে, সে শহর ছেড়ে চলে এলাম চিরদিনের মত। কত বড় অবিচার, কত বড় অন্যায় যে করে এলাম তা একবারও মনে করলাম না—যা দেখলাম তার যে অন্য কোন ব্যাখ্যা থাকতে পারে তাও মনে পড়ল না—নিজের অহঙ্কারে ঘা পড়ে এমনই অন্ধ হয়ে গিয়েছিলাম আমি। শুধু কি তাই? শহর ছাড়ার পথে নিশীথরাত্রে পথের ধারে সে এসে

দাঁড়িয়েছিল—হয়তো চরম অপমানের প্রতিকার প্রার্থনাতেই—কিন্তু আমি ওটাকে চূড়ান্ত অভিনয় মনে করে ঘোড়ার উপর থেকেই তাকে এক লাথি মেরে চলে এলাম। ওঃ ভগবান! সেই দিনই কেন মৃত্যু হয় নি আমার!

'এ ভুল ভাঙল অনেকদিন পরে। ইংলণ্ডের এক ক্লাবে নেশার ঝোঁকে গর্ব করে বলছিল ঐ পাপিষ্ঠটা—কেমন আমাকে বোকা বানিয়েছে—কেমন করে আমার ওপর এক হাত নিয়েছে সে। সেই দিনই জানলুম—মাথাধরা অসহ্য হওয়াতেই বেচারী খোলা হাওয়ায় বেরিয়েছিল শেষ পর্যন্ত এবং সম্ভবত আমি আমাদের প্রিয় জায়গাতে থাকব মনে করে সেখানেই গিয়েছিল। আমার বদলে দেখেছিল হোপকে—তখনই চলে আসছিল, কিন্তু ঐ পশুটা আসতে দেয় নি। ওর মধ্যে তখন দানব জেগেছিল—সেই দানবটার শক্তির কাছে তার আর কতটুকু ক্ষমতা?

'তখনই ওকে শেষ করতাম। ওর মত পশুর সঙ্গে ডুএল লড়াও পাপ—হত্যাই করতাম—কিন্তু ইতিমধ্যে ঐ পাপিষ্ঠটা আর এক সর্বনাশ করেছিল। আমারই এক আত্মীয়-কন্যা কনস্ট্যান্স বলে একটি মেয়ের হৃদয় চুরি করে বসে আছে। তলোয়ার হাতে আমাকে আসতে দেখে সে আমার পায়ে আছড়ে পড়ল; তাতেও হয়তো শুনতুম না—কিন্তু বাইবেলের বাণী শুনিয়ে আমাকে সে নিরস্ত করলে। বললে, প্রভু বলেছেন Vengeance is mine, I shall repay, তুমি প্রতিশোধ নেবার কে? ..ফিরে এলাম—তবে তাকে দিয়েও প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিলাম যে সে হোপকে বিয়ে করতে চাইবে না কোন দিন।

'তখনই ছুটে এসেছিলাম ভারতবর্ষে, কিন্তু ওদের কোন পাত্তা পেলাম না। ওদের বংশের এক পুরাতন সেবক সর্দার খাঁ ও ওদের পুরনো গৃহশিক্ষক আমেদউল্লাকে খুঁজে বার করলাম। একই কথা শুনলাম—ইজ্জত ওদের প্রাণের চেয়েও বড়—সেই ইজ্জতের অপমান সইতে পারে নি—সেই দিনই ওরা দুই বোন গৃহত্যাগ করেছে। কোথায় গেছে তা কেউ জানে না।

'তার পর থেকে একই লক্ষ্য হয়েছিল আমার—জীবনের একই উদ্দেশ্য—ঐ পাপিষ্ঠটার মৃত্যু দেখব!···তাই ছায়ার মত অনুসরণ করেছি ওকে। ওর শাস্তি ও পেয়ে গেছে অবশ্য, ঈশ্বরের বিচারে এতটুকু ভুল হয় নি—কনস্ট্যান্সকে ও সত্যিই ভালবাসত—কিন্তু তাকে বিয়ে করতে পারে নি—পারে নি আমারই জন্যে, ওর প্রাণের ভয়েই কনস্ট্যান্স ওকে বিয়ে করে নি। তা ছাড়া, জীবনে শান্তি পায় নি একটুও—মূর্তিমান দুর্গ্রহের মত, অভিশাপের মত আমি পাশে

পাশে থাকতাম। ইদানীং ওরও মৃত্যুই কাম্য হয়ে উঠেছিল—শুধু পারে নি ক'নর জন্যই···কনিও গেল। সবাই গেল।···আমারও আর কেউ রইল না পৃথিবীতে। যে ঘৃণাকে অবলম্বন করে সব ব্যর্থতা ভুলে ছিলাম—সেটাও আর রইল না।'

ভগ্নকণ্ঠে কথাগুলো বলে থামল ওয়ালেস। শেষের দিকে গলা বুজে এসেছিল ওর—এখন যেন একেবারে বন্ধ হযে গেল। আবেগে বুকের কাছটা ফুলে ফুলে উঠছে—হতাশ্বাস, ব্যথা, একটা ঐকান্তিক আর্তি যেন একসঙ্গে নিরুদ্ধ বেগে মাথা কুটছে তার বুকে, প্রকাশের পথ পাচ্ছে না।—এমনি ভাবেই সমস্ত শরীর তার কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল।

হীরালাল আর মিচেল যেন সম্মোহিতের মত শুনছিল এই কাহিনী। অত্যাশ্চর্য, অলৌকিক সে ইতিহাস। উপন্যাসের মতই রোমাঞ্চকর, উপন্যাসের মতই অবিশ্বাস্য।

অনেক—অনেক ক্ষণ পরে হীরালাল কথা কইল, বলল, 'এখন কী করবেন ?'

'করব ?' একটু ম্লান হাসল ওয়ালেস, 'কী করব তা জানি না। ঈশ্বর যা করাবেন। আত্মহত্যার অধিকার নেই—নইলে তাই করতুম।'

দু জনের দীর্ঘ ইতিহাসে রাত কত হযেছে কেউ-ই খেয়াল করে নি। হঠাৎ পত্রপল্লব কাঁপিয়ে ভোরাই হাওয়া উঠল একটা। প্রথম পাখী ডেকে উঠল ওদের মাথার ওপর। চমকে উঠল ওরা তিন জনেই।

'ইস। ভোর হযে গেল যে। একটু পরেই বিউগ্‌ল্ বাজবে। চল ওঠা যাক!' মিচেলই সকলকে সচেতন করবার চেষ্টা করে।

'চল' বলে ওয়ালেস উঠে দাঁড়াল।

'তুমি এখন কোথায় যাবে চ্যাটার্জি ?' প্রশ্ন করল ওকে।

'আমি!' একটু চুপ করে থেকে হীরালাল বলে, 'যদি সকালটা একটু ছুটি নিতে পারি, ওঁর মাটি দেওয়ার সময়টা সেখানে যাব। সে সময়টা একটু থাকবার ইচ্ছা আছে।'

ওয়ালেস মুহূর্তকাল চোখ বুজে দাঁড়িয়ে রইল—তার পর জামার বোতামটা খুলে বুকের মধ্যে থেকে টেনে বার করল একটা হার আর তার সঙ্গে একটা লকেট। একবার লকেটটা খুলে যেন দেখতে গেল, পরক্ষণেই কী মনে করে সবসুদ্ধ হারটা হীরালালের শিথিল হাতের মধ্যে গুঁজে দিয়ে বললে, 'এটা তুমিই

...বলাতে তোমারই অধিকার বেশি।...আর, আর যদি পার তো মাটি ...বার আমার নাম করেও একমুঠো মাটি আর কটা ফুল ওর কাফনের ...পর আর সেই সময় চুপি চুপি ওকে আমার ছুটো কথা ব'ল,— ...মাকে ভালবাসত, তোমার কথা বিশ্বাস করবে। তাকে ব'ল, আমাকে ...সে... করার চেষ্টা করে। ব'ল যে আমি সত্যি সত্যিই অনুতপ্ত— ...জীবনভর সে অনুতাপ বহন করে বেড়িয়েছি আর বেড়াব। ব'ল—'

কথা শেষ করতে পারে না ওয়ালেস, আবারও গলা বুজে আসে তার। ...অবসরও মেলে না কিছু বলবার। তার আগেই দূরে কোথায় ...বিগল বেজে ওঠে।

সে... ত আছে কর্মের আহ্বান, কর্তব্যের আহ্বান। হৃদয়াবেগের ...তা থেকে মুক্তি।

ওয়ালেস দ্রুত হাঁটতে শুরু করল।

—এই লেখকের—